রাষ্ট্রবিজ্ঞান

(১ম পর্যায়)

(POLITICAL THEORY FOR THREE-YEAR DEGREE COURSE)

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম, এ, (ইতিহাস ও ধনবিজ্ঞান),
পি, এইচ, ডি, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার, ভাগবতরত্ন, ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ,
এইচ, ডি, জৈন কলেজ, আরা, ও ভূতপূর্ব ইন্‌স্পেক্টর অব
কলেজেস্‌, বিহার বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনা

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড ॥
১, শঙ্কর ঘোষ লেন
কলিকাতা-৬

প্রখ্যাত ধনবিজ্ঞানী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

ডক্টর শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের করকমলে

দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ

বহু ছাত্রছাত্রীর সনির্বন্ধ অনুরোধে এই সংস্করণে প্রতি অধ্যায়ের শেষে অনুশীলন নাম দিয়া কতকগুলি সম্ভাব্য প্রশ্ন সন্নিবেশ করা হইল এবং ঐ সব প্রশ্নের উত্তর লিখিতে হইলে কোন কোন কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন তাহা অতি সংক্ষেপে ইঙ্গিত করা হইল। যে সব প্রশ্নের পরে ১৯৬৪ ইত্যাদি সংখ্যা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দ ইত্যাদির প্রশ্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে। যে সব প্রশ্নের শেষে ঐ ধরনের সংখ্যা নাই সেগুলি ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনও জিজ্ঞাসা করা হয় নাই এমন কোন প্রশ্ন সাধারণতঃ সন্নিবেশ করা হইল না। তবে I. A. S. ইত্যাদি পরীক্ষাতে প্রদত্ত কয়েকটি প্রশ্নও ইহাতে কোথাও কোথাও দেওয়া হইল—সে সব স্থানে উহার উল্লেখ করা হইল। গ্রন্থের শেষে এমন কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিবার সন্ধান দেওয়া হইল যাহা সন্তোষজনকভাবে বুঝিবার জন্য সমগ্র গ্রন্থের উপর অধিকার থাকা দরকার। আশা করি বিষয়বস্তুর জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা বৈতরণী উত্তীর্ণ হইবার সহায়তাও ইহাতে মিলিবে।

গোলা দরিয়াপুর, পাটনা-৪ — শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

১।৬।১৯৬৫

সূচীপত্র

———

THREE-YEAR DEGREE COURSE

Syllabus in Political Science

Political Theory—Paper—I

Definition and scope of Political Science—Relation of Political Science to other Sciences—Methods of Political Science. Definition of State—Difference between State, Government and other Associations.

Leading Theories of the Origin and Nature of the State—Theory of Divine Origin—Theory of Force—Theory of Social Contract—views of Hobbes, Locke and Rousseau—Evolutionary theory of the Origin of the State—Organic Theory about the nature of the State—The Idealist Theory—Marxist concept of the State.

Nature and characteristics of Sovereignty—Legal and Political Sovereignty—De jure and De facto Sovereignty, Doctrine of Popular sovereignty—Austinian Theory of Sovereignty—its critical estimate—Theory of limited Sovereignty—Attacks on the Monistic Theory of Sovereignty.

Definition and Nature of Law—Different kinds of Law—Sources of Law—Distinction and relation between Law and morality—Relation between law and liberty—The concept of Liberty—Safeguards of liberty in a modern State—Concept of Natural Law and Natural Right.

Meaning of Nationality—Nation and Nationalism—Essential elements of Nationality—Right of Self-determination—Mono-national State vs. Poly-national State—Dangers of Nationalism—Nationalism and Internationalism.

Citizens and Aliens—Modes of acquiring citizenship—Rights and duties of citizens—Hindrances to good citizenship—Relation between Rights and duties.

Unions of States and Forms of Governments—Personal and Real Union—Confederation and Federal Union—Nature and types of Federation—Chief features and conditions of Federation—Merits and defects of Federation—Alliance—Distinction between Unitary and Federal Governments.

Forms of Governments—Monarchy, Aristocracy, Oligarchy and Democracy—Types of Democracy—Strength and Weakness of Democracy—Comparison between Democracy and Dictatorship—Conditions essential to the Success of Democracy—Parliamentary and Presidential Governments—their Strength and Weakness

Structure of Government—Organisation and functions of Legislature—Executive and Judiciary—Bi-cameralism—its merits and Defects—Separation of Powers.

Functions of Government—Individualism and Socialism—their comparative merits and defects—Types of Socialism. Constitution—Different kinds of Constitutions—their strength and weakness.

Party System—Its advantages and disadvantages. Two-Party System vs. Multiple Party System—one Party Rule.

Public Opinion—Its nature and importance in Popular Government—Agencies for formation of Public opinion.

Electorate—Universal Suffrage—Methods of minority representation—Direct and Indirect election—Relation between the representative and his Constituency.

ভূমিকা

রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি এবং ইহা কেন পড়ার দরকার?

"মানুষ জন্মে স্বাধীনরূপে, কিন্তু সর্বত্র সে শৃঙ্খলে আবদ্ধ," এই কথা বলিয়া রুশো তাঁহার 'সামাজিক চুক্তি' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ আরম্ভ করেন। তিনি যদি বলিতেন 'মানুষ জন্মে অসহায়রূপে, কিন্তু স্বাধীন হইবার শক্তি তাহার ভিতর অন্তর্নিহিত থাকে' তাহা হইলে বোধ হয় প্রকৃত অবস্থাটা বেশি প্রকাশ পাইত। মানুষ স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিবে কি না এবং করিলেও তাহা সফল হইবে কি না, তাহা অনেকটা নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর। যেখানে লোকে দুঃখ-কষ্ট দারিদ্র্যের তাড়নায় মুহ্যমান, অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহের চেষ্টায় পরস্পরের সহিত বিবাদ-বিসম্বাদে রত, সেখানে স্বাধীনতা লাভ করা বা উহা বজায় রাখা সহজ নহে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে, সর্বপ্রথমে সমাজের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা প্রয়োজন। ভাল করিয়া না জানিলে, না বুঝিলে কোন কিছুই আয়ত্ত করা যায় না। প্রাকৃতিক শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াই মানুষ উহাকে নিজের কাজে লাগাইয়াছে। তেমনি সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করিতে পারিলে আমরা পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতি করিতে সমর্থ হইব।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ ছাড়া সে টিকিতে পারে না। সমাজের মধ্যেই তাহার চরিত্রের বিকাশ সম্ভব। সমাজ সংগঠনের মৌলিক তত্ত্ব হইতেছে আদেশ দান ও আজ্ঞা পালন। একজনে বা একদল লোকে আদেশ করে, আর অপর সকলে তাহা প্রতিপালন করে। যেখানে কেহই কাহারও কথা শুনে না, সকলেই নিজের নিজের খেয়ালখুশি মতন কাজ করে, সেখানে কোন সমাজের অস্তিত্ব বজায় থাকিতে পারে না। শিশুরা বাপ মায়ের কথা অনুসারে চলে। তাঁহাদের আদেশ অনুসারে কাজ করিতে করিতে ক্রমশঃ তাহারা শিক্ষক, গ্রাম-নায়ক, উচ্চতন কর্মচারী প্রভৃতির আজ্ঞানুবর্তী হইতে শিখে। কিন্তু শিশু একটু বড় হইলেই অপরকে আদেশ

সকল সংগঠনের মূলে আছে আদেশ দান ও আজ্ঞাপালন

করিতে চাহে। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে আজ্ঞা পালন করিবার ও আদেশ দিবার প্রবৃত্তি বর্তমান আছে। গ্রীক্ দার্শনিকেরা অবশ্য বলিতেন যে, একদল লোক আদেশ করিবে ও অন্য সকলে তাহা মানিয়া চলিবে ইহাই স্বাভাবিক। প্রাচীন ভারতবর্ষেও শূদ্র শ্রেণীর জন্য শুধু উচ্চতর বর্ণের সেবা করা ও তাঁহাদের কথামত চলাই ধর্ম বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু আধুনিক যুগে এরূপ ব্যবস্থা অচল। প্রত্যেক মানুষের সমান অধিকার। অধিকার কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইলে জনসাধারণকে আত্ম-সচেতন হইতে হয়। প্রকৃত পক্ষে স্বাধীনতা সেইখানে সম্ভব যেখানে সমাজ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে সতর্ক থাকে ও পরস্পরকে সেবা করিবার ভাবাদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়।

সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা

সমাজের মধ্যে দুইটি পরস্পর-বিরোধী প্রবৃত্তি দেখা যায়। একটি হইতেছে দশজনে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবার প্রবৃত্তি, যাহাকে বলা যায় সহযোগিতা। আর অপরটির নাম প্রতিযোগিতা—অন্যের চেয়ে আমি বড় হইব, অন্যের যাহা নাই তাহা আমার হউক বা অন্যের যাহা আছে তাহা আমার আয়ত্তে আসুক। সহযোগিতা না থাকিলে মানুষ অতিকায় হিংস্র জীবজন্তুর হাত হইতে বাঁচিতেই পারিত না। মানুষের ঘর-বাড়ি, গ্রাম-নগর, বস্ত্র-অলংকার, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা সংস্কৃতি সব কিছু পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার ফলে গড়িয়া উঠিয়াছে। যে গোষ্ঠীতে, সংঘে বা সমাজে সহযোগিতার ইচ্ছা যত প্রবল, সেই সংগঠন তত বেশি সুদৃঢ় ও শক্তিশালী। কিন্তু যে কোনপ্রকার সংগঠনের মধ্যে দেখা যায় যে পরিচালনা করে একজন বা কয়েকজন আর পরিচালিত হয় বহুজন। যাহারা পরিচালনা করে তাহারা অল্প বা অধিক পরিমাণে ক্ষমতা উপভোগ করে। ক্ষমতা মদের চেয়েও বেশি নেশা জন্মায়। ক্ষমতা একবার হাতে পাইলে লোকে আর সহজে তাহা ছাড়িতে চাহে না। ক্ষমতালাভের জন্য উচ্চাভিলাষীদের মধ্যে ঘোরতর প্রতিযোগিতা দেখা যায়। যে রাষ্ট্র মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর

ক্ষমতার নেশা

করিবার জন্য সংগঠিত হইয়াছে, সেখানে ক্ষমতা লাভ করিবার জন্য ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এবং এক দলের বা এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য দলের বা অন্য শ্রেণীর ঘোরতর বিরোধ বাধিতেছে। আবার

অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বাড়াইবার জন্য এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের প্রতিযোগিতা চলিতেছে। সেই প্রতিযোগিতার ভাব উগ্র হইলে যুদ্ধ বাধে।

ঝড়বৃষ্টি, বন্যা, বজ্রপাত, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যতটা অনিষ্ট ঘটে, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশি উৎপাত হয় যুদ্ধের ফলে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষ প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার হাত হইতে বাঁচিবার অনেক উপায় বাহির করিয়াছে। কিন্তু এ পর্যন্ত আমরা যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করিবার জন্য বিশেষ কিছুই করিতে পারি নাই। বড় বড় রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা অপেক্ষা প্রতিযোগিতার প্রভাব অধিক বলিয়া হাজার হাজার যুবক জনসমাজের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ না করিয়া মানুষকে ধ্বংস করিবার উপযোগী পারমাণবিক বোমা প্রভৃতি উৎপাদন করিতেছে। আহারের অভাবে, রোগের যন্ত্রণায় ও মাথা গুঁজিবার মতন একটু জায়গা না পাইয়া লক্ষ লক্ষ লোক কত কষ্ট পাইতেছে, অথচ কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হইতেছে যুদ্ধের উদ্যোগ-আয়োজনে।

আন্তর্জাতিক সহ-যোগিতার গুরুত্ব

অজ্ঞানতা হইতেই বন্ধন এবং জ্ঞানই বন্ধন মুক্তির একমাত্র উপায়—একথা শুধু মোক্ষ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে, ব্যবহারিক জীবনেও ইহার সত্যতা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। আজ্ঞা কে দেয়, কেন দেয়, কেনই বা উহা মানা হয়, ক্ষমতা কি ভাবে হস্তগত হয়, কি উপায়ে উহাকে সংযত করিয়া জন-কল্যাণের পথে ব্যবহার করা যায়, এই সব বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কার্য। প্রত্যেক দেশের জনসাধারণ যদি আলস্য ও ঔদাসীন্য ত্যাগ করিয়া এই সব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আর স্বার্থান্ধ ক্ষমতা-লোভীদের হাতে তাঁহাদিগকে খেলার পুতুল হইয়া থাকিতে হয় না; যুদ্ধের বিভীষিকাও বিদূরিত হইয়া আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভাব প্রকটিত হয়।

ক্ষমতাকে কি ভাবে জনকল্যাণে নিয়োজিত করা যায়

রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম প্রয়োজনীয় শাখা। ইহার আলোচনার ফলে মানুষ সমাজকে জানিতে পারে, সমাজের প্রতি তাহার

কি কর্তব্য, সমাজে তাহার কি অধিকার, কি উপায়ে সেই অধিকার রক্ষা করা যায় ও কর্তব্য পালন করা যায়, সমাজের রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা কি ভাবে পরিচালিত হইতেছে এই সব তথ্য সম্বন্ধে জ্ঞানদান করা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। ইহা পাঠ করিলে মানুষ একদিকে যেমন নিজেকে জানিতে পারে, অন্যদিকে তেমনি সমাজে তাহার স্থান কোথায় সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইয়া জীবনকে সুপরিচালিত করিতে পারে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়নের উপকারিতা

এ যুগে রাষ্ট্রের কার্য মানুষের আচরণ ও ব্যবহারের সর্বক্ষেত্রে প্রসারিত। জন্মিবামাত্র শিশুর জন্ম তারিখ রাষ্ট্র লিখিয়া রাখে, আবার মৃত্যুর পরও রাষ্ট্রের দ্বারা অনুমোদিত স্থানে শবদেহ সৎকার করা হয়। মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, আহার, বাসস্থান, বিদেশ যাত্রা প্রভৃতি অধিকাংশ কার্য রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং আজ আর সেকালের মতন কেহ বলিতে পারেন না যে, রাজা-উজীরের কথায় তাঁহার কি লাভ-ক্ষতি? রাষ্ট্রবিষয়ে ঔদাসীন্যের মূল্য দাসত্ব। দাসত্ব-শৃঙ্খল ছেদনের প্রকৃষ্টতম উপায় রাষ্ট্রের তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান সঞ্চয় করা।

রাষ্ট্রের গুরুত্ব

এখন পৃথিবী হইতে নিরংকুশ রাজতন্ত্র লোপ পাইয়াছে। দেশের শাসনকার্য জনসাধারণের মত অনুসারে পরিচালিত হয়। কিন্তু লোকে যদি রাষ্ট্রের কার্যকলাপ ও তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অজ্ঞ হয়, তাহা হইলে তাহাদের মতামতের মূল্য বড় বেশি হয় না। এক জোড়া জুতা তৈয়ারি করিতে হইলেও কিছুদিন শিক্ষানবিশী করা প্রয়োজন হয়। চিকিৎসাশাস্ত্র যিনি পড়েন নাই, তাঁহাকে ডাক্তারী করিতে দেওয়া হয় না। অথচ রাষ্ট্রের আইন তৈয়ারি করিবার জন্য আমরা যাঁহাদিগকে নির্বাচন করি অথবা রাষ্ট্রের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জন্য যাঁহারা নিযুক্ত হন, তাঁহারা রাষ্ট্র সম্বন্ধে কিছু জানেন কিনা—সে বিষয়ে বড় একটা খোঁজখবর লই না। রাষ্ট্রীয় কর্মচারীবৃন্দের (civil service) পক্ষে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞান অপরিহার্য বিবেচিত হওয়া উচিত।

জনসাধারণের দায়িত্ব

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের ফলে আমরা ধাপ্পাবাজদের কুযুক্তি ও অপসিদ্ধান্তের হাত হইতে বাঁচিতে পারি। যে কাজ অন্যায় ও নীতি বিগর্হিত তাহা রাষ্ট্রের বা জাতির (race) নামে করিলেই ন্যায়সঙ্গত হয় না। মহাত্মা

গান্ধী বারংবার বলিয়াছেন যে, আমাদের উদ্দেশ্য শুধু মহৎ হইলে চলিবে না, যে উপায়ে ঐ উদ্দেশ্য আমরা সাধন করিব তাহাও সৎ ও নীতি-অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। মাঝে মাঝে ধুয়া উঠে যে, ব্যক্তি রাষ্ট্রের জন্য জীবন ধারণ করে, সমষ্টির নিকট ব্যষ্টি কিছুই নহে। কিন্তু রাষ্ট্রকে একটা দার্শনিক অবাস্তবতায় মণ্ডিত করিয়া তাহার যূপকাষ্ঠে ব্যক্তিকে বলি দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। রাষ্ট্র ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য উদ্ভূত হইয়াছে, ব্যক্তিকে পিষিয়া ফেলিবার জন্য নহে।

ব্যক্তির বিকাশই রাষ্ট্রের লক্ষ্য

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষিত হইবার কয়েক মাস পূর্বে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন :

> ....ক্ষুব্ধ যারা, লুব্ধ যারা,
> মাংসগন্ধে মুগ্ধ যারা, একান্ত আত্মার দৃষ্টিহারা
> শ্মশানের প্রান্তচর, আবর্জনাকুণ্ড তব ঘেরি
> বীভৎস চীৎকারে তারা, রাত্রিদিন করে ফেরাফেরি
> নির্লজ্জ হিংসায় করে হানাহানি।
>
> শুনি তাই আজি
> মানুষ-জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি। (সেঁজুতি)

মানুষ-জন্তুকে প্রকৃত মানুষ করিবার চেষ্টা অনেক কাল হইতে চলিতেছে। কিন্তু সে চেষ্টা সার্থক হয় নাই। প্রায় তেইশ শত বৎসর পূর্বে প্লেটো লিখিয়াছিলেন—

"Man, when perfected, is the best of animals, but when separated from law and justice, he is the worst of all." আধুনিক-যুগে রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানুষকে বিধান ও সুবিচারের বিষয়ে সচেতন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়নের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে পাঠককে উদারনৈতিক সুশিক্ষা প্রদান করা। বহুযুগের ও বহু দেশের মনীষিগণ ক্ষমতার উৎপত্তি, ব্যবহার সংরক্ষণ সম্বন্ধে যে সব আলোচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বুদ্ধিবৃত্তি সুতীক্ষ্ণ হইবে এবং উহার সাহায্যে নাগরিক তাহার কর্তব্য নিরূপণ করিতে পারিবে।

উদার শিক্ষার পক্ষে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অপরিহার্য

পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, প্রাচীন গ্রীসেই রাষ্ট্রীয় তত্ত্ব আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছিল। প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের চিন্তাধারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও মহাভারতের শান্তিপর্ব হইতে জানা যায় যে, মৌর্য সাম্রাজ্য স্থাপনের পূর্বে রাজনীতি বিষয়ে বহু প্রকার মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। শান্তিপর্বে আছে যে ব্রহ্মা এক লক্ষ অধ্যায়ের একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; উহার রাজনীতি সম্পর্কিত বিষয়গুলি শঙ্কর বিশালাক্ষ দশ হাজার অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করেন। তারপর ইন্দ্র পাঁচ হাজার অধ্যায়ের, বৃহস্পতি তিনহাজার অধ্যায়ের এবং কাব্য বা শুক্র এক হাজার অধ্যায়ের বই লেখেন। কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে ভরদ্বাজ, বিশালাক্ষ, পিশুন, কৌণপদন্ত, বাতব্যাধি, বহুদন্তিপুত্র, পরাশর ও পারাশরের মতবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। বার্হস্পত্যমতানুসারে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে বার্তা (ধনবিজ্ঞান) ও দণ্ডনীতি (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) হইতেছে প্রধান। কিন্তু শুক্র বলেন যে, একমাত্র দণ্ডনীতিই প্রধান, অন্যান্য বিদ্যা গৌণ। কৌটিল্য বলেন, যে ত্রয়ী বা বেদ, আন্বীক্ষিকী বা দর্শন, বার্তা ও দণ্ডনীতি এই চার বিদ্যাই প্রধান বটে, কিন্তু একমাত্র দণ্ডনীতিই অলব্ধ বস্তু লাভ করিবার, লব্ধ বস্তু রক্ষা ও বৃদ্ধি করিবার উপায় বিধান করে এবং উপযুক্ত পাত্রদের মধ্যে লব্ধ বস্তুর বিতরণের ব্যবস্থা করে। কৌটিল্যের এই মন্তব্য হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রাচীন ভারতে রাজনীতির স্থান কত উচ্চে ছিল। কিন্তু সেকালে রাজনীতির অধ্যয়ন কেবলমাত্র রাজপুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ লোকে ইহা পাঠ করিত বলিয়া মনে হয় না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উদ্ভব

ইউরোপ ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পঠন-পাঠন একশত বৎসরের চেয়ে বেশি প্রাচীন নহে। কেবল মাত্র সুইডেনে তিন শতাধিক বৎসর পূর্বে রাষ্ট্র-কৌশল (statecraft) ও বাগ্মিতা সম্বন্ধে এক অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করা হইয়াছিল। ব্রিটিশ শাসন-কালে ভারতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপনাকে কর্তৃপক্ষ সুনজরে দেখিতেন না। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন বর্তমান লেখকের History of Political Thought from Rammohan to Dayananda প্রকাশ করেন, তখন বিহার সরকারের

ইহার পঠন-পাঠনের প্রচলন

আদেশে একজন পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লেখকের ক্লাসে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিলেন। ভারতে গণতন্ত্র স্থাপিত হইবার পর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যয়ন-অধ্যাপনাকে যথোচিত উৎসাহ প্রদান করা হইতেছে। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই যে সকল তরুণ ছাত্র ভোটদাতা, রাজকর্মচারী, আইনসভা, ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতির সদস্যরূপে রাষ্ট্রের কার্য নিয়ন্ত্রণ করিবেন তাঁহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে শিক্ষিত না হইলে আমরা অন্ধের দ্বারা পরিচালিত অন্ধজন রহিয়া যাইব।

প্রথম অধ্যায়

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

১। **রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ঃ** রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি নূতন বিষয়। ইহার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ধারণা দিন দিন বদলাইতেছে। তাহার কারণ রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি প্রগতিশীল (dynamic) শাস্ত্র। জার্মান পণ্ডিত ব্লুনট্‌স্‌লি (Bluntschlli) বলেন যে, এই বিজ্ঞান রাষ্ট্রের মৌলিক অবস্থা এবং প্রকৃতি, ইহার বিভিন্ন রূপ ও বিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তাহার স্বরূপ বুঝিতে চায় (It is the science which is concerned with the state, which endeavours to understand and comprehend the state in its fundamental conditions, in its essential nature, its various forms of manifestation, its development.) পল জানে (Paul Janet) বলেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের সেই অংশ যাহা রাষ্ট্রের মূল প্রকৃতি এবং শাসনব্যবস্থার মূল নীতি লইয়া আলোচনা করে। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে জার্মান রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিকেরা এক সম্মেলনে স্থির করেন যে সার্বজনীন জীবনের (public life) সমস্যা, বিশেষ করিয়া ক্ষমতা ও সভ্যতার আলোচনাই রাষ্ট্রবিজ্ঞান। প্রায় ঐ সময়েই আরোঁ (Aron) সংজ্ঞা নির্দেশ করেন যে, অসংখ্য ও জটিল সামাজিক সংস্থার ভিতরে যে কর্তৃত্বের নীচু হইতে উঁচু সিড়ি আছে তাহার অধ্যয়নই রাষ্ট্রবিজ্ঞান (pyramid of authority inside all numerous and complex communities)। ভারতীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আপ্পাদোরাইয়ের মতে সকল প্রকার সামাজিক সংস্থায় কি ভাবে কর্তৃত্ব পরিচালনা করা হয় এবং বশ্যতা স্বীকার করা হয় তাহার আলোচনাই রাষ্ট্রবিজ্ঞান। ক্যাটলিন বলেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজের মধ্যে মানুষের কথা বিশেষ করিয়া পরস্পরের সম্বন্ধের কথা আলোচনা করে। অধ্যাপক রবসন্ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই ক্রমবিকাশের সময়ে সংজ্ঞা নির্দেশের পক্ষপাতী নহেন। সংজ্ঞার পরিধি ছোট হইলে যেমন রাষ্ট্রবিজ্ঞান অসম্পূর্ণ হয়, তেমনি অনর্থক বহুব্যাপক হইলে উহা অসম্বদ্ধ হয়। ব্লুনট্‌সলি প্রদত্ত সংজ্ঞা রাষ্ট্র-

বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ হইতে বিভিন্ন সংজ্ঞা

সংজ্ঞা নির্ণয়ের বিপদ

বিজ্ঞানকে সংকীর্ণ করে, কেন না ইহাতে শাসনপদ্ধতি, উহার উপর জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব, আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ করা হয় নাই। সভ্যতা ও সমাজব্যবস্থার সকল সমস্যা লইয়া টানাটানি করিতে গেলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি অনর্থক বহুবিস্তৃত হইবে। রবসনের ভাষায় বলিতে গেলে আমরা যেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সর্বগ্রাসী (totalitarian) করিয়া না তুলি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু কি কি তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা UNESCO তৈয়ারি করিয়াছেন। উহা হইতেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্বরূপ উপলব্ধি করা যাইবে।

২। **রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিধি** (Scope): রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্গত কি কি বিষয় থাকা উচিত সে সম্বন্ধে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিক্ষা-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (UNESCO) একটি সম্মেলনে আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, নিম্নলিখিত চারিটি বিষয় ইহার অঙ্গীভূত :—(১) রাষ্ট্রীয় মতবাদ বা সিদ্ধান্ত ও তাহাদের ইতিহাস (২) রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও তাহার অন্তর্গত সংবিধান (constitution), জাতীয় সরকার, প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসনপ্রণালী ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের তুলনামূলক সমালোচনা, (৩) রাজনৈতিক দল, উপদল ও সংজ্ঞাসমূহ সরকারী কাজে ও শাসন-পদ্ধতিতে নাগরিকের অংশ গ্রহণ এবং জনমত, (৪) আন্তর্জাতিক বিধান, রাজনীতি ও সংস্থা। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কেবলমাত্র রাষ্ট্রসম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা করিয়া ক্ষান্ত হয় না। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আচার-ব্যবহার ও সরকারী কাজকর্ম বিশ্লেষণ করা ইহার অন্যতম কার্য।

চারিটি প্রধান বিভাগ

রাষ্ট্র সমাজের একটি অঙ্গ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল সমাজের মধ্যে ক্ষমতার ভিত্তি কি, কি ভাবে উহা ব্যবহার হয়, কোথায় উহা প্রযুক্ত হয় এবং তাহার ফলে কি দাঁড়ায় সেই বিষয়ে অনুসন্ধান করা। ক্ষমতা বলিতে কিন্তু শুধু দৈহিক ক্ষমতা বুঝায় না—নৈতিক প্রভাবও ইহার অন্তর্ভুক্ত। পূর্বে কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করিতেন যে, আমাদের কারবার বুঝি শুধু সংবিধান, সরকার ও তাহার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা লইয়া। কিন্তু এখন সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হইয়াছে যে, শ্রমিকসংঘ বা ট্রেড ইউনিয়ন, বণিক সংঘ, উৎপাদক সংঘ, ধর্মমণ্ডলী প্রভৃতি

ক্ষমতা লইয়া বিচার

সংস্থাতে কি ভাবে ক্ষমতা ব্যবহৃত হয় এবং ঐ ব্যবহারের ফলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কিভাবে প্রভাবান্বিত হয় তাহাও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। ক্ষমতা কি ভাবে লাভ করা হইতেছে, ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখিবার জন্য অথবা বিপক্ষ দলকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার জন্য কি ভাবে বিরোধ চলিতেছে, প্রভাব বিস্তারের জন্য কি করা হইতেছে, প্রভাবের হাত হইতে মুক্ত হইবার জন্যই বা লোক কি করিতেছে এই সব বিষয় সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর কৌতূহল অসীম। আর্থিক ক্ষেত্রে মানুষ যেমন ধনসম্পত্তি চাহে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তেমনি ক্ষমতা চাহে। ক্ষমতার ভাল-মন্দ দুই দিকই আছে। ক্ষমতা হাতে না পাইলে মানুষের দুঃখ, দারিদ্র্য, রুগ্নতা, অশিক্ষা প্রভৃতি দূর করা যায় না। আবার ক্ষমতা হাতে পাইলে, বিশেষ করিয়া নিরংকুশ (absolute) ক্ষমতা লাভ করিলে, লোকে মদমত্ত হইয়া অনেক অন্যায় কার্যও করে। সেইজন্য ক্ষমতা কোন্ প্রকারের লোকের হাতে দিলে তাহার অপব্যবহারের আশংকা কম তাহাও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অনুসন্ধান করেন। ক্ষমতা হাতে পাইবার জন্য কোন্ ধরনের লোক আগাইয়া আসে, তাহাদের কি কি উদ্দেশ্য থাকে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধানও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সীমানার অন্তর্গত।

প্রভাব

প্লেটোর (৪২৭-৩৪৭ খৃঃ পূঃ) সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত রাষ্ট্রের স্বরূপ ও কার্যাবলী লইয়া বহু মনীষী অনেক প্রকারের আলোচনা করিয়াছেন। আবার মানব সভ্যতার প্রথম প্রভাত হইতে আরম্ভ করিয়া একাল পর্যন্ত ছোট বড় অনেক ধরনের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দেখা গিয়াছে। অতীতের মতবাদ ও রাজনৈতিক সংগঠন সম্বন্ধে অধ্যয়ন করিয়া আমরা বর্তমানের রাষ্ট্রীয় সমস্যা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারি। অতীতের চিন্তাধারা ও ঘটনা প্রবাহের ফলেই বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। একদিকে যেমন রাষ্ট্রের অতীত ও বর্তমান আমাদের আলোচ্য বিষয়, অন্যদিকে তেমনি উহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও আমরা উদাসীন থাকিতে পারি না। যে সকল বাধাবিপত্তি বর্তমান কালে জনসাধারণকে শোষণ ও পেষণ করিতেছে, তাহা দূর করিবার উপায় চিন্তা করাও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কর্তব্য।

অতীত ও বর্তমানের সম্বন্ধ

অধুনা এক শ্রেণীর রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলিতেছেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজ

হইতেছে শুধু বিশ্লেষণ করা। রাষ্ট্রবিজ্ঞান নৈর্ব্যক্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ (objective) দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সামাজিক প্রত্যেক প্রকারের সংগঠনের কিভাবে নিয়ন্ত্রণ হইতেছে তাহা আলোচনা করিবে, কিন্তু তাহা ভাল কি মন্দ সে বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবে না। ভালমন্দের বিচার বা মূল্য নিরূপণ লোকের ব্যক্তিগত রুচি ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে বলিয়া তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে উহার স্থান নাই। ইঁহারা বলেন যে, যাহা নিতান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাহা বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। পারিভাষিক শব্দে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, ইঁহাদের মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে Positive Science, Normative Science নহে—মূল্য নির্ধারণ করা ইহার কাজ নহে। গ্রীণের সময়ে (T. H. Green ১৮৩৬-৮২) ছাত্রেরা রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়িয়া ন্যায়নীতিতে দীক্ষিত হইত, কিন্তু এখন বলা হইতেছে যে, মতাদর্শ প্রচার করা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজ নহে। Greaves বলেন যে, এই মত যদি ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়, তাহা হইলে হয়তো রাষ্ট্রবিজ্ঞান লোপ পাইবে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি ভালো মন্দ বিচার করিবে না?

মূল্য নিরূপণের কাজ বিজ্ঞান সম্মত না হইতে পারে, কিন্তু কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ, তাহার একটা মাপকাঠি না থাকিলে লোকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়িবে কেন? বিশ্বজনীন নৈতিক আদর্শ স্থাপন করিবার জন্য মানুষের নৈতিক সমস্যাও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর অনুসন্ধানের বিষয়। রবসন বলেন যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু কি আছে তাহাই লইয়া আলোচনা করে না, কি হওয়া উচিত তাহাও বিচার করে। "It is concerned both with what is and also with what should be. Political Science can not be indifferent to the results of Government, unable to distinguish between the good and the bad use of power……So negative an attitude would deprive the subject of its main interest, and render it devoid of significance and usefulness."*

৩। নাম লইয়া মতভেদঃ আরিস্টটলকে (৩৮৪-৩২২ খৃঃ পূঃ) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আদিগুরু বলিয়া অভিহিত করা হয়। তিনি নগর, রাষ্ট্র ও উহার সভ্যদের সম্বন্ধে যে গ্রন্থ রচনা করেন তাহাকে Politics বা রাজনীতি নামে অভিহিত করিয়াছেন। জেলিনেক, সিজউইক, পোলক

প্রভৃতি পণ্ডিতও আমাদের আলোচ্য বিষয়কে রাজনীতি বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ইহার দুইটি বিভাগ—সিদ্ধান্তমূলক রাজনীতি (Theoretical Politics) ও ব্যবহারিক রাজনীতি (Applied Politics)। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক ক্যাটলিন কিন্তু বলেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রীয় দর্শন এই দুই বিষয় লইয়া Politics বা রাজনীতি। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলিতে তিনি বুঝেন কিভাবে রাষ্ট্রীয় ঘটনা ঘটিতেছে এবং কিভাবে তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহার অধ্যয়ন। তাঁহার মতে রাষ্ট্রীয় দর্শন রাষ্ট্রীয় ঘটনার মূল্য বিচার করে ও আদর্শ স্থাপন করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু বিশ্লেষণ করে আর রাষ্ট্রদর্শন আলোচনা করে রাষ্ট্রের আদর্শ কি হওয়া উচিত এবং কোন্ মূল্যায়নের অনুসরণ করা কর্তব্য। রাজনীতি শব্দটি যদি বাজারে ঠিক এই অর্থেই ব্যবহৃত হইত তাহা হইলে বিশেষ আপত্তির কিছু ছিল না। কিন্তু সাধারণ লোকে রাজনীতি বলিতে সরকারের অনুসৃত বিশেষ কোন নীতি কিংবা নির্বাচন প্রভৃতি লইয়া আগ্রহকে রাজনীতি বলে। যে ব্যক্তি ভোট সংগ্রহ করেন, দলাদলি করেন, বিধানসভার সদস্যগিরি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন, তাঁহাকে রাজনৈতিক ব্যক্তি বলা হয়। তিনি হয়তো রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রদর্শন সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ হইতে পারেন। যে শব্দের অর্থ পণ্ডিতে এক রকম বুঝিবেন, জনসাধারণ অন্য রকম বুঝিবেন সে শব্দ কোন গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় ব্যবহার না করাই কর্তব্য।

রাজনীতি বা Politics

পূর্বে কয়েকটি পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রের উৎপত্তি, প্রকৃতি, ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ, রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্র প্রভৃতি আলোচনাকে রাষ্ট্রীয় দর্শন নামে অভিহিত করিয়া উহা দর্শনশাস্ত্রের অংশরূপে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা ছিল। এখন অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র পঠিতব্য বিষয় হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা রাষ্ট্রীয় দর্শনের সংজ্ঞা অপেক্ষা বেশি ব্যাপক। রাষ্ট্রীয় দর্শন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

রাষ্ট্রীয় দর্শন

৪। **রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি হিসাবে বিজ্ঞান?** যে কোন বিষয়ের সুসম্বদ্ধ ও অধ্যাপনাযোগ্য জ্ঞানকে যদি বিজ্ঞান বলা যায়, তাহা হইলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানও বিজ্ঞান নামে অভিহিত হইতে পারে। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে

উপনীত হইবার জন্য পর্যবেক্ষণ, শ্রেণীবিভাগ, অনুমান ও অনুমিত পদার্থের সত্যতা বিচারের জন্য পরীক্ষা বা experiment করা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা আরিস্টটলের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত বহু দেশের ও বহু যুগের শাসনপদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, সমধর্মী সরকারগুলিকে এক এক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন এবং এই ধরনের সরকার হইলে এইরূপ ফল হইবে ইহা অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা পরীক্ষা করিতে পারেন না। নাগরিকদের বাক্-স্বাধীনতা বিলোপ করিলে কিরূপ ফল হইবে তাহা তাঁহারা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বন্ধ করিয়া দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন না। সে ক্ষমতা তাঁহাদের নাই, থাকিলেও উহার প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি ভৌতিকবিজ্ঞানের সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এইখানে একটি পার্থক্য। তাহার উপর আবার আর একটি গুরুতর প্রভেদ দেখা যায়। ভৌতিক বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত উত্তাপ, বিদ্যুৎ, পরমাণু প্রভৃতির স্বাধীন ইচ্ছা বলিয়া কিছু নাই। তাহারা নিয়মের অধীন, নিয়ম অনুসারে কাজ করিতে বাধ্য। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কারবার মানুষকে লইয়া। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা আছে। মানুষ সংঘবদ্ধ হইয়া সমাজে বাস করে। সামাজিক মন বলিয়া যে একটি সমষ্টিগত চেতনা আছে তাহা কিরূপ ঘটনায় কিভাবে প্রকট হইবে তাহা নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন। বস্তুতঃ যেমন ব্যষ্টিপুরুষের, তেমনি সমষ্টিপুরুষের আচরণ জটিল। ভৌতিকবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি কোন পদার্থকে তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পদার্থ হইতে পৃথক করিয়া লইয়া পরীক্ষা চালানো সম্ভব, কিন্তু মানুষকে তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখা একরূপ অসম্ভব। ভৌতিকবিজ্ঞান পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা কতকগুলি প্রাকৃতিক বিধান আবিষ্কার করিতে পারে। ঐ সব বিধান সর্বকালে সর্বদেশে সত্য। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পক্ষে এমন কিছু বলা সম্ভব নহে, যাহা স্থান-কাল-পাত্র-নির্বিশেষে সত্য হইতে বাধ্য। তাহার কারণ মানব-সমাজের এবং মানব-মনের গতিবিধি অত্যন্ত জটিল এবং পরিবর্তনশীল। সর্বাংশে অনুরূপ কারণ যদি দুইটি ক্ষেত্রে ঘটে, তবেই একই প্রকার ফল ফলিবে। কিন্তু ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

গবেষণাগারের মতন পরীক্ষা চালানো অসম্ভব

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত দেশ ও কালের উপর নির্ভর করে

হয় না বলিলেই চলে। এই সব অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া এডমণ্ড বার্ক, আগস্ত কোঁৎ, মেটল্যাণ্ড প্রভৃতি বিদ্বজ্জন আমাদের আলোচ্য বিষয়কে বিজ্ঞানের মর্যাদা দিতে রাজী হন নাই।

ইহাকে পর্যবেক্ষণমূলক বিজ্ঞান বলা চলে

কিন্তু ইহাকে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান (Experimental Science) না বলিলেও পর্যবেক্ষণমূলক বিজ্ঞান (Observational Science) বলে চলে। নানা দেশে বিভিন্ন যুগে কোন এক বিশেষ ব্যবস্থার ফলে যে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে বা হইতেছে, তাহা আমরা ইতিহাসে ও সংবাদপত্রাদিতে পড়িতে পারি ও দেখিতে পারি। সেই পর্যবেক্ষণের ফলে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, এইরূপ কারণ ঘটিলে এইরূপ কার্য ঘটে। আরিস্টটল ১৫৮টি সংবিধানের ফলাফল লক্ষ্য করিয়া রাষ্ট্র বিষয়ে যে সকল মন্তব্য করিয়া গিয়াছেন তাহার মূল্য আজও লোকে স্বীকার করিতেছে। এ যুগেও জেমস্ ব্রাইস বিভিন্ন দেশের গণতান্ত্রিক শাসনের গতিপ্রকৃতি তুলনা করিয়া যে সকল সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন তাহার মূল্য অসীম। অর্থনীতিকে যদি বিজ্ঞানের মর্যাদা দেওয়া হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানও অনুরূপ সম্মান পাইতে পারে। ধনবিজ্ঞানী মার্শাল অর্থনীতির সিদ্ধান্তকে জোয়ারভাঁটার বিজ্ঞানের সহিত তুলনা করিয়াছেন। আমরাও সেইরূপ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আবহবিজ্ঞানের (meterology) সহিত সমপর্যায়ে স্থাপন করিতে পারি। মেঘ, বৃষ্টি ও ঝড়ের সম্বন্ধে যেমন ভবিষ্যদ্বাণী কখন কখন সত্য হয়, অনেক সময় হয় না, তেমনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর ভবিষ্যদ্বাণী সব সময়ে যে ফলিবেই এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। তাহার প্রধান কারণ এই যে জটিল ও চেতনশীল সামাজিক মানুষকে লইয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কারবার। তাই কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক স্যার আর্নেস্ট বার্কার প্রথম বক্তৃতা দিতে

ইহা অপরিণত বিজ্ঞান

যাইয়া বলেন যে, তাঁহার শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার অধ্যাপনার বিষয়কে নীহারিকাতুল্য এবং সম্ভবতঃ সন্দেহজনক বলিয়া মনে করিবেন।* তিনি ব্যঙ্গ করিয়া বলেন যে,

* Each Professor of Political thought is apt to feel about all the other Professors, if not about himself, that they argue from questionable axioms, by a still more questionable process of logic to conclusion that are unquestionably wrong. Barker—The Study of Political Science and Its relation to cognate study.

এ বিষয়ের অধ্যাপকেরা পরস্পরকে নিতান্ত ভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন। সমাজ বিজ্ঞানের অধিকাংশ শাখা সম্বন্ধেই যখন ঐরূপ উক্তি করা চলে তখন শুধু আমাদের অধীতব্য বিষয়টিকে বিজ্ঞানের সীমা হইতে বহিষ্কার করিবার কি প্রয়োজন? ব্রাইসের ভাষায় ইহাকে অপরিণত বিজ্ঞান বলিলেই ঠিক হইবে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য বিষয়ের সম্বন্ধঃ মানুষের সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলী লইয়া ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আইনশাস্ত্র, নৃতত্ত্ব, ভূগোল, নীতিশাস্ত্র, জীববিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সামাজিক মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিদ্যার উদ্ভব হইয়াছে। মানুষকে জানিতে হইলে, বুঝিতে হইলে এগুলির কিছু কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এক বিদ্যা অন্য বিদ্যার প্রতিদ্বন্দ্বী নহে, পরিপূরক। অন্যান্য বিদ্যার সহায়তা ব্যতিরেকে কোন বিদ্যাই পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত মানুষের সামাজিক জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিদ্যার কিরূপ সম্পর্ক তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হয়।

৫। **ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানঃ** ইতিহাস হইতেছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর গবেষণাগার। অতীতে কি ঘটিয়াছে, কেন ঘটিয়াছে, তাহার ফলে ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে এ সম্বন্ধে সমুদয় তথ্য পাওয়া যায় ইতিহাসে। উহা হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তাঁহার প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া তাহার বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন। অতীতকে না জানিলে বর্তমানকে বুঝা যায় না, কেননা বর্তমানের মূল প্রোথিত রহিয়াছে অতীতের মধ্যে। এইজন্য লর্ড অ্যাক্টন বলিয়াছেন ইতিহাসের স্রোতধারায় বালুকণা সমূহের মধ্যে স্বর্ণরেণুর মতন রাষ্ট্রবিজ্ঞান যেন জমিয়া উঠিয়াছে। আইনসভার দুইটি কক্ষ কি ভাবে উদ্ভূত হইল; পাঁচটি, তিনটি বা একটি কক্ষযুক্ত আইনসভা স্থাপন করিয়া কি অসুবিধা হইয়াছিল তাহা না জানিলে বর্তমানের দ্বিকক্ষযুক্ত বিধানমণ্ডলীর উপযোগিতা ভাল করিয়া উপলব্ধি করা যাইবে না। ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে। সেইজন্য আমেরিকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানী উইলোবি বলেন যে, ইতিহাসেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গভীরতা (third dimension) জোগাইয়াছে।

ইতিহাসের মধ্যে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের উপাদান

ইতিহাসও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নিকট কম ঋণী নহে। ষোড়শ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদ, সপ্তদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, অষ্টাদশ শতাব্দীর গণতান্ত্রিক শাসনপ্রণালীর আদর্শ ইতিহাসের ঘটনাসমূহকে একসূত্রে গাঁথিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর ইতালি ও জার্মানির ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ ছাড়িয়া দিলে মুসোলিনি ও হিটলারের কার্যকলাপের মানে বুঝা যায় না। ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা দেখিয়া বার্জেস মন্তব্য করিয়াছেন যে, উভয়কে যদি পৃথক্ করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে একটি বিষয় মৃত না হইলেও বিকলাঙ্গ হইবে এবং অন্যটি আলেয়ার মতন অবাস্তব হইয়া যাইবে। ইংরাজ ঐতিহাসিক স্যার জন সিলী বলেন যে, ইতিহাসের দ্বারা বিশদীকৃত না হইলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান গ্রাম্যভাবাপন্ন হয় আর ইতিহাস যদি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ হারায় তাহা হইলে উহা মাত্র সাহিত্য-পর্যায়ভুক্ত হইয়া পড়ে।*

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নিকট ইতিহাসের ঋণ

সিলী আরও বলেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ছাড়া ইতিহাস ফলপ্রসূ হয় না এবং ইতিহাস ছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান ভিত্তিহীন হয়। এই কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। সকল প্রকারের ইতিহাসের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্বন্ধ নাই। স্থাপত্য বিদ্যার ইতিহাস বা মুদ্রার ক্রমবিকাশের সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ নাই। আবার ইতিহাসের ভিত্তিতে গঠিত নয় এমন মতবাদও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। যেমন প্লেটোর রিপাবলিকের আদর্শ অথবা বেন্থামের হিতবাদ ইতিহাসের সহিত সংস্রববিহীন। কিন্তু একথা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না যে, ইতিহাসের কিছু অংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অঙ্গস্বরূপ।

সিলীর উক্তির বিচার

৬। **রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি:** কৌটিল্য বার্তা বা অর্থনীতিকে দণ্ডনীতি বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতে পৃথক করিয়া দেখিয়াছেন। কিন্তু আরিস্টটল রাজনীতি লিখিতে যাইয়া ধন উৎপাদনের উপায়ের কথা বলিয়াছেন। আবার অষ্টাদশ শতাব্দীতে আডাম স্মিথ অর্থনীতির আধুনিক ভিত্তি স্থাপনের জন্য যে (Wealth of Nations) নামক

উভয়ের ঘনিষ্ঠ সংযোগ

*Politics are vulgar when not liberalised by history, and history fades into mere literature when it loses sight of its relation to politics.

গ্রন্থ রচনা করেন তাহাতে কি উপায়ে রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধ করা যায় তাহাও বিবেচনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ রাজনৈতিক অবস্থার উপর আর্থিক উন্নতি-অবনতি অনেকখানি নির্ভর করে। রাষ্ট্রশক্তি যদি দুর্বল হয়, তাহা হইলে নাগরিকেরা আত্মরক্ষার জন্য অনেক শক্তি ব্যয় করে এবং অর্থের উৎপাদনে সবিশেষ মনোযোগ দিতে পারে না। উৎপন্ন ধন শ্রমিক, পুঁজিপতি, ব্যবসায়ী প্রভৃতি শ্রেণীর মধ্যে কি ভাবে বণ্টিত হইবে তাহা প্রায় সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ধারণা ছিল যে ধনের উৎপাদন ও বিভাজনের ব্যাপারে সরকারের হস্তক্ষেপ মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। ফলে শ্রমিকেরা পুঁজিপতিদের দ্বারা শোষিত ও লাঞ্ছিত হইত এবং রাষ্ট্রও মূর্খ, স্বাস্থ্যহীন ও আশাহীন নাগরিকে পূর্ণ হইত। ধনবিজ্ঞানীরা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের সহিত তাঁহাদের শাস্ত্রের সম্বন্ধ ছেদন করিতে উদ্যত হন। তাহার ফলে ধনবিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক রূপ পাইলেও বাস্তবের সঙ্গে সম্বন্ধচ্যুত হইয়া পড়ে।

রাজনৈতিক অবস্থা আর্থিক অবস্থার ফল

আজকাল রাষ্ট্র আর্থিক পরিকল্পনা অনুসারে পঞ্চবার্ষিকী যোজনার অনুষ্ঠান করিতেছে। সেই জন্য আর্থিক ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। আবার অন্যদিকে জনকল্যাণই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রগতিশীল দেশসমূহে বৃদ্ধ, বেকার, অসমর্থ নরনারীকে ভরণ-পোষণ করা, রুগ্নদের বিনাপয়সায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, ছাত্রদের সরকারী খরচে দুপুরবেলা দুধ, ফল প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য জোগাইবার বন্দোবস্ত ইত্যাদি সরকারের কর্তব্য বলিয়া ধরা হইয়াছে। চীন ও রাশিয়ার ন্যায় সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক দেশে আর্থিক জীবন সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দেশেও রাজস্বনীতি, শিল্প ও বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ, যানবাহন, ব্যাঙ্ক প্রভৃতির পরিচালনা রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের ও ধনবিজ্ঞানের আওতায় আসিয়াছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান আজকাল পৃথক্ পৃথক্ বিদ্যা রূপে অধীত হইতেছে বটে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে।

আর্থিক ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ

৭। **রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ব্যবহার শাস্ত্র (Law)ঃ** ব্যবহার শাস্ত্রের সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্বন্ধ যেমন প্রাচীন তেমনি ঘনিষ্ঠ। রাষ্ট্রই আইন তৈয়ারি করে ও অনুমোদন করে। রাষ্ট্রের শক্তির সাহায্যেই আইনকে প্রয়োগ করা হয়। আবার আইন-কানুন না থাকিলে কোন সংস্থাই টিকিতে পারে না। কোন দেশে কিরূপ আইন চলিবে তাহা অনেকটা নির্ভর করে তাহার সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার উপর। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের আইনের সঙ্গে পুঁজিবাদী সমাজ ও সাম্যবাদী সমাজের আইনের আকাশ-পাতাল তফাৎ। আইন আদেশ করে, নিষেধ করে অথবা বলিয়া দেয় যে এরূপ করিলে এরূপ শাস্তি দেওয়া হইবে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান একদিকে যেমন বর্তমান অবস্থার বর্ণনা করে অন্যদিকে তেমনি কিরূপ হওয়া উচিত তাহাও নির্ণয় করে। ব্যবহার-শাস্ত্রকে এক হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অংশ বলিয়া ধরা যায়। কিন্তু সকল প্রকার আইনের সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক নাই।

আইন সামাজিক অবস্থার ফল

৮। **ভূগোল ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানঃ** ভূগোল ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান উভয়েই মানুষের প্রকৃতি ও তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা লইয়া আলোচনা করে। ভূগোলের ভৌতিক অংশ আবহাওয়া, জোয়ার-ভাঁটা, জমির অবস্থান প্রভৃতি লইয়া বিচার করে। তাহার সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। কিন্তু ভূগোলের সামাজিক অংশ আর্থিক সম্পদ, নগরের উৎপত্তির কারণ, রাষ্ট্রের আয়তন প্রভৃতি লইয়া আলোচনা করে। ইহার সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। রাষ্ট্রকে সুরক্ষিত করিতে হইলে সমুদ্র, পর্বত, বৃহৎ নদী প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের অবস্থান কোথায় থাকিলে ভাল হয় তাহা ভূগোল হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জানিতে পারে। কি রকম জায়গায় রাজধানী স্থাপন করিলে তাহা দুর্ভেদ্য হয় অথচ রাষ্ট্রের সকল লোকের সুবিধাজনক হয় তাহাও ভূগোল নির্দেশ করে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ও এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠান-সমূহ কি ভাবে বিভক্ত হইলে সুবিধা হয় তাহা ভূগোল হইতে জানা যায়। বোদাঁ, মঁতেসক্যু, রুশো, বাকল প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিত রাষ্ট্রের উপর ভৌগোলিক অবস্থানের প্রভাব লইয়া বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে স্বেচ্ছাচারী

ভৌগোলিক প্রভাব

শাসন ও শীতপ্রধান দেশে গণতান্ত্রিক শাসন প্রাদুর্ভূত হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোক অলস এবং শীতপ্রধান দেশের লোক কর্মঠ। এরূপ মন্তব্য নির্বিচারে মানিয়া লওয়া যায় না। আজকাল বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রকৃতিকে বশে আনিয়া মানুষ তাহার সভ্যতা বিস্তার করিতেছে। নাৎসী-শাসিত জার্মানিতে ভূগোলের দোহাই দিয়া বিশ্ব জয় করিবার ধুয়া উঠিয়াছিল। আরিস্টটলের ন্যায় পণ্ডিতও প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যে, উত্তর ইউরোপের লোকের বুদ্ধি ও চতুরতা কম; এসিয়ার লোকের বল ও সাহস কম, কেবল মাত্র গ্রীসের লোকের মধ্যে বুদ্ধি ও সাহসের প্রাধান্য রহিয়াছে।

কিন্তু উহা অনতিক্রমণীয় নহে।

ভূগোলও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরস্পর সংস্রবে Geopolitics নামে একটি শাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে।

৯। **রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্ব** (Anthropology): আধুনিক নৃতত্ত্ব-বিদ্যার সামাজিক অংশে প্রাচীন, লুপ্তপ্রায় এবং আদিম সমাজসমূহের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া সমাজের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য বাহির করা হইয়াছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সাধারণতঃ সেইরূপ সমাজের কথা আলোচনা করে যাহার লিখিত বিবরণ আছে ও সংবিধান আছে। নৃতত্ত্বে যে সমাজের কথা আলোচিত হয় তাহাদের লিখিত বিবরণ নাই বলিলেই হয়। কিন্তু নৃতত্ত্বের আলোচনা হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মাতৃতান্ত্রিক ও পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য, আদিম সমাজের গঠনপ্রণালী ও বিধিনিষেধ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করিয়াছেন। রাষ্ট্র কি ভাবে উদ্ভূত হইল, আইনের সৃষ্টি কিরূপে হইল এই সব সমস্যার উপর নৃতত্ত্ব যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছে। স্যাভিগণী, হেনরী মেইন, এডওয়ার্ড জেঙ্কস্, মরগ্যান, ম্যাকলেনান প্রভৃতি পণ্ডিতগণ নৃতত্ত্বের সাহায্য লইয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

নৃতত্ত্বের কিছু সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানে লওয়া হইয়াছে।

১০। **রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান**: ব্রাইস যথার্থই বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল মনোবিজ্ঞানের মধ্যে প্রোথিত রহিয়াছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান সমস্যা হইতেছে ক্ষমতা লইয়া। কোন্ শ্রেণীর লোক ক্ষমতা চাহে, কিভাবে তাহারা ক্ষমতার ব্যবহার করিবে এসব নির্ভর করে মনোবিজ্ঞানের উপর। ব্যষ্টিমন ও সমষ্টিমনের ঘাতপ্রতিঘাতে কিভাবে

জনমত গঠিত হয় তাহাও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনোবিজ্ঞানীর নিকট শিক্ষা করেন। জনমত যে কেবল যুক্তিতর্কের প্রভাবে গঠিত হয় না, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি এবং ভাবপ্রবণতাও জনমত গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করে এই তথ্যও মনোবিজ্ঞান প্রচার করিয়াছে। সরকার জনমতের সহিত সম্পর্ক রাখিবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করে তাহা মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে জানা যায়। আবার অন্যদিকে রাষ্ট্র মনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। রাশিয়ায় ও চীনদেশে রাষ্ট্র মানুষের মনকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হইতে সমাজকেন্দ্রিক করিবার চেষ্টা করিতেছে। সেকালে প্লেটো ও একালে রুশো শিক্ষাদান করিয়া মানুষের মনকে সুপথে পরিচালিত করার উপায় বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আধুনিক ফরাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লেবঁ বলেন যে, রাষ্ট্র কিরূপ হইবে তাহা জাতির মানসিক গঠনের উপর নির্ভর করে।

মনোবিজ্ঞানের প্রভাব

প্রায় একশত বৎসর পূর্বে বেজহট Physics and Politics লিখিয়া মনোবিজ্ঞানের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার চল্লিশ বৎসর পরে গ্রাহাম ওয়ালাস্ "Human Nature in Politics" লিখিয়া প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ফ্রান্সের তার্দেরেণা, লেবঁ প্রভৃতি, ইংলণ্ডের ম্যাক্‌ডুগ্যাল ও আমেরিকার ল্যাসওয়েল মনোবৈজ্ঞানিক রীতিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কতকগুলি সমস্যা আলোচনা করিয়াছেন। শেষোক্ত লেখক Politics—Who gets what, when, how নামক গ্রন্থে মনোবিজ্ঞান আলোচনার দ্বারা রাজনৈতিক তথ্য নির্ধারণ করিয়াছেন। এখন সকলেই স্বীকার করিতেছেন যে, রাজনীতি কেবলমাত্র বিচারবুদ্ধিপ্রসূত নহে; অবচেতন মনের এবং সহজাত সংস্কারের প্রভাব ইহার উপর কিছু কম নহে।

মনোবিজ্ঞানীদের আলোচনা

১১। **রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও দর্শন**:—দর্শনশাস্ত্রের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কিছুটা সম্বন্ধ আছে; তাই সেকালে ইহাকে Political Philosophy বা রাষ্ট্রীয় দর্শন নামে অভিহিত করা হইত। এখন কিন্তু প্রত্যক্ষবাদী (Positivists) ও আচরণবাদী (Behaviourists) লেখকেরা বলেন যে নীতিশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি রহস্যানুভূতি ও অপরোক্ষ অনুভূতির উপর নির্ভর করিয়া বিষয়টিকে অনর্থক ধোঁয়াটে ও ঘোরালো করিয়া তোলেন।

তাঁহাদের মতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে যে উপকরণ পাওয়া যায় তাহার উপর ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত স্থির করা কর্তব্য। রাষ্ট্রের আদেশ কেন মানা কর্তব্য, গণতন্ত্র কি জন্য একনায়কত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, অথবা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সহিত রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সামঞ্জস্য স্থাপন কি ভাবে করা যায় ইত্যাদি প্রশ্ন মূলতঃ দার্শনিক প্রশ্ন। বিভিন্ন ব্যক্তি নিজের নিজের মনোবৃত্তি অনুসারে ঐ সব প্রশ্নের বিভিন্ন বিভিন্ন উত্তর দিয়া থাকেন। কোন উত্তরটি সত্য তাহা যাচাই করিয়া দেখা কঠিন—কেননা ইহাদের পিছনে বস্তু-মূলক অনুসন্ধান নাই। সেই জন্য চোখে দেখা যায়, ধরা ছোঁয়া যায় এমন সব তথ্যের উপর যাঁহারা সিদ্ধান্তস্থাপনের পক্ষপাতী তাঁহারা রাষ্ট্রীয় দর্শন নামটি ছাড়িয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কিন্তু দর্শনশাস্ত্রের বিচারধারা একেবারে পরিত্যাগ করা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভবও নহে, উচিতও নহে। রাষ্ট্রের স্বরূপ কি, রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ কি ধরনের হইলে ভাল হয়, রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্রের সীমা কতদূর বিস্তৃত হওয়া উচিত—এই ধরনের প্রশ্নগুলির উত্তর পাইতে হইলে দার্শনিকের চিন্তাধারা অনুসরণ করা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পক্ষে প্রয়োজন হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পথপ্রদর্শক প্লেটো ও আরিস্টটল মূলতঃ ছিলেন দার্শনিক। তাঁহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত দার্শনিক বিচারের সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন। নৈতিক বৈধতার প্রশ্নকে একেবারে বর্জন করিয়া কোন রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। মানুষের জীবন কিসে ভালো হয়, উন্নততর হয় সেই প্রশ্নকে এড়াইয়া কোন সামাজিক ব্যবস্থা প্রচলন করা সম্ভব নহে। দার্শনিক পন্থাকে পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সাধারণ জ্ঞানের উপর রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে গড়িয়া তুলিতে চাহেন তাঁহাদের সুবিবেচনাকে প্রশংসা করা যায় না।

অপরপক্ষে একথাও স্বীকার্য যে দার্শনিকেরা প্রায়শঃই কতকগুলি ধারণাকে স্বতঃসিদ্ধরূপে ধরিয়া লন। সেইজন্য অনেকক্ষেত্রে তাঁহারা অবাস্তব সিদ্ধান্তে উপনীত হন। বার্টাণ্ড রাসেল তাঁহার Philosophy and Politics নামক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে প্লেটোর Republic বইয়ে সর্বাত্মক রাষ্ট্র ও সমাজের মূলনীতি নিহিত আছে। জার্মান দার্শনিক হেগেলও রাষ্ট্রের সর্বগ্রাসী ক্ষমতার সমর্থন করিয়াছেন।

পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার সহিত দার্শনিকবিচার প্রণালী প্রয়োগ করিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রীয় দর্শনের মধ্যে যে বিবাদ কল্পনা করা হইয়াছে তাহার অবসান ঘটানো উচিত। দার্শনিক চিন্তাধারাকে বিসর্জন দিলে কোনই সুবিধা হইবে না।

১২। নীতিশাস্ত্র ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানঃ নীতিশাস্ত্র ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান উভয়েরই উদ্দেশ্য সামাজিক মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন। নীতিশাস্ত্র যেমন চিন্তার বিশুদ্ধি, তেমনি আচরণের পবিত্রতা দাবি করে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান কেবল বাহিরের আচরণের বিচার করে। এই হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অপেক্ষা নীতিশাস্ত্রের প্রয়োগক্ষেত্র অধিক ব্যাপক। কোন নৈতিক আদর্শ যখন সর্বজনস্বীকৃত হয় তখনই রাষ্ট্রে উহা আইনের রূপ পরিগ্রহ করে। আট বছরে গৌরীদান না করিলে মহাপাপ হইত বলিয়া সেকালে ধারণা ছিল। একালে অত ছোট মেয়েকে বিবাহ দেওয়াই দুর্নীতিকর বলিয়া ধারণা হইয়াছে। তাই ভারতীয় রাষ্ট্র আইন করিয়া চৌদ্দ বছরের নিম্নবয়স্ক মেয়েদের বিবাহ দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

নীতিশাস্ত্র বেশি ব্যাপক

আরিস্টটল নীতিশাস্ত্র হইতে রাজনীতিকে পৃথক করিয়া বিবেচনা করিলেও তিনি রাষ্ট্রের দোষগুণ নৈতিক মাপকাঠি দিয়া বিচার করিয়াছেন। ইতালির ম্যাকিয়াভেলি বলেন যে, রাজনীতির সহিত নীতিশাস্ত্রের কোন সম্বন্ধ নাই; কেননা নীতিশাস্ত্র অনুমোদন করে না এমন পন্থা অবলম্বন করিয়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা হইয়া থাকে। ষোড়শ শতাব্দীতে ফ্রান্সের বোদাঁ মেকিয়াভেলির মতের তীব্র প্রতিবাদ করেন। বার্ক বলেন যে, নীতিশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বৃহত্তররূপে রাজনীতিতে প্রতিফলিত হয়; ইহা ছাড়া তিনি আর অন্য কোন মত স্বীকার করেন না। ইংরাজ ঐতিহাসিক লর্ড এ্যাকটন বলেন যে, সরকার কি করিতেছে তাহা আবিষ্কার করা অপেক্ষাও সরকারের কি করা কর্তব্য তাহা বাহির করা অধিক প্রয়োজনীয়। এ যুগের একশ্রেণীর রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অবশ্য নীতিশাস্ত্র হইতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে একেবারে পৃথক করিতে চাহেন। কিন্তু রাষ্ট্রের কি করা উচিত, কি করা অনুচিত, কিসে বিশ্বের সার্বজনীন কল্যাণ সাধিত হইবে তাহার আলোচনা যদি বর্জন করা যায়, তাহা হইলে

নৈতিক মাপকাঠি

রাষ্ট্রবিজ্ঞান তাহার উপযোগিতা অনেকাংশে হারাইবে। রাষ্ট্রীয় কার্য নীতিবিগর্হিত হইলেও যদি দোষণীয় বিবেচিত না হয়, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের আশা সুদূরপরাহত হইবে। সেই জন্য মহাত্মা গান্ধী বারংবার বলিয়াছেন যে, নৈতিক দোষে দুষ্ট কোন কিছুই রাজনীতিতে স্থান পাইবার যোগ্য নহে।

১৩। **রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও জীববিদ্যা** (Biology): জীববিদ্যার সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া মহামতি ডারউইন বিবর্তনবাদ স্থাপন করেন এবং জীবন সংগ্রামে যোগ্যতমের জয়নীতি ঘোষণা করেন। যোগ্যতম বলিতে অবশ্য তিনি কেবল দৈহিক শক্তিতে সর্বাপেক্ষা বলবানকে বুঝিতেন না। যে জীব পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বেশি খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারে, সেই যোগ্যতম।

যোগ্যতমের উদ্বর্তন নীতি

হার্বার্ট স্পেন্সার রাষ্ট্রকে একটি জীবদেহের (Organism) সহিত সর্বাঙ্গীন তুলনা করিয়াছেন। জীবজগতের অবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের সঙ্গে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে দ্বন্দ্ব-বিরোধের তুলনা করিয়া জার্মান পণ্ডিত নীট্‌শে ও ট্রইট্‌শকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এরূপ সংগ্রাম স্বাভাবিক এবং ইহার ফলে যোগ্যতম রাষ্ট্রই টিকিয়া থাকে, দুর্বল রাষ্ট্র লোপ পায়। কিন্তু মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হইতেছে পশুত্বের উর্ধ্বে ওঠা। সেইজন্য জীববিদ্যার সঙ্গে তুলনাদ্বারা রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমৃদ্ধ হইয়াছে বলা যায় না।

১৪। **রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান**: সমাজবিজ্ঞান নামটি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে হার্বার্ট স্পেনসর্ জনপ্রিয় করিয়া তোলেন। সামাজিক মানুষের জীবন লইয়া ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, ব্যবহারশাস্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন বিদ্যার সৃষ্টি হয়; কিন্তু এমন অনেক প্রসঙ্গ অবশিষ্ট থাকে যাহা ঐ সব কোন বিদ্যারই অন্তর্ভুক্ত নহে। সেই সব বিষয় সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা ক্ষেত্রে পরিণত হয়। কিন্তু অন্য বিদ্যার পরিত্যক্ত অংশমাত্র লইয়া কোন শাস্ত্র গড়িয়া উঠিতে পারে না। তাই কোন

সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভব

কোন বিবেচক সমাজবিজ্ঞানী তাঁহাদের শাস্ত্রকে সমাজ-সংশ্লিষ্ট অধ্যয়নগুলির কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হইলেন। সংস্কৃতির উৎপত্তি, বিকাশ ও স্বরূপের যোগসূত্র দিয়া তাঁহারা মানবের সমাজজীবন সম্বন্ধীয় সকল বিদ্যাকে একত্রে গাঁথিলেন।

সমাজবিজ্ঞানকে অবশ্য অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব প্রভৃতির বিশেষজ্ঞেরা প্রধান বলিয়া এখনও স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন সমাজবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্র এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট হয় নাই। সুতরাং উহা বিজ্ঞানই নহে। কিন্তু মানুষের সকল শ্রেণীর সংঘই সমাজবিজ্ঞানের বিবেচনার বিষয় ; রাষ্ট্র সমাজের মধ্যে একটি প্রধান সংঘ ; সেই হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সমাজবিজ্ঞানের একটি অংশরূপে মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সমাজবিজ্ঞান মানুষের আচার, ব্যবহার, প্রথা, ধর্ম, আর্থিক জীবন প্রভৃতির ক্রমবিকাশ আলোচনা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে এই সব বিষয়ের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নাই। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের উৎপত্তি কি করিয়া হইল, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কিভাবে উদ্ভূত হইল, এ সব বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের নিকট ঋণী। আবার সমাজবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নিকট হইতে রাষ্ট্রের সংগঠন ও কার্যাবলীর জ্ঞান আহরণ করে। ম্যাকলেনান, গিডিংস, মরগ্যান প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞানী রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। গিডিংস বলেন যে, রাষ্ট্র সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত শিক্ষা দিবার পূর্বে সমাজবিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। এই মত অবশ্য সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মানিয়া লন নাই। তাঁহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে এক স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ বিদ্যারূপে দাঁড় করাইতে চান। কিন্তু মানুষের সমাজ-জীবন বিষয়ক প্রত্যেক বিদ্যাই পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। সেইজন্য কোন বিদ্যাকেই বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা উচিত নহে।

উহার আলোচ্য বস্তু

১৫। **রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধান-পদ্ধতি ঃ** রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, সংস্থা ও কার্যক্রমের সুসম্বদ্ধ অধ্যয়নকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলা হয়। ভৌতিক বিজ্ঞানসমূহের সহিত তুলনায় ইহা অসম্পূর্ণ ও অপরিণত। এমন কি প্রয়োগাত্মক বিদ্যাগুলির (Arts) মধ্যেও ইহা অনেকটা পিছাইয়া আছে ; কেননা এই উপায় অবলম্বন করিলে এই প্রকার ফল ফলিবেই এরূপ সিদ্ধান্ত সকল ক্ষেত্রে সত্য নাও হইতে পারে। সেইজন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধান বাঁধাধরা কোন একটি প্রণালী বা পদ্ধতি অনুসারে করা হয় না। বিভিন্ন প্রকারের সমস্যা অধ্যয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। কিন্তু সকল

একটি মাত্র পদ্ধতি অবলম্বিত হয় নাই।

প্রকার পদ্ধতির মধ্যেই বর্ণনা, বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত স্থাপন হইয়া থাকে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধান গতিশীল (Dynamic), স্থিতিশীল (Static) নহে। কোন এক সময়ে রাষ্ট্রের রূপ ও সংগঠন যেমনটি চোখে দেখা যাইতেছে মাত্র তাহারই বিশ্লেষণ করাকে স্থিতিশীল প্রণালী বলে। কিন্তু রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক ঘটনা কোন সময়েই অপরিবর্তনীয় থাকে না। সামাজিক, আর্থিক, মনোবৈজ্ঞানিক অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাতে প্রতিনিয়ত উহাদের রূপ বদলাইতেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত এই পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং কি কারণে কিরূপ কার্য ঘটে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কি ভাবে অতীতে ছিল, এখন কি আকারে আছে এবং ভবিষ্যতেই বা উহার রূপ কি হইবে এই সব বিষয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া অনুসন্ধান করিতে হয়।

পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধান

অধ্যাপক রবসন্ বলেন যে, ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা নিম্নলিখিত সাতটি পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া অনুসন্ধান চালাইতেছেন—(১) ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical method), (২) আইনমূলক পদ্ধতি (Juridical method), (৩) দার্শনিক পদ্ধতি (Philosophical method), (৪) প্রতিষ্ঠানমূলক পদ্ধতি (Institutional method), (৫) পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি (Statistical method), (৬) বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি (Analytical method), ও (৭) সমাজবিজ্ঞান-মূলক পদ্ধতি (Sociological method)। ইহার সহিত আমরা আরও সাতটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করিতে পারি। যথা (৮) পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (Observational method) (৯) পরীক্ষামূলক পদ্ধতি (Experimental method), (১০) মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (Psychological method), (১১) তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative method), (১২) ডায়েলেকটিক পদ্ধতি (Dialectical method), (১৩) জীববিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (Biological method), (১৪) সামূহিক পদ্ধতি (Integrated method)।

সাতটি বিভিন্ন পদ্ধতির সমাবেশ

পর্যবেক্ষণাত্মক ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক পদ্ধতির একত্র প্রয়োগ করিয়া আরিস্টটল হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাইস ও ফাইনার পর্যন্ত বহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী

অনেক অমূল্যতথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। পর্যবেক্ষণ করিতে যাইয়া যদি কেবলমাত্র এক যুগের বা এক দেশের ঘটনা সংগ্রহ করা হয় তবে সিদ্ধান্ত একদেশদর্শী হইতে পারে। নিজের চোখে দেখিয়া যেমন ঘটনা সংগ্রহ করিতে হয়, ইতিহাস হইতেও তেমনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের তথ্য বাহির করিতে হয়। সমগ্র তথ্যকে একত্র করিবার পর সেইগুলিকে শ্রেণী হিসাবে সাজাইতে হয়, তাহাদের ভিতর পরস্পর কি সম্পর্ক আছে তাহা বাহির করিতে হয়। অপ্রাসঙ্গিক তথ্যকে বাদ দিতে হয় এবং পরিশেষে গৃহীত তথ্য হইতে কার্যকারণাত্মক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। যদি আমরা দেখিতে পাই যে কোন বিশেষ অবস্থার মধ্যে একই ঘটনা বহু দেশে বহু যুগে ঘটিয়াছে, তাহা হইলে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে এইরূপ অবস্থা যেখানে দেখা দিবে সেখানেই ঐরূপ ফল ফলিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এই রীতিতে আরিস্টটল ১৫৮টি দেশের সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া রাষ্ট্রের উত্থান ও পতন সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। ফরাসী পণ্ডিত মতেস্কুও বহু দেশের ও বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি অধ্যয়ন করিয়া তাহার 'The spirit of the Laws' নামক স্মরণীয় গ্রন্থ লিখিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে মেইন ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ব্রাইসও যথাক্রমে প্রাচীন আইন ও আধুনিক গণতন্ত্র বিষয়ে অতুলনীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করিবার সময় সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করা প্রয়োজন, যে দুইটি বিষয় তুলনা করা হইতেছে তাহাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের সমতা আছে কিনা। পরিবেশের পার্থক্য থাকিলে তুলনা করা উচিত নহে।

ঐতিহাসিক পদ্ধতি

অধুনা গ্যাব্রিয়েল অ্যালমণ্ড ও অন্যান্য কয়েকজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এক নূতন ধরনের তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করিতেছেন। তাঁহারা বিভিন্ন রাষ্ট্র বা সরকারের তুলনা না করিয়া রাজনৈতিক অবস্থাকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করিতেছেন। ঐ চার শ্রেণী হইতেছে ইংলণ্ড—আমেরিকার পদ্ধতি, ইউরোপীয় মহাদেশে প্রচলিত ব্যবস্থা, প্রাক্-শিল্পবিপ্লব যুগের অবস্থা এবং রাশিয়া প্রভৃতির সমূহতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি। এই সকল ব্যবস্থার

নূতন তুলনামূলক পদ্ধতি

মূলতত্ত্ব কি তাহা বাহির করিতে পারিলে রাষ্ট্রীয় অনুসন্ধান অনেক বেশি ফলপ্রসূ হইবে। আফ্রিকা, মধ্য পূর্ব এবং পূর্ব দেশীয় অ-বিকশিত রাষ্ট্রব্যবস্থা আলোচনার জন্য এই পদ্ধতি বিশেষ উপকারী।

কোন সামাজিক ব্যবস্থা যদি এক বা ততোধিক সামাজিক প্রয়োজন সাধনে সহায়তা করে তবে তাহাকে উপযোগিতা বা function বলে। যে উপযোগিতা অভিপ্রেত এবং সুপরিচিত তাহাকে ব্যক্ত উপযোগিতা এবং যাহা অন্তর্নিহিত ও অনভীপ্সিত তাহাকে অব্যক্ত উপযোগিতা বলে। এই functional পদ্ধতি আশ্রয় করিয়া কয়েকজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী দপ্তরশাহী (Bureaucracy) প্রভৃতির বিশ্লেষণে কৃতকার্যতা লাভ করিয়াছেন।

উপযোগিতা বিশেষণ পদ্ধতি

মানুষ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কিভাবে আচরণ করে তাহা অনুসন্ধান করিয়া যাঁহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নূতন রূপ দিতে প্রয়াসী হইয়াছেন তাঁহাদিগকে Behavioural approach বা আচরণ বিশ্লেষণ পদ্ধতির সমর্থক বলে। ইঁহারা নৃতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, পরিসংখ্যাণ তত্ত্ব প্রভৃতির সাহায্যে মানুষের আচারআচরণের কারণ নির্ণয় করেন। কে কি জন্য কাহাকে ভোট দেয়, কেনই বা ভোট দিতে না যাইয়া ঘরে বসিয়া থাকে ; কোন অবস্থায় সে কিভাবে কাজ করে তাহা অনেকগুলি ক্ষেত্রে খোঁজ করিয়া একটা সিদ্ধান্ত করা হয়। ঐ সিদ্ধান্ত সমান অবস্থায় পড়িলে লোকে একই রকম আচরণ করিবে এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেও বৈজ্ঞানিক নিয়মের মত সকলক্ষেত্রে অবশ্য প্রযোজ্য নহে। তথাপি রাজনৈতিক দল, নেতৃত্বের উদ্ভব ও পতন, অভিজাতবর্গের প্রতিষ্ঠা, দলাদলির কারণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এই পদ্ধতি আলোকপাত করিয়াছে।

আচরণ বিশ্লেষণ পদ্ধতি

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির প্রয়োগের স্থান অতি সংকীর্ণ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ইচ্ছা করিলেও নাগরিকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অপহরণ করাইয়া দেখিতে পারেন না যে উহার ফল কিরূপ হয়। কিন্তু বিভিন্ন দেশে নানাপ্রকার বিধি-নিষেধ প্রচলন করা হইতেছে। তাহাদের ফল কোথায় কিরূপ হইতেছে তাহা দেখিয়া পর্যবেক্ষণকেই পরীক্ষার নামান্তর মনে করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে পারা

পর্যবেক্ষণ

যায়। পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যদি বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা অবাধে রাজনৈতিক দল বিশেষকে অর্থ সাহায্য করে, তবে সরকার বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ নিরপেক্ষভাবে রক্ষা করিতে পারে কিনা অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। মদ্যপান নিষেধ করিয়া দিলে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের উপর তাহার প্রভাব কিরূপ হইবে তাহা যুক্তরাষ্ট্রের ও মহারাষ্ট্র, গুজরাট প্রভৃতি ভারতীয় প্রদেশের অভিজ্ঞতা হইতে খুঁজিয়া বাহির করা যায়।

দার্শনিক পদ্ধতি

দার্শনিক পদ্ধতিতে কতকগুলি সিদ্ধান্তকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইয়া উহা হইতে অবরোহ প্রণালী-(Deductive method) ক্রমে মতস্থাপন করা হয়। রাষ্ট্র কেন প্রয়োজন, রাষ্ট্রের কার্য কি, ব্যক্তির সহিত রাষ্ট্রের সম্বন্ধ কি এই ধরনের প্রশ্ন সকলের মীমাংসা দার্শনিক পদ্ধতিতে করা হইয়াছে। প্লেটো হইতে হেগেল ও গ্রীণ পর্যন্ত বহু দার্শনিক এই পদ্ধতিতে রাষ্ট্রীয় বিষয়ের বিচার করিয়াছেন।

আইনগত পদ্ধতি

আইনমূলক পদ্ধতিতে সংবিধানাত্মক আইন ও শাসনসম্পর্কীয় আইনের আলোচনা করা হয়। রাষ্ট্রকে একটি কল্পিত বৈধ ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানরূপে মনে করিয়া তাহার কর্তব্য ও অধিকার বিচার করা হয়। আইনজ্ঞগণ লিখিত আইন-কানুনকে ব্যবহারিক রীতি অপেক্ষা বেশি মানেন। ইঁহাদের বিচার সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ।

পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি

আজকাল পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতির সাহায্যে বহুবিধ রাজনৈতিক আচরণের বিচার করা হইতেছে। রাষ্ট্রের ভিতর রাজনৈতিক চেতনা কতটা আছে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য জানা প্রয়োজন ভোটারদের মধ্যে শতকরা কতজন লোক ভোট দিতে যায় অথবা নির্বাচনী সভায় উপস্থিত থাকে। যদি আমরা জানিতে চাহি যে কোন্ শ্রেণীর লোকের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কতটা আছে, তাহা হইলে আইনসভার সদস্যদের মধ্যে কতজন সুশিক্ষিত, কতজন অর্ধশিক্ষিত, কতজন অশিক্ষিত তাহা বাহির করিতে হইবে এবং শিক্ষিতদের মধ্যে ব্যবসায়ী, উকীল, ডাক্তার, কৃষিজীবী, শিল্পপতি প্রভৃতির অনুপাত বাহির করিতে হইবে।

পরিসংখ্যান, মনোবিজ্ঞান, জীববিদ্যা বা সমাজবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতিগুলি এক একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে রাষ্ট্রীয় ঘটনার বিচার করে। রাষ্ট্রীয়

বিজ্ঞানের সমগ্র অংশ এইরূপ কোন এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ দিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে জনমতের সংগঠন, দলের কার্যপ্রণালী, যুক্তি ও সহজাত সংস্কারের প্রভাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রভৃতি প্রশ্নের বিচার করা হয়। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি অথবা গণতন্ত্রের স্বরূপ বিচার করা দুঃসাধ্য। মনোবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলিও এখনও নির্বিচারে মানিয়া লইবার মত অবস্থায় পৌঁছায় নাই।

মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি

রাষ্ট্রের অন্তর্গত স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ অথবা রাষ্ট্রায়ত্ত কোন্ শিল্প কিভাবে কাজ করিতেছে, তাহা প্রতিষ্ঠানমূলক পদ্ধতি বা Institutional method দ্বারা অনুসন্ধান করা হয়। ইহাতে নির্ভুল পর্যবেক্ষণের দ্বারা তথ্য সংগ্রহ করিয়া উহা হইতে কার্যকারণ সম্বন্ধে সাধারণ নীতি নির্ধারণ করা হয়।

সমাজবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতিতে আইনমূলক পদ্ধতির সংকীর্ণতাকে পরিহার করিয়া প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় ঘটনাকে ইতিহাস, অর্থনীতি ও সামাজিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয়। আইনের পুঁথিতে কি লেখা আছে তাহা অপেক্ষা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কি ঘটিতেছে, কেন ঘটিতেছে তাহা বাহির করিবার জন্য সমাজবিজ্ঞানী বেশি ব্যস্ত। কার্ল মার্কস সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনেক সমস্যার বিচার করিয়া অপূর্ব সাফল্য লাভ করিয়াছেন।

সমাজবিজ্ঞানের পদ্ধতি

যে সকল বিভিন্ন পদ্ধতি কথা বলা হইল, তাহাদের মধ্যে ঐতিহাসিক তুলনামূলক পদ্ধতি ও সমাজবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া আজকাল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনেক আলোচনা হইতেছে। বিভিন্ন পদ্ধতিকে একত্র করিয়া সর্বাত্মক আলোচনার দ্বারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পুষ্টিসাধন করাই শ্রেয়ঃ মনে হয়।

বর্তমানে কি কি পদ্ধতি অবলম্বিত হয়?

অনুশীলন

১। Describe the different methods of study in Political Science. Which of them do you consider to be the most diseriable, and why (1962).

১৫ প্রকরণ দেখ। ঐতিহাসিক, তুলনামূলক, প্রতিষ্ঠানমূলক, সমাজবিজ্ঞানমূলক, মনোবিজ্ঞান ও পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি পূর্বে অবলম্বিত হইত। এখন উপযোগিতা ও আচরণ বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া অনেক তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। পুরাতন ও নবীন ধরনের তুলনামূলক পদ্ধতি ও আচরণ বিশ্লেষণ পদ্ধতি সর্বাপেক্ষা কার্যকরী কেননা উহাতে বিভিন্ন পদ্ধতির সমন্বয় ঘটিয়াছে ও মানুষকে খণ্ড খণ্ড করিয়া না দেখিয়া সমগ্রভাবে বিচার করিবার প্রয়াস করা হইয়াছে।

২। Define Political Science and discuss the nature of its relation to History and Sociology (1963).

১, ৫ ও ১৪ প্রকরণ দেখ। বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার ভিতর কিভাবে কর্তৃত্ব পরিচালনা করা হয় ও সাধারণে বশ্যতা স্বীকার করে তাহার অধ্যয়নই রাষ্ট্রবিজ্ঞান। ইতিহাসরূপ নদীর বালুকণার মধ্যে স্বর্ণরেণুর মতন যেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান জমিয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের একটি অংশ মাত্র। সমাজবিজ্ঞান খুব ব্যাপক।

৩। Discuss the nature of Political Science as a science and distinguish it from Political Philosophy (1964).

৩ এবং ৪ প্রকরণ দেখ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে experiment বা পরীক্ষা করিবার সুবিধা অল্প; ইহা পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে। ইহার বিষয়বস্তু হইতেছে মানুষ; তাহার স্বাধীন ইচ্ছা আছে। গ্রহ নক্ষত্র জল মাটির মতন সকল ব্যাপারে মানুষ নিয়মের অনুবর্তী হইয়া চলে না। সেইজন্য আবহবিজ্ঞানের ন্যায় ইহা একটি অপরিণত বিজ্ঞান। রাষ্ট্রদর্শন অপেক্ষা রাষ্ট্রবিজ্ঞান নাম অধিক উপযোগী, কেননা বর্তমান কালে আর কতকগুলি মূল সিদ্ধান্ত হইতে দার্শনিক মতবাদ স্থাপন করিয়া কেহ তুষ্ট নহেন—মানুষের রাজনৈতিক আচরণ বিশ্লেষণ করিয়া যাহা গঠিত হইয়াছে তাহাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলাই সঙ্গত।

৪। Discuss the relations of Political Science with Science, Philosophy, Psychology anc Sociology.

৪, ১০, ১১ ও ১৪ প্রকরণ দেখ।

৫। Discuss the nature and scope of Political Science.

২ প্রকরণ ও ভূমিকা দেখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্র, সমাজ ও সরকার

রাষ্ট্র শব্দটি ঋগ্বেদে পাওয়া যায় কিন্তু আমরা যে অর্থে রাষ্ট্রের অধিকৃত ভূমি শব্দটি ব্যবহার করি বেদে ও পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে সেই অর্থে রাষ্ট্র শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কৌটিল্য রাষ্ট্র ও জনপদকে সমানার্থক শব্দ বলিয়াছেন। কামন্দক তাঁহার নীতিসারে বলিয়াছেন রাজ্যের প্রধান অঙ্গ হইতেছে রাষ্ট্র। আমরা Stateকে রাজ্য না বলিয়া রাষ্ট্র বলিবার পক্ষপাতী, কেন না রাজ্য কথাটা রাজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং এযুগে রাজার হাতে প্রকৃত শাসন-ক্ষমতা খুব অল্প দেশেই আছে। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা এক এক যুগে এক এক লেখক এক এক প্রকার দিয়াছেন। কোন দুইজন পণ্ডিতের দেওয়া সংজ্ঞা সর্বাংশে এক নহে। প্রথমেই সংজ্ঞা নির্দেশ না করিয়া আমরা রাষ্ট্র বলিতে কি বুঝায় তাহা জানিতে চেষ্টা করিব।

সংস্কৃতে রাষ্ট্র শব্দের অর্থ

১। রাষ্ট্রের উপাদান: অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে রাষ্ট্রের চারিটি প্রধান উপাদান—জনসমষ্টি, ভূমি, সরকার ও সার্বভৌম ক্ষমতা। ইহার মধ্যে প্রত্যেকটিই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। লোক না থাকিলে কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা কঠিন। একখণ্ড ভূমির উপর কতকগুলি লোক যদি উপস্থিত থাকে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার কোন ব্যবস্থা না থাকে, তাহা হইলেও রাষ্ট্রের উদ্ভব হইবে না। দেহের মধ্যে যেমন প্রাণ সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, রাষ্ট্রের মধ্যে তেমনি সার্বভৌম ক্ষমতা সব চেয়ে বেশি দরকারী। দেশের সকল লোক সাধারণতঃ যে ক্ষমতার বশ্যতা স্বীকার করে এবং বিদেশের কোন শক্তির অধীনতা যে ক্ষমতা মানে না, তাহাকে সার্বভৌম ক্ষমতা বলা যাইতে পারে। ইহার স্বরূপ লইয়া অবশ্য অনেক তর্ক-বিতর্ক আছে; পরে তাহা বলিব। এই চারিটি উপাদানের বিশদ ব্যাখ্যা করিতেছি।

রাষ্ট্রের চারিটি উপাদান

২। জনসমষ্টি: জনসমষ্টির ইচ্ছা-প্রণোদিত পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ হইতে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। মানুষ সামাজিক প্রাণী। রাষ্ট্রও সামাজিক

প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অন্যতম। কাজেই রাষ্ট্রের কথা বলিতে গেলে প্রথমেই জনসমষ্টির উল্লেখ করিতে হয়। একটি রাষ্ট্রে কিরূপ লোকসংখ্যা হওয়া উচিত এই প্রশ্ন লইয়া প্রাচীন পণ্ডিতেরা অনেক তর্ক-বিতর্ক করিয়াছেন। প্লেটো বলেন যে, ৫০৪০ জনের বেশি এক রাষ্ট্রে জনসংখ্যা হওয়া উচিত নহে। তিনি তাঁহার রিপাবলিকে বলেন যে অভিভাবক বা দার্শনিক শ্রেণীর সংখ্যা, শাসন করিবার লোকের প্রয়োজন অনুসারে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। সেই হিসাবে তাঁহাকে জন্মনিয়ন্ত্রণের উদ্যোক্তা বলা যায়। প্লেটোর শিষ্য আরিস্টটল বলেন যে, রাষ্ট্রের জনসংখ্যা দশ হাজার হইলে ভাল হয়, কিন্তু কোনক্রমেই উহা এক লক্ষের বেশি হওয়া উচিত নয়। গ্রীকগণ রাষ্ট্র বলিতে নগর-রাষ্ট্র (City State) বুঝিতেন। তাঁহারা রাষ্ট্রকে বলিতেন Polis, ইহা হইতেই Politics শব্দের উদ্ভব হইয়াছে; Polis বলিতে প্রথমে এমন একটি স্থান বুঝাইত, যেখানে গ্রাম ও নগরের লোকেরা তাহাদের স্ত্রী-পুত্রসহ আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিত। সেই জন্য জনসংখ্যার আধিক্য গ্রীকদের পক্ষে অসহনীয় ছিল; গ্রীসের নগর-রাষ্ট্র সমূহে নাগরিকগণ এক জায়গায় মিলিত হইয়া রাষ্ট্রের কার্য পরিচালনা করিতেন। প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার প্রথা তাঁহাদের মধ্যে চলিত ছিল না। দশ হাজারের বেশি নাগরিক কোন রাষ্ট্রে থাকিলে তাঁহাদের পক্ষে এক স্থানে মিলিত হওয়া সম্ভব হইত না। রুশোও প্রতিনিধিমূলক শাসন-প্রণালী পছন্দ করিতেন না। তাই তিনিও রাষ্ট্রের নাগরিক সংখ্যা দশ হাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতে বলিয়াছেন। ফরাসী মনীষী মঁতেস্‌ক্যু এবং ডিটকৃভিলও রাষ্ট্রের জনসংখ্যা কম রাখার পক্ষপাতী।

জন সংখ্যা কত হইলে ভাল হয়

কিন্তু এ যুগে বিজ্ঞানের প্রগতি হওয়ায় বহু লোকের মধ্যে যোগাযোগ রাখা সহজ হইয়াছে। স্বায়ত্তশাসন ও সংঘীয় যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যে বহু সংখ্যক লোক এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও শাসন ব্যাপারে কিছু ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারে। দশ হাজার, এমন কি দশ লাখ লোকের রাষ্ট্রের পক্ষেও আজকাল স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন। তাহাদের আর্থিক জীবনের পথেও অনেক বাধা দেখা দেয়। কিন্তু রাষ্ট্রে জনসংখ্যার সীমা বাঁধিয়া দিবার

স্বাধীনতা রক্ষার উপযোগী সংখ্যা

সার্থকতা এ যুগে স্বীকার করা হয় না। চীন, ভারতবর্ষ, রাশিয়া ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর মধ্যে এখন সর্বাপেক্ষা জনবহুল রাষ্ট্র। চীনের লোকসংখ্যা ৬৮ কোটি ৬৪ লক্ষ এবং ভারতবর্ষের ৪৩ কোটি ৬৪ লক্ষ। পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম দুইটি রাষ্ট্র হইতেছে স্যান মেরিনো ও মোনাকো। উহাদের জন সংখ্যা যথাক্রমে ২০ হাজার ও ১৪ হাজার। এত কম লোকের রাষ্ট্র নিতান্ত ঐতিহাসিক কারণেই আজও টিকিয়া আছে। অল্প লোকের রাষ্ট্রের মধ্যে সুইট্জারল্যাণ্ড আদর্শস্থানীয়।

রাষ্ট্রের মধ্যে যাহারা বাস করে তাহারা সকলেই নাগরিক নহে। প্রাচীন এথেন্সে নাগরিকদের সংখ্যা অপেক্ষা দাসের সংখ্যা অধিক ছিল। আজকাল অনেক রাষ্ট্রেই কিছু কিছু বিদেশী বাস করেন। তাঁহারা রাষ্ট্র কর্তৃক রক্ষিত হন, কিন্তু নাগরিকের কোন ক্ষমতা ভোগ করিতে পান না। মনু (৭।৬৯) বলেন যে, রাষ্ট্রের অধিকাংশ লোকেরই আর্য হওয়া উচিত; যে রাজ্যে শূদ্রের সংখ্যা অধিক এবং দ্বিজের সংখ্যা নিতান্ত কম সে রাষ্ট্র টিকিতে পারে না (৮।২২)। কিন্তু বিষ্ণুধর্মসূত্রে (৩।৫) বিধান দেওয়া হইয়াছে যে, রাজ্যের অধিকাংশ লোকের বৈশ্য ও শূদ্র হওয়া উচিত। বৈশ্যের কর্ম ছিল কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য এবং শূদ্ররা ছিলেন জনসেবক। আধুনিক রাষ্ট্রেও এই সব কর্ম যাঁহাদের উপজীবিকা তাঁহারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

নাগরিকদের পেশা

দেশের জনসমষ্টিকে শাসক ও শাসিত—এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যাঁহারা আইন তৈয়ারি করেন, সরকারী নীতি নির্ধারণ করেন, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করেন ও ন্যায় বিচার করেন তাঁহাদিগকে মোটামুটি শাসক শ্রেণীর অন্তর্গত বলা যায়। আরিস্টটল বলিয়াছেন যে কয়েকজনে শাসন করিবে এবং অন্য সকলে শাসিত হইবে এইরূপ ব্যবস্থা থাকা শুধু দরকার নহে, সুবিধাজনকও বটে। কিন্তু গণতন্ত্রে শাসক ও শাসিতের মধ্যে কোনও অলঙ্ঘ্য দেওয়াল নাই; আজ যে শাসিত হইতেছে, কাল সে নির্বাচিত হইয়া বা কোন সরকারী কাজে নিযুক্ত হইয়া শাসকশ্রেণীতে উন্নীত হইতে পারে। তা ছাড়া প্রত্যেক নাগরিক যখন ভোট দেয় তখন সে শাসক, আবার কর্তব্য পালনের সময়ে শাসিতশ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইতে পারে।

শাসক ও শাসিত দুই স্বতন্ত্র শ্রেণী নহে

জনসমষ্টির ইচ্ছাক্রমে, তাহাদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রহিয়াছে। কোন্ রাষ্ট্র কিরূপ হইবে তাহা প্রধানতঃ নির্ভর করে সেই রাষ্ট্রের জনসমষ্টির শিক্ষা, দীক্ষা ও চরিত্রের উপর।

ভূখণ্ডঃ যে কোন জনসমষ্টিকে কোন না কোন স্থানে বাস করিতে হয়। যে জনসমষ্টি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদের কোন রাষ্ট্র থাকিতে পারে না। পশুপালন যাহাদের একমাত্র জীবিকা ছিল তাহারা প্রায়ই এক স্থানে স্থায়ীভাবে বাস করিত না। এক জায়গার ঘাস, লতাপাতা ফুরাইয়া গেলে অন্য জায়গায় যাইয়া আশ্রয় লইত। কৃষিকর্মের উদ্ভাবনের পর রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। পাহাড় বা জঙ্গল কাটিয়া, অসমতল ভূমিকে সমান করিয়া যাহারা চাষ-আবাদের উপযুক্ত করিয়া লয়, তাহারা জমির প্রতি অনুরক্ত হয় এবং সেইজন্য একই ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকে।

স্থায়ীভাবে বসবাস

ভূখণ্ড বলিতে শুধু মাটির উপরিভাগ বুঝায় না। মাটির নিচের খনিজ-সম্পদ, মাটির নিকটের নদী এবং সমুদ্রের উপকূলও বুঝায়। এতদিন পর্যন্ত সমুদ্রের বেলাভূমি হইতে তিন মাইল পর্যন্ত জলরাশি রাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করা হইত। এখন উহার সীমানা বাড়াইয়া বার মাইল করিবার চেষ্টা চলিতেছে। ভূখণ্ডের উপরিস্থিত আকাশও রাষ্ট্রের আয়ত্তে থাকে। অন্য দেশের এরোপ্লেন বিনা অনুমতিতে সেই আকাশের উপর দিয়া উড়িয়া গেলে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হয়।

জমির উপরের ও নীচের অধিকার

রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের পরিমাণ লইয়া সেকালের পণ্ডিতেরা অনেক বিচার বিবেচনা করিয়াছেন। আরিস্টটল বলেন যে, গাছপালা, পশুপক্ষীর মতন রাষ্ট্রেরও আকারের একটা সীমা আছে। সেই সীমার চেয়ে বেশি কম বা অত্যন্ত বেশি হইলে উহা তাহার স্বরূপ হারায় অথবা বিকৃত হইয়া যায়। তাঁহার চোখের সামনে অবশ্য ক্ষুদ্রাকার নগর-রাষ্ট্রের আদর্শই বর্তমান ছিল। তাঁহার পক্ষে দেশব্যাপী রাষ্ট্রের কল্পনা করা সম্ভব হয় নাই। তাঁহার দুই হাজার বৎসর পরে রুশো, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, স্পেন প্রভৃতি বড় বড় রাষ্ট্র দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মতে আকারে ছোট রাষ্ট্রই শ্রেষ্ঠ। তিনি বলিয়াছেন, রাষ্ট্র আকারে যত ক্ষুদ্র হইবে, সেই অনুপাতে শক্তিতে তত

বড় হইবে। ছোট ভূখণ্ড লইয়া রাষ্ট্র গড়িবার স্বপক্ষে তিনি অনেকগুলি যুক্তিও উপস্থিত করিয়াছেন। রাষ্ট্রের আয়তন বড় হইলে শাসনকার্য চালানো কষ্টকর হয়; ফলে শাসনব্যবস্থা খারাপ হয়। দূরবর্তী স্থানের লোকেরা নায়কদের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি বোধ করিতে পারে না। বিভিন্ন প্রদেশে একই আইন চলিতে পারে না, কেন না বিভিন্ন জায়গার প্রয়োজন বিভিন্ন রকমের। যাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি আছে তাহাদের সকলকে কাজে লাগানো সম্ভব হয় না। রাষ্ট্রনায়কেরা কাজের ভিড়ে অস্থির হইয়া পড়েন। ফলে কেরাণীরাই শাসন ক্ষমতা হাতে পায়। তিনি আরও বলেন যে, বৃহদাকার রাষ্ট্রের পক্ষে রাজতন্ত্র এবং মধ্যমাকার রাষ্ট্রের পক্ষে গণতন্ত্র উপযোগী। রুশোর উক্তি অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্র ব্যবস্থার সম্বন্ধে অনেকখানি প্রযোজ্য ছিল বটে, কিন্তু আজকাল অবস্থা বদলাইয়া গিয়াছে। যানবাহন ও সংবাদ আদান-প্রদানের সুবিধা হওয়ায় দূরদেশ এখন আর দূরবর্তী নহে। দিল্লী হইতে মাদ্রাজ ও গৌহাটির সহিত টেলিফোনে কথাবার্তা বলা চলে। এরোপ্লেনে চড়িয়া গেলে কয়েকঘণ্টার মধ্যে ভারতের যে কোন রাজ্য হইতে অন্য কোন রাজ্যে যাওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলন হওয়ায় স্থানীয় ব্যক্তিদের বিদ্যা বুদ্ধি তাহাদের নিজ নিজ রাজ্যের কার্যে নিয়োজিত করা সম্ভব হইয়াছে। প্রত্যেক রাজ্য নিজের নিজের স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে আইন করিতে পারে। বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে আমলাসাহীর উপদ্রব কিছুটা হ্রাস পাইতে পারে। ডি টক্‌ভিল কিন্তু ঠিকই বলিয়াছেন যে, বিশাল সাম্রাজ্যের মতন জনসাধারণের কল্যাণ ও স্বাধীনতার বিরোধী আর কিছুই নাই। কিন্তু সাম্রাজ্যের পরিবর্তে যদি সমান ক্ষমতাসম্পন্ন রাজ্যগুলি সংঘাত্মক শাসনতন্ত্রে (Federal government) যুক্ত হয় তাহা হইলে মানুষের সুখ ও স্বাধীনতার কোন হানি হয় না।

রাষ্ট্র কত বড় হওয়া উচিত

বিকেন্দ্রীকরণ

আজকাল রাষ্ট্রের আয়তন সম্বন্ধে কোন বাঁধাধরা নীতি অনুসরণ করা হয় না। রাশিয়া পৃথিবীর ষষ্ঠাংশ জুড়িয়া আছে, কিন্তু তাহার অন্তর্গত কোন রাজ্যবিশেষ অন্যান্য রাজ্যের উপর শোষন নীতি প্রয়োগ করিতেছে বলিয়া শোনা যায় না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ৫০টি রাজ্যের প্রত্যেকটিই সমান অধিকার ভোগ করে। বর্তমান জগতে কতকগুলি ছোট ছোট রাষ্ট্রও

রহিয়াছে। লাক্সেমবুর্গ রাষ্ট্রের আয়তন মাত্র ৯৯৯ বর্গ মাইল। আবার ক্যাথলিক ধর্ম জগতের গুরু পোপ মহোদয় ভ্যাটিকান নামে যে রাষ্ট্রের অধিপতি তাহার আয়তন মাত্র ১০৯ একর জমি। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে মধ্য ইতালিতে সমুদ্রের পূর্ব উপকূল হইতে পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত এক রাজ্য অবশ্য তাঁহার ছিল। এখন তাঁহার রাষ্ট্র আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইলেও অন্যান্য রাষ্ট্রে দূত প্রেরণের ক্ষমতা পোপের আছে।

ছোট ও বড় রাষ্ট্র

কোন একটি ভূখণ্ড স্থায়ীভাবে অধিকারে না থাকিলে রাষ্ট্র হয় না। ইহুদীদের মধ্যে জাতীয় ভাব খুব প্রবল ছিল, কিন্তু ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে তাহাদের হাতে কোন ভূখণ্ড ছিল না বলিয়া তাহারা কোন রাষ্ট্রগঠন করিতে পারে নাই। কদাচিৎ কখনও এমন ঘটনা দেখা যায় যে, ভূখণ্ড হাতছাড়া হইলেও কাগজে-কলমে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রহিয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পোল্যাণ্ড রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছিল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধের পর উহা পুনর্গঠিত হয়, কিন্তু ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে জার্মানি উহা গ্রাস করে। পোল্যাণ্ডের সরকার ইংলণ্ডে পলায়ন করেন এবং ঐখানে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত পোলাণ্ডের রাষ্ট্রের শাসনকারী বলিয়া নিজদিগকে পরিচিত করেন; মিত্র শক্তিপুঞ্জ তাঁহাদের দাবি মানিয়াও লইয়াছিলেন। বর্তমানে চীন দেশে যে গণশাসন চলিত আছে, তাহাকে সম্মিলিত জাতিসংঘ স্বীকার করেন নাই। চীন হইতে পলায়িত চিয়াং কাইশেকের সরকারকে ঐ সংঘ স্বীকার করিয়া আসিতেছেন।

নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের প্রয়োজনীয়তা

নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে যে কেহ বাস করে সেই ঐ রাষ্ট্রের আইন-কানুন মানিয়া চলিতে বাধ্য। কিন্তু এই নীতির দুইটি ব্যতিক্রম আছে। কোন রাষ্ট্রে অন্যান্য রাষ্ট্র হইতে যে সকল দূত প্রেরণ করা হয় তাঁহাদের প্রত্যেকের এক একটি দূতাবাস থাকে। দূতাবাসের ভিতরে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা নিজের নিজের রাষ্ট্রের অধীন; যে রাষ্ট্রে তাঁহারা আসিয়াছেন সেখানকার শাসন-বিভাগ, আইন ও বিচারালয় তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ কোন জাহাজ বিদেশী বন্দরে উপস্থিত হইলেও জাহাজের লোকজন সব নিজের দেশের রাষ্ট্রের অধীন থাকে।

দূতাবাস ও জাহাজের বিশেষ নিয়ম

এ যুগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করা সম্ভব নহে। বড় বড় রাষ্ট্রের ও সম্মিলিত জাতিসংঘের সৌজন্যে তাহারা কোন রকমে টিকিয়া থাকিতে পারে। তাহাদের আর্থিক জীবনের বিকাশও অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভর করে। তবে একথা ঠিক যে, সুইট্‌জারল্যাণ্ডের ন্যায় নাতিক্ষুদ্র রাষ্ট্র নাগরিকের ব্যক্তিত্ব ও দেশের সংস্কৃতি বিকাশের পক্ষে উপযোগী।

৪। **সরকারঃ** কোন এক ভূখণ্ডের উপর কতকগুলি লোক যদি দেখা যায়, তাহা হইলেই উহাদের মধ্যে রাষ্ট্রের সংগঠন হইবে না। তাহাদের মধ্যে উদ্দেশ্যের ঐক্য থাকা চাই, পরস্পরের মধ্যে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবার মতন আইন ও শৃঙ্খলা থাকা চাই এবং শান্তি বজায় রাখিবার জন্য সরকার চাই। সরকার হইতেছেন রাষ্ট্রের সমবেত ইচ্ছার প্রতীক। রাষ্ট্রের ইচ্ছা সরকারের ভিতর দিয়াই প্রকাশ পায়, এবং ঐ ইচ্ছাকে কার্যকরী করা হয়। সরকার শব্দটি সংকীর্ণ অর্থে মন্ত্রিমণ্ডলীকে বুঝায়, কিন্তু ব্যাপক অর্থে ইহা শাসকগোষ্ঠীর অন্তর্গত সেই সকল লোককে বুঝায়, যাঁহারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনা করেন। যাঁহারা আইন তৈয়ারি করিতেছেন, আইন রক্ষা করিতেছেন, ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ করিতেছেন, যাঁহারা কোন না কোন হিসাবে রাষ্ট্রের ক্ষমতা পরিচালন করিয়া সাধারণের কল্যাণ করিতেছেন তাঁহারা সকলে সমবেতভাবে সরকার নামে পরিচিত। প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকেরা মাঝে মাঝে ভোট দিয়া আইনসভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করেন এবং তাঁহাদের মতামতের উপরই গণতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠীর অস্তিত্ব নির্ভর করে বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে সরকারের অন্তর্ভুক্ত বলা হয় না।

সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের ইচ্ছা প্রকাশিত হয়

যে কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিবার জন্য পরিচালকমণ্ডলীর প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ঐ পরিচালকমণ্ডলীর নাম হইতেছে সরকার। সরকার না থাকিলে জনসমষ্টি উচ্ছৃঙ্খল জনতায় পরিণত হয়। বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে গিলিয়া ফেলে, সেইরূপ সরকারের অভাবে শক্তিমানেরা দুর্বলকে মারিয়া ফেলে। সেইজন্য প্রাচীন ভারতে সরকারবিহীন অবস্থার

সরকারের প্রয়োজনীয়তা

নাম দেওয়া হইয়াছিল মাৎস্যন্যায়। সরকারকে কি করিয়া সংযত ও জনহিতকর কার্যে ব্যাপৃত রাখা যায় তাহা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি প্রধান সমস্যা।

৫। **সার্বভৌমিকতা ঃ** রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হইতেছে সার্বভৌমিকতা। রাষ্ট্রের ভিতরের প্রত্যেক ব্যক্তি যে ক্ষমতা সাধারণতঃ মানিয়া চলে, এবং না মানিলে দণ্ডনীয় হয়, তাহাকে আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা বলে। আন্তর্জাতিক আইনের মতে এক সার্বভৌমশক্তি অন্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের অধীন নহে। যে শক্তি দেশের ভিতর সকলকে নিয়ন্ত্রণ করে অথচ বিদেশের কোনপ্রকার নিয়ন্ত্রণ সর্বদা মানে না, তাহাকে সার্বভৌমিকতা বলা হয়। সার্বভৌম ক্ষমতার বলেই রাষ্ট্র আইন তৈয়ারি করে। আইনকে সর্বসাধারণের ইচ্ছার প্রতীক বলা হয়। সার্বভৌমিকতা লইয়া অনেক সূক্ষ্ম বিচার বিতর্ক আছে। তাহা পরে আলোচনা করা যাইবে। এখন শুধু এইটুকু বলা প্রয়োজন যে মাত্র জনসমষ্টি, ভূখণ্ড ও সরকার থাকিলে রাষ্ট্র হয় না। সেই সরকার অন্য দেশের সরকারের অধীন হইতে পারে। সাম্রাজ্যবাদের যুগে এই রকম অধীন সরকারের দ্বারা শাসিত দেশকে উপনিবেশ বলা হইত। সম্মিলিত জাতিসংঘ এখন যাহাকে সদস্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়, সেই দেশ রাষ্ট্র বলিয়া গণিত হয়।

রাষ্ট্রের প্রাণ হইতেছে সার্বভৌমিকতা

ভারতের রাষ্ট্রের অন্তর্গত মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার প্রভৃতিকে বা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ৫০টি রাজ্যকে সাধারণতঃ State বলিলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুসারে ইহাদিগকে রাষ্ট্র বলা যায় না—কেন না ইহাদের সার্বভৌম ক্ষমতা নাই, এবং ইহারা সম্মিলিত জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত নহে। সম্মিলিত জাতিসংঘও রাষ্ট্র নহে, কেন না তাহার স্বতন্ত্র ভূখণ্ড নাই এবং সার্বভৌম ক্ষমতা নাই।

৬। **রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ঃ** আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় রাষ্ট্র হইতেছে এমন একটি জনসমাজ যাহা সংখ্যায় অল্পাধিক বিপুল, যাহা স্থায়ীভাবে কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ড অধিকার করিয়া থাকে, যাহা বাহিরের কোন শক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে স্বাধীন অথবা প্রায় স্বাধীন এবং যাহার একটি এমন সুগঠিত শাসনযন্ত্র আছে যাহার প্রতি প্রায় সকলেই স্বভাবতঃ আনুগত্য স্বীকার করে। গার্ণার প্রদত্ত এই সংজ্ঞায় পূর্ব বর্ণিত রাষ্ট্রের সকল উপাদানই

রহিয়াছে। জনসমষ্টির কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট নাই, তবে মোটামুটি বলা যায় যে উহা যেন নিতান্ত অল্প না হয়। আজকালকার জগতে এমন রাষ্ট্র খুবই কম আছে যাহার উপর বাহিরের কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ নাই। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র বা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকেও সম্মিলিত জাতি-সংঘের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ মানিয়া চলিতে হয়। সেই জন্য বাহিরের শক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে প্রায় স্বাধীন হইলেও তাহাকে রাষ্ট্র বলিতে হইবে। দেশের সরকারের প্রতি চোরডাকাত প্রভৃতি দুই চারিজন দুষ্ট লোক ছাড়া আর সকলেই স্বভাবতঃ আনুগত্য স্বীকার করে। সেইজন্য আনুগত্য সম্বন্ধে "প্রায় সকলেই" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। উড্রো উইলসন রাষ্ট্রের একটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দিতে যাইয়া বলিয়াছেন—কোন নির্দিষ্ট ভূভাগের মধ্যে আইনের জন্য সংগঠিত জনসমূহকে রাষ্ট্র বলে। আইন সার্বভৌম ক্ষমতার দ্বারা সৃষ্ট হয় অথবা অনুমোদিত হয় এবং সরকার কর্তৃক প্রযুক্ত হয়। সেইজন্য "আইনের জন্য সংগঠিত" বলিলে ইঙ্গিতে সরকার ও সার্বভৌম ক্ষমতার কথা বলা হয়।

রাষ্ট্র কি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইতে পারে

ম্যাক্ আইভার বলেন যে, রাষ্ট্র এমন একটি সংঘ যাহা সরকারের দ্বারা ঘোষিত আইন অনুসারে কার্য করে। সরকার আইন ঘোষণা করিবার এবং উহা পালন করাইবার শক্তির অধিকারী। ঐ শক্তির সাহায্যে সরকার নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত সামাজিক শৃঙ্খলার বাহ্য ও সার্বজনীন অবস্থা বজায় রাখে। এই সংজ্ঞায় সার্বভৌম ক্ষমতা শব্দটি ব্যবহার করা হয় নাই; ম্যাক্ আইভার ঐ ক্ষমতাকে সমাজের সম্মিলিত ক্ষমতা বলিয়া স্থানান্তরে উল্লেখ করিয়াছেন। রাষ্ট্র শুধু বাহ্য অবস্থাই সৃষ্টি করিতে পারে, মানুষের মনে স্নেহ, দয়া, ভালবাসা, সৌভ্রাত্র প্রভৃতি অন্তরের গুণ উৎপাদন করিতে পারে না। সুপণ্ডিত লাস্কির মতে রাষ্ট্র হইতেছে একটি ভূখণ্ডে অবস্থিত এমন সমাজ যাহা শাসকগোষ্ঠী ও প্রজা—এই দুই ভাগে বিভক্ত এবং যাহা নিজের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত অন্য সকল সংস্থার উপর প্রাধান্য দাবি করে। এই সংজ্ঞায় তিনি কার্যত রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন; শুধু ঐ শব্দটি ব্যবহার করেন নাই।

সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা

আরিস্টটল রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন যে, পরিবার

ও গ্রামের এমন এক সংঘকে রাষ্ট্র বলে যাহার উদ্দেশ্য হইতেছে সম্পূর্ণ আনন্দময় এবং সম্মানজনক জীবন যাপন করা। এই সংজ্ঞা নানাকারণে গ্রহণযোগ্য নহে। রাষ্ট্র এখন আর শুধু গ্রাম ও পরিবারের সংঘ নহে। তাহার মধ্যে নগর ও দেশ আছে। কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই এখন সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব নহে। জীবনযাত্রার উপযোগী কোন না কোন জিনিসপত্রের জন্য এক রাষ্ট্রকে অন্য রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করিতে হয়। বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের আয়তন ও প্রকৃতি উভয়েরই মধ্যে যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। এই জন্য সেকালের মনীষীদের প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলি একালে গৃহীত হইতে পারে না।

আরিস্টটলের সংজ্ঞার অসম্পূর্ণতা

(১) ইংরাজীতে উক্ত সংজ্ঞাগুলি নিম্নে দেওয়া হইতেছে—

Garner—The State, as a concept of political science and public law is a community of persons more or less numerous, permanently occupying a definite portion of territory, independent or nearly so, of external control and possessing an organised government to which the great body of inhabitants render habitual obedience.

Woodrow Wilson—The State is a people organised for law within a definite territory.

Mac Iver—The State is an association which, acting through law as promulgated by a government endowed to this end with coercive power, maintaining within a community territorially demarcated, the universal external condition of social order.

Laski—The modern State is a territorial society, divided into government and subjects claiming within its allotted physical area supremacy over all other institutions.

৭। সমাজ ও রাষ্ট্রঃ রাষ্ট্র ও সমাজ এক নহে। বিভিন্ন সংগঠনের সমবায়ে সমাজদেহ গঠিত; রাষ্ট্র সমাজের এক প্রধান সংগঠন। রাষ্ট্র সমাজের মধ্যে অবস্থান করে, কিন্তু রাষ্ট্রের মধ্যেই সমাজের সামগ্রিক রূপ ফুটিয়া উঠে না। মানুষের সহিত মানুষের স্বেচ্ছাকৃত সম্বন্ধ স্থাপনের বিবিধ প্রয়াস হইতে সমাজের উদ্ভব হইয়াছে। নিজের ইচ্ছায় সহযোগিতা করা সমাজের ধর্ম, আর রাষ্ট্র বাহিরের চাপ দিয়া কাজ

রাষ্ট্র সমাজের অন্তর্গত

করাইয়া লয়। সমাজের মধ্যে বাঁধা-ধরা নিয়মের উগ্রতা নাই, রাষ্ট্রের মধ্যে আইনের চুলচেরা বিচার করিয়া সব কাজ করা হয়। সমাজ স্নেহ-প্রীতি-শ্রদ্ধা-সহানুভূতির উপর বেশি নির্ভর করে, রাষ্ট্র কাজ করায় ক্ষমতার বলে।

সমাজের উৎপত্তি বোধ হয় মানুষের উদ্ভবেরও পূর্বে, কেন না মৌমাছি ও পিপীলিকার মধ্যেও সমাজবন্ধন দেখা যায়। মানুষ জৈব প্রেরণায় (biological urge) সমাজে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়াছে; পতিপত্নীর সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া পুত্রকন্যা, ভ্রাতাভগিনী প্রভৃতি লইয়া পরিবার গঠন করিয়াছে; ক্ষুধাতৃষ্ণা ও শীতগ্রীষ্মের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য নানাপ্রকার প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছে; আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে ধর্মসংঘ স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রের উৎপত্তি সমাজবিকাশের পরে হইয়াছে। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সমাজের ন্যায় বহুমুখী নহে। রাষ্ট্র সামাজিক মানুষের বাহিরের ক্রিয়াকলাপকে মাত্র নিয়ন্ত্রণ করে। যে রাষ্ট্র যতই শক্তিশালী হউক না কেন, পরস্পরকে ভালবাসিতে বাধ্য করিতে পারে না। রাষ্ট্রের প্রধান কাজ বাহিরের অবস্থাকে আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা। সমাজের মধ্যে মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর হয়। রাষ্ট্র যদি সামাজিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য না রাখিয়া কোন আইন করিতে যায় তবে তাহা ব্যর্থ হয়।

সমাজের উৎপত্তি আগে, রাষ্ট্রের পরে

রাষ্ট্র বিশেষ কোন ভূখণ্ডের সীমানায় আবদ্ধ, কিন্তু রোমান্ ক্যাথলিক চার্চ এবং সম্মিলিত জাতিসংঘের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান কোন বিশেষ রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে নিবদ্ধ নহে—সারা পৃথিবী ব্যাপিয়া উহাদের কার্যক্ষেত্র। রাষ্ট্রের মধ্যে সরকার থাকা অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু সমাজের মধ্যে বিশেষ কোন শাসন-সংক্রান্ত সংগঠন থাকিতে পারে। এস্কিমো জাতি সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে, কিন্তু তাহাদের কোন রাষ্ট্রও নাই, সরকারও নাই। কিন্তু সুবিকশিত সমাজে রাষ্ট্র থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। রাষ্ট্র বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখে। কিন্তু রাষ্ট্র সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সৃষ্টি করে একথা সত্য নহে। পরিবার, ধর্মসংঘ প্রভৃতি রাষ্ট্র কর্তৃক সংস্থাপিত হয় নাই। রাষ্ট্র সামাজিক প্রথাকে সৃষ্টি করিতে পারে না। কিন্তু ঐ প্রথা কেহ ভঙ্গ করিলে তাহাকে দণ্ড দেওয়ার ভার রাষ্ট্রের উপর।

সমাজ বেশি ব্যাপক

সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্র সংকুচিত ও প্রসারিত হইতে পারে। গ্রীক্ চিন্তানায়কগণ রাষ্ট্র ও সমাজকে এক করিয়া দেখিয়াছেন। Polis শব্দটি নগর, রাষ্ট্র ও সমাজকে বুঝাইত। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর স্পার্টার ও পঞ্চম শতাব্দীর এথেন্সের রাষ্ট্র সমাজের সকল প্রকার সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করিত। আরিস্টটল রাষ্ট্রকে সর্বাত্মক ও সর্বপ্রধান সংগঠন বলিয়াছেন। প্লেটো রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষার জন্য পারিবারিক জীবন বিনষ্ট করিতে দ্বিধা-বোধ করেন নাই। ইউরোপের মধ্যযুগে রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্রকে অত্যন্ত সামাবদ্ধ করা হইয়াছিল। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ইতালি ও জার্মানিতে রাষ্ট্রকে আবার সর্বাত্মক বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল।

রাষ্ট্রের কার্য কি হইবে তাহা সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করে

রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্র ও সমাজের পার্থক্য তাঁহার অনবদ্য ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—"আমাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যরক্ষা এবং বিচারকার্য রাজা করিয়াছে, কিন্তু বিদ্যাদান হইতে জলদান পর্যন্ত সমস্তই সমাজ এমন সহজভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে, এত নব নব শতাব্দীতে এত নব নব রাজত্ব আমাদের দেশের উপর দিয়া বন্যার মতো বহিয়া গেল, তবু আমাদের ধর্ম নষ্ট করিয়া আমাদিগকে পশুর মতো মারিতে পারে নাই, সমাজ নষ্ট করিয়া আমাদিগকে একেবারে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া দেয় নাই। রাজায় রাজায় লড়াইয়ের অন্ত নাই—কিন্তু আমাদের মর্মরায়মান বেণুকুঞ্জে, আমাদের আমকাঁঠালের বনচ্ছায়ায় দেবায়তন উঠিতেছে, অতিথিশালা স্থাপিত হইতেছে পুষ্করিণী খনন চলিতেছে, গুরুমহাশয় শুভংকরী কষাইতেছেন, টোলে শাস্ত্র-অধ্যাপনা বন্ধ নাই, চণ্ডীমণ্ডপে রামায়ণ পাঠ হইতেছে এবং কীর্তনের আরাবে পল্লীর প্রাঙ্গণ মুখরিত। সমাজ বাহিরের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে নাই এবং বাহিরের উপদ্রবে শ্রী-ভ্রষ্ট হয় নাই (স্বদেশী সমাজ, ১৩১১ সাল)।" পাশ্চাত্যের সহিত প্রাচ্যের পার্থক্য দেখাইতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন—"য়ুরোপের শক্তির ভাণ্ডার ষ্টেট। সেই ষ্টেট দেশের সমস্ত হিতকর কর্মের ভার গ্রহণ করিয়াছে—ষ্টেটেই ভিক্ষাদান করে, ষ্টেটই বিদ্যাদান করে, ধর্মরক্ষার ভারও ষ্টেটের উপর। অতএব এই ষ্টেটের শাসনকে সর্বপ্রকারে সবল, কর্মিষ্ঠ ও সচেতন করিয়া রাখা, ইহাকে আভ্যন্তরিক বিকলতা ও

রবীন্দ্রনাথের মতে রাষ্ট্র ও সমাজ

বাহিরের আক্রমণ হইতে বাঁচানোই য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রাণরক্ষার উপায়। আমাদের দেশে কল্যাণশক্তি সমাজের মধ্যে। তাহা ধর্মরূপে আমাদের সমাজের সর্বত্র ব্যপ্ত হইয়া আছে। সেইজন্যই এতকাল ধর্ম ও সমাজকে বাঁচানোই ভারতবর্ষ একমাত্র আত্মরক্ষার উপায় বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে।”

৮। রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘ (Associations) কতকগুলি লোক এক বা কয়েকটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যখন একাধিক কার্যে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং কিভাবে তাহারা কাজ করিবে সে সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু নিয়ম মানিয়া চলে তখন তাহারা সংঘবদ্ধ হইয়াছে বলা যায়। লোকগুলির মধ্যে উদ্দেশ্য এক রকম হওয়া প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্য একটিও হইতে পারে আবার অনেকগুলিও হইতে পারে। কোথাও আগুন লাগিলে অনেকে মিলিয়া আগুন নিভাইতে গেলে সংঘ স্থাপিত হয় না—কেন না তাহাদের সহযোগিতা একটি মাত্র কাজেই সীমাবদ্ধ। সহযোগিতা একাধিক কাজে দেখা দিলে তবে সংঘ হইবে। বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়, শ্রমিকদের উন্নতির জন্য শ্রমিক সংঘ, খেলাধূলা করিবার জন্য খেলার ক্লাব, ধর্ম চর্চার জন্য হরিসভা প্রভৃতি অসংখ্য সংঘ সমাজের মধ্যে দেখা যায়। রাষ্ট্রও সমাজের একটি সংঘ ; কিন্তু ইহার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে।

সহযোগিতার উদ্দেশ্য লইয়া সংঘ গঠিত হয়

লোকে স্বেচ্ছায় কোন সংঘের সদস্য হয়। তাহারা নিজের খেয়াল-খুশি মত রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোন সংঘের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখিতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিকে কোন না কোন রাষ্ট্রের সদস্য হইতেই হয়। পরিবারের মধ্যে প্রায় সকল ব্যক্তিই জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু এমন ব্যক্তিও থাকিতে পারে যে, জন্মের পরই মাতা-পিতার দ্বারা পরিত্যক্ত হয়। সকল ব্যক্তিই কিন্তু কোন না কোন রাষ্ট্রের সদস্যরূপে জন্মায়। বড় হইয়া অবশ্য সে অন্য রাষ্ট্রের সদস্য হইতে পারে।

রাষ্ট্রের সদস্যতা বাধ্যতামূলক

রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে। কয়েকজন লোক হঠাৎ সভা করিয়া রাষ্ট্র সৃষ্টি করে নাই। পরিবারও কেহ যুক্তি-পরামর্শ করিয়া সৃষ্টি করে নাই। কিন্তু অন্যান্য সংঘ মানুষ ইচ্ছা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে।

রাষ্ট্রের ক্ষমতা কোন এক নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু রোমান্ ক্যাথলিক চার্চের ক্ষমতা অথবা সম্মিলিত জাতিসংঘের প্রভাব পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দেখা যায়। একটি রাষ্ট্রের মধ্যে যত রকমের সংঘ আছে, সকলের উপর রাষ্ট্রের অল্পাধিক ক্ষমতা থাকে। রাষ্ট্র তাহাদের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখে। কোন সংঘ জনসাধারণের অনিষ্টকর কোন কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইলে রাষ্ট্র উহাকে বাধা দিতে পারে। সুতরাং অন্যান্য সংঘের চেয়ে রাষ্ট্রের ক্ষমতা বেশি। কিন্তু ক্ষমতা ও প্রভাব এক ব্যক্তির জীবনে রাষ্ট্রের অপেক্ষা পরিবারের, ধর্ম সম্প্রদায়ের বা জীবিকামূলক সংঘের প্রভাব অধিক হইতে পারে।

অন্যান্য সংঘের প্রভাব বেশি কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষমতা বেশি

রাষ্ট্রের প্রাণদণ্ড দিবার ক্ষমতা আছে, অন্যান্য সংঘ বড়-জোর সদস্যকে তাড়াইয়া দিতে পারে। রাষ্ট্রের আদেশ পালন না করিলে কারাদণ্ড হইতে পারে। অন্যান্য সংঘ ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাকে অবরুদ্ধ রাখিতে পারে না।

উদ্দেশ্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও অন্যান্য সংঘের অপেক্ষা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য অনেক বেশি ব্যাপক। অন্যান্য সংঘ দুই একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্র মানবের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনে তৎপর। কিন্তু তাই বলিয়া রাষ্ট্র শক্তি প্রয়োগ করিয়া লোককে নীতিপরায়ণ ও ধার্মিক করিয়া তুলিতে পারে না। রাষ্ট্রের ক্ষমতা লোকের বাহিরের আচরণ ব্যবহারের উপরে মাত্র।

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ব্যাপক

রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংঘ অপেক্ষা অধিক স্থায়ী বলিয়া দাবি করা হয়। কেহ কেহ এমনও বলেন যে, রাষ্ট্র চিরস্থায়ী। কিন্তু পোল্যাণ্ডের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কয়েকবার ঐ রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটিয়াছে। কিছুকাল পরে বিলোপ পাইয়াছে এমন রাষ্ট্রের সংখ্যা কম নহে। অন্যদিকে রোমান্ ক্যাথলিক চার্চ বহুকাল ধরিয়া বর্তমান রহিয়াছে। তবে একথা সত্য যে সামাজিক অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রাষ্ট্রের জীবন সর্বাপেক্ষা অধিককাল স্থায়ী। ষ্টেট শব্দটি মূলতঃ স্থায়িত্ব বা চিরস্থায়িত্ব সূচক।

৯। রাষ্ট্র ও সরকারঃ রাষ্ট্র ও সরকারকে কোন কোন সময়ে একই

অর্থে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করা হইয়াছে। রাষ্ট্র একটি তত্ত্বগত ধারণা; ইহার মূর্তি চোখে দেখা যায় না, কারণ ইহা একটি ভাববস্তু। সরকার হইতেছে রাষ্ট্রের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ। রাষ্ট্রের ইচ্ছা সরকারের দ্বারাই প্রকটিত হয়। গভর্ণমেণ্ট শব্দটির সহিত জাহাজের হাল শব্দটির যথেষ্ট সম্পর্ক আছে।* কর্ণধারের হাতে হাল থাকে বটে, কিন্তু নাবিকেরা যদি তাহার সহিত সহযোগিতা না করে, তাহা হইলে কর্ণধারের পক্ষে জাহাজ চালানো অসম্ভব হয়। সরকার না থাকিলে জনতা অসম্বদ্ধ ও উচ্ছৃঙ্খল হয় এবং তাহাদের পক্ষে একযোগে কোন কাজ করা সম্ভব হয় না।

'গভর্ণমেণ্ট'র ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ

রাষ্ট্র শব্দটি সরকার অপেক্ষা অনেক বেশি ব্যাপক। রাষ্ট্রের মধ্যে নাগরিক আছে তাহাদের সকলকে লইয়া রাষ্ট্র। আর সরকার গঠিত হয় অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোক লইয়া। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে সংকীর্ণ-অর্থে মন্ত্রিমণ্ডলীকে সরকার বলে, কিন্তু ব্যাপক অর্থে যাঁহারা রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করেন তাঁহাদের সকলে সমবেতভাবে সরকার নামে অভিহিত হইতে পারেন। আইনসভার সদস্যরূপে যাঁহারা আইন তৈয়ারি করেন, বিচারক হিসাবে যাঁহারা আইন প্রয়োগ করেন ও ব্যাখ্যা করিয়া নূতন আইন সৃষ্টি করেন, মন্ত্রী হিসাবে যাঁহারা রাষ্ট্রের কার্য-নীতির নির্দেশ দেন এবং রাজকর্মচারী হিসাবে যাঁহারা ঐ নীতি অনুসরণ করেন তাঁহারা সকলে সমবেত ভাবে সরকার রূপে পরিচিত হন।

সরকার বলিতে কি কি বুঝায়

রাষ্ট্র একটি ভাববস্তু বলিয়া সর্বদেশে ও সর্বকালে ইহার স্বরূপ এক ও অভিন্ন। কিন্তু সরকার বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে; যথা—রাজতান্ত্রিক সরকার, অভিজাততান্ত্রিক সরকার, গণতান্ত্রিক সরকার প্রভৃতি। অন্তর্বিপ্লবের ফলে ও বৈধ উপায়ে সরকারের পরিবর্তন ঘটিতে পারে। রাষ্ট্রের পরিবর্তন সম্ভব কিনা বিচার্য। এক শ্রেণীর রাষ্ট্র বিজ্ঞানীর মতে শ্রেণীবিভাগ হইতে

* The word "Government" judged by its philological derivation, apparently has a close affinity to the rudder, or steering gear, of a ship.

রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে ; এক শ্রেণীর লোক অন্যান্য শ্রেণীর লোককে দাবাইয়া রাখে ; তাহারা শাসকশ্রেণী হয়। কখনও বা পুরোহিত শ্রেণীর লোক, কখনও ভূস্বামী শ্রেণীর লোক, কখনও শিল্পপতিরা, আবার কখনও শ্রমিকেরা রাষ্ট্রের উপর প্রভুত্ব করে। ইহাতে রাষ্ট্রের রূপ পরিবর্তিত হয় না—শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং এই প্রকার পরিবর্তনকে রাষ্ট্রের পরিবর্তন না বলিয়া সরকারের পরিবর্তন বলিলে অধিক সঙ্গত হয়। লাস্কি অবশ্য বলেন যে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সরকারই রাষ্ট্র (The State for all practical purposes is the government.)। আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র এক অপ্রত্যক্ষ স্পর্শের অযোগ্য, অপরিবর্তনীয় আদর্শ ব্যক্তি স্বরূপ ; এবং সরকার তাহার এজেন্ট ও প্রতিনিধি। সার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্ট্রের গুণ, সরকারের নহে। সরকার রাষ্ট্রের হইয়া সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহার করে বটে, কিন্তু সরকারকে স্বেচ্ছাচারিতার অপরাধে পদচ্যুত করা যায়।

রাষ্ট্র এক ও অভিন্ন, সরকার ভিন্ন ভিন্ন-রকমের হইতে পারে

অনুশীলন

১। Discuss the meaning and significance of 'territory' as a constituent element of the State. (1964)

তৃতীয় প্রকরণ দ্রষ্টব্য। ভূখণ্ড বলিতে মাটির উপর ও নীচের খনিজ-সম্পদ, নিকটস্থ নদী ও সমুদ্রের উপকূলও বুঝায়। ভূখণ্ড ছোট অথবা বড় হইতে পারে। সর্বগ্রাসী বিরাট ভূখণ্ডযুক্ত রাষ্ট্র স্বাধীনতার অনুকূল নহে বলিয়া অনেকের মত। বিদেশী দূতাবাস ও জাহাজ রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের মধ্যে থাকিলেও তাহার কর্তৃত্বের বাহিরে বলিয়া গণ্য হয়।

২। Define the term State and discuss its essential elements.

ষষ্ঠ প্রকরণ দ্রষ্টব্য। রাষ্ট্র হইতেছে একটি ভূখণ্ডে অবস্থিত এমন এক সমাজ যাহা শাসক গোষ্ঠী ও প্রজা এই দুই ভাগে বিভক্ত এবং যাহা নিজের এলাকার মধ্যে অবস্থিত অন্য সকল সংস্থার উপর প্রাধান্য দাবি করে। জনসমষ্টি, ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমিকতা হইতেছে ইহার চারটি উপাদান।

৩। How does the State differ from other Associations.

অষ্টম প্রকরণ দ্রষ্টব্য। রাষ্ট্রের সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক, অন্যান্য সংঘের সদস্য হওয়া না হওয়া ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও ক্ষমতা ব্যাপকতর। ইহার অস্তিত্বও দীর্ঘকালস্থায়ী। রাষ্ট্র প্রাণদণ্ডও দিতে পারে।

৪। Discuss to what extent economic conditions influence the organisation of the State.

মানুষ আহার, পরিধেয় ও বাসস্থান ছাড়া বাঁচিতে পারে না। রাষ্ট্র না থাকিলে এই অপরিহার্য দ্রব্যগুলির জন্য মানুষের নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করিত। রাষ্ট্রের সমবেত চেষ্টার ফলে জল-বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা, জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করা, কলকারখানা স্থাপন করা সম্ভব হয়। যে শ্রেণীর লোকের হাতে আর্থিক ক্ষমতা থাকে তাহারাই রাষ্ট্র পরিচালনা করে।

তৃতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিবর্তন

রাষ্ট্রের উৎপত্তি কিভাবে হইল এবং কবে হইল তাহা সুনিশ্চিতরূপে জানা যায় না। তবে আজকাল ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব ও সমাজ-বিজ্ঞানের গবেষণার ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ঐতিহাসিক ধারা মোটামুটি অনুমান করা যাইতেছে। রাজনৈতিক চেতনার উদ্ভব হইলে লোকে রাষ্ট্রের প্রয়োজন বোধ করে। দশজনে মিলিয়া রাষ্ট্র সংগঠন করে। রাষ্ট্র কালক্রমে বিবর্তনপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ণরূপে প্রকট হয়। উহার প্রাথমিক সূত্রপাত হইয়াছিল হয়তো মাতৃতান্ত্রিক ও পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের মধ্যে। অধুনা রাষ্ট্রবিজ্ঞান ক্রমবিকাশমূলক মতবাদ স্বীকার করিতেছে। কিন্তু প্রাচীনকালে রাষ্ট্রের উৎপত্তি লইয়া নানাপ্রকার কাল্পনিক মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। একশ্রেণীর লোকে বলিতেন যে, রাষ্ট্র ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। অপর একদল বলিতেন, রাষ্ট্র বল-প্রয়োগের ফলে উৎপন্ন হইয়াছে। অন্য এক দল পণ্ডিত স্থির করেন যে মানুষেরা নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াছে। এক এক যুগে এক এক রকম রাজনৈতিক অবস্থার ফলে এক একপ্রকার মতবাদের উদ্ভব হয়। বিভিন্ন মতবাদের প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন রকমের হইয়াছিল। মূলতঃ কাল্পনিক হইলেও মতবাদগুলির সাময়িক উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না। সেইজন্য আমরা রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিষয়ে যে যে মতবাদ এপর্যন্ত প্রচারিত হইয়াছে তাহার বিশদ আলোচনা করিব।

বিভিন্ন মতবাদ

১। **দৈবী উৎপত্তিমূলক মতবাদ :** (Theory of Divine Origin) রাষ্ট্র মানুষে সৃষ্টি করে নাই, ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন এইরূপ ধারণা কোন কোন প্রাচীন প্রাচ্যজাতির মধ্যে হয়তো ছিল। হয়তো বলিবার কারণ এই যে, রাষ্ট্রের তত্ত্বগত ধারণা তাঁহাদের মধ্যে ছিল না। তাঁহারা রাজার কথাই বলিয়াছেন, রাষ্ট্রের কথা বলেন নাই। দৈবী উৎপত্তির মতবাদ অনুমান করে যে, ভগবান স্বয়ং বা কোন অতিপ্রাকৃত শক্তি রাষ্ট্র সংস্থাপন করিয়া তাহার শাসনভার তাঁহার প্রতিনিধির হাতে সমর্পণ করেন। সেই প্রতিনিধি জনসাধারণের নিকট ভগবানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া

তাহাদিগকে আনুগত্য স্বীকার করিতে বলেন। এইরূপে একজনের আদেশ দিবার শক্তি ও অন্য সকলের তাঁহার প্রতি আনুগত্য হইতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইল। প্রাচীন মিশরে রাজাকে ভগবানের অবতার বলিয়া মনে করা হইত, জীবিতকালে তাঁহাকে সূর্যপুত্র হোরাস্ এবং মৃত্যুর পরে ওসিরিস্রূপে পূজা করা হইত। চীন ও মেসোপটামিয়াতে রাজাকে একদিকে ভগবানের প্রতিনিধি, অন্যদিকে জনসাধারণের প্রতিনিধি বলিয়া মান্য করা হইত। ঋগ্বেদে রাজা পুরুকুৎসকে অর্ধদেব বলিয়া ও অথর্ববেদে রাজা পরীক্ষিতকে মনুষ্য মধ্যে দেব বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে। রাজাকে অবশ্য স্পষ্ট করিয়া ভগবান প্রজাপতির প্রতিনিধি বলা হইয়াছে শতপথ ব্রাহ্মণে। মহাভারতের শান্তিপর্বে দেখা যায়, যে লোকে অরাজকতায় উৎপীড়িত হইয়া ভগবানের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিলে তিনি এক বিস্তৃত বিধানশাস্ত্র রচনা করিলেন ও অযোনিসম্ভব পুত্র বিরজস্‌কে রাজা নিযুক্ত করিলেন এবং লোকে তাঁহার আদেশ পালন করিতে স্বীকৃত হইল। এখানে রাজাকে নিরংকুশ ক্ষমতা দেওয়ার কথা নাই। রাজা ভগবানকৃত বিধান মানিয়া চলিতে বাধ্য বলা হইয়াছে। অশোক নিজে কোথাও দেবত্ব দাবি করেন নাই, শুধু নিজেকে 'দেবতাদের প্রিয়' বলিয়াছেন। বিদেশ হইতে আগত কুষাণ ও শক নৃপতিরা নিজদিগকে দেবপুত্র আখ্যায়ে অভিহিত করিয়াছেন। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে মেধাতিথি মনু-স্মৃতির ভাষ্য রচনা করিতে যাইয়া রাজা যে বিভিন্ন দেবতার অংশ তাহা রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। সুতরাং ভারতবর্ষে রাষ্ট্রের দৈবী উৎপত্তিবাদ বেশি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। শান্তিপর্বে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে, রাজা যদি তাঁহার কর্তব্য পালন না করেন তবে তাঁহাকে ক্ষিপ্ত কুকুরের মত হত্যা করিবার অধিকার প্রজাদের আছে।

প্রাচীন জগতের বিশ্বাস

গ্রীক ও রোমানেরা রাষ্ট্রকে মানুষের দ্বারা সৃষ্ট সংগঠন বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু মেসিডনের নৃপতি আলেকজাণ্ডার নিজের দেবত্ব ঘোষণা করিয়াছিলেন। বাইবেলে সেন্টপল রোমানদের বলিয়াছেন—"প্রত্যেক ব্যক্তিই উচ্চতর ক্ষমতার অধীনে থাকুক; ভগবানের ক্ষমতা ছাড়া অন্য কোন

গ্রীক্ ও রোমানদের মত

ক্ষমতারই অস্তিত্ব নাই; পৃথিবীতে যে কোন ক্ষমতা দেখা যায় তাহা ভগবান্ কর্তৃক প্রদত্ত।" মধ্যযুগে খৃষ্টীয় ধর্মসম্প্রদায়ের পোপ ও পবিত্র রোমান্ সাম্রাজ্যের সম্রাটের মধ্যে কে বড় এই প্রশ্ন লইয়া প্রচণ্ড ও দীর্ঘকালস্থায়ী সংঘর্ষ বাধে। পোপ দাবি করেন যে ভগবানের তিনিই একমাত্র প্রতিনিধি এবং তাঁহার নিকট হইতে সম্রাট ক্ষমতা পাইয়াছেন। তাঁহার পক্ষ হইতে আরও বলা হয় যে, দীনতম ধর্মযাজকের ক্ষমতা উচ্চতম রাজ্যের অধিকারীর ক্ষমতা অপেক্ষা অধিক। কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহের ফলে পোপের দাবি টিকে নাই। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে (১৫৩০ খৃষ্টাব্দে) অগ্‌সবার্গের সম্মেলনে রাষ্ট্রের দৈবী উৎপত্তিবাদ সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত করিয়া বলা হয় জগতের সমস্ত প্রভুত্ব, শাসনপদ্ধতি, আইন ও শৃঙ্খলা স্বয়ং ভগবানের দ্বারা সৃষ্ট ও স্থাপিত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের মত

এই ঘোষণার বলে ইংলণ্ডের স্টুয়ার্টবংশের রাজা প্রথম জেম্‌স্ দাবি করেন যে তিনি রাজক্ষমতা পাইয়াছেন ভগবানের নিকট হইতে; সুতরাং প্রজাদের নিকট তিনি কোনপ্রকার কাজের জন্য কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহেন, এমন কি এইপ্রকার কৈফিয়ৎ চাওয়া পাপ। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ফরাসী লেখক বসুয়ে একখানি গ্রন্থ লিখিয়া প্রমাণ করেন যে, ভগবান রাজাগণকে নিজের মন্ত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ও তাঁহারা প্রজাদিগকে নিজের সন্তানের মত শাসন করিবেন ও কেবলমাত্র ভগবানের নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য হইবেন। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে ফিলমার Patriarcha নামক গ্রন্থে বলেন যে, ভগবান আদমকে প্রথমে রাজা করিয়াছিলেন এবং বর্তমান রাজারা আদমের সন্তান হিসাবে রাজ্যের ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। ইহার উত্তরে লক্ লিখিয়াছিলেন যে, বর্তমান রাজারা যে আদমের জ্যেষ্ঠ পুত্রের জ্যেষ্ঠ বংশধর তাহা যখন প্রমাণ করা যায় না; সুতরাং প্রত্যেক রাজার ক্ষমতাই বে-আইনি। এই প্রকার উত্তরের পর হইতে ইউরোপে রাষ্ট্রের তথা রাজার দৈবী উৎপত্তিবাদ জনপ্রিয়তা হারাইল।

সপ্তদশ শতাব্দীর মতবাদ

দৈবী উৎপত্তিবাদ যেমন ইতিহাসের প্রমাণে টেকে না, তেমনি যুক্তি-তর্কেও অসিদ্ধ প্রমাণিত হয়। স্বৈরতন্ত্রের অবসানে পার্লামেণ্টারি শাসনতন্ত্র

জয়যুক্ত হইল। লোকে রাজাকে ভগবানের প্রতিনিধি বলিয়া বিশ্বাস করাকে ভুল বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এই মতবাদ স্বীকার করিলে গণতন্ত্র শাসনকে ভগবানের অনভিপ্রেত বলিতে হয়। এরূপ বলিবার কোনই হেতু নাই। ভগবান্ একজনকে দিয়া সকলকে কুশাসন ও উৎপীড়ন সহ্য করাইবেন এ কথা অবিশ্বাস্য। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে চুক্তিবাদের প্রাদুর্ভাব ঘটায় দৈবী উৎপত্তিবাদ পরিত্যক্ত হয়।

দৈবী উৎপত্তির বিরুদ্ধে যুক্তি

কিন্তু একথা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না যে এককালে এই মতবাদ শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। আদিম সমাজের লোক শক্তিকে খুব মানিত। ভগবান্ রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়া রাজাকে শান্তিস্থাপনের ভার দিয়াছেন বলিয়া লোকে সহজেই রাজার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। এই মতবাদের আর একটি সুফল এই ফলিয়াছিল যে লোকে রাজনৈতিক ব্যাপারে ভগবানের প্রতি ভয় বা ভক্তিবশতঃ নীতির অনুশাসন কতকটা মানিয়া লইয়াছিল। রাষ্ট্র ভগবানের সৃষ্ট একথা এই হিসাবে সত্য যে সকল প্রকার সৃষ্টিই ভগবানে আরোপিত হয়। ভগবান কোন বিশেষ রাষ্ট্রকে ভালবাসেন এবং সেই রাষ্ট্রের ভিতর দিয়া বিশেষ কোন ধর্মকে প্রচার করিতে চাহেন এরূপ ধারণা এখনও কেহ কেহ পোষণ করেন। ঐরূপ ধারণার বশেই ইহুদিরা ইজ্‌রায়েল ও কিছুসংখ্যক মুসলমান পাকিস্তান রাষ্ট্র স্থাপন করিয়াছেন।

এই মতের সুফল

বর্তমানে ইহার প্রভাব

২। **সামাজিক চুক্তিবাদ** (Social Contract theories): রাষ্ট্র ঈশ্বরকর্তৃক সৃষ্ট নহে, পরস্পরের মধ্যে চুক্তির ফলে জাত এক মানবীয় প্রতিষ্ঠান, এই মত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর গভীর রেখাপাত করিয়াছে। চুক্তি কি ধরনের হইয়াছিল, কোন্ কোন্ পক্ষের মধ্যে হইয়াছিল, ইহা লইয়া অনেক তর্কবিতর্ক হইয়াছে। কিন্তু মোটামুটি বলা যায় যে, চুক্তিবাদী সকল পণ্ডিতই স্বীকার করিয়াছেন যে রাষ্ট্র সৃষ্টি হইবার পূর্বে সমাজে কোন শাসন-শক্তি ছিল না, আইন-শৃঙ্খলা ছিল না, এবং মানুষ প্রকৃতির আইন মানিয়া চলিত। কিন্তু প্রকৃতির আইন কি তাহা কে বলিয়া দিবে? পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ বাধিলে কে মীমাংসা করিবে? এই সব প্রশ্নের জবাব

না থাকায় অনেক অসুবিধা হইত। তাই লোকে নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া রাষ্ট্র সৃষ্টি করিল। রাজা বা শাসক সম্প্রদায় যদি চুক্তির দ্বারা আবদ্ধ হন, তাহা হইলে তাঁহার ক্ষমতা ঐ চুক্তির শর্তের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়। আর তিনি বা তাঁহারা যদি চুক্তি না করেন, লোকেরা নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া শাসকের হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলিয়া দেয় তাহা হইলে তাঁহার ক্ষমতা হয় অসীম। যাঁহারা রাজক্ষমতার বৃদ্ধি চাহিতেন তাঁহারা এক ধরনের চুক্তির কথা বলিয়াছেন, আবার যাঁহারা প্রজার স্বাধীনতা বজায় রাখিতে চাহিতেন তাঁহারা অন্য ধরনের চুক্তির কথা উত্থাপন করিয়াছেন।

চুক্তির কথা কি করিয়া উঠিল

চুক্তিবাদ অনেককালের পুরাতন। বৌদ্ধ দীঘনিকায় গ্রন্থে দেখা যায় যে এক সুদূর অতীতে মানুষ জ্যোতির্ময়দেহে সুখেশান্তিতে বাস করিত। কালক্রমে তাহারা আদর্শভ্রষ্ট হইল। তাহাদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ জাগিল এবং উহার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য তাহারা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। শেষে তাহাদের মধ্যে মহাজন-সম্মত (অর্থাৎ জনসমষ্টির দ্বারা স্বীকৃত) নামে এক বিজ্ঞ, কুশল ও ধর্মাত্মা ব্যক্তির উদ্ভব হইল। জনসাধারণ তাঁহাকে রাজা হইয়া শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে বলিল। তিনি রাজী হইলে তাহারা তাঁহাকে নির্বাচন করিল এবং তাঁহার কাজের বিনিময়ে তাহাদের উৎপন্ন ধান্যের একাংশ দিতে সম্মত হইল। কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে গুপ্তচরদের কথোপকথনচ্ছলে প্রসঙ্গতঃ চুক্তিবাদের উল্লেখ করিয়াছেন—লোকে মনু বৈবস্বতকে সুরক্ষার পরিবর্তে উৎপন্ন শস্যের একষষ্ঠাংশ প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়া রাজা নির্বাচন করিয়াছিল। মনু এই চুক্তি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে কৌটিল্য কিছুই বলেন নাই। মহাভারতের শান্তিপর্বের ৫৯ অধ্যায়ে রাষ্ট্রসৃষ্টির পূর্বে দণ্ড ও দণ্ডদাতার প্রয়োজন ছিল না এমন এক কৃতযুগের কথা বলা হইয়াছে। কালক্রমে মোহের প্রভাবে লোক লোভ, কাম ও হিংসার বশীভূত হইল। তখন দেবতাদের অনুরোধে বিষ্ণু বিরজসকে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাজা করিলেন। বিরজসের পঞ্চম অধস্তন পুরুষ বেণ অত্যন্ত অত্যাচারী রাজা ছিলেন; সেইজন্য ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাঁহার পুত্র পৃথুকে রাজা করিলেন। পৃথু রাজা

বৌদ্ধগ্রন্থে চুক্তিবাদ

মহাভারতে চুক্তিবাদ

হইবার সময় প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি ধর্ম ও দণ্ডনীতি অনুসারে নির্ভয়ে পৃথিবী পালন করিবেন এবং কদাচ নিজের খেয়ালমত কাজ করিবেন না। এখানে কিন্তু স্পষ্ট করিয়া প্রজাদের সঙ্গে কোন চুক্তির কথা বলা হয় নাই।

গ্রীক চিন্তানায়ক প্লেটো এবং আরিস্টটল চুক্তিবাদ প্রসঙ্গে সোফিস্ট দার্শনিকদের মত উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে মনে হয় খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে চুক্তিবাদ প্রচলিত ছিল। আরিস্টটল চুক্তিবাদ স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে, এমন ভাবে যতখানি দিব ততখানি পাইব কিনা তাহার চুলচেরা বিচার করিতে গেলে সামাজিক সংস্থার উৎপত্তি সম্ভব হয় না। রোমান ঐতিহাসিক পলিবিয়াস চুক্তিবাদ সমর্থন করিয়াছেন। মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্র এক হিসাবে চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সপ্তদশ শতাব্দীতে অ্যালথুসিয়াস ও গ্রোসিয়াস চুক্তি হইতে রাষ্ট্রের উদ্ভবের ইঙ্গিত করেন। ঐ শতাব্দীতে ইংরাজ দার্শনিক হব্‌স্‌ ও লক্‌ চুক্তিবাদের পূর্ণ ব্যাখ্যা করেন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে রুশো চুক্তিবাদকে গণতান্ত্রিক শাসনের ভিত্তিরূপে স্থাপন করেন। এই তিনজনের মতবাদ বিশদভাবে আলোচনা করা হইতেছে।

ইউরোপে চুক্তিবাদ

৩। হব্‌স্‌ ব্যাখ্যাত চুক্তিবাদ: টমাস হব্‌স্‌ (১৫৮৮—১৬৭৯) ইংলণ্ডের এক ধর্মযাজকের পুত্র। ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় গভীর ছিল, কিন্তু ধর্মে তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল না। তিনি ক্যাভেনডিস পরিবারে গৃহশিক্ষকের কাজ করিতেন। ইংলণ্ডে গৃহযুদ্ধ বাধিলে তিনি প্যারিসে পলায়ন করেন এবং সেখানে কিছুদিনের জন্য প্রথম চার্লসের পুত্র, ভবিষ্যতের দ্বিতীয় চার্লসের গৃহ-শিক্ষক হন। তিনি ঐ সময় তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থ লেভায়াথানের (Leviathan) পরিকল্পনা করেন এবং ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে উহা প্রকাশিত হয়।

হব্‌সের পরিচয়

হব্‌স্‌ মানুষকে স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, ক্ষমতাপ্রিয়, নিজের বুদ্ধি ও শক্তির উপর অত্যধিক আস্থাশীল করিয়া আঁকিয়াছেন। প্রত্যেক মানুষ নিজের নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া সুখী হইতে চায়। অনেকে একই বস্তু লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে পরস্পরের মধ্যে সংঘাত বাধে। রাষ্ট্র স্থাপনের পূর্বে বিবাদ-বিসম্বাদ মিটাইবার কেহই ছিল না। মানুষ তখন প্রাকৃতিক অবস্থায় বাস করিত। ঐ অবস্থা নিরবচ্ছিন্ন

প্রাকৃতিক অবস্থা

সংঘাতে পরিপূর্ণ ছিল। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে শত্রু বলিয়া মনে করিত। পরস্পরের মধ্যে একই বস্তু লাভ করিবার জন্য প্রতিযোগিতা, একে অপরকে ক্ষমতায় ছাড়াইয়া যাইবে এই ভয় এবং প্রত্যেকেরই প্রধান বলিয়া স্বীকৃত হইবার আকাঙ্ক্ষা সংঘাতের সৃষ্টি করে। প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষের জীবন ছিল সঙ্গীহীন, ধনহীন, ঘৃণ্য, পাশব ও সংক্ষিপ্ত। এইরূপ অবস্থা অসহ্য বোধ হওয়ায় মানুষ অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হইয়া একজন শাসকের বশ্যতা স্বীকারের প্রয়োজন বুঝিল। তাহারা পরস্পরের মধ্যে শুধু এমন চুক্তি করিল না যে, একে অন্যের অধিকার মানিয়া চলিবে। কেন না, হবসের মতে, তরবারির অনুপস্থিতিতে চুক্তি কেবল কথার কথা। হবস্ মনে করেন যে, চুক্তি করিতে যাইয়া লোকেরা যেন প্রত্যেকে প্রত্যেককে বলিয়াছিল

চুক্তির ধরন

আমি নিজেকে নিজে শাসন করিবার অধিকার ত্যাগ করিয়া এই ব্যক্তির বা এই ব্যক্তিসমূহের হাতে ক্ষমতা সমর্পণ করিলাম এই শর্তে যে, তুমিও ঐ ভাবে তোমার অধিকার উহাকে অর্পণ করিয়া তাহার হাতে সকল কাজের ক্ষমতা প্রদান করিবে। হবসের ভাষায় বলিতে গেলে এই চুক্তির ফলে বিরাট লেভায়াথান যাহাকে সশ্রদ্ধভাবে অমরত্বহীন দেবতা বলা চলে, জন্মলাভ করিল; তাঁহারই কাছে, অমর ভগবানের ইচ্ছায় আমরা আমাদের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য ঋণী।

হবসের এই চুক্তির ফলে সার্বভৌম শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইল। তাঁহার মতে এক বা একাধিক ব্যক্তি সার্বভৌম ক্ষমতা পাইলেন। একাধিক ব্যক্তির পক্ষে সার্বভৌম ক্ষমতা পরিচালনা সম্ভব বলিলেও হবস রাজার শাসনই পছন্দ করিয়াছেন। তাঁহার আদেশই হইল আইন। সেই আইন সকলে মানিতে বাধ্য। না মানিলে দণ্ড দেওয়া হইবে। প্রজা যে কোন কারণেই অবাধ্য হউক না কেন, তাহা অন্যায়। কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলিতে পারে না যে, তাহারা সার্বভৌম শক্তির নির্বাচনে মত দেয় নাই, সুতরাং তাহারা উঁহার ক্ষমতা মানিতে বাধ্য নহে। প্রজারা এমনও বলিতে পারে না যে, রাজা চুক্তিভঙ্গ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি আনুগত্য পাইতে পারেন না। রাজার পক্ষে চুক্তিভঙ্গের প্রশ্নই উঠে না, কেন না তিনি তো চুক্তি করেন নাই। চুক্তি হইয়াছে লোকেদের নিজের মধ্যে। সুতরাং

রাজা চুক্তির ঊর্ধ্বে। প্রজারা চুক্তির সময়ে একমাত্র আত্মরক্ষার ক্ষমতা ছাড়া আর সকল ক্ষমতাই সার্বভৌম শক্তিকে প্রদান করিয়াছে। সার্বভৌম শক্তির দ্বারা ঘোষিত আইন যে সব বিষয়ে নীরব সেই সব বিষয়েই শুধু প্রজার স্বাধীনতা আছে। লোকে নিজের ইচ্ছামত বেচাকেনা করিতে পারিবে, জীবিকা নির্বাচন করিতে পারিবে, পছন্দমত খাদ্য খাইতে পারিবে, যেখানে খুসি বাস করিতে পারিবে ও নিজেরা যেমন ভাল বুঝিবে সেইভাবে ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শিখাইতে পারিবে। হব্‌সের মতে রাজা মানুষের বুদ্ধির উপর এবং বিবেকের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারেন না। রাজশক্তির অত্যুগ্র সমর্থক হব্‌স্ স্বীকার করিয়াছেন যে, মানুষ তাহার চিন্তার ক্ষেত্রে স্বাধীন।

রাজা চুক্তির উপরে

হব্‌সের মতের সমালোচনা করিতে যাইয়া বলা হয় যে, হব্‌স্ রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখান নাই। সরকারের পরিবর্তন ঘটিলেও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় থাকে। সার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য, সরকারের নহে। হব্‌স্ সরকারের উপর সার্বভৌম ক্ষমতা আরোপ করিয়া নাগরিকের স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। লোকে ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য রাষ্ট্র চাহে বটে, কিন্তু সরকারের হাতে অসীম ও নিরংকুশ ক্ষমতা প্রদান করিয়া চিরন্তন চুক্তি করিবার মত বোকামি তাহারা করিতে পারে না। মানুষ যদি অত হিংস্র ও ক্ষমতালোলুপই হয়, তাহা হইলে পরস্পরকে বিশ্বাস করিয়া চুক্তি করিতে যাইবে কিরূপে?

হব্‌সের ভুল-ত্রুটি

এই সব দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, হব্‌স্ ইংলণ্ডের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে সর্বপ্রধান না হইলেও প্রধানদের মধ্যে অন্যতম। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে সার্বভৌম ক্ষমতার পূর্ণতম ব্যাখ্যা সর্বপ্রথমে তিনিই করেন। তিনি চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্রের উৎপত্তির সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া দেখান যে, রাষ্ট্র দেবতার তৈয়ারি বস্তু নহে, ইহা মানুষেরই তৈয়ারি জিনিস, সুতরাং মানুষ ইচ্ছা করিলে ইহাকে ভাল করিতে পারে। হব্‌স্ ইহাও দেখান যে, রাষ্ট্র ব্যক্তির জন্য সৃষ্টি হইয়াছে, ব্যক্তি রাষ্ট্রের জন্য নহে। রাষ্ট্র যে সকলপ্রকার স্বার্থ-সংঘাতের মধ্যে শান্তি ও সামঞ্জস্য আনয়ন করে এই তত্ত্বও হব্‌স্ ঘোষণা করেন।

হব্‌সের মতবাদের উপকারিতা

৪। **লকের চুক্তিবাদঃ** জন্ লক্ (১৬৩২-১৭০৪) পেশায় ছিলেন ডাক্তার, কিন্তু দার্শনিক তত্ত্ব অধ্যয়নের আগ্রহ তাঁহার মনে তরুণ বয়সেই জাগিয়াছিল। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি Treatises on Civil Government নামক দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। হবৃস্ যেমন স্টুয়ার্ট রাজতন্ত্রের সমর্থন করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, লক্ তেমনি ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের গৌরবময় বিপ্লবের অর্থাৎ পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্বের সমর্থনে ঐ দুই খানি গ্রন্থ রচনা করেন।

লকের পরিচয়

হবৃসের ন্যায় লক্‌ও প্রাকৃতিক অবস্থা ও প্রাকৃতিক আইনের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মতে প্রাকৃতিক অবস্থা নিরবচ্ছিন্ন মারামারি কাটাকাটির অবস্থা নহে। মানুষ স্বভাবতঃ হিংস্র, হিংসাপরায়ণ বা অসামাজিক নহে। প্রাকৃতিক অবস্থাতে মানুষ প্রাকৃতিক আইন মানিয়া চলিত। যুক্তিবলে সে প্রাকৃতিক আইন আবিষ্কার করিতে পারিত। প্রাকৃতিক আইন তাহাকে জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি বিষয়ে স্বাভাবিক অধিকার দিয়াছে। সমাজ সৃষ্টির পূর্বেও লোকে এই সব বিষয়ে স্বাধীনতা উপভোগ করিত। তাহারা পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা করিত। প্রাকৃতিক অবস্থায় কিন্তু তিনটি বিষয়ে গুরুতর অভাব ছিল। প্রাকৃতিক আইন অবশ্য সকলেরই মনের মধ্যে ছিল, কিন্তু সকলের বুদ্ধি তো সমান নহে। সেইজন্য একজন যেখানে সহজেই বুঝিতে পারিত প্রাকৃতিক আইন কি, অন্যে সেখানে কিছুই বুঝিতে পারিত না। আবার কেহ কেহ বুঝিলেও স্বার্থবুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া ন্যায্য কাজ করিতে চাহিত না। তাই মানুষের প্রথম অভাব ছিল এমন এক সর্বজনসম্মত ও সুপ্রতিষ্ঠিত আইন, যাহার দ্বারা ন্যায় ও অন্যায় বিচারের মাপকাঠি পাওয়া যাইবে এবং উহাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করা যাইবে। দ্বিতীয় অভাব ছিল জানাশুনা নিরপেক্ষ বিচারকের আর তৃতীয় অভাব ন্যায্য বিচারকে কার্যকরী করিবার যোগ্য শাসকমণ্ডলীর (Executive)। এই তিনটি অভাব মিটাইবার জন্য মানুষ civil society বা রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ হইল। এই চুক্তি পরস্পরের মধ্যে, শাসকের সহিত নহে। এই চুক্তির দ্বারা প্রত্যেকে রাজী হইল যে, সে দণ্ড দিবার অধিকার

প্রাকৃতিক অবস্থা

উহার ত্রুটি

চুক্তির স্বরূপ

নিজে রাখিবে না, তাহাদের মধ্যে হইতে নিযুক্ত ব্যক্তি সর্বজনসম্মত আইন অনুসারে দণ্ড দিবে। এই চুক্তিতে প্রথমে সকলকে রাজী হইতে হইবে; তাহার পর তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের দ্বারা পরিচালিত হইতে স্বীকার করিবে। এই চুক্তিও অপরিবর্তনীয়।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, লকের মতে এই চুক্তির ফলে ব্যক্তি তাহার জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার ছাড়িয়া দিল না। বরং ঐ সব অধিকার রক্ষা করিবার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়াই সে চুক্তিবদ্ধ হইল। লক্ খুব সম্ভব দুইটি চুক্তির কথা ভাবিয়াছিলেন। তিনি দ্বিতীয় চুক্তির কথা স্পষ্টতঃ না বলিলেও ইঙ্গিতে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র ও দ্বিতীয় চুক্তির দ্বারা সরকারের প্রবর্তন করা হয়। সরকার অছির (Trust) মতে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কার্যের ভার পাইল। লক্ স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা করিলেন যে জনসমাজ যে কোন লোকের, এমন কি তাহাদের আইনসভার হাত হইতেও স্বাধীনতা ও সম্পত্তি রক্ষা করিবার চরম ক্ষমতা সব সময়েই বজায় রাখে। "The community perpetually retains a supreme power of saving themselves from the attempts and designs of anybody, even of their legislators, whenever they shall be so foolish or so wicked as to lay and carry designs against the liberties of the subject."

দুইটি চুক্তি

বিশুদ্ধ যুক্তির দিক দিয়া দেখিতে গেলে লকের মতবাদের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়ে। তিনি সম্পত্তি বলিতে কি বলিতে চান স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। সম্পত্তির উপর ব্যক্তির অধিকার জন্মায় কি করিয়া, সেই অধিকারের সীমা কতখানি, তাহা লক্ ভাল করিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি সম্মতির উপর রাষ্ট্রের অবস্থিতি বলিয়াছেন, আবার রাষ্ট্রের মধ্যে কাহারও উপস্থিতিকেও তাহার সম্মতি বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। লক্ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর জোর দিতে যাইয়া সাম্যের কথা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছেন। লক্ জনমতকে সার্বভৌমিকতার আধার বলিয়াছেন; তিনি বৈধ সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যাখ্যা করেন নাই। তাঁহার মতে শাসকগণ ও আইনসভা তাঁহাদের উপর ন্যস্ত ক্ষমতা অতিক্রম করিয়া যদি কোন কাজ করেন, তাহা হইলে লোকে বিপ্লবের আশ্রয় গ্রহণ

লকের চুক্তির ভুল-ত্রুটি

করিতে পারে। লোকে কোন্ মাপকাঠি দিয়া শাসকদের ন্যায়-অন্যায় বিচার করিবে? সকল লোকে একসঙ্গে মিলিয়া বিচার করিবেই বা কিরূপে? কোন কোন সময়ে বিপ্লব ছাড়া কুশাসনের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার অন্য উপায় থাকে না। লক্ নিজেও বলিয়াছেন যে, লোকে নিতান্ত নির্যাতিত না হইলে বিপ্লব করিতে চাহে না। কিন্তু বিপ্লবকে কিছুতেই আইনসঙ্গত বলা চলে না।

এ সব দোষত্রুটি থাকিলেও লক্‌কে গণতন্ত্রের পুরোহিত বলা চলে। তিনি নিরংকুশ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রবল যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে ঐ প্রকার শাসনপ্রণালী রাষ্ট্রের প্রকৃতির পক্ষে অসঙ্গত (It is thus evident that absolute monarchs, which by some men is counted the only government in the world is indeed inconsistent with civil society)। লক্ রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যয়নকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

লকের প্রভাব

তিনি যে রাষ্ট্রের কথা বলিয়াছেন তাহা জনসাধারণের কল্যাণের জন্য তাহাদের সম্মতি অনুসারে প্রতিষ্ঠিত এবং ইহার শাসকমণ্ডলীর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তাঁহার এই মতবাদ বিধানতান্ত্রিক শাসনপ্রণালীর প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

৫। **রুশোর চুক্তিবাদঃ** রুশো (১৭১২-৭৮) রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার উপর যেমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, তেমন প্রভাব প্লেটো ছাড়া বোধ হয় আর কেহ করেন নাই। হব্‌স্ ও লক্ রাষ্ট্রকে একটা যন্ত্র বলিয়া মনে করিতেন, আর রুশোর নিকট রাষ্ট্র ছিল একটি প্রাণবন্ত জীবদেহ। চুক্তিবাদ সমর্থন করিয়া হব্‌স্ যেখানে রাজার নিরংকুশ ক্ষমতা স্থাপন করিয়াছেন, লক্ যেখানে নিয়মতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন, রুশো সেখানে বিশুদ্ধ ও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র সমর্থন করিয়াছেন।

রুশোর বৈশিষ্ট্য

রুশো ব্যক্তি-স্বাধীনতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরোহিত। তাঁহার সামাজিক চুক্তি নামক গ্রন্থ ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

রুশোর মতে প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল কল্পলোকের মত সুখ ও শান্তিতে পরিপূর্ণ। সেই অবস্থায় না ছিল কোন বন্ধন, না ছিল হিংসা, দ্বেষ ও দ্বন্দ্ব। আদিম মানব ছিল মুক্ত, মহান্, বন্য, সরল ও সাহসী। মানুষ স্বভাবতঃ

সৎ। সে নিজেকে ভালবাসে বলিয়া আত্মরক্ষা করিতে চায়; সে অপরকেও সহানুভূতি করে বলিয়া দশজনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া বাস করে। প্রাকৃতিক অবস্থায় যতদিন জনসংখ্যা কম ছিল, ততদিন পরস্পরের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় নাই। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রকৃতিদত্ত সীমিত ভোগ্যবস্তুর অধিকার লইয়া সংঘাত বাধিল। কোন কোন লোক বেশি সম্পত্তি অধিকার করিল। কেহ বা কম সম্পত্তি পাইল। ফলে বৈষম্য, অশান্তি ও জটিলতা বৃদ্ধি পাইল।

প্রাকৃতিক অবস্থা

অসাম্য

এইরূপ সমস্যার হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য লোকেরা পরস্পরের মধ্যে চুক্তি করিয়া প্রাকৃতিক অবস্থার অবসান ঘটাইয়া সামাজিক অবস্থার প্রবর্তন করিল। রুশোর মতে ঐ চুক্তি নিম্নোক্ত ধরনের হইয়াছিল—"আমরা প্রত্যেকে তাহার দেহ ও সমগ্র ক্ষমতা একত্রিত করিয়া সমষ্টিগত ইচ্ছার (General will) চূড়ান্ত নির্দেশের অধীনে স্থাপন করিতেছি।" ইহাতে কাহারও কিছু লোকসান তো হইলই না বরং লাভ হইল। প্রত্যেকে যেমন সকল অধিকার দিয়াছিল, তেমনি এক যৌথ ব্যক্তিত্বের (collective body) অংশ হিসাবে তাহা ফিরিয়া পাইল এবং প্রত্যেকের অধিকার বজায় রাখিবার ব্যবস্থা দৃঢ়তর হইল।

চুক্তির স্বরূপ

রুশো যে General will বা সমষ্টিগত ইচ্ছার কথা বলিয়াছেন তাহা কিরূপ? তাঁহার মতে ইহা হইতেছে মিলিত ইচ্ছা; প্রত্যেকের ইচ্ছা যোগ করিয়া ইহা নির্ণীত হয় নাই। সমষ্টিগত ইচ্ছা হইতেছে জনসাধারণের কল্যাণের ইচ্ছা। যাহা সকলের কল্যাণের ইচ্ছা তাহা প্রত্যেকেরও মঙ্গলের ইচ্ছা। যদি এমন দেখা যায় যে কোন একজনের ইচ্ছা সমষ্টিগত ইচ্ছার বিরোধী হইতেছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ঐ ইচ্ছা তাহার প্রকৃত ইচ্ছা নহে। কার্যক্ষেত্রে এরূপ মতবাদের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছাই প্রকৃত ইচ্ছা; সংখ্যালঘুদের ইচ্ছা অপ্রকৃত ইচ্ছা; সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা তাহাদের মানিয়া লওয়া কর্তব্য। যদি তাহারা উহা না মানে তবে বল প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে মানাইতে হইবে। সমষ্টিগত ইচ্ছা কখনও ভুল করিতে পারে না; ইহা অভ্রান্ত। কোন্‌টা ঠিক কোন্‌টা ভুল তাহার

রুশোর মতে সমষ্টিগত ইচ্ছা কি

মাপকাঠিই যখন জনকল্যাণ এবং সমষ্টিগত ইচ্ছা যখন জনসাধারণেরই কল্যাণের ইচ্ছা তখন উহা আর ভ্রান্ত হইবে কেন? রুশো এইরূপ ধোঁয়াটে ও পেঁচানো কথায় সমষ্টিগত ইচ্ছার অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

রুশো হব্‌সের ন্যায় একটিমাত্র চুক্তির কথাই বলিয়াছেন। সেই চুক্তির ফলে যে সার্বভৌম ক্ষমতার উদ্ভব হইল তাহা এক, অবিভাজ্য, সীমাহীন ও চূড়ান্ত। কিন্তু কোন ব্যক্তি বিশেষ বা দলবিশেষের হাতে উহা ন্যস্ত নহে। উহার অধিকারী হইতেছে জনসাধারণ। জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে সার্বভৌম ক্ষমতা পরিচালনা করিবে। তাহারা প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া আইনসভায় পাঠাইবে না, নিজেরাই আইন করিবে। সরকার জনসাধারণের এজেণ্ট মাত্র। সরকার সেইটুকুমাত্র ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারে, যেটুকু জনসাধারণ তাহার হাতে ন্যস্ত করিয়াছে। রুশোর মতবাদে সরকারের স্থান নিতান্ত গৌণ।

সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী কে

রুশোর সমসাময়িক ভলটেয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত অনেক পণ্ডিতই রুশোর যুক্তিতর্কের অনেক গলদ বাহির করিয়াছেন। রুশো প্রবচন (epigram) ব্যবহার করিতে খুব ভালবাসিতেন বলিয়া অনেক সময় অনেক অসতর্ক উক্তি করিয়া বসিয়াছেন। চুক্তির বেলায় লোকে সব ক্ষমতা ত্যাগ করিয়া "বাকীটা" ভোগ করিতে লাগিল বলায় কিংবা মানুষ স্বাধীন হইয়া জন্মে, কাহারও ইচ্ছা যদি সমষ্টিগত ইচ্ছার বিরোধী হয়, তবে সে ইচ্ছা তাহার প্রকৃত ইচ্ছা নহে, এই ধরনের উক্তি যুক্তিতর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। বস্তুতঃ রুশো যুক্তিতর্ককে খুব উঁচুস্থান দেন নাই। রাষ্ট্রের স্বরূপ কি এবং আমি কেন তাহার আদেশ মানিব এই দুই প্রশ্নের তিনি স্ববিরোধী উত্তর দিয়াছেন। একবার বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্র একটি যৌথ ব্যক্তিস্বরূপ এবং ইহাকে মানিলে তবে আমি সত্যিকারের আমি হই, প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হই। সমষ্টিগত ইচ্ছার ভিত্তিতে গঠিত এই মত অনুসারে রাষ্ট্র একটি প্রাণবন্ত জীবদেহ। কিন্তু তিনি আবার একথাও বলিয়াছেন যে রাষ্ট্র একটি সংঘ কিংবা যন্ত্র যাহা মানুষ নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তৈয়ারি করিয়াছে এবং ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই উহার বশ্যতা স্বীকার করে। চুক্তিবাদের

রুশোর মতের সমালোচনা

উপর এই মতের প্রতিষ্ঠা। চুক্তির প্রয়োজনীয়তা মানিতে হইলে সমষ্টিগত ইচ্ছাকে চরম শক্তি বলিয়া স্বীকার করা যায় না, আবার সমষ্টিগত ইচ্ছাই যদি চূড়ান্ত শক্তি হয় তবে চুক্তির প্রয়োজন কি? সমাজ ছাড়া সৎজীবন যাপন করা যায় না এই মতের সহিত ব্যক্তির জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এই মতের সামঞ্জস্য বিধান করিতে রুশো সমর্থ হন নাই।

রুশোর প্রভাব

কিন্তু তাঁহার রচনার মধ্যে এমন শক্তি ছিল যাহা একদিকে আমেরিকার ঔপনিবেশিকগণকে অন্যদিকে ফরাসী বিপ্লববাদিগণকে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। সমগ্র পৃথিবীতে গণতন্ত্রের হোতারূপে রুশো পূজিত হইতেছেন।

৬। **হবস্, লক্ ও রুশোর চুক্তিবাদের তুলনা**ঃ হবস, লক্ ও রুশো প্রাকৃতিক অবস্থা, প্রাকৃতিক বিধান ও প্রাক্ সামাজিক মানুষের স্বভাব হইতে অনুমান করিয়া চুক্তির-দ্বারা রাষ্ট্রের উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু শাসনপদ্ধতি বিষয়ে তাঁহাদের সিদ্ধান্তের মধ্যে কিছুই মিল দেখিতে পাওয়া যায় না। হবস্ চুক্তিকে রাজার যথেচ্ছ শাসনের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছেন, লক্ উহাকে নিয়মতান্ত্রিক রাজার বর্মরূপে এবং রুশো সার্বজনীন সার্বভৌমিকতার ভিত্তিরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে এইরূপ মতবিরোধের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে তাঁহাদের অনুমিত (১) প্রাকৃতিক অবস্থা, (২) মানুষের স্বভাব, (৩) চুক্তির স্বরূপ ও পক্ষ, (৪) সার্বভৌম ক্ষমতার আধার এবং (৫) ব্যক্তিস্বাধীনতার সীমা সম্বন্ধে আলোচনায়।

উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা

হবসের মতে প্রাকৃতিক অবস্থায় লোকে সর্বদা মারামারি কাটাকাটি করিত। কোন প্রকার নিয়ম কানুন ছিল না। যে যাহা পারিত লুটিয়া পুটিয়া লইত। ফলে প্রত্যেকেই জীবন দুর্বিসহ মনে করিত। লক্ কিন্তু প্রাকৃতিক অবস্থাকে এতটা খারাপ বলেন নাই। তখনও মানুষ প্রাকৃতিক নিয়ম মানিয়া চলিত। রুশো বলেন যে প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল স্বর্গের মতন মনোরম। মানুষ তখন মুক্ত, আনন্দময় এবং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। মানুষ স্বভাবতঃ সৎপ্রকৃতির। সম্পত্তি বোধের তখন উৎপত্তি হয় নাই; সুতরাং মারামারি কাটাকাটি করিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না।

প্রাকৃতিক অবস্থা

হবসের মতে মানুষ স্বভাবতঃ ঈর্ষাপরায়ণ, ক্ষমতালোভী ও একান্ত স্বার্থপর। সমাজসৃষ্টির পূর্বে তাহার জীবন ছিল সঙ্গীহীন, কদর্য, ঘৃণ্য, পাশবিক ও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। এই অবস্থা অসহনীয় বোধ হওয়ায় তাহারা চুক্তিতে আবদ্ধ হইল। লক্ বলেন যে মানুষ স্বভাবতঃ শান্ত ও আইনের অনুগত। রাষ্ট্রের আইন তৈয়ারি হইবার পূর্বে সে প্রাকৃতিক আইন মানিয়া চলিত। কিন্তু প্রাকৃতিক আইন এক একজন এক একরূপে বুঝিত বলিয়া চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্রসংগঠনের প্রয়োজন হইল। রুশোর মতে মানুষ পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিতে উন্মুখ। সাম্য ও স্বাধীনতার ইচ্ছা তাহার মধ্যে প্রবল। জনসংখ্যার বৃদ্ধির জন্য জীবনযাত্রা জটিল হইয়াছিল বলিয়া চুক্তিবদ্ধ হইবার দরকার হইয়াছিল।

মানুষের স্বভাব

হবস্ ও রুশোর মতে চুক্তি একটিমাত্র হইয়াছিল এবং তাহা চিরকালের জন্য। উভয়েই সরকারকে চুক্তির পক্ষ বলিয়া বর্ণনা করেন নাই। লক্ খুব সম্ভব দুইটি চুক্তির কথা চিন্তা করিয়াছিলেন—একটি সামাজিক চুক্তি, অপরটি রাজনৈতিক চুক্তি। হবস্ বলেন যে লোকেরা পরস্পরের মধ্যে চুক্তি করিয়া তাহাদের সকল ক্ষমতা একজন ব্যক্তি বা একটি সংসদের হাতে সমর্পণ করিয়াছিল। সেই ব্যক্তি বা সংসদই হইল সার্বভৌম শক্তি। লক বলেন যে লোকেরা নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া প্রথমে রাষ্ট্রীয় সমাজ প্রতিষ্ঠা করে। পরে রাজার সঙ্গে চুক্তি করিয়া কিছু শক্তি তাহার হস্তে ন্যস্ত করে। রাজা যদি ন্যস্ত ক্ষমতার চেয়ে বেশি ক্ষমতা ব্যবহার করেন অথবা প্রজার ধনপ্রাণ রক্ষায় অক্ষম হন তাহা হইলে প্রজা ন্যায়সঙ্গতভাবে তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে পারে। রুশো ও হবসের মতন বলিয়াছেন যে চুক্তির দ্বারা লোকে সকল ক্ষমতাই সমর্পণ করে। কিন্তু হবস্ যেখানে সরকারের হাতে সমর্পণের কথা বলিয়াছেন রুশো সেখানে জনসমাজের অংশস্বরূপ প্রত্যেকের দ্বারা উহা উৎকৃষ্টতররূপে ভোগ করিবার কথা বলিয়াছেন।

চুক্তির ধরন

রুশো হবস্ ও লকের মত কতটা লইয়াছেন

হবসের সার্বভৌম ক্ষমতার সহিত রুশোর সার্বভৌম ক্ষমতার অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু রুশো তাঁহার সামাজিক চুক্তি গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদপটে কাটামুণ্ড এক লেভায়াথানের মূর্তি দিয়াছিলেন।

রুশোর সার্বভৌম শক্তিও এক অবিভাজ্য, এবং অসীম ও নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু তিনি রাজা নহেন; সমষ্টিগত ইচ্ছা বা জনসাধারণের ইচ্ছা। হব্‌স্ রাষ্ট্র ও সরকারকে এক মনে করিয়াছেন। রুশো রাষ্ট্রকেই অসীম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়াছেন, সরকারকে নহে। লক্‌কে অনুসরণ করিয়া রুশো বলিয়াছেন যে, সরকার রাষ্ট্রের এজেণ্ট মাত্র। লকের মতেও সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কিন্তু লক্ বলেন যে জনসাধারণ সার্বভৌম শক্তির আধার হইলেও উহা প্রয়োগ না করিয়া তুলিয়া রাখে, কেবলমাত্র বিপ্লবের সময় উহা ব্যবহার করে। রুশো বলেন তাহা নহে, জনসাধারণই অনবরত ও সদাসর্বদা সার্বভৌম শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকে।

সার্বভৌম ক্ষমতা

হব্‌সের মত অনুসারে চুক্তির পর ব্যক্তির কোন স্বাধীনতাই থাকে না, শুধু চিন্তার স্বাধীনতা বজায় থাকে। রাজার শাসন খুব খারাপ হইলেও প্রজারা বিদ্রোহ করিতে পারে না। রাজা চুক্তিতে আবদ্ধ হন নাই বলিয়া প্রজারা তাঁহার বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ আনিতে পারে না। লকের মতে রাজা ব্যক্তির ধন, প্রাণ ও স্বাধীনতা হরণ করিতে পারে না। তাঁহার ক্ষমতা চুক্তির শর্তের দ্বারা সীমাবদ্ধ। রুশোর মতে ব্যক্তির স্বাধীনতার জন্ম রাষ্ট্রের মধ্যেই অর্থাৎ সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রকাশের ভিতর দিয়া সাম্য ও স্বাধীনতায় মানুষের জন্মগত অধিকার। সমষ্টিগত ইচ্ছা হইতে জাত আইনের দ্বারা লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সুরক্ষিত হইতেছে।

স্বাধীনতার পরিধি

৭। **চুক্তিবাদের সমালোচনা:** চুক্তিবাদ যে কল্পিত তাহা উহার তিনজন প্রধান ব্যাখ্যাতার মধ্যে মতভেদ হইতেই বুঝা যায়। যিনি যে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন তিনি সেই সিদ্ধান্তের অনুকূল অবস্থা কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। চুক্তির আকার বিভিন্ন লেখকের মতে বিভিন্ন প্রকার। কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্র সংগঠনের পূর্বে মানুষের পক্ষে কোন প্রকার চুক্তিই করা সম্ভব নহে। চুক্তি সেই ক্ষেত্রেই হইতে পারে যেখানে উহাকে কার্যকরী করাইবার জন্য কোন নিরপেক্ষ শক্তি থাকে। যখন রাষ্ট্র জন্মে নাই তখন চুক্তি ভঙ্গকারীকে দণ্ড দিবে কে? চুক্তি করিতে হইলে মানুষের মনে যতখানি রাজনৈতিক

কল্পনা হইতে উদ্ভূত

চেতনা জাগা প্রয়োজন, আদিম মানব তাহা কোথা হইতে পাইবে? আর এই বা কি ধরনের চুক্তি যে একদল লোক কোন্ বিস্মৃত অতীতে যাহা সম্পাদন করিল হাজার হাজার বছর ধরিয়া তাহাদের বংশধরেরা তাহা মানিতে বাধ্য থাকিবে? চুক্তি করার স্বাধীনতা যাহাদের থাকে, চুক্তির শর্ত হইতে মুক্ত হইবার অধিকারও তাহাদের থাকা অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ আইন না থাকিলে চুক্তি করা যায় না এবং রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বে কোন আইন থাকিতে পারে না। চুক্তিবাদীরা বলেন যে প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ স্বাধীন ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা আসে অধিকার হইতে। অধিকার গায়ের জোরে পাওয়া যায় না. সর্বসাধারণের সমাজ কল্যাণের চেতনা হইতে অধিকারবোধ জন্মে। যখন জনসাধারণের সমাজ গঠিত হয় নাই তখন এরূপ বোধ জন্মিতে পারে না। রাষ্ট্র না থাকিলে অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করিবার দায়িত্ব কাহার উপর থাকিবে? এইসব কারণে বলিতে হয় যে চুক্তিবাদ যুক্তিবাদকে অস্বীকার করিয়াছে।

অযৌক্তিক

চুক্তিবাদ শুধু অযৌক্তিক নহে, উহা অনৈতিহাসিকও বটে। আদিম মানব যে সমাজ ছাড়া বাস করিত না তাহা আধুনিক নৃতত্ত্ব ও প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগ সম্বন্ধীয় গবেষণা হইতে জানা যায়। আদিম মানবের ভাগ্য নির্ণীত হইত সে কোন্ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহার দ্বারা, আর আধুনিক মানব নিজের ইচ্ছামত জীবিকা অর্জনের পথ বাছিয়া লয়। তাই প্রাচীন আইনের অনুসন্ধানকারী মেইন লিখিয়াছেন যে মানুষের অগ্রগতি হইতেছে Status হইতে Contract-এ উন্নীত হইয়া। চুক্তির মতন একটা সূক্ষ্ম ধার আদিম মানুষের মনে জাগিতে পারে না। সহসা একদিন আদিম মানব এক জায়গায় সমবেত হইয়া পরস্পরের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ হইয়া রাষ্ট্র সংগঠন করিয়া বসিল এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোথাও কোন জাতির মধ্যে পাওয়া যায় নাই। রাষ্ট্রের সম্বন্ধে তাহাদের মনে যখন কোনই ধারণা ছিল না, তখন তাহারা রাষ্ট্র গঠন করিবে কিরূপে? বলা যাইতে পারে যে ১৬২০ খৃষ্টাব্দে 'মে ফ্লাওয়ার' নামক জাহাজের মধ্যে পিউরিটান্ উপনিবেশিকদের পূর্বপুরুষেরা পরস্পরের মধ্যে চুক্তি করিয়া একটি রাষ্ট্রের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা তো আদিম অবস্থার মানব ছিলেন না। তাঁহাদের সামনে ছিল

ইতিহাসে ইহার সমর্থন নাই

ইংলণ্ডের ও অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত। সুতরাং কোন ক্রমেই বলা চলে না যে, তাঁহারা সর্বপ্রথমে রাষ্ট্র স্থাপন করিলেন।

চুক্তিবাদ শুধু যে ইতিহাসের দ্বারা সমর্থিত হয় না তাহা নহে, ইহা রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনকও। রাষ্ট্র কালক্রমে সামাজিক জীবনের তাগিদে গড়িয়া উঠিয়াছে। কেহ খেয়াল-খুশিমত চুক্তি করিয়া কোন এক নির্দিষ্ট দিনে ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করে নাই। রাষ্ট্র যদি একটি জয়েণ্ট স্টক কোম্পানী বা যৌথ কারবার হইত তাহা হইলে চুক্তির দ্বারা ইহার সংগঠন সম্ভব হইত। কিন্তু বার্কের ভাষায় বলিতে গেলে রাষ্ট্র হইতেছে সমস্ত কলা, সমস্ত বিজ্ঞান, সমস্ত সংস্কৃতির অংশীদারী কারবার। ইহাকে চুক্তিজাত বলিলে অরাজকতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। রাষ্ট্র মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক সংগঠন। তাই চুক্তির দ্বারা ইহা গঠিত হইতে পারে না। চুক্তির দ্বারা যদি ইহা গঠিত হয়, তাহা হইলে ইহা ভাঙিয়া দেওয়াও সম্ভব হয়। সরকার বদলানো যায়, কিন্তু রাষ্ট্র অপরিবর্তনীয়।

রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক

৮। **চুক্তিবাদের মূল্যঃ** চুক্তিবাদ অযৌক্তিক ও অনৈতিহাসিক হইলেও ইহার দ্বারা সমাজের মহান্ উপকার সাধিত হইয়াছে। চুক্তিবাদের ভিত্তি হইতেছে এই যে মানুষ নিরাপত্তা লাভের জন্য রাষ্ট্র সংগঠন করে। রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ যদি সেই নিরাপত্তা রক্ষা করিতে অসমর্থ হন তাহা হইলে তাঁহারা জনসাধারণের বশ্যতা দাবি করিতে পারেন না।

রাষ্ট্রের ক্ষমতার উৎস যে জনসাধারণ তাহা এই মতবাদে স্বীকৃত হয়। যে সরকার জনসাধারণকে নিপীড়িত করে, সে সরকার স্থায়িত্ব লাভের অযোগ্য। বিংশ শতাব্দীতে জনসাধারণকে ভোটের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। তাই সরকারকে শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের মন জোগাইয়া চলিতে হয়। চুক্তিবাদে সর্বপ্রথম বলা হয় যে জনসাধারণের সম্মতি ও স্বীকৃতি ছাড়া কোন সরকার চলিতে পারে না।

৯। **চুক্তিবাদের প্রভাবঃ** চুক্তিবাদ অযৌক্তিক, অনৈতিহাসিক ও বিপজ্জনক হইলেও সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। রাজা অত্যাচারী হইলে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করা যাইতে পারে, এই নৈতিক সমর্থন পাওয়া যায় চুক্তিবাদের মধ্যে। রাজাকে ভগবান প্রজার উপর কুশাসন চালাইবার অধিকার দিয়া পাঠান

নাই, তাহা চুক্তিবাদীরা সকলকে বুঝাইয়া দিল। ফ্রান্সের হিউগোনো নামক প্রোটেস্টান্টগণ এবং স্পেনের দ্বারা শাসিত নেদারল্যাণ্ডসের অধিবাসিগণ চুক্তিবাদের দোহাই দিয়া রাজার অত্যাচারের প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হন।

ইতিহাসের উপর প্রভাব

ইংলণ্ডেও দ্বিতীয় জেম্‌সকে সিংহাসনচ্যুত করিবার সময় ঘোষণা করা হয় যে, তিনি রাজা ও প্রজার মৌলিক চুক্তি ভঙ্গ করিয়া রাজ্যের সংবিধান নষ্ট করিবার দোষে দোষী। রুশোর উক্তির সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি শুনা যায় আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্যে, বিশেষ করিয়া যেখানে ঘোষণা করা হইতেছে যে শাসিতের সম্মতি হইতেই সরকার তাঁহার ন্যায্য ক্ষমতা লাভ করেন এবং সরকার যখন প্রজার সাম্য ও স্বাধীনতা হরণ করেন তখন প্রজার অধিকার আছে সেই সরকারকে পরিবর্তিত করিয়া নূতন সরকার স্থাপন করার। এই ঘোষণার তের বৎসর পরে ১৭৮৯ খ্রী: অব্দে ফ্রান্সের বিপ্লবীরা মানবের অধিকার ঘোষণার সময় চুক্তি হইতেই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে বলেন।

জনসাধারণের সম্মতির উপর রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বলায় গণতন্ত্রবাদ প্রসার লাভ করে। চুক্তিবাদ লোককে ন্যায়, সুবিচার ও স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত করে। চুক্তিবাদের আলোচনাকালে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের দুইটি মহান্ সত্য আবিষ্কৃত হয়। একটি হইতেছে এই যে সরকার ও রাষ্ট্র এক নহে, সরকারকে প্রয়োজন মত ধ্বংস করিয়া অন্য সরকার প্রতিষ্ঠা করা যায়। দ্বিতীয় হইতেছে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি। ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষা করে ঐ শক্তি। উহা এক, অবিভাজ্য, চিরস্থায়ী ও সীমাহীন।

মূল্যবান সিদ্ধান্তের উৎপত্তি

মঁতেস্কু ১৭৪৮ খ্রীঃ আইনের মর্ম সম্বন্ধে (Spirit of the Law) গ্রন্থ রচনার সময় চুক্তিবাদ পরিহার করিয়া ইতিহাসের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বার্ক ও অস্টিনও ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্যে রাষ্ট্রের উদ্ভব অনুসন্ধান করেন। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডারুইন তাঁহার Origin of Species গ্রন্থে বিবর্তনবাদের প্রয়োগ করেন। তাহার পর আর কেহ অনৈতিহাসিক চুক্তিবাদে আস্থা স্থাপন করিতে পারে নাই।

প্রভাবের হ্রাস

১০। **বলাত্মক উৎপত্তিবাদ** (Force Theory): গায়ের জোরে রাষ্ট্র কায়েম করা হইয়াছে ও জোর করিয়াই সকলকে দাবাইয়া রাখিয়া

শাসকেরা শাসন করিতেছেন এই মতবাদের সমর্থক প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগেও পাওয়া যায়। এই মতের সমর্থকেরা বলেন, মানুষ স্বভাবতঃ কলহ-পরায়ণ ও ক্ষমতালোলুপ। সব সময়ে বুদ্ধিতে ও শক্তিতে যাহারা বড় তাহারা অন্যকে দাবাইয়া রাখে। মনু প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকারগণ দণ্ড প্রয়োগ করিয়া লোককে সুপথে রাখিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। গ্রীক্ দার্শনিক হেরাক্লিটাস বলেন যে, বলপ্রয়োগ না করিলে লোকে ঠিক থাকে না, তাই রাষ্ট্র সব সময়ে বলপ্রয়োগ করিবে। মধ্যযুগের খৃষ্টীয় ধর্মযাজকেরা রাজশক্তিকে পাশবশক্তি বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। ম্যাকিয়াভেলি বলেন যে, রাষ্ট্র সংগঠন করিয়া যিনিই আইন প্রণয়ন করিবেন, তিনিই এই ধারণা লইয়া অগ্রসর হইবেন যে, মানুষ স্বভাবতঃ অসৎ এবং তাহারা সুযোগ পাইলেই অন্যায় কাজ করে। এ যুগের জেরেমি টেলর লিখিয়াছেন যে, একদল নেকড়ে বাঘ বরং চুপ করিয়া থাকিবে। একমত হইবে তবুও ঐ সংখ্যক মানুষ তাহাদের উপর একজন জোর করিবার না থাকিলে শান্ত থাকিবে না।

বলপ্রয়োগ হইতে রাষ্ট্র উৎপন্ন হইয়াছে

আশ্চর্যের কথা এই যে, একদিকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীরা, অন্যদিকে সমাজতন্ত্রবাদীরা রাষ্ট্রকে বল হইতে উদ্ভূত ও বলের দ্বারাই বিধৃত মনে করেন। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীদের মধ্যে কেহ কেহ ডারুইনের বিবর্তনবাদ স্বীকার করিয়া বলেন যে, জীবন সংগ্রামে শারীরিক শক্তির ও মানসিক ধূর্ততার জয়; দুর্বল পরাজিত হইয়া শক্তিমানের অধীনতা স্বীকার করে অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। রাষ্ট্র দুর্বলকে রক্ষা করিতে যাইয়া প্রাকৃতিক নির্বাচনের বিরোধিতা করে। সুতরাং রাষ্ট্রকে কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান বলা যায় না। হার্বার্ট স্পেন্সার তাই বলিয়াছেন, অকল্যাণের সন্তান হইতেছে সরকার এবং সে তাহার পিতৃপরিচয় বহন করিয়া চলিয়াছে।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীদের কথা

সমাজতন্ত্রবাদের প্রধান পুরোহিত এঙ্গেল্স্ ও কার্ল মার্ক্স্ বলেন যে, এক শ্রেণীর লোক অন্যান্য শ্রেণীকে জোর করিয়া খাটাইয়া লইয়াছে ও তাহাদের পরিশ্রমের ন্যায্য পুরস্কার হইতে বঞ্চিত করিয়াছে—এইরূপ কার্যক্রম হইতেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটিয়াছে। লেনিন বলেন যে, শ্রেণীগত শত্রুতার

সমাজতন্ত্রবাদীদের মত

সমাধান করিতে না পারায় রাষ্ট্রের জন্ম হইয়াছে। রাষ্ট্র যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করে তাহা অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের নির্যাতনকে আইনসম্মত করিবার জন্য।

ফ্যাসিস্ট মত

বিংশ শতাব্দীতে ফ্যাসিস্ট ও নাৎসীবাদীরা 'জোর-যার মুলুক তার' নীতিকে দার্শনিক মতবাদের আবরণে প্রকাশ করেন। সেনাপতি বার্ণহার্ডি বলেন যে "জোর হইতেই ন্যায্য অধিকার জন্মে। ন্যায় কাহার পক্ষে তাহা নির্ণীত হয় যুদ্ধের দ্বারা। জৈব বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া যুদ্ধই যথার্থ বিচার করে, কারণ ইহার সিদ্ধান্ত প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে হয়।"

সমালোচনা

ইতিহাসের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে বলাত্মক উৎপত্তিবাদের মধ্যে যে কিছুটা সত্য আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। বুদ্ধির বলে ও গায়ের জোরে যে লোক বড়, সে তাহার দলের মধ্যে সকলকে দাবাইয়া রাখিয়া নিজে প্রধান হয়। তাহার আদেশমত সকলকে চলিতে বাধ্য করে। সে আবার অন্য দলকেও আক্রমণ করিয়া পরাভূত করিতে চেষ্টা করে। সফল হইলে ক্রমাগত একের পর এক দলকে নিজের অধীনে আনে। এইরূপে একটা ভৌগোলিক অঞ্চলের সে সর্বময় প্রভু হইয়া উঠে। তাহার আদেশই আইন বলিয়া গণ্য হয়। যুদ্ধের দ্বারা এক উপজাতি (tribe) অন্য উপজাতির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে এবং অবশেষে উভয়েই এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে অনেক পাওয়া যায়।

বল অপরিহার্য

কোন রাষ্ট্রই বলপ্রয়োগ বর্জন করিয়া টিকিয়া থাকিতে পারে না। মহাত্মা গান্ধী বলপ্রয়োগের বিরোধী হইলেও কার্যতঃ তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে পুলিশ ও ফৌজ ছাড়া সরকার কাজ চালাইতে পারেন না। দেশের ভিতর শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশের প্রয়োজন ও বাহিরের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনী রাখিবার প্রয়োজন প্রত্যেক রাষ্ট্রই অনুভব করে।

কিন্তু শুধু বলের দ্বারা রাষ্ট্র সৃষ্টও হইতে পারে না, তাহার অস্তিত্বও বজায় রাখিতে পারে না। শাসকের সংখ্যা অপেক্ষা শাসিতের সংখ্যা সর্বত্রই বেশি; গায়ের জোর সেইজন্য শাসিতেরই অধিক। শাসিতের

সম্মতি ছাড়া কোন রাষ্ট্র টিকিতে পারে না। গ্রীন্ বলেন রাষ্ট্রের ভিত্তি হইতেছে সম্মতি, বল নহে। এই দুই মতবাদের বিশদ আলোচনা এই অধ্যায়ের শেষে দ্রষ্টব্য।

রাষ্ট্রের ভিত্তি বল কি সম্মতি

১১। পরিবার সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি-বাদঃ বহু শতবর্ষ পূর্বে আরিস্টটল্ বলেন যে পরিবার বৃদ্ধি পাইয়া গ্রাম হয়, গ্রামসমূহ মিলিত হইয়া Polis বা নগর-রাষ্ট্র গঠিত হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে স্যার হেন্‌রি মেইন্ রোমান্, স্লাভ ও ভারতীয় প্রাচীন আইন অধ্যয়ন করিয়া দেখিতে পান যে যৌথ পরিবারের সর্বজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি পরিবারভুক্ত সকল ব্যক্তির উপর অবাধ শাসন চালাইতেন। তিনি তাহাদিগকে দণ্ড দিতে পারিতেন, বন্ধক দিতে পারিতেন, বিক্রয় করিতে পারিতেন, এমন কি মারিয়া ফেলিতেও পারিতেন। রোমানদের আইনে এই শক্তিকে Patria Potestas বলিত। প্রাচীন ভারতেও পিতা এই শক্তি পরিচালনা করিতেন। তাই শুনঃশেফকে তাহার পিতা পেটের দায়ে বিক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। প্রাচীন কালে পরিবার ছিল বৃহৎ। হোমারের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে প্রিয়ামের পরিবারে প্রায় তিনশত লোক ছিল। পূর্বপুরুষ হইতে জাত হইয়া একই রক্তের সম্বন্ধে আবদ্ধ ব্যক্তিরা পরস্পরের মধ্যে একতা বোধ করিত। পরিবারের সর্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ পুরুষকে সকলে মিলিয়া কর্তা বলিয়া মানিত। মেইন বলেন যে পরিবারভুক্ত সকলে আদিপুরুষের প্রতিনিধি রূপে প্রাচীনতম শাখার সর্ব জ্যেষ্ঠ ব্যক্তির দ্বারা শাসিত হইত। সিজ্‌উইক ইহার প্রতিবাদ করিয়া লেখেন যে প্রাচীন সমাজের লোকেরা প্রতিনিধির ধারণা করিতে পারিতেন না। তাঁহারা কুলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তিকে কর্তা করিতেন। মেইনের মতে কয়েকটি পরিবার একত্রিত হইয়া কুল (gens বা House) ও কুলসমূহ মিলিত হইয়া ট্রাইব বা উপজাতি গঠিত হইত। কয়েকটি ট্রাইবের যোগফলে রাষ্ট্র উৎপন্ন হইয়াছিল। মেইনের এই মতবাদ বর্তমানকালে দুগুইত (Duguit) সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন যে পিতাই পরিবাররূপ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের শাসক ও পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তি শাসিতবর্গ। প্রাচীন নগর পরিবারসমূহের সম্মিলন হইতে জাত।

পিতৃতান্ত্রিক পরিবার

পিতৃতান্ত্রিক পরিবারই পরিবারের আদিম রূপ ছিল না। নৃবিজ্ঞান ও

সমাজবিজ্ঞানের পণ্ডিতেরা গবেষণা করিয়া বাহির করিয়াছেন যে বহু দেশে পরিবার ছিল মাতৃতান্ত্রিক। কে কাহার মাতা তাহা জানা একটুও কঠিন নহে; কিন্তু মানুষ যখন গোষ্ঠীর মধ্যে বাস করিত ও বিবাহ প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই তখন সন্তানের পিতৃত্ব অনুমানের উপর নির্ভর করিত। আধুনিক নৃতত্ব প্রমাণ করিয়াছে যে প্রথমে মেয়েরাই চাষবাস করিত, পুরুষেরা পশুশিকার করিত। একটি মেয়ে একই সঙ্গে কয়েকটি বিবাহ করিতে পারিত। সে শ্বশুর বাড়ি যাইত না; স্বামীরাই মাঝে মাঝে তাহার বাড়িতে আসিত। ছেলেমেয়েরা মায়ের নামে পরিচিত হইত। এইরূপ মাতৃতান্ত্রিক সমাজ এখনও অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে আছে। এমন কি দক্ষিণ ভারতের নায়ার সম্প্রদায়ের মধ্যেও কিছুদিন পূর্বে ছিল। এইরূপ সমাজে মায়েরই প্রাধান্য। বিষয়সম্পত্তি মায়ের অধিকারে থাকিত এবং তাহার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে কন্যারা উহা লাভ করিত। কিন্তু মাতৃতান্ত্রিক সমাজ সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কোথাও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ছিল, কোথাও বা মাতৃতান্ত্রিক সমাজ।

মাতৃতান্ত্রিক পরিবার

উভয় প্রকার সমাজেরই মূল ভিত্তি হইতেছে পরিবার। কিন্তু আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন যে মানব সভ্যতার আদি যুগে পরিবারের অস্তিত্ব ছিল না। মানুষ দলবদ্ধ হইয়া গোষ্ঠীর মধ্যে বাস করিত। কালক্রমে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও বিবাহ প্রথার উদ্ভব হইবার পর পরিবারের সৃষ্টি হয়। সেইজন্য রাষ্ট্রের উৎপত্তি পরিবারের মধ্যে খুঁজিতে যাওয়া অনুচিত। তবে যৌথ পরিবারে মানুষ এক জনের আদেশ মানিয়া চলিতে শেখে একথা ঠিক। তাই বলিয়া পরিবার ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া রাষ্ট্র হইয়াছে এই মত গ্রহণ করা যায় না। রাষ্ট্রের উৎপত্তির মূলে অনেক প্রকার কারণ আছে। কোন একটি কারণকে প্রাধান্য দেওয়া যায় না।

পরিবার সমাজের আদিম প্রতিষ্ঠান নহে

১২। বাস্তব অথবা ঐতিহাসিক বিবর্তন-বাদ (Realistic or Historical theory): রাষ্ট্র সহসা একদিন ঈশ্বরের ইচ্ছায়, কিংবা মানুষের চুক্তির ফলে উৎপন্ন হয় নাই; ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে রাষ্ট্র উদ্ভূত হইয়াছে। মানুষের ভাষার মতন মানুষের রাষ্ট্রও স্বাভাবিক প্রয়োজনে

ধীরে ধীরে সংগঠিত ও বিকশিত হইয়াছে। কেহ যুক্তি পরামর্শ করিয়া অথবা সভায় প্রস্তাব পাশ করিয়া রাষ্ট্র সৃষ্টি করে নাই। বার্জেস্ যথার্থই বলিয়াছেন রাষ্ট্র মানবসমাজের ক্রমিক বিকাশের ফল; মানবস্বভাবের সর্বজনীন নীতি রাষ্ট্রের মধ্যে ক্রমশঃ সার্থকতা লাভ করিয়াছে। নৃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসের গবেষণার ফলে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীরা এখন রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই বিবর্তনবাদ স্বীকার করিয়াছেন।

বিবর্তনবাদের মূল কথা

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন একটি কারণকে যেমন গ্রহণ করা যায় না, তেমনি সকল রাষ্ট্রই একই প্রকারে বিবর্তিত হইয়াছে এই সিদ্ধান্তও ঠিক নহে। বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন প্রকার সমবায়ে বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। বুঝিবার সুবিধার জন্য আমরা কারণগুলিকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিব, যথা—মানবের সামাজিকতা, রক্তের বন্ধন, ধর্মের বন্ধন, বলপ্রয়োগ এবং রাজনৈতিক চেতনা।

দার্শনিক দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে মানবের সামাজিকতাই রাষ্ট্রের উৎপত্তির মূল কারণ। মানুষ সামাজিক জীব। সে একা থাকিতে পারে না। জৈব প্রেরণায় সে সঙ্গী খোঁজে। মানুষের অসংখ্য প্রয়োজন মেটানো কেবলমাত্র একজন বা দুইজনের চেষ্টায় সম্ভব নহে। আদিম মানবকে অতিকায় এবং হিংস্র বন্য পশুর সহিত সংগ্রাম করিয়া টিকিয়া থাকিতে হইয়াছে। একক জীবন যাপন করিতে হইলে সে উহাদের আক্রমণে ধ্বংস হইয়া যাইত। বর্তমান আকারের মানুষের বিবর্তনের পূর্ব হইতেই লোকে দলবদ্ধ হইয়া বসবাস ও চলাফেরা করিত। যেখানে দল সেইখানেই দলের নেতা দেখা যায়। এমন কি বানরদের মধ্যেও দলের প্রধান আছে। নেতার আদেশ দলভুক্ত সকলে যখন মানিয়া চলিতে আরম্ভ করিল তখনই রাষ্ট্রের মৌলিক উপাদান, আজ্ঞাদান ও আনুগত্য স্বীকার উপস্থিত হইল। আরিস্টটল্ যথার্থই বলিয়াছেন যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন হইতে; কিন্তু রাষ্ট্র কেবল জীবন রক্ষার জন্য টিকিয়া নাই; উন্নততর জীবনের বিকাশের জন্যই রাষ্ট্র বর্তমান থাকে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি স্বাভাবিক প্রয়োজন

আদিম সমাজের মধ্যে একতা স্থাপনের সবচেয়ে বড় যোগসূত্র ছিল রক্তের বন্ধন। মায়ের সঙ্গে ছেলের যোগ অত্যন্ত নিবিড়। শিশু মায়ের

আদেশ মানিয়া চলিতে অভ্যস্ত হয়। কোথাও কোথাও মা-ই দলের নেতা হইলেও সাধারণতঃ পুরুষকেই দলের নেতৃত্ব করিতে হইত। প্রসবের পর মাতা ও শিশু উভয়েরই বেশ কিছুদিন রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন হয়। দশজনে যেখানে একত্রে থাকে সেখানে একজনের আদেশ মানিয়া চলিতে হয়। গোষ্ঠীপতি দলের পরিচালনা করিতেন।

রক্তের সম্বন্ধ

কালক্রমে বিবাহ ও সম্পত্তির সৃষ্টি হইলে গোষ্ঠী বিভিন্ন পরিবারে বিভক্ত হইল। কিন্তু তাহারা একই পুরুষ হইতে উদ্ভূত এরূপ ধারণা পোষণ করিত। এই ধারণা কোথাও বা সত্য, কোথাও বা কৃত্রিম ছিল। দত্তক পুত্র গ্রহণের নিয়ম প্রাচীন সমাজে প্রচলিত ছিল বলিয়া কোথাও কোথাও রক্তের সম্বন্ধ কৃত্রিম হইত। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি জাতিদের মধ্যে আজও গোত্র উল্লেখ করিয়া পূজা, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম-কর্ম নিষ্পন্ন করিতে হয়। এক গোত্রের কিংবা এক গোষ্ঠীর লোক স্বভাবতঃই ঐক্যবদ্ধ হইত।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে যৌথপরিবারের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ শাখার সর্বজ্যেষ্ঠ পুরুষ কর্তা হইতেন। তাঁহার আদেশ পরিবারের সকলকে মানিতে হইত। তাঁহার অধিকারকে রাষ্ট্রের সূচনা মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রের সঙ্গে পরিবারের গুরুতর পার্থক্য আছে। পিতা বা গোষ্ঠীপতির ক্ষমতা তাঁহার বংশের লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত, বাহিরের লোককে তাঁহারা সযত্নে দূরে রাখিতেন। একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে যাঁহারা স্থায়িভাবে বসবাস করেন তাঁহারা সকলেই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হন; কিন্তু পরিবারের মধ্যে সম্বন্ধ ছিল ব্যক্তিগত, স্থানগত নহে। পরিবার ও গোত্র প্রথার দ্বারা চালিত হইত; সুবিধা ও প্রয়োজন অনুসারে নূতন আইন করিবার ইচ্ছা ও শক্তি উহাদের ছিল না।

রাষ্ট্র ও পরিবারের পার্থক্য

রক্তের বন্ধনের মতন ধর্মের বন্ধনও রাষ্ট্রের বিবর্তনের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছিল।

পূর্বপুরুষকে পূজা করা আদিম সমাজের একটি সুপ্রচলিত প্রথা ছিল। যাঁহারা এক পূর্বপুরুষ হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহারা মাঝে মাঝে একত্রিত হইয়া পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে পিণ্ডাদি প্রদান করিতেন। তাহাতে তাঁহাদের মধ্যে ঐক্যবন্ধন বৃদ্ধি পাইত। প্রাচীনকালে লোকে

ঝড়, জল, বজ্রপাত, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে খুব ভয় করিত।

ধর্মবোধ

তখন এক শ্রেণীর ধূর্তলোক দাবি করে যে তাহারা তন্ত্রমন্ত্র প্রভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগকে শান্ত করিতে পারে। এইসব লোককে আধুনিক নৃবিজ্ঞানের পরিভাষায় ঐন্দ্রজালিক (Magician) বলা হয়। তাহারা অতিপ্রাকৃতিক শক্তি দাবি করিত। অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোক কিছুটা ভয়ে, কতকটা শ্রদ্ধায় তাহাদের আদেশ মানিত। এইরূপে কোন কোন স্থানে তাহারা কতকটা রাজশক্তি পরিচালনা করিতে থাকে। আবার অন্যদিকে মিশর, চীন, জাপান, ভারতবর্ষ প্রভৃতি বহুদেশের রাজারা নিজদিগকে সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতির বংশধর বলিয়া ঘোষণা করিতেন। লোকে ভয়ে ও ভক্তিতে তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করিত। আবার কোথাও বা একই ধর্মমন্দিরে একই ধরনের উপাসনায় রত হওয়ায় লোকের মধ্যে ঐক্য বন্ধন বৃদ্ধি পাইল। এইরূপে ধর্মসংস্কার মানুষের সমষ্টিগত ঐক্য বৃদ্ধি করিয়া তাহাতে আজ্ঞানুবর্তী হইতে শিখাইল। গেটেল সেইজন্য বলিয়াছেন যে রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের আদিমতম ও সর্বাপেক্ষা সংকটময় যুগে একমাত্র ধর্মই বর্বরসুলভ অরাজকতাকে দমন করিয়া শ্রদ্ধা ও আনুগত্য শিখাইয়াছিল।

বলপ্রয়োগের দ্বারাও যে রাষ্ট্রের বিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। শিকার ও পশুপালন করিয়া যাহারা জীবন ধারণ করিত তাহারা একস্থানে বসবাস করিত না। আর যে সব গোষ্ঠীর মধ্যে চাষ-আবাদ করিবার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহারা বাধ্য হইয়াই নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করিত। শিকারীরা গায়ের জোরে চাষ-আবাদকারাদের পরাজিত করিয়াছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নহে। তাহারা কৃষকদের নিকট হইতে কর আদায় করিতে আরম্ভ করে। তাহাদের মধ্যে কোন কোন ট্রাইব্‌ বা উপজাতি সমান ধর্ম ও সমান অবস্থাবিশিষ্ট অন্য ট্রাইবের সঙ্গে সম্মিলিত হইত। আবার কোন ট্রাইব অন্যান্য ট্রাইবের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিত। যুদ্ধের সময় একজন নায়কের নেতৃত্ব সকলে স্বীকার করিত। তাঁহার আদেশ মানিয়া চলিতে লোকে অভ্যস্ত হইল। পরে শান্তির সময়ে লোকে তাঁহার কথামত কাজ করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে রাজশক্তির উদ্ভব হয়। যুদ্ধবিগ্রহের ফলে

বল-প্রয়োগ

বিজেতাদের ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি পাইল। সম্পত্তির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আইন-কানুন করার প্রয়োজন হইল। কিন্তু আদিম সমাজে চিরাচরিত প্রথার প্রভাব খুব বেশি ছিল। জনসমাজের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনা যখন বৃদ্ধি পাইল, তখন সামাজিক প্রয়োজন অনুসারে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি আইন প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিল।

প্রথা

রাষ্ট্রীয় চেতনা বলিতে লোকের মনের এমন ধারণা বুঝায় যাহার দ্বারা নিজেদের সার্বজনীন স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য রাজনৈতিক সংগঠন করিতে অগ্রসর হয়। কতকগুলি বিষয়ে সকলের স্বার্থ সমান এই চিন্তা আদিম সমাজের লোকের মনে অনেক দিন পরে জাগিয়াছিল। প্রথমে তাহাদের মধ্যে যাহারা নেতৃত্ব করিত তাহারা ইহা বুঝিতে পারিয়াছিল। পরে অন্যান্য লোকেও সর্বজনীন স্বার্থ কিসে তাহা উপলব্ধি করিয়াছিল। রাষ্ট্র সেই উপলব্ধির পরিণতি। রাষ্ট্রের ধারণা প্রথমে মনের মধ্যে জাগিয়াছে, কালক্রমে উহা বাস্তবরূপ গ্রহণ করিয়াছিল। দেশের ভিতরে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা ও বাহিরের শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা যে সকলের পক্ষে সমান প্রয়োজনীয় এই বোধ হইতে লোকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে সম্মতি দিয়াছিল। এইরূপে বলপ্রয়োগ ও সম্মতি, ধর্ম ও রক্তের বন্ধন, পরিবারের মধ্যে আজ্ঞানুবর্তিতা প্রভৃতি বিবিধ উপাদানের সমবায়ে অত্যন্ত অস্পষ্ট আকার হইতে ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়া রাষ্ট্র বর্তমান আকার লাভ করিয়াছে।

রাষ্ট্রীয় চেতনা

১৩। সরকার বলের উপর প্রতিষ্ঠিত না সম্মতির উপর? সরকার বলের উপর প্রতিষ্ঠিত কি জনসাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত ইহা লইয়া বাস্তববাদী ও আদর্শবাদীদের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ দেখা যায়। যাঁহারা রাষ্ট্র কিভাবে কাজ করিতেছে তাহা বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন তাঁহাদিগকে বাস্তববাদী বলা হয়। ইহার মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদী, সাম্যবাদী, নৈরাজ্যবাদী, রাষ্ট্রহীন সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদী (Syndicalists) ও সংঘ-সমাজবাদী (Guild Socialists) আছেন, আবার নীট্‌সে ও ট্রইট্‌স্‌কের ন্যায় উগ্র রাষ্ট্রক্ষমতার সমর্থকও আছেন। ফরাসী দার্শনিক কোঁৎ বলেন যে প্রত্যেক মানবীয় সমাজই বলের ভিত্তির উপর গঠিত। তিনি আরও বলেন যে যতদিন না আমরা স্বীকার করিব যে সরকার জোরের উপর

প্রতিষ্ঠিত ততদিন পর্যন্ত সমাজবিজ্ঞান দার্শনিক ধোঁয়ার মধ্যে আবৃত থাকিবে। তিনি প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে সেকালে সমাজের মধ্যে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ নির্ণীত হইত জোরের দ্বারা। একজন শক্তিশালী যোদ্ধা প্রথমে তাহার নিজের ট্রাইবের উপর ক্ষমতা বিস্তার করিয়া পরে অন্যান্য ট্রাইবকে জয় করে। অন্যকে জয় করিবার ইচ্ছার দ্বারা মানুষ পরিচালিত হয়। যাহারা খাদ্য-বস্ত্র প্রভৃতির উৎপাদন করিয়া মানুষের জীবন ধারণ করা সম্ভব করিয়া তুলে তাহারা দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। যখন কারুশিল্পের উদ্ভব হয়, তখন ঐসব শিল্পকে সামরিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ব্যবহার করা হইতে লাগিল। ঐ সময়ে উৎপাদকেরা ক্রীতদাসের পর্যায় হইতে ভূমির সহিত সংশ্লিষ্ট অর্ধ-স্বাধীন রায়তের শ্রেণীতে (serfs) উন্নীত হইল। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিল্পোৎপাদনের যুগে তাহারাই কারখানার শ্রমিক হইল। শিল্পপতিরা তাহাদিগকে শোষণ করিয়া আর্থিক অধীনতার মধ্যে রাখিয়া দেয়। কার্ল মার্ক্সের মতেও এ পর্যন্ত যে সমস্ত সমাজ বর্তমান আছে তাহার ইতিহাস শ্রেণীগত সংঘাতের ইতিহাস। গ্রীনের ন্যায় আদর্শবাদীও স্বীকার করিয়াছেন যে রাষ্ট্রের সংগঠনে বল প্রয়োগের প্রয়োজন হইয়াছিল। ট্রাইবের মোড়ল সৈন্যবলে অন্যের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল এবং অন্য ট্রাইবকে জয় করিয়াছিল জোরের দ্বারাই। পরিবারের বিশেষ ক্ষমতাগুলি ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছিল ও মধ্য যুগে সামন্তশাসনকে পদদলিত করিয়া আধুনিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। গ্রীন্ আরও বলেন যে রাষ্ট্র মানুষের বাহিরের ব্যবহারকে সংযত করিবার জন্য বল প্রয়োগ করিতে বাধ্য হয়।

সামাজিক বিবর্তন

শ্রেণীসংঘাত

কিন্তু শুধু বলের দ্বারা সুদীর্ঘকাল ধরিয়া রাষ্ট্র বা সরকার কখনই টিকিয়া থাকিতে পারে না। এরূপ করিতে গেলে বিরোধ বাধিবেই। রাষ্ট্রের সকলে না হউক অধিকাংশ লোক অন্ততঃ রাষ্ট্রের অস্তিত্বে সম্মতি দেয় এবং উহাকে আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। রাষ্ট্র শুধু গায়ের জোরই ব্যবহার করেনা, নৈতিক বলও প্রয়োগ করে। রাষ্ট্র সর্বসাধারণের অধিকার রক্ষার জন্য তাহার বলাত্মক কর্তৃত্ব (coercive authority) ব্যবহার করে। রাষ্ট্র আইন তৈয়ারি

সম্মতিই রাষ্ট্রের ভিত্তি

করিয়া সকলের অধিকার রক্ষা করে। রাষ্ট্রের প্রকৃত ভিত্তি হইতেছে সকলের সম্মতি, শুধু পাশব বল নহে। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন "প্রজার শক্তিতেই রাজা শক্তিমান, নহিলে রাজার নিজবাহুতে বল কত?"

অনুশীলন

১। Discuss the Evolutionary Theory of the State. (1963)

১২ প্রকরণ দেখ।

পরিবারের মধ্যে মানুষ বশ্যতা ও একযোগে কাজ করিতে শেখে। পরিবার বৃদ্ধি পাইয়া কুল ও শাখায় (Tribe) পরিণত হয়। শাখাভুক্ত লোকেরা একজন বা একদলের লোকের বাধ্য হইয়া কাজ করে। সম্পত্তির উদ্ভব হইতে নেতৃত্বের প্রয়োজন অনুভূত হয়। একজন নায়ক না থাকিলে ধনপ্রাণ রক্ষা করা কঠিন হয়। নায়ক বড় যোদ্ধা বা বীর হইতে পারেন, ধর্মগুরুও হইতে পারেন। যুদ্ধ ও রাজ্যজয়ের ফলে রাষ্ট্র বলশালী হয়। বলপ্রয়োগ রাষ্ট্রকে দৃঢ়তর করে। কিন্তু জনসাধারণের সম্মতি ছাড়া রাষ্ট্র বা সরকার বেশি দিন টিকিতে পারে না।

২। 'The State is a growth, not a creation'. Describe the factors which have contributed to the evolution of the State.

রাষ্ট্র যে সহসা চুক্তির দ্বারা উদ্ভূত হয় নাই তাহা দেখাইয়া দ্বাদশ প্রকরণের যুক্তিগুলি লেখ।

৩। State and examine the theory of Divine Origin of the State. What purpose did the theory serve.

প্রথম প্রকরণ দেখ। এই মতবাদ লোকের মধ্যে শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপনে ও নৈতিক জীবন অনুসরণে সহায়তা করিয়াছিল। আদিম যুগের লোকেরা ভগবানের প্রতি ভয় বা ভক্তির জন্য রাজা বা ধর্মগুরুকে তাঁহার প্রতিনিধি বলিয়া মানিত এবং তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিত।

৪। State and examine the Force theory of the Origin of the State.

দশম প্রকরণ দেখ।

৫। Examine the Social Contract theory of the Origin of the State.

২, ৬, ৭ প্রকরণ দেখ।

৬। State the points of agreement and difference between Hobbes and Lock as expounders of the Social Contract Theory.

৩, ৪ ও ৬ প্রকরণ দেখ।

৭। Give a critical estimate of the Social Contract theory as propounded by Rousseau.

৫ম প্রকরণ দেখ।

৮। Attempt a reconciliation of the principal theories concerning the origin of the State.

ইহার উত্তরে বাস্তববাদ বা ঐতিহাসিক বিবর্তনবাদ ১২ প্রকরণ অনুসারে লেখ।

৯। Explain how the State is based essentially on consent and not on force.

১৩ প্রকরণ দেখ।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিষয়ক মতবাদ

১। **জৈব মতবাদ (State as an Organism):** রাষ্ট্রকে জীবদেহের সহিত তুলনা করিয়া রাষ্ট্রের প্রকৃতি নির্ণয় করিবার চেষ্টা বহু প্রাচীন। রাষ্ট্র যদি জীবদেহতুল্য হয় এবং ব্যক্তি জীবকোষের মতন হয় তাহা হইলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ঘোষণার বিশেষ সার্থকতা থাকে না। রাষ্ট্রকে যাঁহারা মানুষের তৈয়ারি যন্ত্র মনে করিয়াছিলেন তাঁহারা চুক্তিবাদের উপর উহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। মানুষ যন্ত্র নির্মাণ করে নিজের সুখসুবিধার জন্য। যদি কোন যন্ত্র কার্যোপযোগী না হয় তাহা হইলে উহাকে ইচ্ছামত পরিবর্তিত করিয়া লওয়া যায়। রাষ্ট্রকে যন্ত্র বলিয়া ধরিলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার সুবিধা হয়। কিন্তু ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের উপর অতিরিক্ত জোর দিলে রাষ্ট্র ও সমাজের সংহতি বিলুপ্ত হইবার আশংকা থাকে। প্লেটোর সময় ও উনবিংশ শতাব্দিতে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এত বেশি বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে লোকে আত্মকেন্দ্রিক হইয়া রাষ্ট্রের কার্যের পরিধিকে সংকীর্ণ করিতেছিল। রাষ্ট্র ব্যক্তিকে যত বেশি কাজে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিবে তত বেশি মঙ্গল হইবে (Laissez Faire বা Let alone) এই মত অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঘোষিত হইয়াছিল। তাহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ উনবিংশ শতাব্দীতে জৈববাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়।

জৈববাদের প্রাচীন ও আধুনিক রূপ

প্লেটো ও আরিস্টটল জীবদেহের সহিত রাষ্ট্রের তুলনা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে কোন কোন মনীষী রাষ্ট্রকে পুরাপুরি জীবদেহ বলিলেন। তাঁহারা জীবদেহের সঙ্গে রাষ্ট্রের অভিন্নতা প্রমাণ করিতে ব্যগ্র হইলেন।

প্লেটো রাষ্ট্রকে এক বৃহত্তর জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করিয়া মানুষের বিভিন্ন কাজের সহিত রাষ্ট্রের কার্যাবলীর উপমা দেন। আরিস্টটল বলেন দেহের সঙ্গে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যেরূপ সম্বন্ধ রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির সেইরূপ সম্বন্ধ। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যদি দেহ হইতে

প্লেটো ও আরিস্টটল

বিচ্যুত হয় তাহা হইলে আর উহারা নিজেদের নির্দিষ্ট কাজ করিতে পারে না। হাত কিছু লইতে বা ধরিতে পারে ততক্ষণ যতক্ষণ উহা দেহের সহিত সংযুক্ত থাকে। সেইরূপ মানুষ রাষ্ট্রের সহিত যুক্ত না থাকিলে মানুষ বলিয়াই গণ্য হয় না। সমগ্রের একটি ধারণা না করিতে পারিলে অংশের কল্পনা করা যায় না। হাতির ধারনা না থাকিলে হাতির দাঁতের সম্বন্ধে ধারণা জন্মে না। সেইরূপ রাষ্ট্রের ধারণা প্রথমে না জন্মিলে তাহার অংশস্বরূপ ব্যক্তির ধারণা করা যায় না, এই হিসাবে আরিস্টটলের মতে রাষ্ট্র ব্যক্তির পূর্ববর্তী (The State is prior to the Individual) মানুষের দেহের বিকলাঙ্গতার কথা ভাবিয়াই তিনি রাষ্ট্রের বিকৃতরূপের কথা বলিয়াছেন। তিনি জৈববাদ এমনভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যাহাতে মানুষের মধ্যে শাসক ও শাসিতের পার্থক্য বজায় থাকে। পায়ের কড়ে আঙুলের চেয়ে হাতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বেশি, আবার হাতের উপর মস্তিষ্ক প্রধান। সুতরাং তাঁহার মতে প্রকৃতি নিজেই মানুষকে শাসক ও শাসিত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে।

রুশো রাষ্ট্রকে জীবদেহের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন বটে ; কিন্তু তিনি মানুষের সাম্যে বিশ্বাসী। তিনি রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির সহিত মস্তকের, প্রথা ও আইনের সঙ্গে হৃদয়ের, শাসক ও বিচারকের সঙ্গে ইন্দ্রিয় ও ইচ্ছাশক্তির, শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিকর্মের সহিত মুখ ও পেটের এবং রাজস্বের সঙ্গে শোণিতের তুলনা করিয়াছেন।

রুশোর ব্যাখ্যা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জৈববাদ আর কেবলমাত্র তুলনাত্মক রহিল না ; রাষ্ট্রের সঙ্গে জীবদেহের অভিন্নতা প্রমাণ করিবার জন্য একদল লেখক উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ইংরাজ সমাজ-বিজ্ঞানী হাবার্ট স্পেনসার, অস্ট্রিয়ার লেখক আলবার্ট শাফল্ (Schaffle), রাশিয়ার পল লিলেনকেণ্ড, পোলাণ্ডের গামপ্লীউট্‌স্‌ ও জার্মানির ব্লুন্ট্‌সলির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা জীবদেহের বিবর্তনের সহিত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ক্রমবিকাশের সমতা দেখাইয়াছেন। শ্যাওলা হইতে আরম্ভ করিয়া নানাবিধ কীটপতঙ্গের দেহ ও সর্বশেষে মানব শরীরে যেমন বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকাশ হয় রাষ্ট্রের মধ্যেও তেমন প্রয়োজন অনুসারে বিবিধ শাসনযন্ত্রের সৃষ্টি হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জৈববাদীরা

জীবকোষ (germ cell) লইয়া যেমন জীবদেহ গঠিত, তেমনি ব্যক্তি লইয়া রাষ্ট্র গঠিত। জীবকোষের মৃত্যু হইলেও জীবদেহ বাঁচিয়া থাকে। তেমনি ব্যক্তির মৃত্যুতে রাষ্ট্রের মৃত্যু হয় না। জীবদেহ বিভিন্ন ধরনের অঙ্গ লইয়া গঠিত; ঐ সব অঙ্গের কার্য পৃথক্ পৃথক্ বটে, কিন্তু একের কাজ অন্যের পরিপূরক এবং একে অন্যের উপর নির্ভরশীল; প্রত্যেক অঙ্গের কাজ যদি ভালভাবে চলে তাহা হইলে সমগ্র জীবদেহ সুস্থ থাকে। দেহের প্রত্যেক অংশ সমগ্র জীবদেহের উপর নির্ভর করে আবার জীবদেহের স্বাস্থ্য প্রত্যেক অংশের ভালভাবে কাজ করার উপর নির্ভর করে। রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির তেমনি অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। ব্যক্তির উন্নতিতে রাষ্ট্রের উন্নতি, রাষ্ট্রের উন্নতিতে ব্যক্তির সুখসুবিধা। জৈববাদকে যদি এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় তাহা হইলে উহা না মানিবার কারণ দেখা যায় না। কিন্তু জীবদেহের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখাইতে যাইয়া জৈববাদীরা অনেক বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। ব্লুন্‌টসলি বলেন রাষ্ট্র পুংলিঙ্গধারী, সেইজন্য নারীর ভোটের অধিকার থাকা উচিত নহে। সরকারের বৈদেশিক বিভাগ তাহার নাকের মত, গন্ধ শুঁকিয়া শত্রু মিত্র বুঝিয়া পররাষ্ট্রনীতি নির্ণীত হয়। ইনি রাষ্ট্রকে ব্যক্তির সমষ্টির অতিরিক্ত এক ভাবময় বস্তু বলিয়াছেন। একটি মর্মর মূর্তি যেমন মার্বেল পাথরের সমষ্টি মাত্র নহে, একখানি তৈলচিত্র যেমন তৈলবিন্দুর যোগফল মাত্র নহে, তেমনি রাষ্ট্র কেবল তাহার অন্তর্গত ব্যক্তির সমষ্টি মাত্র নহে। এই তত্ত্ব হইতে তিনি তর্কের দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে রাষ্ট্রের এক স্বতন্ত্র সত্তা আছে এবং রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিকে বলি দেওয়া যাইতে পারে। ঘা হইয়া দেহের কোন অঙ্গ যদি পচিয়া যায় উহা যেমন নির্মমভাবে শল্যচিকিৎসক কাটিয়া ফেলেন তেমনি রাষ্ট্র তাহার নিজস্ব প্রয়োজনে ব্যষ্টির স্বার্থ সমষ্টির কল্যাণার্থে বলি দিতে পারে। তিনি রাষ্ট্রের কার্যের কোন গণ্ডি বাঁধিয়া দিতে রাজী নহেন। রাষ্ট্র জীবনের সর্বপ্রকার কার্যে নিয়ন্ত্রণ করিবে। বিংশ শতাব্দীর সর্বাত্মক ফ্যাসি ও নাৎসীবাদের মূল এই মতবাদের মধ্যে নিহিত আছে।

ব্লুন্‌টসলির ব্যাখ্যা।

হার্বার্ট স্পেনসার কিন্তু জৈববাদকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সমর্থনকল্পে ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি জীবদেহের সঙ্গে রাষ্ট্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ সাদৃশ্য

দেখাইয়াছেন। জীবদেহের মতন রাষ্ট্রের উদ্ভব, বিকাশ ও মৃত্যু ঘটে। জীবজগতের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে যেমন দেখা যায় যে নিম্নতর প্রাণীর শুধু উদর, নিশ্বাস-প্রশ্বাস লইবার যন্ত্র ও প্রজনন যন্ত্র আছে, তেমনি আদিম সমাজে প্রত্যেক মানুষই যোদ্ধা, শিকারী ও মিস্ত্রী। কালক্রমে জীবদেহে যেমন বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৃষ্টি হয়, তেমনি রাষ্ট্রে কর্ম-বিভাগ হয়। জীবদেহে যেমন রক্ত চলাচলের জন্য ধমনী আছে, রাষ্ট্রদেহে তেমনি যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে। স্পেন্সার সামরিক শক্তির সহিত মানবদেহের স্নায়বিক শক্তির তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু, তিনি রাষ্ট্রদেহের সঙ্গে জীবদেহের কয়েকটি গুরুতর পার্থক্যও দেখাইয়াছেন। জীবদেহে বিভিন্ন অঙ্গ দৃঢ়ভাবে পরস্পরের সহিত সংবদ্ধ, রাষ্ট্রদেহে অংশসমূহ কতকটা স্বাধীন ও বিভিন্নস্থানে ন্যস্ত। জীবদেহে চেতনাশক্তি একস্থানে সংহত হইয়া থাকে; সমাজদেহে ইহা সর্বত্র বিক্ষিপ্ত। সেই জন্য ব্যষ্টির কল্যাণ ছাড়া সমষ্টির কল্যাণ বলিয়া কিছু নাই। সমাজ ব্যক্তির সুবিধার জন্য বর্তমান, ব্যক্তি সমাজের জন্য নহে। তিনি আরও বলেন যে, রাষ্ট্র যখন জৈবিক ক্রমবিকাশের ফল, তখন প্রকৃতির কাজের উপর রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। প্রকৃতি দুবলকে বিনষ্ট করে। জীবন সংগ্রামে যোগ্যতম ব্যক্তি জয়ী হয়। সুতরাং দুর্বলকে সাহায্য করার জন্য আইনকানুন তৈয়ারি করা, কিংবা সরকার হইতে কারখানার কাজের সময় নির্ধারণ করা অন্যায়। তিনি রাষ্ট্রের কাজকে শুধু বাহিরের আক্রমণ হইতে এবং ভিতরের দুষ্ট লোকদের অত্যাচার হইতে রক্ষা ও সুবিচার করার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহিয়াছেন। শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা করাও তাঁহার মতে অনুচিত। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে জৈববাদ কাহারও মতে রাষ্ট্রের সর্বাত্মক ক্ষমতার পরিপোষক, আবার কাহারও মতে উহা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থক। কল্পিত সামাজিক চুক্তির বিভিন্ন ধরনের উপর যেমন সরকারের ক্ষমতার পরিমাণ নির্ভর করিত, তেমনি কল্পিত জীববাদের বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যার উপর কার্যের গণ্ডি কতদূর হইবে স্থির করা হইত।

হার্বার্ট স্পেনসারের মত ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ

জৈবদেহের সঙ্গে রাষ্ট্রদেহের কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও উভয়কে অভিন্ন বলা চলে না। কেননা উভয়ের মধ্যে পার্থক্য গভীর। রাষ্ট্রের ভিতর প্রত্যেক

ব্যক্তির স্বতন্ত্র চেতনা আছে, স্বতন্ত্র ইচ্ছা আছে, স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে। জীবদেহের বা উদ্ভিদ দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বা ডাল পাতার সেরূপ স্বতন্ত্র সত্তা নাই। দীনতম ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশে সুবিধা দেওয়া রাষ্ট্রের কর্তব্য। দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একই সঙ্গে পুষ্ট হয়, রাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যক্তি সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না।

রাষ্ট্রের সঙ্গে জীবদেহের পার্থক্য

জৈবদেহের বিনাশ আছে, কিন্তু রাষ্ট্র অবিনাশী না হইলেও দীর্ঘকালস্থায়ী। কোন কোন রাষ্ট্র হাজার বছরের বেশিও টিকিয়াছে। দেহের বিনাশ হইলে জীবকোষগুলি সঙ্গে সঙ্গেই নষ্ট হয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে পোলাণ্ডের রাষ্ট্রের যখন বিনাশ হইয়াছিল তখন সেখানকার সকল লোক মরিয়া যায় নাই। আবার এক জীবদেহ হইতে অন্য জীবদেহের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এক রাষ্ট্র হইতে অন্য রাষ্ট্রের সৃষ্টি কদাচিৎ দেখা যায়। জৈববাদে আজকাল আর কেহ বড় একটা বিশ্বাস করেন না। অধ্যাপক হবহাউস বলেন রাষ্ট্রকে প্রাণী রূপে কল্পনা করা নিরর্থক।

রাষ্ট্রের জন্ম ও মৃত্যু

জৈববাদের বহু ত্রুটি আছে সত্য, কিন্তু এই মত কয়েকটি মৌলিক সত্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। রাষ্ট্র জীবদেহের মতন ক্রমবিকাশের ফল। তবে রাষ্ট্রের বিকাশ শুধু প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না, সুচিন্তিত নির্দেশের দ্বারা তাহার বিকাশকে নিয়ন্ত্রিত করা চলে। রাষ্ট্র ব্যক্তির সমষ্টি মাত্র নহে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া ব্যক্তিকে কল্পিত রাষ্ট্রীয় সত্তার নিকট বলি দেওয়া উচিত নহে। জৈববাদের সবচেয়ে বড় কথা হইতেছে ব্যক্তির সহিত রাষ্ট্রের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। ব্যক্তির বিকাশ রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করে, আবার রাষ্ট্রের বিকাশও ব্যক্তির কল্যাণের উপর নির্ভর করে। ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোন অনতিক্রম্য বিরোধ নাই।

জৈববাদের মূল্য

২। আদর্শবাদ ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি: যাঁহারা বাহ্যবস্তুকে প্রকৃত সত্তাবিহীন এবং ভাবের বা Ideaর প্রকাশ মাত্র বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের মতকে Idealism, আদর্শবাদ বা ভাববাদ বলা হয়। এই মতবাদকে দার্শনিক, আধ্যাত্মিক (metaphysical), রহস্যানুভূতিমূলক (mystical) এবং

দেশকালনিরপেক্ষ (Absolute) মতবাদ বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়া থাকে। যাহা চোখে দেখা যায় তাহাই সত্য নহে, যাহা যুক্তির উপর এবং ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাই সত্য ও বাস্তব; রাষ্ট্র সর্বশ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শের প্রতিমূর্তি এবং ইহার আদেশ নির্বিচারে পালনীয়—ইহাই আদর্শবাদের সার কথা।

আদর্শবাদীরা রাষ্ট্রকে ব্যক্তিত্ব ও স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সমাজের আইনকানুন ও সংস্থা-প্রতিষ্ঠানসমূহ যেন রাষ্ট্রের ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি। রাষ্ট্রের চেতনা হইতেই ব্যক্তির চেতনা উদ্ভূত। রাষ্ট্রের ভিতর দিয়াই ব্যক্তিপুরুষের অন্তর্নিহিত গুণগুলি ফুটিবার সুযোগ পায়। রাষ্ট্রই নৈতিক আচার-আচরণের উৎসস্বরূপ। এক ব্যক্তি সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে তাহা নির্ণয় করিয়া দেয় রাষ্ট্র।

রাষ্ট্র আদর্শবাদীদের মতে চিরস্থায়ী। মানুষ স্বল্পকালের জন্য জন্মায়, বাঁচে ও কালগর্ভে বিলীন হইয়া যায়। তাহার জীবনধারা রাষ্ট্রের আদর্শে ও প্রভাবে গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। রাষ্ট্ররূপ পূর্ণসত্তার আংশিক বিকাশ হইতেছে ব্যক্তি। রাষ্ট্র ব্যক্তিগণের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠে; আবার ব্যক্তি রাষ্ট্রের মধ্যেই সার্থকতা লাভ করে।

রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য এবং সেবার দ্বারাই ব্যক্তির নৈতিক জীবন চরিতার্থ হয়। তাহার নিজের ইচ্ছাকে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে বলি দিতে দ্বিধা করা উচিত নহে। সে অন্য যে কোন সংস্থার সদস্য হউক না কেন, সকলের উপরে সে রাষ্ট্রের দাবি মানিয়া লইতে বাধ্য—কেননা অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানই রাষ্ট্রের প্রভায় প্রভান্বিত। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তির কোন অধিকার থাকিতে পারে না। ব্যক্তির অধিকারের সহিত রাষ্ট্রের অধিকারের যখন সংঘর্ষ বাধে তখন রাষ্ট্রের দাবিই মাথা পাতিয়া লওয়া উচিত। মানুষ রাষ্ট্রকে মানিয়া লইলে মহত্তর জীবনের আস্বাদ পায়। রাষ্ট্র সমস্ত নৈতিক বন্ধনের ঊর্ধ্বে। এই ধরনের অনেক ধোঁয়াটে বাক্‌চাতুর্য দিয়া আদর্শ-বাদীরা রাষ্ট্রকে এক অতিকায় দেবরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন।

এই নবদেবতা নীতি মানে না, ব্যক্তিকে সমষ্টির যূপকাষ্ঠে বলি দিতে দ্বিধা বোধ করে না এবং কাহারও প্রতি তাহার যে কোন কর্তব্য আছে তাহা স্বীকার করে না। এক রাষ্ট্রের সহিত অন্য রাষ্ট্রের ব্যবহার কেবলমাত্র

নিজ নিজ স্বার্থবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু বস্তুতঃ রাষ্ট্র তো কতিপয় ব্যক্তির বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারেই কাজ করিয়া থাকে। সেইসব ব্যক্তিকে নীতি ও ধর্মের উপরে স্থান দিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। রাষ্ট্রই যে মানুষের ক্রমবিকাশের সর্বোচ্চ নিদর্শন এরূপ মনে করাও যুক্তিসঙ্গত নহে।

৩। **আদর্শবাদের ইতিকথাঃ** প্লেটো ও আরিস্টটলের চিন্তাধারার মধ্যে আদর্শবাদের বীজ নিহিত আছে। কিন্তু তাহার পরিস্ফুটন হইয়াছে জার্মান দার্শনিক হেগেলের (১৭৭০-১৮৩১) মতবাদের মধ্যে। তাঁহার সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া ইংরাজ দার্শনিক গ্রীন্ (১৮৩৬-১৮৮২), ব্র্যাড্‌লে (১৯৪৬-১৯২৪) ও বোসাঙ্কে (১৮৪৮-১৯২৩) নব আদর্শবাদ বা Neo-Idealism প্রচার করেন। হেগেলের মত একদিকে ফ্যাসিস্ট ও নাৎসীবাদের উৎস বলিয়া ধরা হয়, আবার অন্যদিকে কার্লমার্কস্ ও লেনিনের চিন্তাধারার উপর তাঁহার প্রভাব যথেষ্ট লক্ষিত হয়। এইজন্য দুরূহ হইলেও তাঁহার প্রচারিত আদর্শবাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।

প্লেটো লিখিয়াছিলেন যে সমাজ বা রাষ্ট্র নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহার আদেশ পালন করিয়াই মানুষ তাহার ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করিতে পারে।

আদর্শবাদের ইতিহাস

আরিস্টটল্ বলেন যে রাষ্ট্র মহত্তর জীবনের জন্য বর্তমান, সুতরাং ইহা নিজে মহত্তম। তাঁহার মতে রাষ্ট্র স্ব-সম্পূর্ণ —ইহা অন্য কাহারও উপর নির্ভর করে না। হেগেল কাণ্টের নিকট হইতে রাষ্ট্রকে ঐশ্বরিক এবং সর্বশক্তিমান্ প্রতিষ্ঠানরূপে ভাবিতে শিখিয়াছিলেন।

তিনি রাষ্ট্রকে পৃথিবীতে ঈশ্বরের জয়যাত্রার প্রতীক বলিয়াছেন। যে সার্বিক প্রজ্ঞা হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, রাষ্ট্রও তাহা হইতে উদ্ভূত। প্রজ্ঞা রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়া তাহার লক্ষ্যের অভিমুখে চলিয়াছে। পরিবারের

রাষ্ট্রের আধ্যাত্মিক সত্তা

ভিতরে যে প্রীতি ও সহযোগিতা দেখা যায় তাহার বিপক্ষে রহিয়াছে প্রতিযোগিতামূলক বুর্জোয়া সমাজ, কিন্তু রাষ্ট্রের মধ্যে পরিবার ও বুর্জোয়া সমাজের সামঞ্জস্য স্থাপিত হইয়াছে। তাহার মতে রাষ্ট্র উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র নহে; রাষ্ট্র স্বয়ং উপেয় ("Not a means to an end but an end in itself.")। রাষ্ট্রের ভিতরেই মানবের আধ্যাত্মিক বাস্তবতা (spritual reality) সার্থকতা লাভ

করে। সেইজন্য ব্যক্তি পরিপূর্ণরূপে রাষ্ট্রের অধীনতা মানিতে বাধ্য। ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রের সবকিছু ক্ষমতা আছে। ব্যক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য হইতেছে—রাষ্ট্রের আদেশ পালন করা। রাষ্ট্র নৈতিক বন্ধনের উর্ধ্বে। রাষ্ট্র ব্যক্তির জীবন পরিচালনার জন্য নৈতিক নির্দেশ দেয়; সুতরাং ব্যক্তি কখনও বলিতে পারে না যে রাষ্ট্রের অমুক কাজটা নীতি-সঙ্গত হয় নাই। সোজা কথায় বলিতে গেলে রাষ্ট্র যাহাই কিছু করুক না তাহাই ঠিক। রাষ্ট্র উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র নহে, তাহার সার্থকতা নিজের মধ্যেই।

ব্যক্তির স্বাধীনতা

রাষ্ট্র ছাড়া মানুষ সম্পূর্ণ পরাধীন। রাষ্ট্রের আইন ও সংস্থা সমূহের ভিতর মানুষ যথার্থ স্বাধীনতা উপলব্ধি করে। কিন্তু হেগেলীয় দর্শনে স্বাধীনতার অর্থ একটু অন্য ধরনের: মানুষকে তখনই স্বাধীন বলা যায়, যখন সে প্রজ্ঞা বা বিচারশক্তির আদেশ অনুযায়ী কাজ করে। ব্যক্তি নিজের বুদ্ধি বিবেচনার দ্বারা সব সময়ে নিজের প্রকৃত হিত বুঝিতে পারে না; সে ভ্রান্ত হইয়া নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের কথা চিন্তা করে। একমাত্র রাষ্ট্রই নিরপেক্ষ ও নৈর্ব্যক্তিক প্রজ্ঞার অধিকারী, কেন না, ইহা কোন ব্যক্তির বা দলের কথা ভাবে না, সকলের যাহাতে কল্যাণ হয়, সকলে যাহাতে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে তাহাই করে। রাষ্ট্রের মধ্যে মানুষের ইতিহাস চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্রের আইনের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্যের দ্বারা ব্যক্তি পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করে। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে আইন তো বাহিরের বস্তু, উহার চাপ দিয়া কাজ করাইলে আর ব্যক্তির স্বাধীনতা কোথায় থাকে? ইহার উত্তরে হেগেল বলেন যে আইন বাহিরের বস্তু নহে; ব্যক্তি যাহা প্রকৃত ইচ্ছা করে উহা তাহাই। রাষ্ট্রই বাস্তব-সত্তার সেই রূপ যাহার ভিতর ব্যক্তি তাহার স্বাধীনতা ভোগ করে, এই শর্তে যে সে যাহা সার্বজনীন তাহা স্বীকার করে, বিশ্বাস করে এবং ইচ্ছা করে ("The State is that form of reality in which the individual has and enjoys his Freedom provided he recognises believes in and wills what is common to the whole".)। এই মতের সহিত রুশোর general will-য়ের ব্যাখ্যার কিছু সাদৃশ্য আছে।

হেগেল জৈববাদে পূর্ণ বিশ্বাসী। চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্রের সংগঠনকে তিনি

বাতুলতা মনে করিতেন। তাঁহার মতে রাষ্ট্র তাহার অংশসমূহ অপেক্ষা বড়। রাষ্ট্রের বিকাশেই ব্যক্তির বিকাশ হয়। আমার হাত যদি আমাকে না মানে তবে উহা যেমন আমার হাতই হইতে পারে না, তেমনি ব্যক্তি যদি রাষ্ট্রকে না মানে তবে সে প্রকৃত মানবই হইতে পারে না।

জৈববাদ

হেগেল বলেন যে রাষ্ট্রের সত্তার শ্রেষ্ঠরূপ দেখা যায় যুদ্ধের সময়। ঐসময়ে রাষ্ট্র নাগরিকদের জীবন সর্বতোভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। যুদ্ধের সময়ে রাষ্ট্র নিজের সুরক্ষা ছাড়া আর কোন নীতি মানিতে বাধ্য নহে। অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবহারের প্রসঙ্গে নীতির প্রশ্ন তোলাই অন্যায়। হেগেল বলেন যে যুদ্ধের দ্বারা লোকের নৈতিক স্বাস্থ্য অটুট রাখা যায়। দীর্ঘকাল স্থায়ী শান্তি রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শক্তিকে দুর্বল করে ও ব্যক্তিকে দুর্নীতিপরায়ণ করে। সুসভ্য দেশের পক্ষে অসভ্য দেশকে জয় করার ব্যাপারে কোন প্রকার অন্যায় নাই। বিংশ শতাব্দীর দুইটি মহাযুদ্ধই যে জার্মান জাতির দ্বারা ঘোষিত হইয়াছিল তাহার একটি কারণ বোধ হয় হেগেলের দর্শন।

রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠরূপ যুদ্ধে দেখা যায়

হেগেলের দর্শনে রাষ্ট্রকে দুর্দান্ত শক্তিশালী করিয়া ব্যক্তিকে নিষ্পেষিত করা হইয়াছে। ব্যক্তি তাহার নিজের ভালোমন্দ বুঝে না, রাষ্ট্রের মতন একটা নির্বৈক্তিক ভাববস্তু তাহা বুঝে এ কথা মানিয়া লওয়ার মানে হইতেছে নিজের বিচার-বুদ্ধিকে বিসর্জন দেওয়া। হেগেল মানবিকতা ও বিচারবুদ্ধির দোহাই দিয়া মানুষকে বিচারহীনতার দিকে ঠেলিয়া দিয়াছেন। তিনি স্বাধীনতা ও বশ্যতাপালনকে একই বস্তু বলিয়া স্বাধীনতা শব্দের অর্থবিপর্যয় ঘটাইয়াছেন। নিজের ইচ্ছার অধীন না হইয়া রাষ্ট্রের ইচ্ছার অধীন হইলে তবে লোকে স্বাধীন হইবে একথা আধ্যাত্ম বা রহস্যবাদীদের পক্ষেই মানা সম্ভব। রাষ্ট্রের ইচ্ছা বলিতে তো প্রকৃতপক্ষে সরকারের নেতৃস্থানীয় দুই এক ব্যক্তির ইচ্ছা বোঝায়। রাষ্ট্রকে ভগবানের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করাও সম্ভব নহে। গীতার মতে সব কিছুই তো ভগবানের প্রতিনিধি। হেগেলের আদর্শবাদ অবাস্তব। তাঁহার কল্পিত রাষ্ট্র পৃথিবীতে স্থাপন করা অসম্ভব।

হেগেলীয় আদর্শবাদের দোষ

হেগেলের দর্শন কিন্তু সমাজের উপর ব্যক্তির নির্ভরশীলতার উপর জোর দিয়া সমাজবন্ধনকে দৃঢ়তর করিয়াছে। মানুষ তাহার শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে স্বাধীনতার ধারণা পোষণ করে। এই মতও আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে স্বীকৃত হইয়াছে। সমষ্টিগত জীবনকে পূর্ণতর ও মহত্তর করিতে হইলে ব্যক্তির পক্ষে রাষ্ট্রের আনুগত্য করা ও স্বার্থত্যাগ করা প্রয়োজন এই সত্যের প্রতি জোর দিয়া হেগেল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের একদেশদর্শিতা খণ্ডন করিয়াছেন।

হেগেলীয় দর্শনের গুণ

কিন্তু তিনি জনসাধারণের ভোটের অধিকার এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মত অনুসারে কাজ করার সার্থকতা স্বীকার করেন নাই। তিনি বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতিনিধি নির্বাচন করা অপেক্ষা বিভিন্ন সংঘ হইতে প্রতিনিধি লইয়া বিধানমণ্ডলী স্থাপন করা ভাল মনে করিতেন। গণতন্ত্র তিনি পছন্দ করিতেন না। তিনি বলেন যে, যিনি সাধারণ মতকে অবজ্ঞা করিতে শেখেন নাই, তাঁহার দ্বারা কোন বড় কাজ হইতে পারে না।

শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে হেগেলের মত

৪। গ্রীণের নব-আদর্শবাদে রাষ্ট্রঃ হেগেলের আদর্শবাদে ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হইয়াছে। গ্রীন্ আদর্শবাদী হইয়াও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পক্ষে যুক্তি প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি হেগেলের ন্যায় রাষ্ট্রকে জীবদেহতুল্য মনে করেন, মনুষ্যসৃষ্ট যন্ত্র মাত্র ভাবেন না। হেগেলের মতন গ্রীন্‌ও রাষ্ট্রকে দৈবীশক্তির পূর্ণতম প্রতিমূর্তি বলিয়া স্বীকার করেন। হেগেলকে অনুসরণ করিয়া তিনি বলেন যে, রাষ্ট্র মানবের অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠ গুণগুলির বিকাশের সুবিধা করিয়া দেয় এবং এমন কর্তব্য নির্দিষ্ট করে যাহা পালন করিয়া সে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে। রাষ্ট্র যে সকল জনসমাজের (Community) সংহতি এবং সকলের উপরে এই মতও গ্রীন্ হেগেলের নিকট হইতে লইয়াছেন। সবচেয়ে বড় কথা গ্রীন্ হেগেলের মতন সমাজকে আধ্যাত্মিক সত্তাসম্পন্ন এমন এক মহান্ প্রতিষ্ঠানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন যাহার নিকট হইতে ব্যক্তি ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে ধারণা লাভ করে।

হেগেলের নিকট গ্রীণের ঋণ

মোটামুটি এতগুলি সাদৃশ্য থাকিলেও গ্রীন্ হেগেলীয় মতবাদকে অনেক স্থলে খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার মতে রাষ্ট্র সর্বশক্তিমানও নহে, দায়িত্ব-জ্ঞানহীনও নহে। রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বে পরিবার ও অন্যান্য অনেক সংঘের উৎপত্তি হইয়াছে। রাষ্ট্র তাহাদের উপর প্রাধান্য করিয়া তাহাদের কার্যের মধ্যে কোন বিরোধ থাকিলে তাহার সমন্বয় করিতে পারে বটে, কিন্তু ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করিতে পারে না। গ্রীনের মতে রাষ্ট্র নীতি ও বিবেককে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। তিনি নীতি বলিতে স্বেচ্ছায় স্বীকৃত কর্তব্যের নিঃস্বার্থ প্রতিপালন বুঝেন। রাষ্ট্রের কার্য এক্ষেত্রে এমন অবস্থা সৃষ্টি করা যাহাতে ব্যক্তি তাহার কর্তব্য সাধনে কোন বাধা না পায়।

গ্রীনের বৈশিষ্ট্য

রাষ্ট্রকে উদ্দেশ্য বা উপেয় বলিয়া গ্রীন্ স্বীকার করেন না। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইতেছে ব্যক্তির পূর্ণতম বিকাশসাধন করা। তিনি বারংবার বলিয়াছেন প্রতিষ্ঠানগুলি মানুষের জন্য, মানুষ প্রতিষ্ঠানের জন্য নহে। কাণ্টের মতন গ্রীন্ও বিশ্বাস করিতেন যে প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বতন্ত্র মূল্য ও মর্যাদা আছে এবং কোন অজুহাতেই ব্যক্তিকে শোষণ করা যাইতে পারে না। রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের জীবন ছাড়া রাষ্ট্রের কোন স্বতন্ত্র জীবনের অস্তিত্বও তিনি স্বীকার করেন না।

রাষ্ট্র উপায় মাত্র

গ্রীন্ বিশ্বভ্রাতৃত্বের মহান্ নীতিতে আস্থাশীল ছিলেন। সেই জন্য তিনি বিশ্বাস করিতেন না যে যুদ্ধের দ্বারা ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের বিকাশ ঘটে। যুদ্ধ যদি অপরিহার্য হয়, তাহা হইলেও রাষ্ট্র ন্যায় ও নীতি-সঙ্গত ভাবে যুদ্ধ করিবে। রাষ্ট্রকে সকল প্রকার নীতি-বন্ধনের উপরে বলিয়া মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ গ্রীন্ দেখিতে পান নাই। রাষ্ট্রকেই মানব-ইতিহাসের চরমতর বিকাশ বলিয়া তিনি মানেন নাই। তিনি আন্তর্জাতিক সমাজের প্রতিষ্ঠার দ্বারা বড় বড় রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে হিংসাদ্বেষ ও দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাইতে চাহিয়াছেন।

গ্রীনের আন্তর্জাতিকতা

হেগেলের সহিত গ্রীনের সবচেয়ে বড় পার্থক্য এই যে গ্রীন্ বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রতিরোধ করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছেন। রাষ্ট্র মানে অবশ্য এখানে সরকার; কেবলমাত্র সামাজিক কারণে এবং

সর্বসাধারণের কল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া যখন আত্মানুসন্ধানের ফলে উপলব্ধি করা যাইবে যে প্রতিরোধ করিবার ইচ্ছার মধ্যে বিন্দুমাত্র স্বার্থবোধ জড়িত নাই তখনই মাত্র প্রতিরোধ কার্যে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। দেশের মধ্যে গভীর এবং সুস্পষ্ট অসন্তোষের চিহ্ন দেখা দিলে তবে প্রতিরোধ করা উচিত। এরূপ অবস্থায় আর কেহ যদি সঙ্গী নাও হয় তাহা হইলেও অন্যায় শাসনের অবসান ঘটাইবার জন্য বিবেকশালী ব্যক্তি একলা অগ্রসর হইবেন। বাস্তবের সঙ্গে আদর্শবাদের সমন্বয় করিতে যাইয়া গ্রীন্ অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

রাষ্ট্রের প্রতিরোধ কি সমর্থনীয়

৫। **রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্কসীয় সিদ্ধান্ত:** হেগেল ও মার্কস্ দুইজনেই জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু হেগেল রাষ্ট্রকে ঐশ্বরিক মর্যাদা দিয়াছেন, আর কার্ল মার্কস্ উহাকে শ্রেণীগত শোষণের যন্ত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। হেগেলীয় দর্শনে রাষ্ট্রকে মানব ইতিহাসের চরমতম বিকাশ এবং চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠান রূপে ঘোষণা করা হইয়াছে। কার্ল মার্কসের মতে রাষ্ট্র সুদূর অতীতে ছিল না এবং সমাজের শ্রেণীবৈষম্য দূরীকৃত হইলে ইহার অস্তিত্ব থাকিবে কিনা সন্দেহ। হেগেল নিয়মতান্ত্রিক রাজশাসনের পক্ষপাতী এবং সংরক্ষণশীল। কার্ল মার্কস্ শ্রমিকের একনায়কত্বে বিশ্বাসী এবং বিপ্লবের সমর্থক। হেগেল ইতিহাসের ভাববাদী ব্যাখ্যা করিয়াছেন আর মার্কস্ জড়বাদী ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

হেগেলের সহিত পার্থক্য

কার্ল মার্কস্ (১৮১৮-১৮৮৩) যখন ত্রিশ বছরের যুবক তখন তিনি তাঁহার বন্ধু এঙ্গেল্‌সের সহযোগিতায় Communist Manifesto বাহির করেন। উহাতে তিনি বিশ্বের সকল শ্রমিককে একতাবদ্ধ হইতে আহ্বান করিয়াছেন এই বলিয়া যে তাহারা তো নিঃস্ব, সুতরাং তাহাদের শৃঙ্খল ছাড়া আর অন্য কিছুই হারাইবার ভয় নাই। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের তৃতীয় ফরাসী বিপ্লবের সময়ে ঐ ঘোষণা প্রকাশিত হয় এবং সেই সময় হইতে মার্কস্ অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেন। কিন্তু ঐ বিপ্লব যখন ফ্রান্স ও জার্মানিতে দমিত হইল ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি জয়ী হইল তখন মার্কস্ ইংলণ্ডে পলায়ন করেন।

কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো

সেইখানেই তিনি জীবনের অবশিষ্ট অংশ কঠোর দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে সুগভীর অধ্যয়নের মধ্যে অতিবাহিত করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার যুগান্তকারী গ্রন্থ 'ক্যাপিটাল' প্রকাশিত হয়। উহার প্রভাবে যেমন চিন্তাজগতে তেমনি কর্মজগতে এমন আলোড়ন উপস্থিত হইল, যে পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনও কোন গ্রন্থের প্রভাবে সেরূপ হয় নাই। কার্ল মার্কস্ প্রচলিত ধর্মমতে বিশ্বাসী নহেন, কিন্তু তিনি যেন আত্মা ও ভগবান-বিহীন জড়বাদী এক নূতন ধর্মমত স্থাপন করিলেন। তাঁহার মতবাদ শোষিত জনগণের মনে এক নূতন আশার সঞ্চার করিল। ঐ মতবাদ কেবলমাত্র বাদ-বিতণ্ডা ও অধ্যয়ন অধ্যাপনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিল না। তাঁহার সিদ্ধান্তকে বাস্তবরূপ দিবার জন্য হাজার হাজার লোক নিজেদের প্রাণ বলি দিতেও দ্বিধা বোধ করে না। ইঁহারা জেহাদের মনোবৃত্তিসম্পন্ন এবং মধ্যযুগীয় ধর্মযোদ্ধাদের চেয়েও অধিক অসহিষ্ণু।

মার্কস্ ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ধন কি ভাবে উৎপন্ন হয় এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কি ভাবে বণ্টিত হয় তাহার উপর সমাজের সংগঠন নির্ভর করে। হেগেল বলিয়াছেন যে মানুষের চিন্তা ও ইচ্ছার দ্বারা ইতিহাসের গতি নির্ধারিত হয়। মার্কস্ বলেন যে তাহা নহে, পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তন এবং নূতন নূতন কাঁচা মালের ও নূতন নূতন শিল্পোৎপাদন পদ্ধতির আবিষ্কারের ফলে ইতিহাসের ধারা বদলায়। সমাজ জীবনের আদিম যুগে মানুষ পশু শিকার করিয়া এবং বনের ফলমূল খাইয়া জীবন ধারণ করিত। তাহারা এক জায়গায় বেশি দিন থাকিত না। জমির উপর অধিকার স্থাপন করা সেই জন্য প্রয়োজন হয় নাই। আদিম সমাজে পশু শিকার করিবার যন্ত্রপাতি এবং শিকার-করা পশু সাধারণের সম্পত্তি ছিল। এই অবস্থাকে আদিম সাম্যবাদী সমাজ বা Primitive Communism বলা যায়। তখন রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয় নাই, তাহার প্রয়োজনও ছিল না, কেননা তখন সমাজে শ্রেণী বৈষম্য স্থাপিত হয় নাই। মানুষ পশু শিকার করিতে করিতে পশুপালন করিতে শিখিল। গোরু, ভেড়া, ঘোড়া প্রভৃতিকে বশ মানাইয়া লোকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি করিতে লাগিল। যাহার যত পশু তাহার তত ক্ষমতা। (প্রাচীন ভারতে গোরুর সংখ্যা দিয়া

শ্রেণী সংঘাতের ব্যাখ্যা

ধনের পরিমাণ নির্ণয় করা হইত)। ক্ষমতাশালী লোকেরা সমাজের ক্ষমতা পরিচালনা করিতে লাগিল। যাহাদের পশুরূপ সম্পত্তি নাই তাহারা পশুর মালিকদের আদেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য হইল। এইরূপে একশ্রেণীর লোকের দ্বারা অন্যশ্রেণীর লোকের শাসন ও শোষনের সূত্রপাত হইল। এই ধারা বৃদ্ধি পাইল কৃষিকর্মের যুগে। পশুদের খাওয়াইবার জন্য ঘাসপাতার প্রয়োজন। একজায়গায় ঘাসপাতা ফুরাইয়া গেলে অন্য জায়গায় যাওয়ার চেয়ে সেইখানেই উহা জন্মাইবার চেষ্টা করিতে করিতে কৃষিকর্মের উদ্ভব হয়। জমি তখন ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। সমাজের মধ্যে যাহারা সব চেয়ে বলিষ্ঠ এবং সুচতুর তাহারা বেশির ভাগ জমি দখল করিয়া বসিল। যুদ্ধে পরাজিত লোকেরা দাস হইল। মার্কসের মতে শ্রেণীসংঘর্ষ প্রথম দেখা দেয় দাস ও প্রভুর মধ্যে। দ্বিতীয়তঃ সামন্তযুগে লোকেরা আহার, বস্ত্র ও বাসস্থানের বিনিময়ে দাসত্ব স্বীকার করিত। আবার কেহ কেহ অন্যের আক্রমণ হইতে বাঁচিবার জন্য কোন পরাক্রান্ত ব্যক্তির বশ্যতা স্বীকার করিল। কৃষিযুগে জমির মালিকদের মালিকানা সত্ত্ব রক্ষা করিবার জন্য আধুনিক অর্থে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইল। যাহাদের হাতে ক্ষমতা রহিল তাহারা আইনকানুন এমন ভাবে তৈয়ারি করিতে লাগিল যেন তাহাদের অধিকার চিরস্থায়ী হয়। সামন্ত তন্ত্রের যুগে Serf বা ভূমিদাসদের সম্বন্ধে নিয়ম করা হইয়াছিল যে, তাহারা অধিকাংশ সময়ে মালিকের জমি চাষ করিবে আর রাত্রিতে বা সপ্তাহের দুই একদিনে মালিকের প্রদত্ত ক্ষুদ্র এক টুকরা জমিতে ফসল উৎপাদন করিয়া নিজের পরিবার প্রতিপালন করিবে। মালিক জমি বেচিয়া দিলে, ইহারাও জমির সঙ্গে সঙ্গে নূতন মালিকের সম্পত্তি হইত। স্ত্রী ও কন্যার উপরও ইহাদের পূর্ণ অধিকার ছিল না। এই অবস্থার মধ্যে মানুষ চিরকাল সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। কাজেই মাঝে মাঝে কৃষক বিদ্রোহের ন্যায় শ্রেণী-সংগ্রাম দেখা দিত।

যন্ত্রশিল্পের যুগ

মার্কস্ বলেন যে, উৎপাদন-পদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে পরিবর্তন আসে। হাতে চালানো তাঁতের যুগে সামন্ত-তন্ত্রের এবং কলে চালানো তাঁতের সময়ে ধনিকতন্ত্রের প্রবর্তন হয়। ইতিহাস শ্রেণী-সংঘর্ষের ধারাবাহিক বিবরণ মাত্র। সপ্তদশ

হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে শিল্পোৎপাদনের যে সমস্ত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় তাহার ফলে শিল্পপতিরা ভূমিদাসগণকে ক্রমে ক্রমে কারখানার দিকে আকর্ষণ করেন। যন্ত্রের কাজই হইল শ্রমকে বাঁচানো। একশ জন যে ভারী জিনিস টানিয়া তুলিতে পারে না, একটি ক্রেন অনায়াসে তাহা পারে। কারখানায় কাজ পাইবার জন্য ভূমিদাসেরা ব্যগ্র। শ্রমিকের আমদানির অনুপাতে শ্রমিকের চাহিদা কম বলিয়া শিল্পপতিরা শ্রমিককে তাহার উৎপন্ন ধন অপেক্ষা অনেক কম দিয়া নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। মার্কসের মতে এইভাবে শ্রমিককে শোষণ করিয়া কারখানার মালিকেরা মুনাফা শিকার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ধনী হইয়া সামন্তশ্রেণীকে ক্ষমতা চ্যুত করিলেন। ঐতিহাসিক বিবর্তনের তৃতীয় যুগে সমাজের উপরতলায় রহিলেন শিল্পপতি ও পুঁজিপতিরা, নীচের তলায় শ্রমিকেরা আর মাঝখানে শিক্ষক, কেরাণী, উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি। ধনিকেরা শ্রমিকদিগকে ন্যায্য বেতন কখনই দেন না, কেন না নূতন নূতন যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে একদিকে কম লোক নিযুক্ত করিবার দরকার হয়, অন্যদিকে শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইহার প্রতিফল তাঁহাদিগকে ভোগ করিতে হয়। যত জিনিস কারখানায় তৈয়ারি হয়, সব সময়ে তত জিনিস খরিদ করিবার মত সামর্থ্য লোকের থাকে না—কেন না তাহাদের বেতন কম। ফলে মাঝে মাঝে উৎকট আকারে আর্থিক সংকট দেখা দেয়। ধনিকশ্রেণীর লোকেরা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিতে করিতে ছোটখাটো শিল্পপতিকে পিষিয়া মারিয়া ফেলে। উৎপাদনের সংস্থাগুলি ক্রমে বিশাল হইতে বিশালতর হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির মালিকেরা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হয়। পরিণামে দেখা যায় যে, একদিকে মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণীর লোক, আর অন্যদিকে অসংখ্য দরিদ্র, নিষ্পেষিত শ্রমিক।

ধনিক ও শ্রমিক বিরোধ

কিন্তু অল্পসংখ্যক ধনিকশ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ন্যস্ত রহিয়াছে। তাহারা পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে ও আইনের অজুহাতে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে। এইভাবে কিন্তু চিরকাল তাহারা ক্ষমতা ভোগ করিতে পারে না। মার্কস্ বলেন যে, প্রত্যেক অবস্থার ধ্বংসের বীজ তাহারই নিজের মধ্যে লুকাইয়া থাকে। এক একটি কারখানায় বহু শ্রমিক একসঙ্গে কাজ করে;

রাষ্ট্র বলের উপর প্রতিষ্ঠিত

কারখানার আকার যত বাড়ে ততবেশি শ্রমিক পরস্পরের মধ্যে সংঘবদ্ধ হইবার সুযোগ পায়। সেইজন্য মার্কস্ বলিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ড ও জার্মানির মতন শিল্পে অগ্রসর দেশে সর্বপ্রথমে শ্রমিকেরা বিপ্লব করিয়া রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করিয়া লইবে। সাংবিধানিক ক্রমবিকাশের ফলে এইরূপ ক্ষমতার হস্তান্তর কখনও হইতে পারে না।

বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী

যে শ্রেণীর হাতে যখন রাষ্ট্রক্ষমতা থাকে সেই শ্রেণী তখন অন্যান্য শ্রেণীকে নির্যাতন করিয়া দাবাইয়া রাখে। প্রভুরা দাসশ্রেণীকে, সামন্তেরা ভূমিদাস-দিগকে এবং পুঁজিপতিরা শ্রমিকদিগকে নিষ্পেষণ করিয়াছে। শ্রমিকদের একনায়কত্ব যখন প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন তাহারা অন্যান্য শ্রেণীকে শুধু দাবাইয়া রাখিবে না, তাহাদিগকে একেবারে সমূলে বিনষ্ট করিবে। ফলে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা হইবে। উৎপাদনের সকল যন্ত্র ও উপাদান তখন রাষ্ট্রের আয়ত্তে আসিবে। প্রথমে সমাজতন্ত্র এবং পরে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

শ্রেণীহীন সমাজ

রাষ্ট্র যখন শ্রেণীগত স্বার্থরক্ষার জন্যই স্থাপিত হইয়াছিল তখন শ্রেণীহীন সমাজে রাষ্ট্রের অস্তিত্বের সার্থকতা কোথায়? মার্কস্ কোথাও স্থির সিদ্ধান্ত করেন নাই যে, শ্রমিকের একনায়কত্ব স্থাপনের পর রাষ্ট্র আর থাকিবে না। তাঁহার ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত কয়েকটি বিতর্ক হইতে তাঁহার বন্ধু এঙ্গেলস্ ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে সিদ্ধান্ত করেন যে, ভবিষ্যতের সামাজিক বিপ্লবের ফলে রাষ্ট্র বিলুপ্ত হইবে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বলেন যে ধন উৎপাদনের সকল উপায়ই যখন রাষ্ট্রের হাতে আসিবে, তখন শ্রমিকেরা রাষ্ট্রকে আর রাষ্ট্র রাখিবে না। উৎপাদনের উপায়গুলি আয়ত্তের মধ্যে আনাই রাষ্ট্রের শেষ স্বাধীন কাজ হইবে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি আরও বলেন যে, উৎপাদনের উপায় রাষ্ট্রের অধিকারে আসিলে মানুষ প্রয়োজনের রাজ্য হইতে স্বাধীনতার রাজ্যে উত্তীর্ণ হইবে। লেনিন এই মতের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, বিপ্লবের পূর্বে যে রাষ্ট্র ছিল তাহা বিলুপ্ত হইবে এই কথা ঠিক নহে; সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে রাষ্ট্র শ্রেণীগত শোষণের অস্ত্ররূপে বিলুপ্ত হইবে।

রাষ্ট্র কি শেষে বিলুপ্ত হইবে?

৬। **মার্কসবাদের মূল্য নিরূপণ:** মার্কসের ভক্তের সংখ্যা

যেমন গণনাতীত তাঁহার বিরুদ্ধবাদীর সংখ্যাও তেমনি বিশাল। ধনতান্ত্রিক-দেশের অধিকাংশ পণ্ডিত তাঁহার বিপ্লবী মতের তীব্রতম বিরুদ্ধ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি সহিংস বিপ্লবের সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া অনেকে তাঁহার উপর বিরক্ত। কিন্তু তাঁহার অতি বড় শত্রুদেরও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায় তিনি এমন এক দিব্যদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন যাহা অন্য কোন মনীষী পূর্বে চিন্তাও করিতে পারেন নাই। সমাজের আর্থিক বিকাশের উপর যে রাষ্ট্রের তথা আইন আদালতের দৃষ্টিভঙ্গী নির্ভর করে, এই মত তিনিই সর্বপ্রথমে ব্যাখ্যা করেন। তিনি অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার উপর জোর দিলেও সমাজ-জীবনের উপর ধর্ম, সাহিত্য, চারুকলা প্রভৃতির প্রভাব অস্বীকার করেন নাই। তবে তাঁহার মতে ধর্ম, সাহিত্য প্রভৃতিও আর্থিক ব্যবস্থার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হয়।

ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যার গুরুত্ব

মার্ক্স্ আশাবাদী। তিনি মানুষের প্রকৃতির পরিবর্তন সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করেন। রাষ্ট্রীয় চিন্তাধারার ইতিহাসে দেখা যায় যে, যাঁহারা মানুষের প্রকৃতি অপরিবর্তনীয় মনে করেন, তাঁহারাই সাধারণতঃ সংরক্ষণ-শীলতার পক্ষপাতী হন। আর যাঁহারা মনে করেন যে, মানুষ চিরকাল এমন স্বার্থপর, প্রতিদ্বন্দ্বিতাপরায়ণ থাকিবে না, তাঁহারা বিপ্লব ঘটাইয়া মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন করিতে চাহেন। কারণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার দোষেই মানুষ ক্ষুদ্র স্বার্থ ও পরস্পরের সহিত সংঘর্ষ লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হইতেছে বুর্জোয়া সমাজের ভিত্তি, সেইজন্য মানুষ এই সমাজের মধ্যে পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিতে চায়। কিন্তু সহযোগিতার ভিত্তিতে যে সমাজ গঠিত হইবে, সেখানে লোকে সমাজের সেবার দ্বারাই নিজেদের জীবনকে সার্থক করিবে বলিয়া মার্ক্স্ আশা করেন। কিন্তু মানুষের প্রকৃতিতে মৌলিক পরিবর্তন আনিতে হইলে দীর্ঘ কালের আবশ্যক।

আশাবাদী

মার্ক্সীয় মতবাদের প্রভাবে রাশিয়াতে যে রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে তাহার সহিত জনসাধারণের মধ্যে সহযোগিতা থাকিলেও নেতৃবৃন্দের মধ্যে কিন্তু প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা লক্ষ্য করা যায়। ৪৫ বৎসর গত হইলেও সেখানে

রাষ্ট্রের বিলুপ্তির বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা দেখা যায় না। বরং পৃথিবীর আর কোথাও রাষ্ট্র এমন করিয়া জীবনের সকল ক্ষেত্র জুড়িয়া নাই।

মার্কস্ শ্রেণীগত বিরোধের উপর খুব জোর দিয়াছেন, কিন্তু শ্রেণীর সীমা কি বর্ণাশ্রম ধর্মের মতন কঠোরভাবে সুনির্দিষ্ট? শ্রমিকের ছেলে পার্লামেন্টের সদস্য, এমন কি প্রধানমন্ত্রী হইয়াছেন এমন দৃষ্টান্ত তো বিরল নহে। মার্কস্ বলিয়াছিলেন যে, শ্রমিক ও ধনিকের সংঘাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিলুপ্ত হইবে। কিন্তু মধ্যবিত্তের বিলুপ্তির কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না; বরং তাহাদের মধ্যে ম্যানেজার এবং সুনিপুণ শিল্প উপদেষ্টার এক নূতন শ্রেণীর প্রভাব এখন বৃদ্ধি পাইতেছে। শ্রমিকেরাও দিন দিন দরিদ্রতর হইতেছে না, তাহাদের জীবনের মান দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহার কারণ অবশ্য ট্রেড ইউনিয়নের শক্তি বৃদ্ধি। মার্কস্ বলিয়াছিলেন যে, বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাপে ছোটখাট কারবার লোপ পাইবে। কিন্তু এ ভবিষ্যদ্বাণীও সফল হয় নাই। মার্কস্ অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবকে যথোচিত গুরুত্ব দেন নাই। নিছক ক্ষমতা লাভ ও ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য অনেকে সব কিছু করিতে প্রস্তুত। ইহার দৃষ্টান্ত সব দেশেই পাওয়া যায়, রাশিয়াও এ বিষয়ে ব্যতিক্রম নহে।

মার্কসের মতের সমালোচনা

১। Discuss the Idealist Theory regarding the nature of the State (1962).

Discuss critically the Idealist Theory of the State (1964)

দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকরণ দেখ।

আদর্শবাদের সম্বন্ধে সাধারণ বর্ণনা দিবার পর হেগেলের সিদ্ধান্ত ও তাহার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা কর।

২। What are the merits and defects of the Organic Theory of the State ?

প্রথম প্রকরণে বর্ণিত জৈববাদ লেখ। ব্লুন্টসলি ও হার্বার্ট স্পেনসারের মত ব্যাখ্যা কর ও পরে জীবদেহের সহিত রাষ্ট্রের পার্থক্য দেখাও।

৩। How does the Idealist view of the State differ from the Utilatarian view ?

আদর্শবাদীরা ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির পার্থক্যকে আমল দেন না। তাঁহারা কেবল সমষ্টিকে দেখেন, এই সমষ্টিই রাষ্ট্র। রাষ্ট্র সার্বজনীন ভাবের অভিব্যক্তি। ইহারই প্রভাবে ব্যক্তি বিচারশীল ও সামাজিক ভাব সম্পন্ন হয়। He (the Idealist) sees only man in the aggregate, and the human aggregate which he stresses is that which forms the state —which he holds to be the truest manifestation of the universal spirit. It is the same universal spirit which makes the individual rational, and hence social. কিন্তু Utilatarian বা হিতবাদী ব্যক্তির সত্তাকে শ্রদ্ধা করেন; তিনি অধিকতর সংখ্যকের অধিকতম হিতসাধনকে শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহার মতে ব্যক্তি সমষ্টির মধ্যে বিলীন হইয়া যায় না।

পঞ্চম অধ্যায়

রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা

১। **সার্বভৌমিকতার স্বরূপঃ** অনেক লোক যদি একসঙ্গে বসবাস করে, তবে তাহাদের মধ্যে মতভেদ হওয়া স্বাভাবিক। দশজনে যাহা ভাল মনে করিতেছে, অন্যে তাহা অন্যায় বলিতে পারে। তাহাদের বিরোধ মিটাইয়া দিবার ক্ষমতা কোথাও না কোথাও থাকা দরকার; না থাকিলে সমাজের মধ্যে সংহতি থাকে না; লোকে পরস্পরের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করে। রাষ্ট্রের মধ্যে বহু ব্যক্তি, বহু পরিবার, বহু সংঘ ও প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। তাহারা নিজের নিজের কাজ করে। কিন্তু তাহাদের সকলকে জনকল্যাণের জন্য একমুখী করা এবং জনগণের অহিতকর কার্য হইতে নিবৃত্ত করা রাষ্ট্রের কার্য। তাহারা রাষ্ট্রের কথা মানিবে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এক এক পণ্ডিত এক একভাবে দিয়াছেন। রাষ্ট্রের হাতে শক্তি আছে, তাই লোকে ভয়ের চোটে রাষ্ট্রের আদেশ পালন করে—এই কথা অনেকেই বলেন। কিন্তু শুধু ভয় দেখাইয়া কিংবা শুধু গায়ের জোরে সব লোককে চিরদিনের জন্য বশে রাখা যায় না। লোকে রাষ্ট্রের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এবং বাল্যকাল হইতে রাষ্ট্রের আদেশ মানিয়া চলিতে থাকে। অধিকাংশ লোক অভ্যাস বশেই রাষ্ট্রের আদেশ মানিয়া চলে। কিন্তু এমন অল্প সংখ্যক লোক সব রাষ্ট্রেই থাকে, যাহারা অজ্ঞতা ও স্বার্থান্ধতাবশতঃ সেই আদেশ অমান্য করে। তাহাদিগকে আদেশ মানাইবার জন্য শক্তির দরকার। সেই শক্তি সব সময়ে প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় না। আদেশ না মানিলে উহা মানিতে বাধ্য করা হইবে এই ধারণাই তাহাদিগকে আজ্ঞানুবর্তী করে। ভাল লোকেরা কিন্তু জানে যে, রাষ্ট্র সার্বজনীন ইচ্ছাকে প্রকাশ করে, সকলের মঙ্গলজনক কার্য করে, তাই তাহার আদেশ পালন করা কর্তব্য। এই ভাবে অভ্যাস বশেই হউক অথবা কর্তব্য বুদ্ধিতেই হউক, লোকে স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব মানিয়া চলে। গ্রীন্ বলেন যে রাষ্ট্রের ভিত্তি

লোকে রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে কেন

সম্মতির উপর, জোরের উপর নহে। কিন্তু রাষ্ট্রই যে বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভিন্ন শ্রেণী ও বিভিন্ন সংঘের মধ্যস্থ হইয়া তাহাদের বিরোধ মিটাইয়া দেয় একথা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। রাষ্ট্র সকলের উপরে। ইহাই একমাত্র সামাজিক প্রতিষ্ঠান যাহার আদেশ রাষ্ট্রের ভিতরে প্রায় সকলেই সাধারণতঃ মানে এবং যে বাহিরের অন্য কোন শক্তির আদেশ মানিতে বাধ্য নহে।

এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে রাষ্ট্রকে একটি কাল্পনিক ব্যক্তিরূপে ধরা হইয়াছে বলিয়া তাহার সম্বন্ধে 'যে' এবং 'যাহার' শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। আইনতঃ রাষ্ট্র একটি ব্যক্তি। সে অন্যের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে পারে, এবং অন্যে তাহার বিরুদ্ধে নালিশ করিতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র সর্বভৌমিক শক্তির বলে নিজেই আইন তৈয়ারি করে এবং প্রচলিত প্রথাকে মানিয়া লইয়া তাহাকে আইন বলিয়া অনুমোদন করে। কেহ কেহ বলেন যে, প্রথার প্রভাব এমন ব্যাপক যে, রাষ্ট্র উহাকে না অনুমোদন করিয়া পারে না। সেইজন্য রাষ্ট্রকে আইনের স্রষ্টা না বলিয়া আইনের অভিভাবক বলিলে ঠিক হয়। যাহা হউক, রাষ্ট্রের আদেশ ও অনুমোদন হইতে আইনগত ন্যায় ও অন্যায়ের সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্র আইনের অধীন নহে, কেন না তাহা না হইলে রাষ্ট্রকে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী বলা চলে না; আইনই ঐ ক্ষমতার অধিকারী হয়। চূড়ান্ত ক্ষমতা যদি দুই জায়গায় ন্যস্ত থাকে তবে তাহাদের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা করিবে কে? এইজন্য সর্বাভৌমিকতাকে এক, অবিভাজ্য, হস্তান্তরের অযোগ্য, চিরস্থায়ী এবং সর্বব্যাপক বলিয়া আইন-ব্যাখ্যাতারা নির্ণয় করিয়াছেন।

রাষ্ট্র কি আইনের অধীনে

এই সার্বভৌমিকতাকে বুঝিতে হইলে দুই একটি উপমা মনে রাখিলে সুবিধা হইবে। দেহের মধ্যে প্রাণ আছে। রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা যেন তাহার প্রাণ। দেহের মধ্যে প্রাণ ঠিক কোথায় অবস্থিত, তাহা দেখিতে কত বড় এবং কি রকম তাহার রং, তাহা যেমন নিশ্চিতভাবে বলা যায় না, রাষ্ট্রের ঠিক্ কোথায়—সরকারের মধ্যে, না বিধানমণ্ডলীর মধ্যে, না নির্বাচকদের মধ্যে, না জন-সাধারণের মধ্যে সার্বভৌমিকতা অবস্থিত তাহাও তেমনি ঠিক করিয়া বলা যায় না। অথবা সার্বভৌমিকতাকে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের মতন

সার্বভৌমিকতা সরকারের বৈশিষ্ট্য নহে

আকারহীন, অথচ সর্বব্যাপী, এক এবং পরিপূর্ণ বলিয়া মনে করিতে পারি। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রেরই ক্ষমতা, সরকারের নহে। জনসাধারণ ভোট দিয়া কিংবা বিপ্লব করিয়া সরকার বদল. করিতে পারে; কিন্তু তাহাতে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা যেমনটি ছিল তেমনটিই থাকে। আইনের পণ্ডিতদের হাতে পড়িয়া সার্বভৌমিকতার মতবাদ অত্যন্ত সূক্ষ্ম, এমন কি অনেক সময়ে সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগম্য হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তবক্ষেত্রে যাহা চোখে দেখিতেছি, তাহার সঙ্গে ঐ মতবাদের সব সময়ে মিল দেখা যায় না। তাই বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে কোল, ল্যাস্কী প্রভৃতি সার্বভৌমিকতার বহুত্ব ঘোষণা করিয়াছেন।

২। **সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা :** সার্বভৌমিকতার আধুনিক কয়েকটি সংজ্ঞা হইতে ইহা কি বস্তু তাহার সম্বন্ধে কতকটা ধারণা জন্মিবে। ইহার সংক্ষিপ্ততম সংজ্ঞা দিয়াছেন উইলোবি (Willoughby)। তিনি বলেন যে, রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ইচ্ছা হইতেছে সার্বভৌমিকতা (Sovereignty is the supreme will of the state.)। কিন্তু ইহাকে সংজ্ঞা বলা যায় কিনা সন্দেহ।

বিভিন্ন সংজ্ঞা

আমেরিকার অন্য একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক, বার্জেস বলেন যে, সার্বভৌমিকতা হইতেছে প্রত্যেক প্রজার ও প্রজাদের সকল প্রকার সংঘের উপর মৌলিক, চরম, অসীম এবং সর্বাত্মক ক্ষমতা ("It is the original, absolute, unlimited, universal power over the individual subject, and all association of subjects".)। তিনি আবার প্রজাদের উপর আদেশ দেওয়া এবং তাহাদিগকে উহা প্রতিপালন করিতে বাধ্য করিবার স্বতোৎসারিত ও স্বাধীন ক্ষমতাকে সার্বভৌমিকতা বলিয়াছেন। স্বতোৎসারিত ও স্বাধীন শব্দের মানে পাওয়া যায় জেলিনেকের সংজ্ঞার মধ্যে, কেন না তিনি বলিয়াছেন্—যে সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের সেই বৈশিষ্ট্য যাহার বলে ইহার নিজের ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোন ইচ্ছার দ্বারা আইনতঃ ইহাকে বাঁধা যায় না এবং নিজের শক্তি ছাড়া অন্য কোন শক্তির দ্বারা সীমিত করা যায় না ("that characteristic of the state in virtue of which it cannot be legally bound except by, its own will or limited by, any other power than itself") ; ইংরাজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী পোলক নেতিবাচক শব্দে বলিয়াছেন যে, সার্বভৌমিকতা

সেই ক্ষমতা যাহা সাময়িক মাত্র নহে, অন্য কাহারও নিকট হইতে ন্যস্ত ক্ষমতা মাত্র নহে, যাহা এমন কোন নিয়মের দ্বারা বদ্ধ নহে, যে নিয়ম রাষ্ট্র বদলাইতে পারে না ("Soveriegnty is that power which is neither temporary nor delegated, nor subject to particular rules which it cannot alter".)।

পোলকের সংজ্ঞা

৩। **সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য:** আইনজ্ঞগণ সার্বভৌমিকতার যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন তাহা হইতে উহার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। মনে রাখা প্রয়োজন যে, এইসব বৈশিষ্ট্য শুধু আইনগত। বাস্তব জীবনে ইহাদের অনেকগুলি অল্লাধিক পরিমাণে অনুপস্থিত থাকে। কানুনী দৃষ্টিতে যাঁহারা সার্বভৌমিকতার এককত্ব, অবিভাজ্যতা প্রভৃতি ব্যাখ্যা করেন তাঁহাদিগকে একত্ববাদী বলা যাইতে পারে। সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকে ইঁহাদের মত স্বীকার করেন না। তাঁহাদিগকে বহুত্ববাদী বলে। বহুত্ববাদীদের সিদ্ধান্ত পরে আলোচনা করা যাইবে।

সার্বভৌমিকতার প্রথম বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার স্থায়িত্ব। যতদিন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকে ততদিন তাহার সার্বভৌমিকতা বজায় থাকে। যদি কোন সময়ে কোন কারণে রাষ্ট্র সার্বভৌমিকতা হারায়, তাহা হইলে রাষ্ট্রের অবসান ঘটিবে। কিন্তু রাষ্ট্রের অভিপ্রায় অনুসারে সার্বভৌমিক শক্তি যাঁহারা পরিচালনা করেন তাঁহাদের পরিবর্তন ঘটিলে, সার্বভৌমিকতার অবসান হয় না।

স্থায়িত্ব

সার্বভৌমিকতা এক ও অবিভাজ্য। রাষ্ট্রের মধ্যে চূড়ান্ত ক্ষমতা একটি মাত্র কেন্দ্রেই সংন্যস্ত হইতে পারে। দুইটি বা ততোধিক কেন্দ্রে ঐ ক্ষমতা থাকিলে উহাদের মধ্যে বিরোধ ঘটা অসম্ভব নহে। সে ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবে কে? সেইজন্য সার্বভৌমশক্তিকে exclusive বা সম্পূর্ণ একক বলা হয়। বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় যে, ঐ ক্ষমতা সরকারের বিভিন্ন অংশ কর্তৃক ব্যবহৃত হইতেছে। আইনবাদীরা বলিবেন উহা শক্তির বিভাজন নহে, বণ্টন মাত্র।

অবিভাজ্য

রাষ্ট্রের ভিতরকার প্রত্যেক ব্যক্তি এবং ব্যক্তিগণ কর্তৃক সংগঠিত প্রত্যেক সংঘ সার্বভৌম শক্তির বশ্যতা স্বীকার করে। তাই সার্বভৌমিকতার

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার সর্বব্যাপকতা। অবশ্য বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতেরা ঐ ক্ষমতার এক্তিয়ারের বাহিরে; কেন না তাঁহারা নিজের রাষ্ট্রের অধীনতা মানিয়া চলেন। কিন্তু যে রাষ্ট্রে তাঁহারা দৌত্য করিতেছেন, সে রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করিতে পারেন। এই অধিকার হইতেই প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সার্বভৌমিক শক্তি নিরংকুশ, বাধাহীন। কিন্তু শক্তি থাকিলেই যে তাহা প্রয়োগ করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পিতা সন্তানকে মারিয়া ফেলিতে পারিতেন। কিন্তু কয়জন পিতা এই ক্ষমতার প্রয়োগ করিতেন? রাষ্ট্র সকল প্রকার সংঘের উপর যে কোন প্রকার আদেশ দিতে পারে, কিন্তু কোন্ সার্বভৌমিক শক্তি পরিবার ধ্বংস করিতে উদ্যত হইবে?

সর্বব্যাপকতা

সার্বভৌমিকতার চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, ইহা ইচ্ছামত হস্তান্তরিত করা যায় না। মানুষ যেমন তাহার প্রাণ অপরকে দিতে পারে না, বৃক্ষ যেমন তাহার পল্লব জন্মাইবার ক্ষমতা ত্যাগ করিতে পারে না, রাষ্ট্র তেমনি তাহার সার্বভৌমিকতা ছাড়িয়া দিতে পারে না। সার্বভৌমিকতা ছাড়িয়া দেওয়া মানে হইতেছে রাষ্ট্রের বিলুপ্তি। যদি যুদ্ধবিগ্রহের ফলে কিংবা সন্ধির ফলে রাষ্ট্র তাহার ভূখণ্ডের কোন অংশ ছাড়িয়া দিতে রাজী হয়, তাহা হইলে উহার দ্বারা সার্বভৌমিকতা ছাড়িয়া দেওয়া বুঝায় না। তেমনি আবার এক সরকার অন্য সরকারের হাতে সার্বভৌমিকতা অর্পণ করিলে তাহাও সার্বভৌমিকতার হস্তান্তর বলিয়া গণ্য হইবে না। কেননা রাষ্ট্র তো তাহার সার্বভৌমিকতা ছাড়িয়া দিতেছে না। মালিক যখন গাড়ির কোচোয়ান বদলান, তখন তাঁহার মালিকানা সত্ত্বের বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় না।

হস্তান্তরের অযোগ্যতা

সার্বভৌমিকতার পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার মৌলিকতা, চরমতা ও সীমাহীনতা (Original, absolute and unlimited power)। ব্রহ্মার উপর আর কোন বিধাতা নাই বলিয়া যেমন তাঁহাকে অযোনিসম্ভব বলা হয়, তেমনি সার্বভৌমিকতা স্বয়ম্ভূ; ইহার মূল যদি অন্য কোথাও থাকে তবে তাহাকেই চূড়ান্ত ক্ষমতার আধার বলিতে হয়। সার্বভৌমিকতা যদি অন্য কোন শক্তির দ্বারা সীমিত

অবাধ ও সীমাহীন

হয়, তবে সেই শক্তিই চরম ও চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। সেইজন্য সার্বভৌমিকতা হইতে রাষ্ট্রকে আইনতঃ সম্পূর্ণ স্বাধীন বলা হইয়াছে।

সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের সংবিধানিক কানুন কিংবা আন্তর্জাতিক কানুনের দ্বারা নিরাকৃত হয় না। সাংবিধানিক কানুন রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের কাঠামো তৈয়ারি করিয়া দেয়। শাসনযন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গ কিভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে, কতটা ক্ষমতা কোন্ ক্ষেত্রে ব্যবহার করিবে তাহার নির্দেশ পাওয়া যায় বৈধানিক কানুন হইতে। কিন্তু উহা তো রাষ্ট্র নিজেই করিয়াছে, অন্য কেহ রাষ্ট্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার উপর চাপাইয়া দেয় নাই। সুতরাং উহার দ্বারা রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা সীমিত হয় না। অবশ্য বৈধানিক কানুন বদলাইতে হইলে উহার সংশোধনী বিধি যে ভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহার অনুসরণ করা প্রয়োজন হয়। যেখানে সংবিধান লিখিত নহে সেখানে চিরাচরিত প্রথা অনুসৃত হয়। কিন্তু ঐ প্রথা সার্বভৌম ক্ষমতা কর্তৃক স্বীকৃত হয় বলিয়াই উহার এত জোর। অবশ্য এ কথাও বলা যায় যে, রাষ্ট্র ঐ প্রথা না মানিয়া পারে না। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় যে, কোন প্রথাই চিরস্থায়ী নহে।

সংবিধান সার্বভৌমিকতাকে সীমিত করে না

আন্তর্জাতিক আইন সার্বভৌমিকতার হানিকর কিনা দেখা যাউক। অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধকালে ও শান্তির সময়ে কোন্ রাষ্ট্র কিরূপ ব্যবহার করিবে তাহা আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা নিরূপিত হয়। ঐ আইন সাধারণতঃ মানিয়া চলা হয়। কিন্তু রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় আন্তর্জাতিক আইন মানিয়া চলিতে স্বীকৃত হইয়াছে। তাহাকে জোর করিয়া উহা মানাইবার মতন ক্ষমতা আইনতঃ অন্য কোন রাষ্ট্রের নাই। সম্মিলিত জাতিসংঘের হাতেও এমন কোন অস্ত্রশস্ত্র বা সৈন্যদল নাই, যাহার প্রয়োগ করিয়া কোন রাষ্ট্রকে কোন কার্যে বাধ্য করা যায়। সেইজন্য আইনের চোখে প্রত্যেক রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা কোন সীমার দ্বারা বদ্ধ নহে। রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে আন্তর্জাতিক আইন নাও মানিতে পারে। কিন্তু নিজেদের সুবিধার জন্যই রাষ্ট্র ঐ সব আইন সাধারণতঃ মানিয়া চলে। এমন দিন আসিতে পারে, যখন রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা সত্য সত্যই আন্তর্জাতিক সংঘ ও আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। কিন্তু এখনও সে দিন দূরে।

আন্তর্জাতিক আইনও সার্বভৌমিকতার পরিপন্থী নহে

কোন কোন পণ্ডিতের মতে সার্বভৌমিকতা ধর্ম, ভগবানের বিধান, নৈতিক বিধান প্রভৃতির দ্বারা সীমিত। ব্লুণ্টস্‌লি বলেন যে, রাষ্ট্রকে সর্বশক্তিমান বলা চলে না, কেন না একদিকে ইহার অধিকার অন্যান্য রাষ্ট্রের অধিকারের দ্বারা সীমাবদ্ধ, অন্যদিকে ইহার নিজের প্রকৃতি এবং প্রজাদের ব্যক্তিগত অধিকারের দ্বারা উহা খর্বীকৃত। অন্য রাষ্ট্রের অধিকার আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা নিরূপিত হয় এবং ঐ আইনকে রাষ্ট্র নিজের ইচ্ছায় মানিয়া লয় বলিয়া উহার দ্বারা সার্বভৌমিকতার কোন হানি হয় না তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ব্যক্তিগত অধিকার রাষ্ট্রের দ্বারা স্বীকৃত ও অনুমোদিত হইলে তবে উহা প্রজারা ভোগ করিতে পারে। রাষ্ট্র না থাকিলে কে ঐ অধিকার রক্ষা করিবে! সেইজন্য সার্বভৌমিকতা নাগরিকের অধিকারের দ্বারা ক্ষুণ্ণ হয় না। ধর্ম ও ভগবানের বিধান কি—সে সম্বন্ধে মতভেদের অবসর আছে। রাষ্ট্র নীতি ও ধর্ম মানিয়া চলে। গার্ণার বলেন যে, ভগবানের বিধান, মানবিকতার আদর্শ, যৌক্তিকতা, জনমতের মর্যাদা রক্ষা প্রভৃতি সার্বভৌমিকতার তথাকথিত বাধাগুলির আইনতঃ কোন মূল্য নাই; রাষ্ট্র নিজের ইচ্ছায় ঐ সব মানিয়া লইয়া উহাদিগকে সমর্থন করে। কোন রাষ্ট্রই গোঁয়ারতুমি করিয়া নীতি ও ধর্মকে অমান্য করে না। বহু লোক যে আদর্শে জীবন যাপন করে, তাহাকে রাষ্ট্র অস্বীকার করিবে কেন? কিন্তু এক্ষেত্রেও আইনবিদেরা বলিবেন যে, রাষ্ট্র যখন স্বেচ্ছায় ঐ আদর্শ মানিয়া লইয়াছে, তখন উহা তাহার সার্বভৌমিক শক্তির দ্বারাই বিধৃত হইতেছে।

নীতি ও ধর্ম

সার্বভৌমিকতা একটি আইনগত ধারণা। বাস্তব ক্ষেত্রে রাষ্ট্র জনমতের ও সম্মিলিত জাতি সংঘের আদর্শের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখাইলেও আইনতঃ তাহার সার্বভৌমিক শক্তি এক, অবিভাজ্য, সর্বব্যাপক, হস্তান্তরের অযোগ্য, বহুকালস্থায়ী এবং সীমাহীন।

আইনতঃ ধারণা

৩। **সার্বভৌমিকতার সিদ্ধান্তের ইতিহাস:** Sovereignty শব্দটি লাতিন শব্দ superamus (সকলের মধ্যে প্রধান) হইতে উদ্ভূত। কিন্তু গ্রীস ও রোমে এই মতবাদের উৎপত্তি হয় নাই। গ্রীসে রাষ্ট্র ও সমাজ একই ছিল। প্লেটো আইনকে সর্বোচ্চ বলিয়াছেন। কিন্তু সোফোক্লিসের Antigone নাটকে ক্রিয়ন বলিতেছে যে, রাষ্ট্র যাহাকে নিযুক্ত করিয়াছে

তাহাকে ছোট, বড়, ন্যায়-অন্যায় সব বিষয়ে মানিতে হইবে। সেইজন্য গ্রীকেরা সর্বপ্রধান ও চূড়ান্ত ক্ষমতার ধারণার সঙ্গে একেবারে অপরিচিত ছিলেন না। মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্রের মধ্যে সার্বভৌমিকতার বিকাশ হওয়া সম্ভব হয় নাই। সে সময়ে প্রভু ও সামন্তের সম্বন্ধ ছিল ব্যক্তিগত; সামন্তের সঙ্গে আবার তাঁহার প্রজাদের বন্ধন ব্যক্তিগত ছিল। সে যুগে চূড়ান্ত ক্ষমতার দাবিদার ছিল সাম্রাজ্য ও চার্চ। ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে হোলি রোমান এম্পায়ারের প্রাধান্য লইয়া সংগ্রাম চলিয়াছিল বহুকাল ধরিয়া। উভয় প্রতিষ্ঠানই খৃষ্টীয় ধর্মাবলম্বী দেশগুলির উপর প্রভুত্ব করিতে চাহিতেন। কিন্তু সেই প্রভুত্ব স্থাপন করিবার মতন শক্তি তাঁহাদের ছিল না। ঐ সময়ে আবার দার্শনিকেরা প্রকৃতির বিধানের কথা বলিতেন। মানুষের আইনের চেয়ে প্রকৃতির আইনকে বড় বলা হইত। সেইজন্য রাষ্ট্র আইন তৈয়ারির চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী এই মতের উৎপত্তি তখন হয় নাই। কিন্তু প্রভু ও সামন্তের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য হইতে, বিশেষ করিয়া এক ভূখণ্ডের মধ্যে উভয়ের অবস্থিতি হইতে কালক্রমে সার্বভৌমিকতার বিকাশ হয়।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে ইহার অভাব

১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে জাঁ বোদাঁ (Bodin) ফ্রান্সের তৃতীয় হেনরীর রাজত্বকালে সর্বপ্রথম সার্বভৌমিকতার সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন। ফ্রান্স তখন ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্টদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বে ছিন্নভিন্ন। এক শক্তিকে না মানিলে দেশের ঐক্য বজায় থাকে না। তাই বোদাঁ বলিলেন যে, সমস্ত প্রজা ও নাগরিকের উপর আইনের দ্বারা অপ্রতিহত যে শক্তি, তাহাকেই সার্বভৌম শক্তি বলে। রাজা নিজে আইন করেন, সেইজন্য তিনি তাঁহার নিজের সৃষ্ট বস্তুর দ্বারা আবদ্ধ হইতে পারেন না। তিনি অপর কাহারও সম্মতি ব্যতিরেকে আইন তৈয়ারি করিতে পারেন, স্থগিত রাখিতে পারেন ও বদল করিতে পারেন। তিনি বলেন যে, ফ্রান্সের রাজা বাহিরের পোপের ও আভ্যন্তরীণ সামন্তগণের কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণের অধীন নহেন। তিনিই সর্বপ্রথম সার্বভৌমিক শক্তিকে অসীম, অবিভাজ্য, চিরস্থায়ী বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু তাঁহার মতে সার্বভৌম শক্তি অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধির দ্বারা ও প্রজাদের সঙ্গে চুক্তির দ্বারা আবদ্ধ। তিনি ইচ্ছামত

বোদাঁর মতবাদ

প্রজাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন না। তিনি রাষ্ট্রের মৌলিক বিধানের দ্বারাও আবদ্ধ। এই তিন প্রকার বন্ধনের কথা বলিয়া তিনি আইনগত ধারণার সহিত নৈতিক ও রাজনৈতিক ধারণা মিলাইয়া ফেলিয়াছেন।

১৬২৫ খৃষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের আইনবিদ্ হুগো গ্রোটিয়াস্ (Grotius) রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির সিদ্ধান্ত আরও সুন্দর করিয়া ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, সেই শক্তিই সার্বভৌম, যাহার কোন কার্য অন্যের নিয়ন্ত্রণের অধীন নহে এবং অন্য কোন মানুষের ইচ্ছা যাহার কার্যকে নাকচ করিয়া দিতে পারে না। তিনি এক রাষ্ট্রের সহিত অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্বন্ধ বিষয়ে সার্বভৌমিকতার নীতির উপর জোর দিয়াছেন। রাষ্ট্রেরা সমান ও স্বাধীন এবং নিজ নিজ এলাকার মধ্যে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী এই সত্য তাঁহার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ্রোটিয়াসের মত

১৬৫১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত লেভিয়াথান গ্রন্থে হব্‌স্ সার্বভৌমিকতাবাদকে আরও বিকশিত করেন। তাঁহার মতে লোকে প্রাকৃতিক অবস্থার জীবন অসহ্য মনে করিয়া নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া তাহাদের সকল অধিকার এক বা কয়েক ব্যক্তির হাতে চিরতরে ছাড়িয়া দিল। হব্‌স কয়েক ব্যক্তির কথা বলিলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি রাজতন্ত্রেরই ভক্ত। চুক্তির পূর্বে ব্যক্তিদের হাতে সার্বভৌমিকতা ছিল না; কেন না সার্বভৌম শক্তি ও তাহার অধীন প্রজার উৎপত্তি একই কালে হইয়াছিল। রাজা প্রজাদের সঙ্গে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হন নাই, সেইজন্য প্রজারা কোন কারণেই রাজার কাছে কোন কৈফিয়ৎ চাহিতে পারে না। হব্‌সের সার্বভৌম বোদাঁর সার্বভৌমের চেয়েও বেশি ক্ষমতার অধিকারী। হব্‌সের মতে প্রজাদিগকে কি ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা নিরূপণ করিয়া দিবেন সার্বভৌম আইন করিবার, বিচার করিবার দণ্ড ও পুরস্কার দিবার, যুদ্ধ করিবার, রাজ্য রক্ষা করিবার সব ক্ষমতার একমাত্র আধার হইতেছেন তিনি। হব্‌স রাষ্ট্র ও সরকারকে অভিন্ন বলিয়া ধরিয়াছেন। প্রজাদের সরকার পরিবর্তনেরও কোন অধিকার নাই। রাজার অনুমতি ছাড়া তাহারা নিজেদের মধ্যে অন্য কোন চুক্তিও করিতে পারে না। প্রজা কোন্ বস্তু কতখানি ভোগ করিবে এবং কোন্ কাজ সে অন্য প্রজাদের দ্বারা

হবসের মতবাদ

বাধা না পাইয়া করিতে পারিবে, তাহাও রাজাই নির্দিষ্ট করিয়া দেন। রাষ্ট্রের দ্বারাই যে নাগরিকের অধিকার সৃষ্ট ও সুরক্ষিত হয় এই পরম সত্য হব্‌স কর্তৃকই আবিষ্কৃত হয়। তিনি নৈয়ায়িক তর্কের খাতিরে বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্রকে যদি নাগরিকগণকে সুরক্ষাকরা রূপ প্রাথমিক কার্য সম্পন্ন করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার হাতে সমাজের সকল ক্ষমতাই থাকা উচিত; কিন্তু উহার দ্বারা তিনি এমন কথা বুঝান নাই যে, বাস্তবক্ষেত্রে সত্য সত্যই রাজার হাতে অত সব ক্ষমতা থাকে। তবে হব্‌সের মতে সীমাবদ্ধ সার্বভৌমিকতা স্ববিরোধী এবং সোনার পাথরের বাটীর মতন অবাস্তব।

লক্‌ Sovereignty, শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তিনি উহাকে Supreme power বলিয়াছেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, লকের মতে রাষ্ট্র ও সরকার পৃথক্‌ বস্তু। তাঁহার মতে জনসমূহের হাতেই প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রধান ক্ষমতা থাকে। তাহারাই সকল প্রকার শাসন প্রণালীতে সকল ক্ষমতার আদিম উৎস। তাহারা যখন দেখে যে, সরকার তাহাদের ন্যস্ত বিশ্বাসের অপব্যবহার করিয়াছে তখন তাহারা সেই সরকারকে বদল করিতে পারে। জনসমূহের অধীনে আইন তৈয়ারি করিবার ভার যাহাদের উপর রহিয়াছে, জনসমূহ তাহাদের উপরই ভাল আইন করিবার ও লোককে রক্ষা করিবার ভার দিয়াছে। আইনকর্তাদের নীচে থাকে শাসনকর্তারা। আধুনিক ভাষায় প্রকাশ করিতে গেলে বলা চলে যে, সার্বভৌম শক্তির তিন ধাপ রহিয়াছে। নীচের ধাপে থাকেন নামে মাত্র সার্বভৌম,—যিনি রাজা নামে পরিচিত এবং যিনি আইনের সীমার মধ্যে প্রধান। তাঁহার উপরে থাকে বিধানমণ্ডলী বা রাজা ও পার্লামেণ্ট। ইহা আইনতঃ সর্বপ্রধান, কিন্তু ইহার ক্ষমতা মৌলিক নহে, ন্যাসী হিসাবে প্রাপ্ত, সুতরাং সেই অর্থে ইহাও অন্যের অধীন। যাহারা রাজা ও পার্লামেণ্টের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত করিয়াছে, তাহারা হইতেছে জনসমূহ। তাহারাই প্রকৃত ক্ষমতার আধার। সেইজন্য জনসমূহকে রাজনৈতিক হিসাবে সার্বভৌম (Political sovereign) বলা চলে। এই প্রকার বিচার কতদূর যুক্তিসহ তাহা জনগণের সার্বভৌমিকতা প্রসঙ্গে আলোচনা করিব।

লকের ব্যাখ্যা

রুশোও লকের ন্যায় জনসমূহের সার্বভৌমিকতা স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু লক্‌ যেখানে সার্বভৌম ক্ষমতাকে সীমিত ও তিনভাগে বিভক্ত

করিয়াছেন, রুশো সেখানে হবৃসের মতন উহাকে এক, অবিভাজ্য ও অসীম বলিয়াছেন। হবৃস রাজাকে সার্বভৌম বলিয়াছেন, রুশো কিন্তু সমষ্টিগত ইচ্ছাকেই সার্বভৌম বলিয়াছেন। ইহা যখন জনসমূহের ইচ্ছারূপে ঘোষিত হয়, তখন ইহা সার্বভৌমিকতার কার্য বলিয়া গণিত হয়; আর যখন উহা জনসমূহের একাংশের মাত্র ইচ্ছারূপে প্রকাশ পায়, তখন উহা শাসকদের কাজ বা তাঁহাদের আদেশ মাত্র। সার্বভৌমিকতাকে বিধানগত ও শাসন প্রণালীগত (legislative ও executive) বলিয়া যাঁহারা বিভক্ত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া রুশো বলেন, এ যেন একটা লোকের কয়েকটা দেহ কল্পনা করার মতন, কোন দেহে শুধু চোখ, কোন দেহে শুধু হাত, কোন দেহে শুধু পা রহিয়াছে মাত্র ভাবা। সমষ্টিগত ইচ্ছা কখনও ভ্রান্ত হইতে পারে না। রুশো হবৃসের চরম ও অসীম সার্বভৌমিকতার সহিত লকের জনগণের সম্মতিবাদ মিশাইয়া জনগণের সার্বভৌমিকতার সৃষ্টি করেন।

রুশোর মতবাদ

রুশোর পরে ইংলণ্ডের বেন্থামের হাতে সার্বভৌমিকতাবাদের পরিপুষ্টি লাভ করে। তিনি যাহা ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই সুপরিস্ফুট হইয়াছে জন অস্টিনের রচনায়। সার্বভৌমিকতার আইনগত ব্যাখ্যার পরিপূর্ণতা দিয়াছেন অস্টিন।

বেন্থামের মত

৪। **অস্টিনের মতবাদঃ** জন্ অস্টিন ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ব্যবহারশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থে (Jurisprudence) সার্বভৌমিকতার নিম্নলিখিত সংজ্ঞা প্রদান করেন—"যদি কোন সুনির্দিষ্ট মানবীয় কর্তৃপক্ষ (যাহা এক বা ব্যক্তিগোষ্ঠী হইতে পারে) অন্য কোন অনুরূপ কর্তৃপক্ষের বশ্যতা স্বীকারে অভ্যস্ত না হয়, অথচ সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির আনুগত্য সাধারণতঃ লাভ করে, তাহা হইলে সেই সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঐ সমাজের সার্বভৌম শক্তি হইবেন এবং উক্ত কর্তৃপক্ষসহ ঐ সমাজকে রাজনৈতিকভাবে গঠিত ও স্বাধীন সমাজ বলা হইবে" ("If a determinate human superior not in the habit of obedience to a like superior receives habitual obedience from the bulk of a given society, that determinate superior is sovereign in that

সংজ্ঞা

society, and the society (including the superior) is a society political and independent"). এই সংজ্ঞায় আইনগত সার্বভৌমিকতার সকল লক্ষণই সংক্ষেপে অথচ সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে; অস্টিন সমগ্র সমাজে সার্বভৌম শক্তি আরোপ করেন নাই; উহা কেবল রাষ্ট্রের লক্ষণ, আর রাষ্ট্র হইতেছে রাজনৈতিকভাবে গঠিত সমাজ অর্থাৎ সমাজের একাংশ মাত্র। সার্বভৌম শক্তি সুনির্দিষ্ট ও মানবীয় হওয়া প্রয়োজন। ভগবান সর্বশক্তিমান হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে সার্বভৌম বলা চলিবে না, কেন না তিনি চরাচরে ব্যাপ্ত, তাঁহাকে সুনির্দিষ্ট করা মানুষের সাধ্যাতীত। সমষ্টিগত ইচ্ছা বা জনসাধারণের মধ্যে সার্বভৌমিকতা আছে বলিলেও উহাকে সুনির্দিষ্ট করা হইবে না—কেন না উভয়ই বহুব্যাপক ও অনির্দিষ্ট। সেই কর্তৃপক্ষ হয়তো অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে একটা সন্ধি করিয়া উহার শর্ত পালন করে অথবা আন্তর্জাতিক বিধানের কোন একটা নিয়ম মানিয়া চলে; ঐ সব কাজের দ্বারা তাহার বশ্যতাকে অভ্যস্ত বলা চলে না; ঐরূপ কাজ কখনও কখনও করা হয়। আবার আভ্যন্তরীণ অবস্থার দিক হইতে বলা হইয়াছে যে, দেশের অধিকাংশ লোক যেন সেই কর্তৃপক্ষের অনুগত হয়, তাঁহার আদেশ মানিয়া চলে। সকল লোকই আদেশ যদি মানিত তবে আর দেশে চোর, ডাকাত থাকিত না। দু-দশ জন দুষ্ট লোক সব সমাজেই থাকে, তাহারা আইন ভঙ্গ করে এবং কর্তৃপক্ষ তাহাদিগকে শাস্তি দেন। কতিপয় দুষ্ট লোক আইন ভাঙ্গে বলিয়া সেই রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা কোন ক্রমে ক্ষুণ্ণ হয় না। সার্বভৌম শক্তি অসীম। উহা অন্য কাহারও আদেশমত কাজ করিতে বাধ্য নহে।

ব্যতিক্রমে নিয়ম সিদ্ধ হয়

অস্টিনের দ্বারা ব্যাখ্যাত সার্বভৌম শক্তি নির্ধারিতরূপে সংগঠিত এবং তাঁহারই বা তাঁহাদেরই নির্দেশকে আইন বলিয়া স্বীকার করা হয়। আইন তৈয়ারি করিবার ঐ কর্তৃপক্ষের অধিকার আছে। অস্টিন নিজে ছিলেন আইনের অধ্যাপক এবং তিনি বক্তৃতাও দিতেছিলেন আইনের ছাত্রদের মধ্যে। সুতরাং তিনি সার্বভৌমিকতার প্রশ্নটি কেবলমাত্র আইনের চোখে দেখিয়াছিলেন। চিরাচরিত প্রথার জঙ্গল সাফ করিয়া আইনের ও সমাজের সংস্কার সাধন করিতে

আইন

চাহিয়াছিলেন বলিয়া তিনি সার্বভৌম শক্তির আদেশকেই আইনের একমাত্র উৎস বলিয়া ঘোষণা করেন।

অস্টিনের সমালোচকেরা বলেন যে, সার্বভৌমের আদেশকে আইনের একমাত্র উৎস বলা ঠিক নহে। চিরাচরিত প্রথাও (custom) আইনের মর্যাদা পায়। মেইন (Maine) দেখাইয়াছেন যে, পাঞ্জাবের রণজিৎ সিংহের ন্যায় স্বৈরাচারী রাজাও প্রজাদের মধ্যে যুগযুগান্ত ধরিয়া প্রচলিত প্রথাকে মানিয়া চলিতেন। অবশ্য এরূপ আপত্তি হইতে পারে ভাবিয়া অস্টিন আগেই বলিয়াছেন যে, সার্বভৌম শক্তি যাহা অনুমোদন করেন, যাহা চলিতে দেন তাহাও তাঁহার আদেশ বলিয়া গণ্য করা যায়। কিন্তু রণজিৎ সিংহ যে প্রথা অনুসারে প্রজাদের বিচার কার্য চালাইতেন, তাহা তাঁহার অনুমোদনের অপেক্ষা রাখে কি? কোন রাজা বা ডিক্‌টেটর দেশের প্রথাকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিতে পারেন কি? যাহা অগ্রাহ্য করা সঙ্গত নহে বলিয়া তিনি বিবেচনা করেন, তাহাকে যদি তাঁহার অনুমোদিত বলিয়া বিবেচনা করা হয় তাহা হইলে অস্টিনের মত কতকটা সঙ্গত হয়।

সমালোচনা

অস্টিন শুধু আইনজ্ঞের চোখ দিয়া প্রশ্নটির বিচার করিয়াছেন। আইনের একটি ধারণারূপে অস্টিনের সার্বভৌমবাদকে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা যায়। কিন্তু তিনি বাস্তবক্ষেত্রে যাহা ঘটে, তাহার প্রতি সুবিচার করেন নাই। ক্ষমতার আদিম উৎস যে জনমত তাহাকে অস্টিন অনির্দিষ্ট বলিয়া আমল দেন নাই। তাঁহার সিদ্ধান্ত কেবল সুগঠিত ও সুবিকশিত রাষ্ট্র সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, অর্ধগঠিত ও প্রথার উপর নির্ভরশীল—রাজনৈতিক সমাজের প্রতি নহে।

অবাস্তবতা

৫। সার্বভৌমিকতার বিবিধ রূপ : ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে Sovereign বা সার্বভৌম শব্দের দ্বারা রাজাকে বুঝাইত। এখনও ঐ অর্থে উহা ব্যবহার করিয়া রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথকে ইংলণ্ডের sovereign বলা হয়। তাঁহার নামে শাসন কার্য চালানো হয়, কিন্তু তাঁহাকে চরম ক্ষমতার আধার বলা যায় না। পার্লামেণ্টের হাতেই সার্বভৌম ক্ষমতা রহিয়াছে। তাই রানীকে নামে

নামে মাত্র সার্বভৌম

মাত্র সার্বভৌম (titular sovereign) এবং পার্লামেণ্টকে কার্যক্ষেত্রে সার্বভৌম বলা যাইতে পারে।

কখনও কখনও যুদ্ধ, বিপ্লব বা শাসন ব্যবস্থার ফলে আইনতঃ যিনি সার্বভৌম কার্যতঃ তাঁহার হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা না থাকিতে পারে। এই সময়ে *de facto* বাস্তব এবং *de jure* আইনসঙ্গত সার্বভৌমের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী আইন অনুসারে কিংবা আইনের বিরুদ্ধে নিজের অথবা নিজেদের ইচ্ছা সকলকে মানাইতে পারে, তাহাকে বাস্তব সার্বভৌম বলে। কার্যক্ষেত্রে সকলে তাঁহারই বশ্যতা স্বীকার করে। ক্রমওয়েল যখন পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিলেন তখন সকলে তাঁহাকেই সার্বভৌম বলিয়া মানিয়া লইল, যদিও দ্বিতীয় চার্লস্ তখনও আইনতঃ sovereign বা সার্বভৌম। নেপালে রাজশক্তির পুনরভ্যুত্থানের পূর্বে রাজা আইনত প্রধান বলিয়া স্বীকৃত হইলেও তাঁহার হাতে কোন ক্ষমতা ছিল না। তাঁহার প্রধানমন্ত্রীই বস্তুতঃ সার্বভৌম ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পোল্যাণ্ডের শাসনকর্তারা ইংলণ্ডে পলায়ন করিয়া নিজদিগকে পোল্যাণ্ডের ন্যায়তঃ সার্বভৌম বলিলেন। কিন্তু কার্যতঃ তথাকার জার্মান শাসকেরাই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী রহিলেন।

বাস্তব ও আইনসঙ্গত সার্বভৌম

অনেক সময়ে দেখা যায় যে, আইন অনুসারে গঠিত শাসনতন্ত্রকে হটাইয়া দিয়া কোন সামরিক নেতা সমস্ত ক্ষমতা অধিকার করিয়া লন। তাঁহাকে প্রথম প্রথম *Do facto* বা কার্যতঃ সার্বভৌম বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনিই যখন ক্ষমতার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হন, তখন লোকে আর তথাকথিত আইনসঙ্গত সার্বভৌমের কথা মনে রাখে না। ভারতের নিকটতম দুইটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রে এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। সেইজন্য *Defacto* ও De jure পার্থক্যের উপর বিশেষ জোর দেওয়া ঠিক নহে।

এই পার্থক্য মৌলিক নহে

অনেক সময়ে আইনগত সার্বভৌমের সহিত রাজনৈতিক সার্বভৌমের পার্থক্য দেখানো হয়। এ দুইটি কিন্তু পৃথক বস্তু নহে। আইনগত সার্বভৌম বলিতে সেই সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বুঝায়, যাহার দ্বারা রাষ্ট্রের উচ্চতম আদেশ আইনের আকারে প্রকাশিত হয়। আইন অনুসারে সেই কর্তৃপক্ষ

ঐশ্বরিক আইন, নীতিশাস্ত্রের বিধান এবং জনমতের নির্দেশ অগ্রাহ্য করিতে পারে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এরূপ কেহ করে না বলিয়া উড্রো উইলসন্ বলিয়াছেন, আইনের সিদ্ধান্তে সার্বভৌমিকতার যে আদর্শের ধারণা দেওয়া হইয়াছে তাহা বস্তুতঃ কোথাও দেখা যায় না ("Sovereignty as ideally conceived in legal theory, nowhere actually exists"). ইংলণ্ডে রানীসহ পার্লামেণ্ট ইচ্ছা করিলে এমন আইন পাশ করিতে পারে, যাহার ফলে নাগরিকেরা একে অন্যকে বধ করিতে বাধ্য হইতে পারে; অথবা প্রত্যেক নাবালক প্রাপ্তবয়স্কের অধিকার পাইতে পারে, কিংবা বিবাহ প্রথা রদ করিয়া দিতে পারে। তাই একজন বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন যে, পার্লামেণ্ট শুধু পুরুষকে নারী ও নারীকে পুরুষ করিতে পারে না; ইহা ছাড়া আর সব কিছু করিতে পারে। কিন্তু পার্লামেণ্ট যদি নীতি, ধর্ম ও জনমতের বিরুদ্ধে ক্রমাগত আইন করিয়া যায় তবে লোকে হয় পার্লামেণ্টের ক্ষমতা মানিতে অস্বীকার করিবে অথবা পার্লামেণ্টের সদস্যদিগকে পাগলা গারদে বন্ধ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিবে। পার্লামেণ্টের কথা দূরে থাকুক, অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী কোন রাজা বা একনায়কও দীর্ঘকাল ধরিয়া নীতি, ধর্ম ও জনমতকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। বাস্তব দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে রাজার উপরে মহারাজা হইতেছেন গণদেবতা। সেইজন্য ডাইসির ন্যায় আইনানুগ মনীষীও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, উকীলেরা যে সার্বভৌমকে স্বীকার করেন, তাঁহার পিছনে এমন এক সার্বভৌম আছেন, যাঁহার চরণতলে আইনসঙ্গত সার্বভৌম প্রণাম করিতে বাধ্য।

অবাধ ক্ষমতা কোথাও নাই

জনগণের সার্বভৌমিকতা

এই বাস্তব সার্বভৌমকে কিন্তু সুস্পষ্ট সংজ্ঞার দ্বারা বুঝানো কঠিন। রাষ্ট্রে ইহার প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় গণতান্ত্রিক ভোটদানের মধ্যে, বিভিন্ন সংবাদপত্রের অভিমতে, নানা জনের বক্তৃতায়, লেখায়, বুদ্ধিমান জনের কথাবার্তায় এবং আরও অনেক মাধ্যমে। কিন্তু আইনানুগগণ যে বলেন, সার্বভৌম সুনির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন, সে গুণ ইহার মোটেই নাই। বাস্তব সার্বভৌম সুসংবদ্ধ নহে। কিন্তু কাজের বেলায় ইহার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

ইহা অনির্দিষ্ট

অস্টিন্ চুলচেরা আইনের বিচার করিয়া সব জিনিস যাচাই করিয়া লইয়াছেন বটে, কিন্তু যখন তিনি নির্বাচকমণ্ডলীকে আইনগত সার্বভৌম বলিয়াছেন, তখন তাঁহার কথা মানিয়া লওয়া কঠিন হয়। নির্বাচকমণ্ডলী মোটেই সুসংবদ্ধ নহে, সকলের এক মতও নহে; ইঁহারা পাঁচ বৎসর পরে একবার মাত্র একটি বা দুইটি ব্যালটপত্র ব্যবহার করিতে পারেন, তাও আবার সকলে ব্যবহার করেন না। নির্বাচকমণ্ডলী আইনসভার সদস্য নির্বাচন করেন, কিন্তু ইঁহারা আইন তৈয়ারি করেন না। আজ যখন প্রায় সকল দেশেই প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী ভোটের অধিকার পাইয়াছেন, তখন নির্বাচকমণ্ডলীর সহিত রাজনৈতিক সার্বভৌমকে এক বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

নির্বাচকমণ্ডলী

আইনতঃ যে গোষ্ঠীর হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা আছে, তাঁহাদিগকে সব সময়েই জনমতের অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়। কিন্তু জনমত এমন একটি নির্দিষ্টতাবিহীন পদার্থ যে ইহার উপর সার্বভৌমিকতার মতন একটি সূক্ষ্ম ভাবকে আরোপ করা যুক্তিযুক্ত নহে।

জনমত

৬। **জনগণের সার্বভৌমিকতা ঃ** বাস্তব সার্বভৌমিকতা আর জনগণের সার্বভৌমিকতা অনেকটা একই বস্তু। তবে বাস্তব সার্বভৌমিকতা শব্দটি আধুনিক আর জনগণের সার্বভৌমিকতা রোমান আইনের মধ্যেও পাওয়া যায়। মধ্যযুগের অবসান কালে যখন স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের কুশাসনে লোকে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল তখন ওকহামের উইলিয়ম ও তাঁহার সমসাময়িক (চতুর্দশ শতাব্দীর) পাদুয়ার মারসিগ্লিও এবং ষোড়শ শতাব্দীর আলথুসিয়াস্ বলেন যে, জনগণই প্রকৃত পক্ষে সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রুশো এই মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণায় এবং ফরাসী বিপ্লবের সময় রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করার সময় জনগণের সার্বভৌমিকতার উপর খুব জোর দেওয়া হইয়াছিল।

রুশোর জনগণ

আধুনিক সময়ে অধ্যাপক রিচি (Ritchie) এই মতের এক নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, জনগণ প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনী ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া এবং অপ্রত্যক্ষরূপে প্রভাব বিস্তার করিয়া, ভয় দেখাইয়া অথবা বিপ্লবের সম্ভাব্যতার দ্বারা

রিচির নূতন ব্যাখ্যা

সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহার করে। শক্তির পরীক্ষা করিতে গেলে গায়ের জোর তাহাদের দিকেই বেশি পাওয়া যাইবে। তাহাদের যদি বেশি উত্যক্ত করা হয়, তাহা হইলে তাহারা বর্তমান সরকারের উচ্ছেদ করিতে পারে। তাঁহার মতে সার্বভৌমিকতা শেষ পর্যন্ত গায়ের জোরের উপর নির্ভর করে; জোরের দ্বারাই লোককে বশ্যতা স্বীকার করানো হয়; সেইজন্য সংঘাত বাধিলে যে শক্তির আদেশ করিবার মত শক্তি থাকিবে সেই শক্তিই সার্বভৌম।

অযৌক্তিক

এই মত কিন্তু যুক্তিযুক্ত নহে। জনগণ সুসংবদ্ধ নহে। রাষ্ট্রের সংজ্ঞাই হইতেছে যে, সরকারের দ্বারা সংগঠিত জনসমূহ, যাহা আইন তৈয়ারি করে ও মানিতে বাধ্য করে। সেইজন্য অসংবদ্ধ জনগণকে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী বলা যায় না। সুসংবদ্ধ কয়েক হাজার লোক লক্ষ লক্ষ লোকের জনতাকে দাবাইয়া রাখিতে পারে। তাই জনগণের শারীরিক ক্ষমতা বেশি এ কথাও ঠিক নহে।

চূড়ান্ত ক্ষমতা ঠিক কোথায় থাকে?

৭। **সার্বভৌমিকতার অবস্থান কোথায়?** দেহের মধ্যেই যেমন প্রাণ থাকে, রাষ্ট্রের মধ্যেই তেমনি সার্বভৌমিকতা থাকে। প্রাণ চলিয়া গেলে দেহ যেমন শব মাত্র, সার্বভৌমিকতা চলিয়া গেলে তেমনি রাষ্ট্র পরাধীন দেশ বা উচ্ছৃঙ্খল জনসমষ্টিতে পরিণত হয়। কিন্তু দেহের ঠিক কোনখানে প্রাণ থাকে, তাহা যেমন বলা যায় না, রাষ্ট্রের—বিশেষতঃ যুক্তরাষ্ট্রের তেমনি কোথায় সার্বভৌমিকতা থাকে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। অস্টিন একবার পার্লামেণ্টকে অন্য আর একবার ভোটারদিগকে সার্বভৌমিকতার আধার বলিয়াছেন। ভোটারদিগকে যে সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ বলা চলে না তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। যে সব গণতন্ত্রে পার্লামেণ্টারি শাসনপ্রথা চলিত আছে সেখানে না হয় পার্লামেণ্টে সার্বভৌমিকতার অবস্থান বলিলাম। কিন্তু যেখানে প্রেসিডেণ্টের দ্বারা শাসন চলে সেখানে সার্বভৌমিকতা কোথায় থাকিবে? যদি প্রেসিডেণ্টের ইচ্ছাই বলবৎ হয়, পার্লামেণ্ট যদি নামে মাত্র থাকে, তাহা হইলে প্রেসিডেণ্টকেই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী বলা যায়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কিন্তু প্রেসিডেণ্ট কংগ্রেসের বিনা অনুমতিতে অনেক কিছুই করিতে পারেন না। আবার কংগ্রেসের হাতেও আইন তৈয়ারি করিবার চূড়ান্ত

ক্ষমতা নাই। ইংলণ্ডে পার্লামেণ্ট যে কোন আইন করুক না কেন, বিচারালয় তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য। কিন্তু আমেরিকায় সেরূপ নহে।

কতকগুলি বিষয়ে আইন করিবার অধিকার আছে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির হাতে, আর কতকগুলি সংঘীয় কংগ্রেসের হাতে। একে অন্যের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। সেইজন্য রাষ্ট্রের বা সংঘের আইনসভাকে সার্বভৌম বলা চলে না। আবার কংগ্রেস সংবিধান অনুসারে আইন করিতে বাধ্য। সংবিধানের দ্বারা অনুমোদিত নহে এমন কোন বিষয়ে কংগ্রেস আইন করিলে আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট সে আইন নাকচ করিয়া দিতে পারে। সেইজন্য কি সুপ্রিম কোর্টকেই সার্বভৌম বলিব? তাহাও নহে, কেন না সুপ্রিম কোর্টকে সংবিধান অনুসারে কংগ্রেস প্রণীত কতকগুলি নিয়ম মানিয়া কাজ করিতে হয়। সুতরাং সুপ্রিম কোর্টকে সার্বভৌম বলা চলে না।

যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতা

কেহ কেহ আমেরিকার সংবিধানকেই সার্বভৌম বলিবার পক্ষপাতী। কিন্তু সংবিধান তো মানুষ নয়, একটি দলিল মাত্র, তাছাড়া সংবিধান অপরিবর্তনীয় নহে। যাহা বদল হয় তাহাকে সুনির্দিষ্ট বলা চলে না। তাহা হইলে সংবিধানকে বদল করিবার ক্ষমতা যাহার হাতে তাহাকে সার্বভৌম বলা যায় কি? না, তাহাও নহে, কেন না সংবিধানের পরিবর্তনের প্রস্তাব করে কংগ্রেস এবং তাহা অনুমোদন করে রাষ্ট্রগুলির আইনসভা। সেইজন্য যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র লোকের কিংবা বিভিন্ন রাষ্ট্রের লোকেরা অন্যের অপেক্ষা না রাখিয়া সংবিধান সংশোধন করিতে পারেন না। আবার সংবিধানের এমন ধারাও আছে, যাহা কেহই সংশোধন করিতে পারে না—যথা প্রত্যেক রাষ্ট্র হইতে যে দুইজন করিয়া প্রতিনিধি সেনেটে পাঠাইবার বিধান আছে, তাহা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের নিজের ইচ্ছা ছাড়া কেহ রদবদল করিতে পারে না। সংবিধান সংশোধন করিবার ক্ষমতা কখন কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়। যাঁহারা বলেন, সংবিধান করিবার শক্তির হাতে সার্বভৌমিকতা আছে তাঁহারা কি বলিবেন যে দশ বিশ বছরে একবার মাত্র সার্বভৌম য়াশীল হন?

সংবিধান কি সার্বভৌম?

উড্রো উইলসন এই সব সমস্যার সমাধানকল্পে বলিয়াছেন যে,

উড্রো উইলসনের মত

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সার্বভৌমিকতা আছে আইন তৈয়ারি করিবার সকল প্রকার ক্ষমতা যে সব কর্তৃপক্ষের হাতে রহিয়াছে তাঁহাদের। ইহার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, (১) রাষ্ট্র ও সংঘের আইনসভা, (২) বিচারালয়সমূহ যখন আইনের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া আইন তৈয়ারি করে, (৩) শাসনকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ যখন ঘোষণার দ্বারা আইন করেন, (৪) সংবিধান সংশোধন করিবার জন্য আহূত মহাসভা, (৫) এবং পরিপৃচ্ছা (Referendum) ও গণ-উদ্যোগ (Initiative) কার্যে নিরত নির্বাচকগণের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা আছে। কিন্তু এতগুলি সংস্থা ও ব্যক্তির ইচ্ছা এক হওয়া কঠিন এবং ইহাদিগকে সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া মানিয়া লওয়াও সহজ নহে। তাহার উপর এতগুলিকে মানিলে সার্বভৌম শক্তিকে বিভাগ করা হয়, কিন্তু আইনানুগদের মতে উহা অবিভাজ্য।

আমেরিকার শাসনযন্ত্রের কোন অংশে সার্বভৌম শক্তি সম্পূর্ণমাত্রায় নাই। সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের লক্ষণ, শাসনযন্ত্রের বা সরকারের নহে। রাষ্ট্রের

উইলোবির সিদ্ধান্ত

মধ্যে ক্ষমতা পরিচালনার মূল আকর হইতেছে রাষ্ট্রেরই চরম ইচ্ছা। তাই আমেরিকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানী উইলোবি বলিয়াছেন—"শাসনের কর্তৃত্ব যেখানেই ব্যবহৃত হউক না—উহা আইন-ঘটিত, শাসন-সম্পর্কীয় বা বিচার-সংশ্লিষ্ট যাহাই হউক, উহাতে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা প্রকাশ পায়" ("Whatever the govermental authority that is exercised, whether legislative, executive or judicial in character, sovereignty is manifested.")।

৮। **আদর্শবাদীদের মতে সার্বভৌমিকতা**ঃ আইনানুগগণ রাষ্ট্রকে ব্যক্তিরূপে কল্পনা করিয়া তাহার ইচ্ছাকে অনুসরণ করিতে সকলকে বাধ্য করিয়াছেন। আদর্শবাদী হেগেল রাষ্ট্রের আইনগত কাল্পনিক

হেগেলের মতবাদ

ব্যক্তিত্বের কথা না বলিয়া উহাকে আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বে ভূষিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে রাষ্ট্র হইতেছে সুপরিণত প্রজ্ঞা। তিনি রাষ্ট্র ও সমাজকে অভিন্ন সিদ্ধান্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, জীবনের যাহা কিছু কাম্য, তাহা রাষ্ট্রের মধ্যে ও রাষ্ট্রের মাধ্যমেই ব্যক্তির পক্ষে লাভ করা সম্ভব। রাষ্ট্র শুধু আইনতঃ নহে, নীতিশাস্ত্র

অনুসারেও অসীম ক্ষমতার অধিকারী। হেগেলের মত অনুসরণ করিয়া বোসাঙ্কে বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্রই সর্বোচ্চ সমাজ, কেবলমাত্র রাষ্ট্রের মধ্যেই সুসম্বন্ধ নৈতিক জীবন সম্ভব ; রাষ্ট্র হইতেই নীতির ও সভ্য জীবনের উদ্ভব। আইন সার্বজনীন উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে, সুতরাং উহা মানিয়া চলাই ব্যক্তির একমাত্র স্বাধীনতা। কেন না ব্যক্তি যখন তাহার খেয়ালখুসি ছাড়িয়া সার্বজনীন ইচ্ছাকে নিজের প্রকৃত ইচ্ছা বলিয়া মানিয়া লয়, তখনই সে সত্যিকারের স্বাধীন। সাদা কথায় এই দাঁড়ায় যে, বাস্তবক্ষেত্রে ব্যক্তির যে ইচ্ছা প্রকাশ পায়, তাহা তাহার প্রকৃত ইচ্ছার বিরুদ্ধে ; তাহার প্রকৃত ইচ্ছা হইতেছে সমাজের সার্বজনীন ইচ্ছা ; সেই সার্বজনীন ইচ্ছা রাষ্ট্রের ইচ্ছা ছাড়া আর কিছুই নহে। কিন্তু আদর্শবাদীদের বিরুদ্ধে বলা যায় যে রাষ্ট্রে লক্ষ লক্ষ নাগরিক থাকিলেও কয়েকজন মাত্র ব্যক্তিই নীতি নির্ধারণ করেন। সুতরাং রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে সকলের ইচ্ছা বলিয়া মানিয়া লওয়া আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তর মাত্র। রাষ্ট্রকে ব্যক্তি বলা যেমন কল্পনামাত্র, সার্বজনীন ইচ্ছাও তেমনি কাল্পনিক। আদর্শবাদীরা আইনবাদীদের অপেক্ষা আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়া দাবি করিয়াছেন যে, রাষ্ট্র তাহার সার্বভৌমিকতার বলে ব্যক্তির নৈতিক জীবনও নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। কিন্তু নীতি ও বিবেক সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা প্রভূত পরিমাণে প্রভাবান্বিত হইলেও, উহা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের ব্যাপার, রাষ্ট্রীয় ব্যাপার নহে।

প্রকৃত ইচ্ছার সমস্যা

৯। **মার্কসীয় মতে সার্বভৌমিকতা :** হেগেল রাষ্ট্রকে ভাবরূপে বা আদর্শরূপে দেখিয়াছেন, আর মার্কস বাস্তব রাষ্ট্রের কথা বলিয়াছেন। মার্কসের মতে সমাজের যে শ্রেণীর হাতে উৎপাদনের যন্ত্রসমূহ থাকে, সেই শ্রেণীই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। যাহাদের হাতে যন্ত্র নাই, তাহারা যন্ত্রের মালিকদের নিকট তাহাদের শ্রমশক্তি বেচিতে বাধ্য হয়। মালিকেরা তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়া কেবলমাত্র তাহাদের জীবনধারণ ও সন্তান পালনের উপযুক্ত সামগ্রী দেয়, কিন্তু তাহাদের উৎপন্ন ধনের অধিকাংশ নিজেদের আয়ত্তে রাখে। ধনের যতগুলি উৎস আছে সব পুঁজিপতিদের হাতে থাকে। তাহারাই রাষ্ট্রের সার্বভৌম। মার্কস এতদূর পর্যন্ত বলিয়াছেন যে, নাতি,

শাসক শ্রেণীর সার্বভৌমিকতা

ধর্ম, আইন, শিল্পকলা প্রভৃতি সব কিছুই পুঁজিপতিরা এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যে, জনসাধারণ বর্তমান ব্যবস্থাকেই একমাত্র ন্যায্য ও সম্ভাব্য ব্যবস্থা বলিয়া মানিয়া লয়। এটি যে অতিশয়োক্তি, তাহা আধুনিক ইংলণ্ডে শ্রমিকদের ক্ষমতা হইতেই বুঝা যায়।

১০। **সার্বভৌমিকতার বহুত্ববাদ:** অন্যান্য মতবাদের মতন সার্বভৌমিকতার একত্ববাদও ঐতিহাসিক কারণে সৃষ্ট হইয়াছিল। চার্চ এবং সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব যখন জাতীয় সংহতির বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছিল, তখন বোদাঁ (Bodin) সার্বভৌমিকতার ব্যাখ্যা করিয়া রাজার অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজশাসনের ফলে ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে জাতীয় রাষ্ট্র (Nation State) সংগঠিত হয়। বহুধা-বিভক্ত জার্মানিতে এক রাষ্ট্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তাই সম্ভবতঃ হেগেলকে সার্বভৌমিকতার ভাববাদী ব্যাখ্যা প্রদানে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। অস্টিন পার্লামেণ্টকে সার্বভৌমরূপে স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন এই ভাবিয়া যে, প্রথা ও সংস্কারের জাল ছিন্ন করিয়া সর্বশক্তিমান পার্লামেণ্টের পক্ষে আইন করিয়া সামাজিক সংস্কার সাধন করা সহজ হইবে। রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্র এখন আর পুলিশের মতন টহলদারির মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন ও বিচিত্র ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ দেখা যাইতেছে। এমন সময়ে যদি লোকে বিশ্বাস করে যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা এক, অবিভাজ্য ও অপ্রতিহত তাহা হইলে ব্যক্তি ও সংঘের স্বাধীনতা বজায় রাখা কঠিন হইবে। সামাজিক জীবনের সুষ্ঠু বিকাশ ঘটিবে না। রাষ্ট্রের ইচ্ছা তো ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সরকারেরই ইচ্ছা। সরকার আবার কাম ক্রোধপরায়ণ সাধারণ মানুষের দ্বারাই গঠিত। তাহাদের ক্ষমতাকে যদি অবাধ ও সীমাহীন বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে। ক্ষমতা মানুষকে স্বাধিকার-প্রমত্ত করিয়া তুলে। বিধানমণ্ডলী, শাসকমণ্ডলী ও বিচারক-মণ্ডলীর সদস্যরূপে যাঁহারা সরকারী ক্ষমতা পরিচালনা করেন তাঁহারাও মানুষ একথা ভুলিলে চলিবে না।

ব্যক্তি ও সংঘের স্থান

তাই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সার্বভৌমিকতার একত্ববাদের বিরুদ্ধে

স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। তাহারই ফলে বহুত্ববাদের জন্ম হইল। বহুত্ববাদিগণকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। একদল পণ্ডিত বলেন যে, রাষ্ট্র ও সমাজ এক নহে। সমাজের মধ্যে বহুবিধ সংঘ আছে। রাষ্ট্র তাহাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হইলেও অন্যতম সংঘমাত্র। অন্যান্য সংঘের স্বাধীনতা লোপ করিয়া একমাত্র রাষ্ট্রকেই সার্বভৌম বলা অবাস্তব ও অসঙ্গত। আর একদল আইনের দিক্ দিয়া রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতাকে আক্রমণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে আইন রাষ্ট্রের আদেশ মাত্র নহে। রাষ্ট্র আইনের উর্ধ্বেও নহে। তৃতীয় এক দৃষ্টিকোণ হইতেও সার্বভৌমিকতাকে অবাঞ্ছনীয় বলা হইয়াছে। প্রত্যেক রাষ্ট্র যদি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও অনন্যনির্ভর হয়, আন্তর্জাতিক বিধানকে উপেক্ষা করার শক্তিকে যদি আদর্শরূপে সামনে ধরা হয়, তাহা হইলে বিশ্বজনীন সম্প্রদায়ের উদ্ভব কোনকালে হইতে পারিবে না। মানুষ চিরকাল ছোট ছোট গণ্ডিতে বিভক্ত থাকিয়া পরস্পরের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরিবে। বহুত্ববাদীদের মতে, সার্বভৌমিকতার মতবাদটি এখন বর্জন করাই কর্তব্য। ইহার যে ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল তাহা ফুরাইয়া গিয়াছে। সমসাময়িক চিন্তাধারায় আর দায়িত্বশূন্য এক অসীম শক্তিকে আইনের বন্ধনের বাহিরে অবস্থিত বলিয়া কুহেলিকাচ্ছন্ন করিবার সার্থকতা নাই। রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতাকে একটি সম্মানীয় কুসংস্কার (a superstition) বলিয়া বিদ্রূপ করা হইয়াছে। বার্কার বলেন যে, সার্বভৌম রাষ্ট্রের মতবাদ যতটা শুষ্ক ও অনর্থক এমন আর রাজনৈতিক অন্য কোন ধারণা নহে ("No political commonplace has become more arid and unfruitful than the doctrine of sovereign state.")। লাস্কী আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন যে, সার্বভৌমিকতার সমগ্র ধারণাটিকেই যদি পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্থায়ী উপকার হইবে। ("It will be of lasting benefit to Political Science, if the whole concept of Sovereignty was surrendered.")

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে সার্বভৌমিকতার বিরোধ

বার্কারের মতে নিরর্থক এক ধারণা

১১। **বহুত্ববাদের বিকাশ-ধারা:** বিগত শতাব্দীর শেষভাগে জার্মান আইনবিদ্ গিয়ার্কে সংঘের ব্যক্তিত্ব প্রমাণ করিয়া একখানি গ্রন্থ

লেখেন। ইংরাজ ঐতিহাসিক মেটল্যাণ্ড উহা অনুবাদ করেন। এই দুইজনকে বহুত্ববাদের প্রথম ব্যাখ্যাতা বলা হয়। ইঁহাদের মতে সমাজের মধ্যে বহু সংঘ আছে ও ক্রমাগত গঠিত হইতেছে। বিভিন্ন উদ্দেশ্য লইয়া বিভিন্ন সংঘ গড়িয়া উঠিয়াছে। সামাজিক সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই সব সংঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যে সব সংঘ স্থায়ী তাহাদের স্বতন্ত্র চেতনা ও স্বতন্ত্র ইচ্ছা আছে। অন্যান্য সংঘের মধ্যে রাষ্ট্র একটি সামাজিক সংঘ।

ফিগিস্ ধর্মসম্প্রদায় বা চার্চের কথা বলিতে যাইয়া লেখেন যে, ইহাকে কোনক্রমেই রাষ্ট্র হইতে উদ্ভূত বলা চলে না। ইহার নিজস্ব উদ্দেশ্য আছে, স্বতন্ত্র জীবন আছে, তাই ইহার বিকাশ কি ভাবে হইবে তাহা ইহা নিজেই স্থির করিবার অধিকার চাহে। মধ্যযুগে যে সব গিল্ড বা কারুশিল্পীদের সংঘ ছিল, বা আজকাল যে ট্রেড ইউনিয়ন আছে তাহা কি রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াছে? রাষ্ট্র কি পরিবার তৈয়ারি করিয়াছে? রাষ্ট্র সামাজিক সংঘসমূহকে স্বীকার করিয়া লয় মাত্র, সৃষ্টি করে না। ফিগিস্ ঐ সব সংঘের মধ্যে রাষ্ট্রকে মধ্যস্থতা করিতে দিতে রাজী আছেন। তাহার বেশি আর কিছু নহে। ফুটবল খেলার রেফারিকে যদি মালিক বলা না চলে, তবে মধ্যস্থকেও সর্বপ্রধান অথবা সব কিছুর মালিক বলা চলে না। রাষ্ট্র বিভিন্ন সংঘের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখে সত্য, কিন্তু সেই জোরে রাষ্ট্র যদি বিভিন্ন সংঘের নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধনে অনর্থক হস্তক্ষেপ করে তবে সমাজ-জীবনের পূর্ণ বিকাশ ঘটিতে পারে না। প্রত্যেক সংঘের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন।

ফিগিসের মতে ধর্মসম্প্রদায় ও অন্যান্য সংঘের স্থান

বাগানে নানান্ ফুল ফুটিলে যেমন শোভা বাড়ে, সমাজের মধ্যে তেমনি বিভিন্ন সংঘের নিজ নিজ বিকাশের সুযোগসুবিধা থাকিলে জীবনের পরিপূর্ণতা পরিস্ফুট হয়। সংঘবাদীদের মতে ব্যক্তি একক ও নিরলম্ব জীবন যাপন করে না। সে সামাজিক বিভিন্ন সংঘের সদস্যরূপে বসবাস করে। প্রত্যক সংঘ তাহার ব্যক্তিত্বের এক এক দিক্ বিকশিত করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছে। যে সংঘ যতটা সেবা করে বা সমাজের উপযোগী কাজ করে,

তাহার ততটা ক্ষমতা থাকা দরকার। পূর্বে যেমন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দাবি করা হইত এখন তেমনি সংঘ-স্বাতন্ত্র্যের উপর জোর দেওয়া হইতেছে। রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান নহে; সমগ্র জীবনও রাষ্ট্রের এক্তিয়ারে থাকে না। ধর্ম, নীতি, সংস্কৃতি প্রভৃতির বিকাশের জন্য অন্যান্য সংঘের প্রয়োজন স্বীকার করিতেই হইবে। লাস্কী সংঘের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা স্বীকার করিয়া লইবার জন্য অনেক যুক্তিতর্ক উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মানুষের বিবিধ প্রকার উদ্দেশ্য সাধন একমাত্র রাষ্ট্রের দ্বারা হইতে পারে না। রাষ্ট্র যেমন নিজের ক্ষেত্রে সার্বভৌম, অন্যান্য সংঘও তেমনি নিজের ক্ষেত্রে সার্বভৌম। উহাদের সদস্যেরা ঐ সব সংঘের আনুগত্য স্বীকার করে। তাহারা রাষ্ট্রের চেয়ে আপন আপন সংঘকে বেশি আপনার মনে করে।

সেবার উপর ক্ষমতা নির্ভর করে

সংঘবাদীরা সার্বভৌমিকতার বহুত্ব প্রতিপাদন করেন, কিন্তু রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব একেবারে অস্বীকার করেন না। কিন্তু ফ্রান্সের লিয়োঁ দুগুই, হল্যাণ্ডের হুগো ক্র্যাব প্রভৃতি রাষ্ট্রকে আইনের অধীন করিয়া সার্বভৌমিকতার মূলে একেবারে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। দুগুইয়ের মতে আইন সামাজিক জীবনের প্রয়োজনকে প্রতিফলিত করে। মানুষ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল; সেইজন্য সে সামাজিক সংহতি চাহে। সামাজিক ঐক্যবোধের চেতনা উদ্ভূত হয় মানুষের একসঙ্গে বসবাসের ফলে। একসঙ্গে থাকার দরুণ সার্বজনীন সামাজিক প্রয়োজন তাহারা বুঝিতে পারে, আবার ব্যক্তিগত প্রয়োজন কি তাহাও জানিতে পারে। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে কিভাবে আচরণ করিলে ঐ সব প্রয়োজন মিটিবে সে সম্বন্ধে নিয়ম-কানুনের দরকার হয়। আইন সার্বভৌমের ইচ্ছামাত্র নহে। তাঁহার আদেশ বলিয়া ইহা লোকে মানে না, সার্বভৌমের বাধ্যতা আদায় করিবার মতন জোর আছে বলিয়াও ইহা সিদ্ধ নহে। সামাজিক সংহতির পরিপুষ্টি কতটা সাধিত হয় তাহার উপরই আইনের প্রামাণিকতা নির্ভর করে। রাষ্ট্র বলিতে শাসক ও শাসিত উভয়কেই বুঝায়, আর সরকার শুধু শাসকদের সমষ্টিমাত্র; তাঁহারা রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক শক্তির উপর একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করেন। তাঁহারা যদি জনসাধারণের চেয়ে সামাজিক সংহতির মূল্য বেশি

রাষ্ট্র কি আইনের অধীন?

বুঝেন, তাহা হইলে যাহাতে ঐ সংহতি বৃদ্ধি পায়, এমন সব আচরণের নিয়ন্ত্রণের উপর আইনের ভিত্তি স্থাপন করিবেন। সামাজিক ব্যবহারের অভিব্যক্তি বলিয়া লোকে আইন মানিয়া চলে, সার্বভৌমের আদেশ বলিয়া নহে। রাষ্ট্র আইনের অধীন। আইন আগে হইয়াছে, তাহার পর রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে।

ক্র্যাব শেষোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন যে, আইন ছাড়া অন্য কিছুরই কর্তৃত্ব প্রমাণসিদ্ধ নহে। আইনই কর্তৃত্বের আদিম ও চরম উৎস। সেইজন্য সার্বভৌমিকতা হইতে আইনের উৎপত্তি এই ধারণা আইন সম্বন্ধীয় ও রাজনৈতিক মতবাদ হইতে অন্তর্ধান করিতেছে। ক্র্যাবের মতে রাষ্ট্র আইনকে প্রয়োগ করে, আইনকে সৃষ্টি করে না। সমাজের ভিতর ন্যায় সম্বন্ধে যে ধারণা আছে, তাহাই আইনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। প্রাচীন ভারতের মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকারগণও ধর্মকে রাজার উপরে স্থান দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে রাজা ধর্মের অধীন।

বর্তমান যুগে আন্তর্জাতীয় সমাজ চাই

বিংশ শতাব্দীতে দুইটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হইলেও আন্তর্জাতীয়তার ভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিজ্ঞানের বহুবিধ আবিষ্কারের ফলে দূর নিকটে আসিয়াছে; অসংখ্য ক্ষেত্রে এক দেশের লোক অন্য দেশের লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে। এমন যুগে রাষ্ট্রকে বৈদেশিক নীতিতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও কেবল মাত্র নিজের ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মনে করিলে বিশ্বমানবের সমাজ কখনই গঠিত হইবে না। সার্বভৌম রাষ্ট্রকে সেইজন্য মানবের উচ্চতম আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের পরিপন্থী বলিয়া গণ্য করা হয়। রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার পরিবর্তে যাঁহারা আন্তর্জাতীয় সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন, আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী।

১২। **বহুত্ববাদের মূল্য নিরূপণঃ** রাষ্ট্র জগন্নাথের রথের মতন তাহার ভক্তবৃন্দকে নিষ্পেষিত করিবার নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী—এই অবাস্তব মতবাদের একটা প্রতিবাদ হওয়ার প্রয়োজন ছিল। বহুত্ববাদীরা অস্টিনের আইনগত ধারণা ও হেগেলের আদর্শবাদী মতের বিরুদ্ধে

যুক্তিতর্ক দেখাইয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা সংঘসমূহের কার্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ক্ষমতা শুধু রাষ্ট্রেরই একচেটিয়া অধিকার নহে। রাষ্ট্র যদি পরিবার, ধর্ম সম্প্রদায়, আর্থিক সংঘ প্রভৃতিকে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করে, তাহা হইলে সামাজিক জীবন পঙ্গু হইবে। আইনানুগ পণ্ডিতেরাও বলেন না যে, রাষ্ট্র সংঘগুলিকে অগ্রাহ্য করিবে।

বহুত্ববাদের উপযোগ

আজ রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্রের পরিধি এত ব্যাপক হইয়াছে যে, সংঘগুলিকে তাহাদের নিজ নিজ কার্য নির্বিঘ্নে সম্পাদন করিতে দেওয়া ছাড়া উপায় নাই। রাষ্ট্রযন্ত্রও খুব জটিল হইয়া উঠিয়াছে। লালফিতার দৌরাত্ম্যে রাষ্ট্রের কাজের গতি হইয়াছে যেমন মন্থর, তেমনি অপচয়ে ভরা। সেইজন্য শ্রমিক সংঘ, বণিক সংঘ, ডাক্তারদের মেডিক্যাল কাউন্সিল, উকীলদের বার কাউন্সিল, ইঞ্জিনীয়ারদের ইন্স্টিটিউট প্রভৃতি পেশাগত সংঘগুলির হাতে অনেক ক্ষমতা আসিয়া পড়িয়াছে।

সংঘের উপকারিতা

অনেকে আঞ্চলিক প্রতিনিধির জায়গায় পেশাগত প্রতিনিধি লইয়া আইনসভা গঠন করিতে বলেন। মুসোলিনি ইতালিতে কয়েকটি পেশার প্রতিনিধি লইয়া যে বিধানমণ্ডলী গঠন করিয়াছিলেন, তাহা জনসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণ করে নাই। জার্মানিতে বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংঘের প্রতিনিধি লইয়া যে Economic Council গঠিত হইয়াছিল, তাহাও সফলতা লাভ করে নাই।

সংঘগত প্রতিনিধিত্ব

বহুত্ববাদীরা সার্বভৌম রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক প্রীতিবন্ধনের পরিপন্থীরূপে চিত্রিত করিয়া বিশ্বমানবের সমাজ গঠনের পথ খুলিয়া দিয়াছেন। সংঘগুলির সহিত তাহাদের সদস্যদের সম্বন্ধ, সংঘদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি আচরণ এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে তাহাদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের উপর ঐ প্রকার নিয়ন্ত্রণের ভার দেওয়া যায় না। যাহার উপর নিয়ন্ত্রণের ভার তাহাকে সার্বভৌম বলা হউক আর না হউক, তাহার প্রাধান্য মানিতেই হইবে, তাহার আদেশকে চূড়ান্ত

বহুত্ববাদের গুণ ও দোষ

সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। একত্ববাদীরা যেখানে আইনগত বিচার করিয়াছেন, বহুত্ববাদীরা সেখানে নীতির প্রশ্ন তুলিয়াছেন। বহুত্ববাদীরা সংঘের ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য ওকালতি করিয়াছেন। কিন্তু সংঘের সংখ্যা যত বাড়িবে এবং তাহাদের কার্যক্ষেত্র যত বিস্তৃত হইবে, রাষ্ট্রের ক্ষমতা সেই অনুপাতে কমিবে না, বরং বাড়িবে; কেন না সংঘগুলির কাজের সমন্বয় সাধনের সমস্যা ক্রমান্বয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হইবে।

অনুশীলন

১। Write an analytical note on the attacks upon the Monistic theory of sovereignty. (1962)

Monistic theory বলিতে যে সার্বভৌমিকতা এক, অবিভাজ্য ও সর্বব্যাপক তাহাই বুঝায়। ইহা প্রত্যেক প্রজার ও প্রজাদের সকল প্রকার সংঘের উপর মৌলিক, চরম, অসীম ও সর্বাত্মক ক্ষমতা। কিন্তু বহুত্ববাদীরা বলেন যে বাস্তবপক্ষে রাষ্ট্রের ইচ্ছা মানে সরকারের ইচ্ছা। আর সরকার চালায় মানুষে—যাহাদের মনে হিংসা, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ আছে। তাহাদের ক্ষমতাকে অবাধ ও সীমাহীন বলিয়া স্বীকার করিলে স্বাধীনতা লোপ পাইবার আশংকা আছে। সেইজন্য আইনের দিক হইতে ও আন্তর্জাতিক শান্তির দিক হইতে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার উপর আক্রমণ করা হইয়াছে। চার্চ এবং পরিবার রাষ্ট্র হইতে উদ্ভূত নহে। রাষ্ট্র সামাজিক সংঘসমূহকে স্বীকার করিয়া লয় মাত্র, কিন্তু তাহাদের উপর অনর্থক হস্তক্ষেপ করিতে পারে না।

১০, ১১ ও ১২ প্রকরণ হইতে উত্তর লিখিতে হইবে।

২। Define Sovereignty and distinguish between (a) Legal and Political Sovereignty and (b) *De Jure* and *De Facto* Sovereignty. (1963)

সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের সেই বৈশিষ্ট্য যাহার ফলে ইহার নিজের ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোন ইচ্ছার দ্বারা আইনতঃ ইহাকে বাঁধা যায় না এবং নিজের শক্তি ছাড়া অন্য কোন শক্তির দ্বারা সীমিত করা যায় না। ইহা এক, *অবিভাজ্য, সর্বব্যাপক এবং হস্তান্তরের অযোগ্য।*

পঞ্চম প্রকরণে বাস্তব ও আইনগত সার্বভৌমিকতার প্রভেদ দেখ।

৩। Write a critical note on the Austinian theory of Sovereignty. (1964)

চতুর্থ প্রকরণে অস্টিনের মতবাদ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তাঁহার মতের সমালোচনা উহার শেষাংশে এবং একাদশ প্রকরণের তৃতীয় অনুচ্ছেদে পাইবে।

৪। The State is limited within ; it is also limited without. Examine. Discuss in this connection the essential attributes of Sovereignty.

রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত সংঘগুলির দ্বারা এবং বাহিরের অন্যান্য রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রসংঘের দ্বারা রাষ্ট্রের ক্ষমতা বাস্তবক্ষেত্রে সীমিত হয়।

৫। 'Externally, surely, the concept of an absolute and independent Sovereign State is incompatible with the interests of humanity'. Discuss.

প্রত্যেক রাষ্ট্রই যদি বলে যে সে বাহিরের কোন শক্তিকে মানিবে না, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠে।

দশম ও একাদশ প্রকরণের শেষ অনুচ্ছেদ দেখ।

৬। "It would be of lasting benefit to Political Science if the whole concept of sovereignty were surrendered." Examine the statement and discuss briefly the grounds on which the Pluralistic school base their attack on the traditional theory of Sovereignty with your own comments.

একাদশ ও দ্বাদশ প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

আইন

১। **আইনের প্রকৃতিঃ** বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়মের অধান। গ্রহ-নক্ষত্র সূর্যচন্দ্র বিধি-নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে চলিতেছে। এক গ্রহ যদি সহসা বিদ্রোহী হইয়া অন্য গ্রহের পথে চলিতে চায়, তাহা হইলে প্রলয় উপস্থিত হইবে। গ্রহদের স্বাধীন ইচ্ছা নাই, তাই তাহাদের পক্ষে বিদ্রোহ করা অসম্ভব। তাহারা চিরকাল একুই নিয়মের অধীন। মানুষকে দশজনের সঙ্গে একত্রে সমাজে, এমন কি পরিবারের মধ্যেও বাস করিতে হইলে নিয়ম মানিয়া চলা দরকার। মানুষ ইচ্ছা করিলে নিয়ম ভঙ্গ করিতে পারে। কিন্তু তাহাতে সকলেরই অসুবিধা হয়। সেইজন্য সামাজিক জীবনে কতকগুলি সদাচার সাধারণতঃ মানিয়া চলা হয়। সদাচারের আদর্শ এক এক দেশে এক এক রকম এবং উহা যুগে যুগে বদলায়। কোন দেশে নগ্ন গাত্রে কলার পাতায় ভাত রাখিয়া হাত দিয়া খাওয়া সদাচার, আবার কোথাও ভাল পোষাক পরিয়া, চেয়ারে বসিয়া কাঁটা চামচ দিয়া খাওয়া সদাচার। আমাদের দেশে আগে আট বছরের মধ্যে মেয়ের বিবাহ না দিলে সামাজিক নির্যাতন সহ্য করিতে হইত, এখন চৌদ্দ বছরের কম বয়সের মেয়ের বিবাহ দিলে আইনের কবলে পড়িবার ভয় আছে। বিবাহের বয়স আগে সমাজ হইতে নিরূপিত হইত, এখন সরকার আইন করিয়া উহা স্থির করিয়াছেন। সমাজের নিয়ম ভঙ্গ করিলে লোকে নিন্দা করে এবং কোন কোন স্থানে 'একঘরে' করে। সরকারী বিচারালয় যে নিয়মের প্রয়োগ করে, তাহাকে আইন বলে। বিচারকগণ আইন অমান্যকারীকে অর্থদণ্ড, কারাদণ্ড, এমন কি প্রাণদণ্ডও দিতে পারেন। কিন্তু বিশ্বের বিধান যেমন অপরিবর্তনীয়, আইন সেরূপ পরিবর্তনবিহীন নহে। সমাজের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আইনের পরিবর্তন ঘটে। হিন্দুরা আগে একাধিক বিবাহ করিতে পারিত, এখন পারে না; আগে হিন্দুর বিবাহ অচ্ছেদ্য ছিল, এখন উহার বন্ধন ছেদ করা যায়। কয়েক

সদাচারের ধারণা এক নহে

সমাজের দণ্ড ও রাষ্ট্রের দণ্ড

বছর আগে দেশে জমিদার নামে এক শ্রেণীর লোক কতকগুলি বিশেষ সুবিধা ও অধিকার ভোগ করিত, এখন আইন করিয়া জমিদারি প্রথা বিলোপ করা হইয়াছে। আইন মানুষের চিন্তাধারার এবং সামাজিক অবস্থার দর্পণস্বরূপ। সোবিয়েতের দেশের আইন অনুসারে কলকারখানা, দোকান-পাট, বড় ক্ষেত-খামার কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে পারে না, কিন্তু অন্যান্য দেশে দেওয়ানী আদালতগুলি সম্পত্তির উপর বিভিন্ন ব্যক্তির অধিকার কতখানি তাহা আইন অনুসারে নিরূপণ করিয়া দেয়।

নীতি ও ধর্মের আদর্শ পরিবর্তনশীল

সমাজে যেরূপ নীতি ও ধর্মের আদর্শ থাকিবে সেই রাষ্ট্রের আইনে সেইরূপ আদর্শের প্রতিফলন হইবে। কোন দেশের আইন অনুসারে মদ খাওয়া ও মদ বিক্রয় করা দণ্ডনীয়; অন্য দেশের আইনে আবার দণ্ড দেওয়া দূরে থাকুক, সরকার হইতে পানশালা খুলিয়া দেওয়া হয়। তাই বলা হয় আইন আপেক্ষিক-তত্ত্ব (Relativity) মানিয়া চলে। আইন মানুষের বাহিরের আচরণকে সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। আইন প্রত্যেক নাগরিককে কতকগুলি অধিকার দেয়। অন্য কেহ সেই অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। একজনের যাহা অধিকার অন্যের তাহা কর্তব্য। সেইজন্য আইনের দ্বারা মানুষের যা খুশী করিবার ক্ষমতা হ্রাস করা হয়। কিন্তু

আইনের এক্তিয়ার কতদুর

আইন মানুষের চিন্তা, ধর্ম সম্বন্ধীয় ধারণা অথবা বিবেক-বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। আইন করিয়া লোককে সুখী বা দয়ালু করা যায় না, প্রতিবেশীর প্রতি প্রীতিশীল করা যায় না কিংবা যে ভগবৎবিশ্বাসী তাহাকে নাস্তিক বানানো যায় না। কিন্তু আইন এমন অবস্থা সৃষ্টি করিতে বা বজায় রাখিতে পারে, যাহা মানুষের আত্মবিকাশের পক্ষে অনুকূল।

আইন কতকগুলি কাজ করিতে আদেশ দেয় এবং কতকগুলি কাজ করিতে নিষেধ করে। ঐ সব বিধি-নিষেধের পশ্চাতে রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের

লোকে আইন অভ্যাস বশে মানে

ভীতি আছে। অনেক লোক স্বভাবতঃ আইনানুবর্তী। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সমাজ-চেতনায় অনুপ্রাণিত হইয়া বিচার-বুদ্ধির বলে আইন মানেন, কিন্তু অধিকাংশ লোকই অভ্যাসবশে আইন মানিয়া চলেন। আবার কেহ কেহ দণ্ডের ভয়ে

আইন অনুসারে কাজ করেন। কিছু সংখ্যক দুষ্ট লোক আইনের বাধা না মানিয়া প্রবৃত্তির বশে অন্যের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করে অথবা রাষ্ট্রের আদেশ অমান্য করে। জেল, পুলিশ আদালত প্রভৃতি এই শ্রেণীকে দমন করিয়া সংযত রাখে। সেইজন্য বলা হয় যে, আইনের পিছনে রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের শক্তি বিদ্যমান। আইন তৈয়ারি করা হইল, অথচ সরকার উহাকে চালু করিবার জন্য কিছুই করিলেন না, এরূপ ঘটনা বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু পণপ্রথা নিবারণের জন্য সম্প্রতি ভারতবর্ষে যে আইন পাশ হইয়াছে, তাহাকে সক্রিয় করার বিষয় জনসাধারণ ও সরকার সমান উদাসীন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, আইনের পিছনে জনমত থাকা প্রয়োজন। যে আইন জনমতের চেয়ে বেশি আগাইয়া যায়, তাহা প্রতিপালিত হইবার সম্ভাবনা কম। আবার যে আইন জনমতের অপেক্ষা পিছাইয়া আছে, তাহাও বেশি দিন টিকিতে পারে না। সন্ধ্যার পর ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজের উপর কেহ মুখে কালি লাগাইয়া যাতায়াত করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হইবার আইন ইংলণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পর্যন্ত ছিল। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ঐরূপ সামান্য অপরাধে চরম দণ্ড দেওয়া হইত না। পরে উহা নাকচ করিয়া দেওয়া হয়।

আইন ও জনমত

আইন রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখে। আইন না থাকিলে জীবনযাত্রা অসম্ভব হইত। আইনের অর্থ সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। আইন যাহাতে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে প্রয়োগ করা হয় সে বিষয়ে বিচারকগণ সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

২। আইনের সংজ্ঞা ঃ সার্বভৌমিকতার অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে অস্টিনের মতে সার্বভৌমের আদেশই আইন, তবে সার্বভৌম যাহা অনুমোদন করেন, তাহাও আদেশ করেন বলিয়া ধরিতে হইবে। আদেশ মাত্রেই কিছু বা করিতে বলা হয় কিছু বা নিষেধ করা হয়। উহা মানা প্রজার কর্তব্য ; না মানিলে দণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু আইনের এরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করিলে কেবলমাত্র ফৌজদারী দণ্ডবিধিই আইনের আওতায় আসে ; দেওয়ানী আইন অনুমতিমূলক বলিয়া তাহার কথা বলা হয় না। চিরাচরিত প্রথাকে সার্বভৌমের আদেশ বলা চলে না। প্রথার প্রভাব এত সুদূরব্যাপী যে

অস্টিনের সংজ্ঞার দোষ

সার্বভৌম উহা অগ্রাহ্য করিতে পারে না। অর্ধ-বিকশিত সমাজে প্রথার প্রাধান্য যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। আইনকে শুধু আদেশ বলিলে উহার ভিতর যে নৈতিক শক্তি অছে তাহার কোন উল্লেখ থাকে না। অনেকেই তো আইন মানে উহার নৈতিক শক্তির জন্য, উহার পিছনে যে শারীরিক শক্তি আছে তাহার ভয়ে নহে। সংবিধানের প্রথাকেও (Conventions) আদেশ বলা চলে না।

অস্টিনের সংজ্ঞার এই সব দোষ দেখিয়া হল্যাণ্ড নিম্নলিখিত সংজ্ঞা স্থির করেন—বাহ্য ব্যাপারে মানুষের আচরণের যে সাধারণ নিয়ম সার্বভৌম রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্বদ্বারা বলবৎ করা হয় তাহাই আইন ("A general rule of external human action enforced by a sovereign political authority.")। ইহার অর্থ এই যে, আইন শুধু মানুষের আচরণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, প্রাকৃতিক শক্তির বেলায় অথবা মানুষের মনের কাজের উপর ইহার কোন অধিকার নাই; ইহার বিধি-নিষেধ সকলের উপর খাটে, ব্যক্তি বিশেষের উপর নহে, তাই ইহাকে সাধারণ নিয়ম বলা হইয়াছে। সার্বভৌম যদি কোন নিয়ম প্রয়োগ না করেন তবে আর উহাকে আইন বলা চলে না।

হল্যাণ্ড প্রদত্ত সংজ্ঞা

কিন্তু এই সংজ্ঞাও কেবলমাত্র বিশ্লেষণাত্মক (Analytical); ইহাতে আইন যে ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল তাহার ইঙ্গিত নাই। তাই উড্রো উইলসন্ সংজ্ঞা দেন যে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ধারণা ও অভ্যাসের যে অংশ সার্বজনীন নিয়মের আকারে সুস্পষ্টরূপে ও সরকারীভাবে স্বীকৃত হইয়াছে এবং যাহা সরকারের অধিকার ও ক্ষমতার দ্বারা বলবৎ করা হয় তাহাই আইন। ("Law is that portion of established thought and habit which has gained distinct and formal recognition in the shape of uniform rules backed by the authority and power of government.") এখানে ঐতিহাসিকের দৃষ্টি দিয়া আইনকে দেখা হইয়াছে। আইন সার্বভৌমের দ্বারা সৃষ্টি হয় না, ঐ শক্তির দ্বারা স্বীকৃত হয় মাত্র। ইহা যে সমাজ-জীবনের দর্পণস্বরূপ, সে ইঙ্গিতও এই সংজ্ঞার মধ্যে রহিয়াছে। সামাজিক প্রয়োজনবশেই আইনের উদ্ভব হয়।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আইন

আমেরিকায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা উইলোবি বলেন যে, বিচার করিবার সময় বিচারালয় যে সব আচরণের নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহাই আইন ("Those rules of conduct that control courts of Justice in the exercise of their jurisdictions.")। সামাজিক আচরণের সকল নিয়ম সরকারের শক্তির সাহায্যে বলবৎ করা হয় না। যে সকল নিয়ম ঐ ভাবে বলবৎ করা হয় তাহাই আইন। উইলোবি বিচারালয়ের উপর জোর দিয়াছেন। কিন্তু ইংলণ্ডে ও ইউরোপের অন্যান্য বহু দেশে এখন সরকারী শাসনবিভাগের কর্মচারীরা কোন কোন বিষয়ে আইন প্রয়োগ করিতেছেন। তাঁহারা Administrative Tribunals বা শাসনসংক্রান্ত বিচারালয়ে বসেন।

বিচারালয়ের কার্য

মার্কসীয় চিন্তাধারায় আইনকে শ্রেণীগত স্বার্থের রাষ্ট্রিক প্রকাশ বলিয়া গণ্য করা হয়। লাস্কিও বলিয়াছেন যে, সমাজে শ্রেণীগত সম্বন্ধের কোন বিশেষ রূপকে রক্ষা করাই আইনের কার্য। কোথাও আইনের সাহায্যে জমিদারদের কোথাও বা শিল্পপতিদের আবার কোথাও বা শ্রমিকদের প্রাধান্য বজায় রাখা হয়।

৩। আইন সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ : আইনের স্বরূপ কি ইহা লইয়া বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। যাঁহারা বর্তমান আইনগুলিকে তাহাদের প্রকাশভঙ্গী অনুসারে শ্রেণী বিভাগ করিয়া বিশ্লেষণ করেন তাঁহাদিগকে বিশ্লেষণমূলক মতবাদের সমর্থক (Analytical school) বলা হয়। ইঁহারা কালক্রমে সমাজের বিবর্তনের ফলে আইন কি ভাবে পরিবর্তিত হয় সেদিকে দৃষ্টিপাত করেন না। বর্তমান অবস্থায় কি ভাবে সার্বভৌমের আদেশক্রমে আইন সৃষ্ট হইতেছে তাহাই আলোচনা করেন। প্রাচীন গ্রীসের সোফিস্ট নামক পণ্ডিতেরা বলিতেন যে, শাসকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য যাহা দরকার তাহার উপর ভিত্তি করিয়া আইন করা হয়; শাসিতগণকে উহা মানিতে বাধ্য করা হয়। এই হিসাবে আইনকে আদেশ বলিয়া গণ্য করা যায়। বোদাঁ, হব্স্, অস্টিন, হল্যাণ্ড প্রভৃতি মনীষীরা এই মত পোষণ করেন। সোফিস্টদের দ্বারা ব্যাখ্যাত শাসকশ্রেণীর স্বার্থের কথা আজকাল মার্কসীয় ব্যাখ্যায় গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু বিশুদ্ধ বিশ্লেষণবাদীরা শ্রেণীগত স্বার্থের

বিশ্লেষণমূলক মতবাদ

বাহকরূপে আইনকে দেখেন না। বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যার অপূর্ণতা আছে নিশ্চয়। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে রাষ্ট্রের শক্তির সাহায্যে আইন মানানো হয় এই সত্যটি সুস্পষ্ট রূপে বিশ্লেষণবাদীরা ধরিয়াছেন।

ঐতিহাসিক মতবাদ

যাঁহারা আইনের উৎস কোন আদেশের মধ্যে নহে কিন্তু চিরাচরিত প্রথা লোকাচার প্রভৃতির মধ্যে অনুসন্ধান করেন এবং ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে আইনের আলোচনা করেন তাঁহাদিগকে ঐতিহাসিক মতবাদী বলা হয়। জার্মান ব্যবহারবিদ স্যাভিগ্‌নী প্রথমে এই মত স্থাপন করেন। পরে ইংলণ্ডের স্যার হেন্‌রী মেন ইহার সমর্থন করিয়া প্রাচীন সমাজের আইনের উপর এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ লেখেন। ইঁহাদের মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌমশক্তির বিকাশের পূর্বেও লোকে প্রথাকে মানিত। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে সমাজের মধ্যে পরস্পরের অধিকার ও কর্তব্য নিরূপিত হইত। ঐ প্রথা ভঙ্গ করিতে রাজাও সাহস পাইতেন না।

ঐতিহাসিক মতের বিপক্ষে বলা যায় যে, অবিকশিত সমাজে প্রথার প্রাধান্য থাকিলেও সুবিকশিত রাষ্ট্রে সমাজের প্রয়োজন অনুসারে আইন করা হয়। উহার পিছনে রাষ্ট্রের শক্তি রহিয়াছে। ঐ শক্তির সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মতবাদীরা উদাসীন।

আধুনিক কালে সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আইনের আলোচনা হইতেছে। ফ্রান্সের দুগুই, হল্যাণ্ডের ক্র্যাব্ প্রভৃতি মনীষীরা এই আলোচনার প্রবর্তক। ইঁহারা ঐতিহাসিক মতবাদকে আর এক ধাপ আগাইয়া লইয়া গিয়াছেন। ইঁহারা বলেন যে, বিবর্তনের ফলে সার্বজনীন কয়েকটি স্বার্থ জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করে। সমাজমন যখন উহার ন্যায্যতা স্বীকার করে তখন রাষ্ট্র উহাকে মানিয়া লয়। রাষ্ট্র আইন সৃষ্টি করে না, সমাজমন যাহা ন্যায়সঙ্গত মনে করে তাহাকে মাত্র আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করিয়া লয়। এই ভাবে আইন তৈয়ারি হয়। লোকে আইন মানে তাহার প্রধান কারণ হইতেছে যে, আইন সমাজের উপযোগী বলিয়া। সমাজজীবনে অনুপযোগী আইন দীর্ঘকাল প্রতিপালিত হইতে পারে না। এই মতের দৃষ্টিভঙ্গী প্রশংসনীয়। কিন্তু সমাজমন, সমাজের ন্যায়বোধ প্রভৃতি ধারণা অনেকটা ধোঁয়াটে।

সমাজবিজ্ঞানী মতবাদ

যাঁহারা আইনকে ন্যায়বোধ ও প্রজ্ঞার প্রকাশরূপে দেখিতে অভ্যস্ত তাহাদিগকে আইনের দার্শনিক মতবাদী বলা যায়। গ্রীক্ পণ্ডিতেরা আইনকে সমাজের সার্বজনীন অধ্যাত্ম সত্তা বলিয়া বিবেচনা করিতেন। জার্মান দার্শনিক কাণ্ট বলেন যে, আইন হইতেছে ব্যষ্টিমনের বৈধানিক ইচ্ছার প্রকাশ। হেগেলের মতে আইন সমাজের প্রজ্ঞা ও সর্বোচ্চ নীতির প্রকাশ। আইনকে আদর্শের দিক্ দিয়া যাচাই করিয়া দেখা প্রয়োজন। এই দিক্ দিয়া দার্শনিক মতবাদ মূল্যবান, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই সব বাক্‌চাতুরীর মূল্য নিরূপণ করা কঠিন।

দার্শনিক মতবাদ

খৃষ্টের জন্মের প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে সোফিস্ট নামধারী দার্শনিকেরা প্রাকৃতিক বিধান (Law of Nature) বলিয়া একপ্রকার আইনের কথা বলিয়াছিলেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ঐ মত বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাই এ সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বিবরণ দিতেছি।

৪। প্রাকৃতিক বিধান (Law of Nature)ঃ আরিস্টটল বলেন যে, মানুষের মনে যে স্বাভাবিক ন্যায়অন্যায়ের বোধ রহিয়াছে তাহাই প্রাকৃতিক বিধান; ইহা বিশ্বজনীন। প্রাকৃতিক বিধান আইন নহে, কিন্তু আইনের আদর্শ। স্টোয়িকেরা ইহাকে প্রজ্ঞার প্রকাশ বলিয়াছেন। দেশের আইন এই প্রাকৃতিক বিধানের আদর্শে গঠিত হওয়া উচিত। রোমানেরা এই মত স্বীকার করিয়া লইয়া তাহাদের civil law-য়ের বা পৌর আইনের বাহিরে এক Jus gentium গঠন করে। রোমে যে সব বিদেশী লোক বাস করিত তাহাদের উপর প্রথমে উহা প্রযুক্ত হইত। প্রকৃতিতে অর্থাৎ যুক্তির দ্বারা যে সব আইন সমর্থিত এবং যাহা সকল দেশের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য তাহা এই আইনপ্রণালীর অন্তর্ভুক্ত হইল এবং উহা প্রাকৃতিক আইন বলিয়া পরিচিত হইল। ব্রাইস বলেন যে, রোমানেরা সাধারণতঃ যাহা যুক্তিসঙ্গত, মানব প্রকৃতির বিকাশের অনুকূল, উচ্চ নৈতিক আদর্শে পরিপূর্ণ এবং সাধারণের পক্ষে সুবিধাজনক তাহাকেই প্রাকৃতিক বিধান বলিয়া মানিত; অন্য আইন কৃত্রিম এবং যথেচ্ছচারী বলিয়া এই আইনকে প্রাকৃতিক আইন বলা হইত। মধ্যযুগে খৃষ্টীয় চার্চ প্রাকৃতিক বিধানকে ঈশ্বরের অনুজ্ঞা বলিয়া মনে করিতেন এবং সকলেরই উহা মানা উচিত

রোমান্ মত

মধ্যযুগের ধারণা

বলিতেন। কিন্তু উহার পিছনে রাষ্ট্রের শক্তি নাই বলিয়া উহাকে বলবৎ করা যাইত না। ইংরাজেরা মধ্যযুগে তাঁহাদের comman law-কে প্রাকৃতিক আইনের সঙ্গে সমান-অর্থক মনে করিতেন। হব্‌স্ কিন্তু প্রাকৃতিক আইনকে মানেন নাই। তিনি যুক্তিবাদী ছিলেন, তাই যুক্তিপ্রয়োগ করিয়া দেখাইলেন যে আইন ও বিচার রাষ্ট্রের ভিতরে উদ্ভূত হয়; রাষ্ট্রের উৎপত্তির পূর্বে উহাদের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। লক্ প্রাকৃতিক বিধান মানিতেন। তাঁহার মতে ভগবান উহা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মানুষকে উহা আবিষ্কার করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। সেই জন্যই লকের কল্পিত প্রাক্-রাষ্ট্রের লোকেরা অপেক্ষাকৃত ভদ্র ও শান্ত, হব্‌সের কল্পিত পাশব প্রকৃতির নহে।

হব্‌স্

উনবিংশ শতাব্দীতে ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে আলোচনার ফলে প্রাকৃতিক বিধানের অস্তিত্ব অনেকে অস্বীকার করিলেন। কিন্তু ইংরাজ দার্শনিক গ্রীন্ ইহাকে নূতনভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি ইহাকে law of nature না বলিয়া "natural law" বলিয়াছেন। যে সমস্ত নিয়ম, প্রথা, আইন প্রভৃতি আদর্শ-রাষ্ট্রে প্রযুজ্য হইবার যোগ্য তাহারাই প্রাকৃতিক বিধান। সাধারণ আইন বাস্তব সমাজে কতকগুলি বিধি-নিষেধের নির্দেশ দেয়, আর প্রাকৃতিক বিধান সেইরূপ বিধিনিষেধের কথা বলে যাহা প্রতিপালিত হইতেছে না, কিন্তু হওয়া উচিত। মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য প্রাকৃতিক বিধানের প্রয়োজন আছে।

গ্রীনের নূতন ব্যাখ্যা

উইলোবি প্রাকৃতিক বিধানকে তিন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রথমতঃ প্রাকৃতিক জগতের কার্য-কারণ সম্বন্ধকে প্রাকৃতিক বিধান বলা চলে। ইহার সঙ্গে রাষ্ট্রের কোন সম্বন্ধ নাই। দ্বিতীয়তঃ স্পিনোজা ও হাক্সলির সহিত একমত হইয়া তিনি ইহাকে মানুষের সহজাত সংস্কারের প্রেরণা হইতে জাত আচরণ বলিয়াছেন। ইহাও রাষ্ট্রের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় না। তৃতীয়তঃ ইহাকে মানুষের আচরণের এমন নীতি বলা যায় যাহাকে লোকে পবিত্র মনে করে, কেন না ইহা ঐশী ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য হইতে উদ্ভূত। ইহাও অবাস্তব। সুতরাং বর্তমান কালে প্রাকৃতিক বিধানের দোহাই দেওয়া চলে না। ফ্রান্সের ও আমেরিকার বিপ্লবীরা অবশ্য ইহার দোহাই দিয়াছিলেন।

প্রাকৃতিক বিধানের তিন অর্থ

এখনও আন্তর্জাতিক আইনের অনেক বিধানকে প্রাকৃতিক আইন বলা হয়। ঐগুলির মূলে কোন রাষ্ট্রের আদেশ নাই, উহাদের পিছনে কোন শারীরিক শক্তিও নাই। তবুও রাষ্ট্রগুলি উহা মানিয়া চলে। তাহার ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিচারকেরা যখন তাঁহাদের রায়ের স্বপক্ষে কোন বিশেষ আইন-কানুন পান না তখন তাঁহারা ন্যায়বোধ ও প্রজ্ঞার দোহাই দেন। উহা প্রাকৃতিক বিধানের ধারণার প্রভাব। সুতরাং অমূলক বলিয়া পরিত্যক্ত হইলেও, প্রাকৃতিক বিধানের ধারণা মানব সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছে।

৫। আইনের শ্রেণীবিভাগ বা বর্গীকরণ: আইনের অনেক বিভাগ আছে। কোন আইন প্রণালী শুধু এক রাষ্ট্রের মধ্যেই প্রযোজ্য, আবার বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ, শান্তি ও নিরপেক্ষ অবস্থায় সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য আন্তর্জাতিক আইন প্রচলিত আছে। পূর্বোক্ত আইন প্রণালীকে (State Law, National Law, বা Municipal Law), রাষ্ট্রীয়, জাতীয় বা পৌর আইন বলা হয়। ইহাকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—Public Law বা সরকার সম্বন্ধীয় আইন এবং Private Law বা ব্যক্তিসম্পর্কিত আইন।

সরকার সম্বন্ধীয় আইন

সরকার সম্বন্ধীয় আইনের মধ্যে আবার একটি অংশকে সংবিধান আইন (Constitutional Law), অন্য অংশকে শাসন-বিভাগীয় (Administrative Law) আইন বলে। ফৌজদারী আইন ব্যক্তির উপর প্রযুক্ত হইলেও সরকার সম্বন্ধীয় আইনের মধ্যে স্থান দেওয়া হয়, কেননা কেহ যদি হত্যা করে বা শান্তি ভঙ্গ করে তাহার কাজকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কাজ বলিয়া গণ্য করা হয়। লোকের ধনপ্রাণ রক্ষাই রাষ্ট্রের প্রধান কার্য। অধ্যাপক হল্যাণ্ডের মতে সরকার সম্বন্ধীয় আইনের কাজ হইতেছে ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নির্ণয় করা, সরকারের ক্ষমতা সমূহের সীমা নির্দেশ করা এবং রাষ্ট্রের সংগঠন নীতির নির্দেশ দেওয়া। ব্যক্তিগত আইনে উভয় পক্ষই সাধারণ ব্যক্তি আর সরকার সম্বন্ধীয় আইনে এক পক্ষ হইতেছে সরকার, অন্য পক্ষ হইতেছে সাধারণ ব্যক্তি। সরকার ব্যক্তিগত আইন স্থির করিয়া ও প্রয়োগ করিয়া সাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যে নিরপেক্ষ মধ্যস্থের কাজ করে।

রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কি ভাবে কোথায় অবস্থিত তাহা সাংবিধানিক

আইন বলিয়া দেয়। আইনকে কি ভাবে তৈয়ারি করিবে তাহাও নির্ণয় করা ইহার কাজ। সাংবিধানিক আইনকে মৌলিক (Fundamental) আইন বলে, কেননা দেশের শাসনপ্রথা কি ভাবে চলিবে তাহা ইহার দ্বারা নিরূপিত হয়। বিধানমণ্ডলী শাসকমণ্ডলী ও বিচারমণ্ডলীর মধ্যে ক্ষমতার যথাযথ বণ্টন সাংবিধানিক আইনের দ্বারা করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয সরকার ও আঙ্গিক রাজ্যগুলির সরকারের মধ্যে কাহার কোন্ বিষয়ের উপর এক্তিয়ার তাহাও সাংবিধানিক আইন স্থির করিয়া দেয়। সরকারের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, বিশেষ করিয়া ব্যক্তির স্বাধীনতার সীমা নির্ণীত হয় ইহার দ্বারা। সেই জন্য অন্য সকল প্রকার আইনকে সাংবিধানিক আইনের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া চলিতে হয়। যদি কোথাও কোন আইন সংবিধানের বিরুদ্ধে যায় তবে তাহা নাকচ করা হয়।

সাংবিধানিক আইন

সাংবিধানিক আইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া ইহার সংশোধন বা পরিবর্তন অত্যন্ত ধীরে ও বিশেষ বিবেচনার সহিত করা প্রয়োজন। অনেক রাষ্ট্রেই ইহার সংশোধনী প্রণালী বেশ জটিল ও সময়সাপেক্ষ। কিন্তু ইংলণ্ডের ন্যায় দেশে ইহা সাধারণভাবে পরিবর্তন করা গেলেও, কার্যতঃ অনেক বিচারবিবেচনার পর সংশোধনে হাত দেওয়া হয়।

শাসনবিভাগীয় আইন (Administrative Law) বলিতে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কার্যপরিচালনার জন্য যে সব ছোটখাট বিষয়ের উপর নিয়মকানুন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা ঘোষিত হয় তাহাই বুঝায়। রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্র বাড়িয়া যাইতেছে। বিধানমণ্ডলীর এমন সময় নাই, এমন বিদ্যা ও নৈপুণ্য নাই, যে স্বাস্থ্যবিভাগ, চিকিৎসাবিভাগ, শিক্ষাবিভাগ প্রভৃতির কার্যাবলী সংক্রান্ত নিয়মাবলী করিতে পারে। সেই জন্য বিধানমণ্ডলী একটা আইনের কাঠামো মাত্র তৈয়ারি করিয়া উহার অন্তর্গত নিয়মাদি প্রস্তুত করিবার ভার সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপর দেয়। আজকাল শাসনবিভাগীয় আইনের দ্বারা নাগরিকের জীবন বেশ কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সার্বজনীন কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থকে বলি দেওয়ার প্রয়োজন হইলে আজকাল প্রায়শঃই শাসনবিভাগীয় আইনের আশ্রয় লওয়া হয়। ফ্রান্সে সরকারী কর্মচারীরা যখন আইনভঙ্গের

শাসনবিভাগীয় আইন

জন্য অভিযুক্ত হন, তখন তাঁহাদের বিচার শাসনবিভাগীয় আইন অনুসারে Administrative Tribunal-এর সামনে হয়। ডাইসি তাঁহার জীবনের শেষভাগে ১৯১৫ খ্রীঃ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, ইংলণ্ডেও শাসনবিভাগীয় আইনের প্রভাব বাড়িতেছে।

রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকদের পরস্পরের মধ্যে দেওয়ানী আদালতের বিচারযোগ্য বিষয়ের আইন লইয়া ব্যক্তিগত আইনের কারবার। সরকার বা রাষ্ট্র ইহাতে কোন পক্ষ অবলম্বন করে না। ব্যক্তি-সম্পর্কিত আইন কতকটা আসিয়াছে প্রথা হইতে। ইংলণ্ডে প্রথা হইতে Common Law-এর উৎপত্তি হইয়াছে। বিধানমণ্ডলী আইন পাশ করিয়াও ব্যক্তিগত আইন (Statute Law) স্থির করে। আবার স্বল্পকালের জন্য সর্বোচ্চ শাসক অর্ডিনান্স বা হুকুম জারি করিয়া আইন তৈয়ারি করিতে পারেন।

ব্যক্তিগত আইন

৬। **আন্তর্জাতিক আইন ঃ** এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য রাষ্ট্র কিরূপ আচরণ করিবে তাহার নির্দেশ আন্তর্জাতিক আইনে পাওয়া যায়। এই আইন একদিনে দুই-দশজন ব্যক্তি মিলিয়া তৈয়ারি করেন নাই। বহুদিনে বহু মনীষীর বিচার-বিতর্ক ও বহু রাষ্ট্রের সম্মতিক্রমে ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে। এই আইন কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রযুক্ত হয় না। কিন্তু প্রত্যেক রাষ্ট্র তাহার নৈতিক বোধের মানদণ্ড ও সুবিধা অনুযায়ী ইহা অল্পাধিক পরিমাণে মানিয়া চলে।

মহাভারতের শান্তি পর্বে ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের ব্যবহার সম্বন্ধে কতকগুলি নীতির উল্লেখ দেখা যায়। সাধারণতঃ যুদ্ধের সময়ে ঐ সব নীতি ভারতের রাষ্ট্রগুলি মানিত, আবার শান্তির সময়েও পরস্পরের মধ্যে দূত প্রেরণ, দূতের অবধ্যতা প্রভৃতি বিষয়ে উহা স্বীকৃত হইত।

প্রাচীন ভারতের নীতি

আধুনিক আন্তর্জাতিক আইন আকারে বিশাল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার প্রধান কারণ এই যে, আজ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে নানাবিধ ভাবের ও বস্তুর আদান-প্রদানের গুরুত্ব বাড়িয়া গিয়াছে। এক রাষ্ট্রের লোক ব্যবসাবাণিজ্য বা লেখাপড়া শিখিবার জন্য অন্য রাষ্ট্রে বাস করিতেছে। তাহাদের অধিকার ও কর্তব্য আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা নির্ণীত হয়। পূর্বে শুধু

রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে জমির অধিকার লইয়া বিবাদ করিত। এখন বেলাভূমি হইতে বার মাইল পর্যন্ত সমুদ্রের উপর এবং বায়ুমণ্ডলে এরোপ্লেন চালাইবার অধিকারের সীমা আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা ঠিক করিয়া দেওয়া হইতেছে। সকল রাষ্ট্রই উহাতে সম্মতি দিতেছে। যুদ্ধের সময় কিরূপে অস্ত্র প্রয়োগ করা কর্তব্য তাহা লইয়াও আন্তর্জাতিক আইন নির্দেশ দিতেছে। যুদ্ধের সময়ে যে সব রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকে, তাহাদের সহিত যুধ্যমান শক্তিগুলি কিরূপ ব্যবহার করিবে তাহাও আন্তর্জাতিক আইনের অন্তর্ভুক্ত।

আধুনিক যুগে ইহার গুরুত্ব

প্রাচীন ভারতের মতন প্রাচীন গ্রীস ও রোমেও আন্তর্জাতিক আইনের ভ্রূণ অবস্থা দেখা যায়। গ্রীসের Amphictyonic Council নগররাষ্ট্রগুলির মধ্যে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করিত। রোমে বিভিন্ন জাতির সহিত আচরণের নীতি লইয়া *jus feciale* নামক একপ্রকার আইন গড়িয়া উঠিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে ফ্রান্সে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে মহামন্ত্রী সালি (Sully) এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে হল্যাণ্ডের হুগো গ্রোটিয়াসকেই আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। তিনি ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধের বিষময় ফল দেখিয়া যুদ্ধের বিভীষিকাকে হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "যুদ্ধ ও শান্তির আইন" (১৬২৫ খৃঃ) রচনা করেন। তিনি প্রত্যেক রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা এবং সমান মর্যাদার উপর ভিত্তি করিয়া আন্তর্জাতিক আইন রচনা করেন। তাঁহার পরে বহু মনীষী এবং বহু আন্তর্জাতিক সম্মেলন উহার পুষ্টি সাধন করিয়াছেন।

গ্রীস ও রোম

সপ্তদশ শতাব্দীতে বিকাশ

আন্তর্জাতিক আইনের ছয়টি আকর স্বীকার করা যায়। যথা (১) রোমান আইন, (২) গ্রোটিয়াস্, ভ্যাটাল প্রভৃতি প্রাচীন এবং হল, লরেন্স, গার্ণার প্রভৃতি আধুনিক মনীষীর রচিত গ্রন্থাদি, (৩) রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সন্ধি ও চুক্তি, (৪) আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং মধ্যস্থদের বিচার, (৫) রাষ্ট্রের পৌর আইন এবং (৬) রাষ্ট্রদের বৈদেশিক দপ্তরের আলাপআলোচনা ও চিঠিপত্র।

উহার আকর

আইনের বিশ্লেষণাত্মক মতবাদ যাঁহারা মানেন, তাঁহারা আন্তর্জাতিক

আইনকে আইনের মর্যাদা দিতে রাজী নহেন। কেন না এই আইনকে কোন সার্বভৌমশক্তির আদেশ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না; আবার এই আইনকে বলবৎ করিবার জন্য কোন শক্তিও নাই। যদি সকল রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব করিবার জন্য ও আন্তর্জাতিক আইন মানিতে বাধ্য করিবার জন্য এক শক্তিকে সৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা নষ্ট হইয়া যাইবে, এবং আন্তর্জাতিক আইন এক বিশ্বরাষ্ট্রের পৌর আইনে পরিণত হইবে। এরূপ ঘটিলে ভাল হইবে কি মন্দ হইবে সে প্রশ্ন এখন তুলিয়া লাভ নাই; তবে রাষ্ট্রগুলির মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে বলিতে হয় এখনও এরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করিবার মতন মানসিক অবস্থার উৎপত্তি হয় নাই। আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা যদি রক্ষিত হইত তাহা হইলে জাপান ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়াই চীনকে আক্রমণ করিত না কিংবা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হিরোশিমার নিরস্ত্র ও অ-সামরিক জনতার উপর আণবিক বোমা নিক্ষেপ করিত না। বিশ্লেষণবাদীরা সেইজন্য বলেন যে যে আইন এমন ভাবে ভঙ্গ করিলে কোন শাস্তি দিবার ব্যবস্থা নাই তাহাকে আইন বলিয়া মানা যায় কিরূপে?

আন্তর্জাতিক আইনকে আইন না বলার তিনটি কারণ

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যদি আইন ভঙ্গ করিলেই আইনের আইনত্ব নষ্ট হয় তাহা হইলে পৌর বা জাতীয় আইনকেও আইন বলা চলে না। এমন কোন্ আইন আছে যাহা কেহ না কেহ লঙ্ঘন না করে? আর আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করিলে দণ্ড দিবার কোন ব্যবস্থাই নাই এমন কথা বলা যায় না। লীগ অব নেশন আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে আর্থিক বয়কট চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। সম্মিলিত জাতি সংঘ আন্তর্জাতিক সেনাদল গঠন করিয়া অপরাধী রাষ্ট্রকে শাস্তি দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। এই সব দণ্ড অবশ্য এখনও যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করা হইতেছে না। কিন্তু বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ যত অধিক জনপ্রিয় হইবে আন্তর্জাতিক আইন তত বেশি কার্যকরী হইবে।

ঐ সব কারণ ঠিক নহে

আন্তর্জাতিক আইনের পিছনে যথোপযুক্ত শক্তি নাই বটে, কিন্তু শক্তি দিয়া আইনকে ব্যাখ্যা করা সমাজ-বিজ্ঞানসম্মত নহে। আইন ঐতিহাসিক

কারণে ও সামাজিক প্রয়োজন বশে উদ্ভূত হয়। সার্বজনীন ইচ্ছা হইতে যেমন পৌর আইনের, তেমনি আন্তর্জাতিক আইনের জন্ম হইয়াছে। সম্মিলিত জাতিসংঘের প্রত্যেক সদস্য প্রতিজ্ঞা করেন যে, তাঁহারা জোরজবরদস্তি না করিয়া বা ভয় না দেখাইয়া আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ পরিচালনা করিবেন। এই সব কারণে বলা চলে যে, আন্তর্জাতিক আইন মানুষের প্রজ্ঞা ও শুভবুদ্ধির ফল। পণ্ডিতী বিচারের মানদণ্ডে কিছু হীন হইলেও আন্তর্জাতিক আইনকে আইনের মর্যাদা দিলে মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষা পাইবে। নতুবা ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া কঠিন।

আন্তর্জাতিক আইনকে না মানিলে ধ্বংস অনিবার্য

৭। **আইনের উৎস (Sources)**ঃ আইনকে কেবলমাত্র সার্বভৌমের আদেশ বলিয়া মনে করিলে ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। সামাজিক বিবর্তনের ফলে ইতিহাসের ধাপে ধাপে ইহা কি ভাবে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা জানিতে হইলে আইনের উৎসের সন্ধান করা দরকার। ঐতিহাসিক, নৃতত্ত্ববিদ্, সমাজবিজ্ঞানী প্রভৃতি মনীষীরা তুলনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, চিরাচরিত প্রথা, ধর্ম, বিচারকের সিদ্ধান্ত, ন্যায়নীতি, আইনজ্ঞদের ভাষ্য এবং আইন প্রণয়নের দ্বারা আইন গঠিত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত হইতে দেখা যায় যে, বহু আইনকে সার্বভৌম শক্তি কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক ভাবে (formally) আইন বলিয়া স্বীকার করিয়া লন। সার্বভৌম শক্তির অপেক্ষা না রাখিয়াই ঐসব নিয়ম-কানুন প্রচলিত হইয়াছিল।

ছয়টি উৎস

প্রাচীন সমাজে প্রথা অনুসারেই সংঘের সহিত ব্যক্তির ও ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইত। কোন্ জাতি কি কাজ করিবে, কোন্ কাজের আর্থিক মূল্য কি হইবে, সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কে হইবে এসব বিষয় প্রথার উপর নির্ভর করিত। প্রথাকে কেহ বুদ্ধিবিবেচনা করিয়া সৃষ্টি করে না; সমাজের মধ্যে প্রচলিত আচারব্যবহার কালক্রমে প্রথার আকার ধারণ করে। প্রথার মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা ও উপযোগিতা থাকে; তাই লোকে যুগ যুগ ধরিয়া উহা মানে। অনেকে অবশ্য ধর্মের ভয়ে বা নিছক গড্ডালিকা প্রবাহের ন্যায়

প্রথা

প্রথাকে মানিয়া চলে। প্রথাই সকল দেশের আইন-ব্যবস্থার একটা বিশাল অংশ জুড়িয়া আছে। ইংলণ্ডের Common Law ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান আইন মুখ্যতঃ প্রথার উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত। তবে কোন প্রথা যখন তাহার উপযোগিতা হারায় তখন রাষ্ট্র উহা পরিবর্তন করিয়া নূতন আইন সৃষ্টি করে। ম্যাক্‌আইভার বলেন যে মানুষ যেমন তাহার শরীরকে নূতন রূপ দিতে পারে না, রাষ্ট্রও তেমনি সমাজের আইনব্যবস্থাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সম্পূর্ণ নূতন করিয়া গড়িতে পারে না। রাষ্ট্র শুধু এখানে সেখানে দুই দশটি আইন পরিবর্তন করে এবং নূতন আইন জুড়িয়া দেয়। কেহ কেহ বলেন যে, আজও যে প্রথা হইতে আইন তৈয়ারি হইতেছে তাহা শেয়ারের বাজারের কয়েকটি প্রথাকে আইনের স্বীকৃতিদান হইতে বুঝা যায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শেয়ার বাজারের উহা usage আচার মাত্র Custom বা প্রথা নহে।

ধর্ম

প্রথা ও ধর্ম সেকালে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল। প্রথাকে অমান্য করা অধর্মাচরণ বলিয়া মনে করা হইত। লোকে দলপতিকে ও কুলপতিকে ভগবানের প্রতিনিধি বলিয়া জানিত। ভারতবর্ষে কুলের প্রথাকে কুলধর্ম এবং জাতির প্রথাকে জাতিধর্ম বলিত। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি রচিত ধর্মশাস্ত্রে আইনের কথা প্রচুর আছে। আইন ধর্মের সঙ্গে অভিন্ন ছিল বলিয়া মনুসংহিতা ধর্মশাস্ত্ররূপে পরিগণিত হয়। মনু বলেন যে ধর্মের মূল হইতেছে বেদ, স্মৃতি এবং শিষ্টগণের আচার। গৌতম বলেন যে, বেদের বিরোধী নহে এমন দেশধর্ম, জাতিধর্ম ও কুলধর্ম প্রামাণ্যে। বশিষ্ট বলেন যে, রাজা চারি বর্ণের মধ্যে এরূপ ধর্ম বা আইন প্রয়োগ করিবেন। প্রাচীন রোমের প্রাচীন আইনও ধর্মের কতকগুলি আদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহুদিদের মধ্যেও ধর্মের অনুশাসনই আইন বলিয়া পরিগণিত হইত। খৃষ্টীয় ধর্মের প্রভাবে ইউরোপের সকল দেশের আইন যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হইয়াছে। সমাজ যখন জনবহুল ও জটিল হইয়া উঠে তখন আর প্রথা ও ধর্মের চিরাচরিত নিয়মের দ্বারা তাহার সকল বিরোধের সমাধান করা যায় না। সেই সময়ে বিধানমণ্ডলী ও বিচারক-মণ্ডলীর পক্ষে কোন কোন বিষয়ে আইন তৈয়ারি করা অপরিহার্য হইয়া উঠে।

বিচারক শুধু বিচারই করেন না, অনেক সময়ে তাঁহার রায়ের মধ্যে আইনের নূতন সিদ্ধান্ত থাকে। যখন প্রথা অনুসারে বিচারকেরা নিষ্পত্তি করিতেন, তখনও তাঁহাদের নিজস্ব মতামতের মূল্য কম ছিল না। এক গোষ্ঠীর প্রথার সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর প্রথার যখন বিরোধ দেখা যাইত তখন তাঁহারা নিজেদের বুদ্ধিবিবেচনা অনুসারে প্রথার ব্যাখ্যা করিয়া লইতেন। ঐ ব্যাখ্যা কালক্রমে অনুরূপ সকল মামলায় প্রয়োগ করা হইত। আজকালও আইনের ধারার মধ্যে যখন কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয় না তখন উচ্চতম আদালতের বিচারকগণ সংশ্লিষ্ট আইনের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া নূতন নীতি স্থাপন করেন। তাঁহাদের রায় ঐ ধরনের অন্যান্য মামলা নিষ্পত্তির সময়ে অনুসৃত হয়। এইরূপে বিচার-মীমাংসা আইনের অন্যতম উৎসরূপে পরিণত হয়।

বিচার-মীমাংসা

আইন স্থিতিস্থাপকতার পক্ষপাতী, কিন্তু সামাজিক জীবন গতিশীল। এই জন্য সামাজিক জীবনের গতির সঙ্গে তাল রাখিতে যাইয়া আইনকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা ব্যাখ্যা করার দরকার হয়। কখনও কখনও কিন্তু দেখা যায় যে বিচারকেরা অতিরিক্ত সংরক্ষণশীলতার জন্য সামাজিক নূতন শক্তিকে স্বীকার করিতে চাহেন না। লাস্কি বলেন যে বিচারকেরা যে শ্রেণী হইতে উদ্ভূত সেই শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকল্পে রায় দেওয়াই তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক।

আইনের চতুর্থ উৎস হইল Equity বা শাশ্বত নীতি। আইনের এক বিশাল শাখা Equity নামে পরিচিত। প্রাচীন রোমে আইনের পরিবর্তন করা দুঃসাধ্য ছিল। বিচারকগণ প্রাকৃতিক বিধানকে শাশ্বত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত মনে করিতেন এবং উহার প্রয়োগ করিয়া অনেক মামলার বিচার করিতেন। ইংলণ্ডেও ঐ নীতি গৃহীত হয় এবং লর্ড চ্যান্সেলার উহার প্রয়োগ দ্বারা ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা করেন। পূর্বে আমরা যে বিচার মীমাংসার উল্লেখ করিয়াছি তাহার সহিত শ্বাশত নীতির পার্থক্য আছে। বিচার মীমাংসার সময় বিচারকেরা কোন না কোন আইনের সন্ধান পাইয়া উহাকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেন যাহাতে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে ঐ আইনের সঙ্গতি রক্ষা হয়। কিন্তু শাশ্বত নীতির প্রয়োগ সেই সময়ে করা হয় যখন দেখা যায় যে আইন ঐরূপ মোকদ্দমার

শাশ্বত নীতি

বিষয়ে কিছুই নির্দেশ দেয় নাই। এইরূপে নূতন আইনের সৃষ্টি হয়। এরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে সামাজিক ন্যায় বোধের পরিবর্তিত ধারণার সঙ্গে আইনের সামঞ্জস্য রাখা যায় না। সব সময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে আইন বদলানো সম্ভব নহে তাই বিচারকগণের দ্বারা প্রযুক্ত শাশ্বত নীতির উপর নির্ভর করিতে হয়।

সুবিখ্যাত আইনবিদেরা আইনের ভাষ্য তৈয়ারি করিয়াও আইন সৃষ্টি করেন। মনুসংহিতার অনেক বিধিকে মেধাতিথি এমনভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে নবম শতাব্দীর সমাজব্যবস্থা মনুর সময়ের চেয়ে অনেক বেশি উদার নীতিসম্পন্ন হইয়াছিল। প্রাচীন রোমেও সুপ্রসিদ্ধ আইনজ্ঞদের মতামত বিচারালয়ে গৃহীত হইত। আইনের মধ্যে প্রযুক্ত কোন্ শব্দের কিরূপ অর্থ গ্রহণ করা উচিত তাহা এই সব ভাষ্যকারের মত হইতে বুঝা যায়। ইংলণ্ডের কোক, ব্ল্যাকস্টোন প্রভৃতি, আমেরিকার স্টোরী, কেণ্ট প্রভৃতির এবং আমাদের দেশের রাসবিহারী ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মুল্লা প্রভৃতির ব্যাখ্যা বিচারকগণ শ্রদ্ধার সহিত মানিয়া লন। ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যাকে বিচার মীমাংসার তুল্য বলা যায় না বটে, কিন্তু তাঁহাদের মতামত এত বেশি গৃহীত হয় যে উহাকেও প্রামাণিক বলিয়া ধরা হয়।

আইনের পণ্ডিতদের লিখিত ভাষ্য

সপ্তদশ শতাব্দী হইতে আইন প্রণয়ন আইনের একটি প্রধান উৎস বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে। তাহার পূর্বে প্রথা, ধর্ম, বিচারকদের মীমাংসা, শাশ্বত নীতি প্রভৃতি অধিকাংশ আইন জোগাইত। সরকার শুধু সাংবিধানিক আইন ও শাসনবিভাগীয় আইন করিবার একচেটিয়া অধিকার রাখিতেন। এখন বিধানমণ্ডলী আইন তৈয়ারি করে। নাগরিকেরা প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া বিধানমণ্ডলীতে প্রেরণ করে। সেইজন্য আইন জনমতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। প্রথা যেখানে সংরক্ষণ করে, আইন প্রণয়ন সেখানে পরিবর্তন আনে। কিন্তু লোকের নৈতিক বোধ ও রাজনৈতিক চেতনাকে অগ্রাহ্য করিলে কোন আইন টিকিতে পারে না।

আইন প্রণয়ন

উড্রো উইলসনের মতে আইনের ছয়টি উৎসের মধ্যে প্রথা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, ধর্মও তাহার প্রায় সমসাময়িক এবং প্রথার মতনই বহু আইনের

স্রষ্টা। বহু প্রাচীন কাল হইতেই বিচার মীমাংসা এবং শাশ্বত নীতি পাশাপাশি অগ্রসর হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় চেতনার বিশেষ বিকাশ না ঘটিলে আইন প্রণয়ন ও ভাষ্যকারদের মত প্রভাবশালী হয় না। আজকাল বিধানমণ্ডলী ছাড়া, শাসকমণ্ডলী এবং আমলাতন্ত্রও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বহু আইন তৈয়ারি করিতেছেন।

৮। **আইন ও জনমত ঃ** কোন সমাজের উপর জোর করিয়া কোন আইন চাপানো যায় না, যাইলেও উহা বেশি দিন টিকে না। স্বেচ্ছাচারী রাজারাও জনমতকে একেবারে অগ্রাহ্য করিতে সাহসী হইতেন না। তবে স্বৈরতন্ত্রে জনমত নির্ণয় করা খুব কঠিন, কেননা লোকে স্বাধীনভাবে নিজের নিজের মত ব্যক্ত করার সুবিধা পায় না। আজকাল গণতন্ত্রের প্রচলন হওয়ায় লোকে সংবাদপত্রের মারফতে তাহাদের মতামত ব্যক্ত করিতে পারে, সভা করিয়া অন্যকে তাহাদের মতের অনুকূল করিতে পারে, বিদ্বান ও বুদ্ধিমানলোকেরা পুস্তকপুস্তিকা প্রকাশ করিয়া জনমত গঠন করিতে পারেন। সকলের উপরে লোকে কয়েক বৎসর পরপর আইনসভার প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারে। আইনসভাতেই আজকাল গুরুত্বপূর্ণ আইনগুলি তৈয়ারি হয়। প্রথমে আইনের খসড়া সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয়। যে কেহ উহার সমালোচনা করিবার অধিকারী। সংবাদপত্রে প্রস্তাবিত আইনের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে লেখালেখি করা হয়। সরকার ঐ সব মতামত বিবেচনা করেন।

জনমতের প্রকাশ

কখনও কখনও আইনের খসড়া বিশেষভাবে জনমত নির্ধারণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত হয়। কোন ব্যক্তি বা যে কোন সংঘ উহার সম্বন্ধে নিজ নিজ বক্তব্য সরকারের নিকট পেশ করিতে পারে। ঐ সব মতামত বিবেচনা করিবার পর আইনসভায় জনসাধারণের প্রতিনিধিরা উহার প্রয়োজনীয়তা বিচার করেন। বিরোধী দলের সদস্যেরা উহার দোষত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এইভাবে আইনসভার দুই পক্ষে আলোচনা করিয়া আইন পাশ করা হয়।

জনমত নির্ধারণ

এরূপ সাবধানতা সত্ত্বেও যদি জনমতের বিরোধী কোন আইন সংখ্যাগরিষ্ঠ দল পাশ করেন, তাহা হইলে পরবর্তী নির্বাচনে তাঁহারা আর বেশি সংখ্যক ভোট পাইবেন না। এই ভয়ে সাধারণতঃ সরকার জনমতের

নাড়ী পরীক্ষা করিয়া আইন তৈয়ারি করেন। কিন্তু কখনও কখনও সামাজিক সংস্কার করিবার অতিরিক্ত উৎসাহে আইন-সভা এমন আইন প্রণয়ন করেন, যাহার প্রতি লোকের সহানুভূতির অভাব পরিলক্ষিত হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আইন করিয়া মদ্যপান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু লোকে গোপনে মদ্য প্রস্তুত করিয়া উহার চোরাকারবার আরম্ভ করিল। দেশে অশান্তি দেখা দিল। ফলে কিছুকাল পরে ঐ আইন নাকচ করিয়া দেওয়া হইল।

জনমত বিরোধী আইন

আইন জনমতকে সংগঠন করে। সম্প্রতি ভারতবর্ষে পণপ্রথাকে দূর করিবার জন্য আইন করা হইয়াছে। তাহার ফলে পণ দেওয়া নেওয়া বন্ধ হয় নাই বটে, কিন্তু লোকে নির্লজ্জভাবে আর পণ দাবি করিয়া কাগজে বিবাহের বিজ্ঞাপন দিতেছে না। আশা করা যায় যে কালক্রমে এই কুৎসিত প্রথা বিলুপ্ত হইবে।

আইন জনমতকে চালিতও করে

বিচারকদের রায়ে যে আইন সৃষ্টি হয় তাহাও জনমতের সহিত সম্পর্কশূন্য নহে। সমাজের উন্নতির পক্ষে যাহা প্রয়োজন তাহাই সাধারণতঃ বিচারকগণ তাঁহাদের আদর্শরূপে গ্রহণ করেন। আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের বিচারকেরা ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ব্যক্তিগত সম্পত্তির গোঁড়া সমর্থক ছিলেন; কিন্তু পরে তাঁহারা সামাজিক কল্যাণ সাধনের জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করিতে থাকেন। ঐ সময়ে আমেরিকার জনমতও চাহিয়াছিল যে কৃষক ও শ্রমিকের স্বার্থরক্ষার জন্য সম্পত্তির ও কারখানার মালিকদিগের অসংযত ব্যবহারকে সংযত করা দরকার।

জনমত সুস্পষ্টভাবে ও সজোরে দাবি করিয়াও যখন কোন অনিষ্টকর আইনকে পরিবর্তন করিতে অসমর্থ হয় তখন সেই আইন অমান্য করিবার জন্য আন্দোলন উপস্থিত হয়। এরূপ আন্দোলন সমাজের ভিত্তিকে নাড়া দেয়। সেই জন্য আমাদের বিবেচনা করা প্রয়োজন যে আইন আমরা কেন মানি এবং কি অবস্থায় আইন অমান্য করা কর্তব্য।

আইন অমান্য আন্দোলন

৯। আইন মানিবার কারণঃ প্রাচীন কালে আইন ও ধর্ম একীভূত ছিল বলিয়া লোকে ধর্মের ভয়ে আইন মানিয়া চলিত। কিন্তু এ যুগে লোকে আইন কেন মানে ইহা লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ আছে।

যাঁহারা মানুষের স্বভাব সম্বন্ধে বিশেষ উচ্চ ধারণা পোষণ করেন না তাঁহারা বলেন যে দণ্ডের ভয়ে মানুষ আইন মানে। কৌটিল্য বলেন যে দণ্ড না থাকিলে প্রবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করে; দণ্ডের ভয়েই দুষ্টলোকে সংযত হইয়া চলে। হব্‌স্‌ও এই মতের অনুবর্তী। বেন্থাম, অস্টিন প্রভৃতি যাঁহারা বিশ্লেষণাত্মক আইনের আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাও বলেন যে আইন ভঙ্গ করিলে শাস্তি হইবে এই ভয়ে লোকে আইনের অনুবর্তী হয়। কিন্তু ইহার উত্তরে বলা চলে যে সমাজের মধ্যে দুষ্টলোকের সংখ্যা বেশি নহে। দুষ্ট ব্যক্তিরাই অপরাধ প্রবণ, সুতরাং সকলেই শাস্তির ভয়ে আইন মানিয়া চলে একথা বলা ঠিক নহে।

দণ্ডের ভয়

আদর্শবাদীরা বলেন যে আইন সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা হইতে উদ্ভূত এবং মানব তাহার বুদ্ধিবলে বুঝিতে পারে যে আইনের অনুবর্তী হইয়া চলিলেই মহত্তর জীবন উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। আইন প্রত্যেকের অধিকারকে সংরক্ষণ করে; ঐ অধিকার না থাকিলে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি বিকশিত হইতে পারে না; সুতরাং মানুষ আইনের উপযোগিতা বুঝিয়া আইনানুবর্তী হয়। রাষ্ট্রের মধ্যে দুই চারিটি খারাপ আইন থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা অমান্য না করিয়া, উহার অপকারিতা লোককে বুঝাইয়া দিয়া ঐ আইন রদ করিবার জন্য আন্দোলন করা উচিত।

যুক্তি-তর্ক

সব লোক যেমন স্বভাবতঃ অপরাধ-প্রবণ নহে, তেমনি খুব বেশি সংখ্যক লোক আইনকে প্রজ্ঞার প্রতীক্‌ বলিয়াও বুঝিবার ক্ষমতা রাখে না। অধিকাংশ লোক নির্ঝঞ্ঝাটে জীবনযাত্রা করিতে চায়। আইন অমান্য করার হাঙ্গামার চেয়ে আইন মানিয়া চলা অনেক বেশি সুবিধাজনক বলিয়া বেশির ভাগ লোক আইনানুবর্তী হয়। মানুষের মন সঙ্গ চায়। অন্যের সঙ্গে বসবাস করিতে গেলে তাহাদের প্রতি সহানুভূতি জাগে; অন্যে যেমনটি করিতেছে তেমনি ভাবে চলিতে ইচ্ছা হয়। আইন মানিয়া চলিতেছে দেখিয়া অনেকে স্বাভাবিক অনুকরণ স্পৃহাবশে আইনের বাধ্য হয়। মানুষ ছোট বেলা হইতে বাপমায়ের, শিক্ষকের ও গুরুজনের আদেশ মানিয়া চলিতে অভ্যস্ত হয়। সুতরাং অভ্যাস বশেই অধিকাংশ লোক আইনের

স্বভাব

অনুকরণ স্পৃহা

আদেশ মানিয়া চলে। এইসব কারণ বিবেচনা করিয়া ব্রাইস্ বলিয়াছেন যে মানুষ আইন মানে পাঁচটি কারণে—আলস্য (Indolence), অপরের প্রতি শ্রদ্ধা (Deference) এবং সহানুভূতির প্রেরণায় (Sympathy) ও শাস্তির ভয়ে (Fear) এবং বুদ্ধির বশে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে অধিকাংশ লোক যদি বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ না করিয়া কেবলমাত্র হাঙ্গামা এড়াইবার ভয়ে বা রাজনৈতিক ব্যাপারের প্রতি ঔদাসীন্যের জন্য আইন মানে তাহা হইলে যাঁহাদের হাতে আইন তৈয়ারির ভার আছে তাঁহারা যথেচ্ছাচারী হইতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে জনমতের সহিত আইনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখা কঠিন হয়। যে দেশে সু-নাগরিকের সংখ্যা যত অধিক সে দেশে আইন তত বেশি প্রতিপালিত হয়। জেল ও পুলিশের জন্য যত টাকা খরচ করা হয় নাগরিক গঠনের শিক্ষার জন্য তাহার অপেক্ষা বেশি ব্যয় করা উচিত। কেননা লোককে আইনানুবর্তী করার উহাই শ্রেষ্ঠ পন্থা।

১০। **আইন অমান্য করা উচিত কি?** সাধারণতঃ আইন অমান্য করিবার অধিকার কাহারও নাই এবং থাকিতে পারে না। কিন্তু সময় বিশেষে দোষযুক্ত আইন অমান্য করা শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। গ্রীন্ বলেন যে, যখন শাশ্বত নীতির সহিত আইনের অসঙ্গতি দেখা যায় তখন আইনকে অগ্রাহ্য করিয়া শাশ্বত নীতিকে মানা কর্তব্য, কেননা শাশ্বত নীতি অনুসারে কাজ করিলে মানুষের ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ এবং উহাকে না মানিলে মানুষের মহত্তর জীবনের উপলব্ধি হইতে পারে না। রাষ্ট্র, আইন প্রভৃতি দ্বারা ব্যক্তিত্বের বিকাশ যদি না হয় তাহা হইলে আইনানুবর্তীতায় লাভ কি?

নীতিহীন আইন

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই যে রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে মতদ্বৈধ ঘটিলে কি করিয়া ঠিক করা যাইবে যে কাহার মত সত্য? রাষ্ট্র আইন নির্দেশ করে। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি উহার যৌক্তিকতা বিচার করিয়া পালন করিবে কিনা নির্ণয় করিতে বসে, তবে পরিণামে অরাজকতার উৎপত্তি হইবে। আইন বিশেষ কাহারও স্বার্থের প্রতিকূল হইলেই কি সে উহা অমান্য করিতে পারে? আরিস্টটল্ বলেন যে খারাপ রাষ্ট্রও শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতর দিয়া রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য

কে বিচার করিবে কোন্‌টি নীতিসঙ্গত?

শিখাইবার অধিকারী। জনসাধারণ রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত হয় ইহাই তিনি চাহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মতে প্রজ্ঞাবান্ স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় শিক্ষার ঊর্ধ্বে উঠিয়া খারাপ রাষ্ট্রকে অমান্য করিতে পারে।

আইন অমান্য করিবার পূর্বে কয়েকটি বিষয় বিশেষ ধীরতার সহিত বিবেচনা করা কর্তব্য—প্রথমতঃ যে আইনের প্রতিকূলতা করা হইতেছে এবং যাহা প্রস্তাব করা হইতেছে তাহার মধ্যে তুলনা করিয়া দেখা উচিত যে তাঁহার প্রস্তাবের দ্বারা সত্যই ভাল হইবে কিনা। যদি ভাল হইবে বলিয়া স্থির বিশ্বাস জন্মে এবং বিবেক কিছুতেই প্রচলিত আইন মানিতে সম্মতি না দেয় তাহা হইলে বৈধানিক উপায়ে অধিকাংশ ব্যক্তিকে ঐ প্রস্তাবের স্বপক্ষে আনার চেষ্টা করা উচিত। যদি এই চেষ্টা সফল হয় তাহা হইলে আর আইন-বহির্গত উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না। বার্ক সংক্ষেপে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন যে রাষ্ট্রকে প্রতিরোধ করাটা ঔষধের মতন ব্যবহার করা উচিত, খাদ্যের মতন নহে। অর্থাৎ যখন রাষ্ট্রদেহ খুবই অসুস্থ হইয়া পড়িবে তখন তিক্ত ঔষধ খাওয়ানোর মতন তাহাকে প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

ধীর বিবেচনা প্রয়োজন

লাস্কি বলেন যে একজনেও অবশিষ্ট সকলের বিপক্ষে দাঁড়াইয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিবার অধিকারী। তবে অন্যায়ের গুরুত্বের অনুপাতে প্রতিবাদ জোরালো হওয়া উচিত ("the protest should be proportionate to the evil"). মহাত্মা গান্ধী যদি প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না জানাইতেন, যদি তিনি সত্যাগ্রহ অবলম্বন না করিতেন তাহা হইলে অস্পৃশ্যতার ধারণা আজ ভারতের সংবিধানে বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইত না। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীকেও স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে তাঁহার অবলম্বিত সত্যাগ্রহ কখনও কখনও তাঁহার অনুবর্তীদের হাতে দুষ্ট-গ্রহে পরিণত হইয়াছিল। সেই জন্য সাধারণ নীতি হিসাবে বলা যায় যে কোন আইনকে খারাপ বলিয়া বুঝিলে তাহা সরাসরি অমান্য না করিয়া তাহার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা কর্তব্য এবং জনমতের সমর্থন-লাভ করিয়া উহা রদ করাইবার চেষ্টা করা উচিত। স্বৈরতন্ত্রে বিদ্রোহই অন্যায়ের একমাত্র প্রতিকার; কিন্তু গণতন্ত্রে প্রত্যেকেরই

লাস্কির প্রতিরোধ মত

গণতন্ত্রের আলোচনার দ্বারা মীমাংসা

নিজের মতের অনুকূলে জনমত গঠনের অধিকার আছে। জনমত গঠন করিতে অবশ্য সময় লাগে। লাস্কি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে ইংলণ্ডে কোন কোন সংস্কার সাধন করিতে ত্রিশ বৎসর সময়ও লাগিয়াছে। কিন্তু অধৈর্য হইয়া তাড়াতাড়ি যা হোক্ একটা সংস্কার সাধন করিয়া ধীরে সুস্থে আপসোস অপেক্ষা বিধানসঙ্গত উপায়ে আইন বদলাইবার চেষ্টা করাই শ্রেয়ঃ।

১১। আইনের সহিত নৈতিকতার সম্বন্ধঃ নৈতিকতা (Morality) হইতে আইনের উৎপত্তি হইয়াছে ; আইন হইতে নৈতিকতার নহে। প্রাচীন ভারতে আইন ও নীতিশাস্ত্র উভয়েই ধর্মের অন্তর্গত ছিল। মিশরে ও চীনেও নীতিশাস্ত্র হইতে আইন উদ্ভূত হইয়াছে। নৈতিকতার ধারণা যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়। সেই অনুসারে আইনও বদলায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময়েও কোন কোন বিশুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ ৩৬৫টি বিবাহ করিয়া বছরের প্রতিদিন এক এক শ্বশুর বাড়িতে জামাই আদর লাভ করিতেন। এখন একাধিক বিবাহ করাকে দুর্নীতি মনে করা হয় বলিয়াই আইন এক স্ত্রী বর্তমানে অন্য বিবাহ করা নিষেধ করিয়াছে। মুসলমানেরা ঐ আইনের আওতায় না পড়িলেও আজকাল একাধিক বিবাহ করিতে তাঁহাদিগকে বড় একটা দেখা যায় না। যে আইন সমাজে প্রচলিত নীতিবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে তাহা বেশিদিন টিকিতে পারে না। আমেরিকার মদ্যপান নিষেধমূলক আইনের বেলায় ইহা দেখা গিয়াছে।

নীতি হইতে আইনের উৎপত্তি

রাষ্ট্র আইন করিয়া মানুষকে নৈতিক জীবন যাপন করিতে বাধ্য করিতে পারে কি? আংশিক পারে, সম্পূর্ণ পারে না। আইন শুধু মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, তাহার চিন্তা ও ভাবনার উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে না। চুরি করা, অন্যকে আঘাত করা, বা হত্যা করা, ব্যভিচার করা প্রভৃতি অনৈতিক কার্যকে আইন নিষেধ করে। কিন্তু আইন জোর করিয়া লোককে দয়ালু, জনহিতপরায়ণ, পিতামাতা ও শিক্ষকের প্রতি ভক্তি-পরায়ণ করিতে পারে না। কেহ যদি অকৃতজ্ঞ বা হিংসাপরায়ণ হয় তাহাকে আইন কৃতজ্ঞ ও প্রীতিপরায়ণ করিতে পারে না। নীতির ক্ষেত্র আইনের

আইনের এক্তিয়ার শুধু আচরণের উপর

ক্ষেত্র অপেক্ষা অনেক বেশি ব্যাপক। কেননা নীতি চিন্তা ও আচরণ উভয়কে উন্নত করে, রাষ্ট্র কেবলমাত্র আচরণকে সমাজ-মুখী ও শিষ্টজনসম্মত করিতে পারে। কোন কোন ব্যক্তি আইন প্রতিপালন করে দণ্ডের ভয়ে, কিন্তু অনেকেই আইনকে নীতিসঙ্গত বলিয়া উহা মান্য করে। নীতিকে অমান্য করিলে বিবেকের দংশন সহ্য করিতে হয়, সমাজেও অনাদৃত হইবার ভয় থাকে। কেহ যদি সামর্থ্য সত্ত্বেও বৃদ্ধ পিতামাতাকে ভরণপোষণ না করে, লোকে তাহাকে অবজ্ঞা করে। মিথ্যাবাদী যদি মিথ্যাকথনের দ্বারা অন্যের অনিষ্ট করে বা আদালতে শপথ গ্রহণ করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তবে সে আইনের দ্বারা দণ্ডিত হয়, কিন্তু যদি কেহ মিথ্যা করিয়া বলে যে সে আজ কালিয়া পোলাও খাইয়াছে তাহাকে সঙ্গীরা উপহাস করে, আইন কোন শাস্তির ব্যবস্থা করে না।

আইনের নির্দেশ যেমন সুস্পষ্ট, নীতির নির্দেশ ততটা পরিষ্কার নহে। এক নৈতিক আদেশের সঙ্গে অন্য নৈতিক আদেশের বিরোধ দেখা যায়।

নীতির আদেশ সর্বত্র সুস্পষ্ট নহে

সদা সত্য কথা বলিবে এবং অপ্রিয় কথা বলিও না ইহার সামঞ্জস্য করিতে হয় এই বলিয়া যে অপ্রিয় বাক্য সত্য হইলেও বলিও না। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে নীতির ধারণা ভিন্ন রকমের হওয়া সম্ভব। আইনও এক এক দেশে এক এক রকম। ব্যক্তি হিসাবেও আইন বিভিন্ন হয়, যেমন বাঙ্গালীরা দায়ভাগের দ্বারা এবং বিহারীরা মিতাক্ষরার দ্বারা শাসিত হয়। কিন্তু নীতির ব্যাখ্যা করিবার ও প্রয়োগ করিবার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট সংস্থা নাই; আইন সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ও বিচারালয়ে প্রযুক্ত হয়।

গ্রীন্ যথার্থই বলিয়াছেন যে নৈতিক কর্তব্য আইনের সাহায্যে সম্পাদন করানো যায় কিনা এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ নিরর্থক—কেননা এরূপ কখনই সম্ভবপর

অশোকের নীতি

নহে। অশোক তাঁহার অনুশাসন সমূহে লোককে সত্য কথা বলিতে, পিতামাতা ও গুরুজনকে ভক্তি করিতে এবং সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন। এগুলি আইনের কথা নহে, নীতির কথা। তবুও লোককে নীতিপরায়ণ করিবার জন্য তিনি ধর্মমহামাত্র নামে একদল উচ্চ কর্মচারীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা শুধু ভালো কথায় লোককে বুঝাইতেন, দণ্ড দিয়া কাহাকেও নীতিপথে

আনিবার চেষ্টা করিতেন না। অন্য কোন দেশে অন্য কোন রাজা বা সরকার লোকের নৈতিক জীবন উন্নত করিবার জন্য এত চেষ্টা আর কখনও করেন নাই।

অনুশীলন

১। Define Law, and point out the distinction and relation between Law and Morality. (1962).

বিচারকগণ বিচার করিবার সময় যে সব আচরণের নিয়মাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন তাহাই আইন। সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ধারণা ও অভ্যাসের যে অংশ সার্বজনীন নিয়মের আকারে সুস্পষ্টরূপে ও সরকারীভাবে স্বীকৃত হইয়াছে এবং যাহা সরকারের অধিকার ও ক্ষমতার দ্বারা বলবৎ করা হয় তাহাকেই প্রেসিডেণ্ট উইলসন আইন বলিয়াছেন।

একাদশ প্রকরণে নৈতিকতা বা Morality-র সহিত সম্বন্ধ দেখ।

আইনের অপেক্ষা নীতির ক্ষেত্র ব্যাপক। আইন বাহিরের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। মানুষকে জোর করিয়া সাধু, সচ্চরিত্র ও বিশ্বপ্রেমিক করিতে পারে না।

২। Define Law and point out its different sources with their relative importance (1964).

সপ্তম প্রকরণে আইনের উৎস বা sources দেখ। প্রথা, ধর্ম, পূর্বের বিচার মীমাংসা, শাশ্বতনীতি, পণ্ডিতদের ভাষ্য ও আইন প্রণয়ন এই ছয়টি প্রধান উৎস। এখন শেষোক্ত উৎসই গুরুত্ব পাইতেছে—কেননা আইনসভা প্রতি বৎসর বহু বিষয়ে আইন সৃষ্টি করিতেছে। তবে প্রথার সংখ্যাও কম নহে।

৩। The State is both the child and the parent of law. Discuss.

যেমন বীজ হইতে গাছ ও গাছ হইতে বীজ জন্মে তেমনি আইন হইতে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র হইতে আইন নির্মিত হয়। কোন সমাজের বিষয়সম্পত্তি-সম্পর্কিত প্রথাকে বলবৎ করিবার জন্য রাষ্ট্র উদ্ভূত হয়। রাষ্ট্র আইন সৃষ্টি

করে না, সমাজ মন যাহা ন্যায্য বলিয়া মানে তাহাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে (formally) স্বীকার করিয়া লয়। তবে রাষ্ট্রের শক্তি পিছনে না থাকিলে কোন আইনই কার্যকরী করা যায় না। তাই রাষ্ট্রের লিখিত আদেশকে আইন বলা হয়; রাষ্ট্র যাহা মানিয়া লয় তাহাও আইন বলিয়া গৃহীত হয়।

৪। Explain the sources and sanctions of International Law.

ষষ্ঠ প্রকরণ দেখ

ইহার আকর বা sources ছয়টি—(১) রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সন্ধি ও চুক্তি (২) আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং মধ্যস্থদের বিচার (৩) রাষ্ট্রসমূহের বৈদেশিক দপ্তরের আলাপ-আলোচনা ও চিঠিপত্র (৪) প্রাচীন রোমান্ আইন (৫) রাষ্ট্রের পৌর আইন এবং (৬) গ্রেটিয়াস্, ভ্যাটাল, হল, লরেন্স, গার্ণার প্রভৃতির দ্বারা রচিত গ্রন্থাদি।

আন্তর্জাতিক আইনকে না মানিলে দণ্ড দিবার ব্যবস্থা বড় একটা দেখা যায় না। রাষ্ট্রগুলির উপরে কোন এক দণ্ডদাতা মহা-রাষ্ট্র নাই। তবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনকারীকে বয়কট করিবার বা তাহার সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। বিশ্বের জনমতই এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক আইনের একমাত্র রক্ষাকবচ।

৫। What are the various Schools of Law? State their contributions.

তৃতীয় প্রকরণে আইনের বিশ্লেষণমূলক মতবাদ, বিবর্তনমূলক মতবাদ, দার্শনিক মতবাদ, ও সমাজবিজ্ঞানী মতবাদ দেখ।

রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদ

১। **কয়েকটি সংজ্ঞা :** ইংরাজীতে Race, People, Nation, Nationality প্রভৃতি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়। কিন্তু বাংলায় Caste বলিতেও জাতি শব্দ ব্যবহার করি, আবার race, nation প্রভৃতির অনুবাদেও জাতি কথাটিরই প্রয়োগ করি। রবীন্দ্রনাথ বলেন "স্বীকার করিতে হইবে, বাংলায় 'নেশন' কথার প্রতিশব্দ নাই।···নেশন শব্দটা অবিকৃত আকারে গ্রহণ করিতে আমি কিছু মাত্র সংকোচ বোধ করি না" (আত্মশক্তি)। Race শব্দটিকে রবীন্দ্রনাথ এবং ভারত সরকারের পরিভাষা গঠন সমিতি জাতি বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু বাংলাদেশে এখন অনেকে উহাকে কুল বলিতেছেন। Race-কে যাঁহারা কুল বলিতে চান তাঁহারা বোধ হয় রাধার শ্যাম রাখি কি কুল রাখি সমস্যার কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃতে কুল শব্দের পরিধি পরিবার অপেক্ষা বড় ও জন অপেক্ষা ছোট। আমরাও নেশনকে নেশনই বলিব, কিন্তু Nationality শব্দের অর্থ জাতীয়তাবাদ করিব এবং Raceকে জাতি বলিয়াই ধরিব। ইংরাজ ও ফরাসীরা যে অর্থে People শব্দ ব্যবহার করেন জার্মানেরা ঠিক সেই অর্থ বুঝাইবার জন্য Nation শব্দ প্রয়োগ করেন না; লাতিন ভাষায় Nation (জন্ম) শব্দ হইতে Nation ও Nationality শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ইংরাজীতে People এবং Nationality-র মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। আজকাল অনেকে নেশন ও ন্যাশনালিটি শব্দ দুইটি বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করেন। তাঁহারা বলেন যে ন্যাশনালিটি একটি অধ্যাত্ম চেতনা; কতকগুলি লোক যখন একই ভূখণ্ডে বাস করে, একই জাতি, একই ভাষা, একই ধর্ম, একই ঐতিহ্য ও প্রথা, একই প্রকার সর্বজনীন স্বার্থ, রাজনৈতিক সংঘ এবং রাজনৈতিক ঐক্যের আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় তখন তাহাদিগকে ন্যাশনালিটি বলে। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রের সঙ্গে ন্যাশনালিটি যুক্ত হইলে নেশন্ হয়। ন্যাশনালিটি মাত্রেই হয় অতীতে রাষ্ট্র ছিল কিংবা ভবিষ্যতে

রবীন্দ্রনাথের পরিভাষা

রাষ্ট্র হইতে চায়। রবীন্দ্রনাথ ন্যাশনালিটি শব্দের স্থলে নেশন শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন। জিমার্ন বলেন যে, কোন নির্দিষ্ট আবাসভূমির সহিত সংশ্লিষ্ট সংঘবদ্ধভাবের বিশেষ অন্তরঙ্গ, গুরুত্বপূর্ণ এবং মর্যাদাযুক্ত প্রকাশই ন্যাশনালিটি ("Nationality is a form of corporate sentiment of peculiar intensity, intimacy and dignity related to a definite home country.")*

ন্যাশনালিটি কি

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক সীমাবিভাগকে নেশনের ভিন্নতা সাধনের একটা প্রধান হেতু বলিয়া মানিলেও তাহাকে চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন "ভূখণ্ডে, জাতিতে, ভাষায় নেশন গঠন করে না। ভূখণ্ডের উপর যুদ্ধক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্রের পত্তন হইতে পারে, কিন্তু নেশনের অন্তকরণটুকু ভূখণ্ডে গড়ে না। জনসম্প্রদায় বলিতে যে পবিত্র পদার্থকে বুঝি, মনুষ্যই তাহার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। সুগভীর ঐতিহাসিক মন্থনজাত নেশন একটি মানসিক পদার্থ, তাহা একটি মানসিক পরিবার, তাহা ভূখণ্ডের আকৃতির দ্বারা আবদ্ধ নহে।"

২। **ন্যাশনালিটির উপাদানঃ** রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতেরা সাতটি উপাদান লইয়া ন্যাশনালিটির ভাবধারা গঠিত হইয়াছে বলিয়াছেন। ঐগুলি হইতেছে (১) সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকার, (২) জাতি (race) গত একতা, (৩) ভাষাগত ঐক্য, (৪) ধর্মের একতা, (৫) একই সরকারের অধীনতা, (৬) আর্থিক প্রয়োজনের ঐক্য এবং (৭) ঐতিহ্যের একতা। এই গুলির মধ্যে কোনটিকেই অপরিহার্য বলা চলে না। আবার একটিও যদি না থাকে তাহা হইলেও ন্যাশনালিটির ভাব দানা বাঁধিতে পারে না।

সাতটি উপাদান

* Oppenheimer বলেন—"the Consciousness of nationality makes the nation and not the nation the Consciousness of nationality". ন্যাশনালিটি মনস্তাত্ত্বিক ধারণা মাত্র। ম্যাকআইভার উহার সংজ্ঞা ঠিক করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—'We define nationality as a type of Community sentiment, a sense of belonging together, created by historical circumstances and supported by common spiritual possessions, of such an extent and so strong that those who feel it, desire to have a common government particularly or exclusively of their own"

পূর্বেই বলিয়াছি যে ভূখণ্ড অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু বিভিন্ন দেশে বাস করিয়াও লোকে একই ন্যাশনালিটির ভাবসূত্রে আবদ্ধ রহিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কয়েক বৎসর পূর্বে ইহুদিদের নিজের কোন রাষ্ট্র ছিল না। তাহারা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া ছিল এবং এখনও আছে। তথাপি প্রত্যেক ইহুদির মনে ন্যাশনালিটির ভাব এত প্রবল যে, সুদূরে অবস্থিত অন্যান্য ইহুদির সঙ্গে সে মানসিক ঐক্যসূত্রে সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। পোলিশ জাতীয় লোকেরাও বিভিন্ন দেশে বাস করিয়া ঐরূপ ঐক্য বোধ করিত।

ভূখণ্ড

Race বা জাতি আধুনিক নৃতত্ত্বের মতে একটি কল্পিত ধারণা মাত্র। পৃথিবীতে কোন জাতির মধ্যেই রক্তের বিশুদ্ধতা নাই। হিট্‌লার নর্ডিক জাতির বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য হাজার হাজার ইহুদিকে বলি দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রিয় নর্ডিক জাতির ধমনীতে অন্যান্য বহু জাতির শোণিত প্রবাহিত হইতেছে। জার্মান, ইংরাজ, ডাচ, ওলন্দাজ প্রভৃতি একই জাতির লোক, কিন্তু তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ন্যাশনালিটির কোন বন্ধন নাই। আবার আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বহু জাতির লোক বসবাস করে, তাহারা সকলেই জাতীয়তার ঐক্য বোধ করে।

রেস্ বা জাতি

ঐক্য বন্ধনের এক প্রধান ধারক ও বাহক হইতেছে ভাষা। কিন্তু সুইট্‌জারল্যাণ্ডের লোক তিনটি ভাষায় বিভক্ত হইয়াও জাতীয়তাবোধের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু ভারতবর্ষে বাংলা ভাষার সহিত ওড়িয়া এবং অসমীয়া ভাষার সামান্য মাত্র পার্থক্যও সময়ে সময়ে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটায়। আবার অন্যদিকে একই ভাষায় কথাবার্তা বলিলেও ইংরাজ ও আমেরিকান্ বিভিন্ন ন্যাশনালিটিভুক্ত। আমাদের বাড়ির কাছেও এরূপ একটি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

ধর্মের ঐক্য এককালে বেশ প্রবল ছিল। তুর্কীদের অধীনে গ্রীসের খ্রীষ্টানগণ, প্রোটেস্ট্যান্ট ইংলণ্ডের অধীনে আয়র্লণ্ডের ক্যাথলিকেরা বা প্রোটেস্ট্যান্ট জার্মানির অধীনে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত পোলেরা জাতীয়তার ঐক্যবন্ধন প্রবলভাবে বোধ করিত। সাধারণতঃ যেখানে লোক মনে করে যে অপর ধর্মের লোকেরা তাহাদের উপর অত্যাচার করিতেছে, সেইখানেই ঐরূপ ন্যাশনালিটির ভাব

ধর্ম

জাগে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করিতেন যে এ যুগে ধর্মবোধ ন্যাশনালিটির ততটা পুষ্টি সাধন করে না। একথা সত্য হইলে পাকিস্তানের উদ্ভব হইত না।

সকলের বৈষয়িক স্বার্থ এক এই বোধ হইতে ন্যাশনালিটির ভাব জাগে সন্দেহ নাই। পরের অধীন যাহারা তাহারা মনে করে যে স্বাধীন হইতে পারিলে তাহারা এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিত যাহার ফলে তাহাদের কৃষি, শিল্পোদ্যোগ ও বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইত। এই বোধ যে মিথ্যা নহে, তাহা স্বাধীন ভারতের আঠারো বৎসরের আর্থিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু শুধু আর্থিক স্বার্থের খাতিরে লোকে যৌথ কারবার খুলিতে পারে, নেশন গড়িতে পারে না।

বৈষয়িক স্বার্থ

এক সরকারের অধীনতা ঐক্যবোধকে দৃঢ়তর করে। ভারতবর্ষের গুজরাটি, মহারাষ্ট্রী, তেলঙ্গী, বাঙ্গালি, ওড়িয়া প্রভৃতি এক বৃটিশ সরকারের অধীনতা পাশে বদ্ধ থাকার সময়েই এক জাতীয়তার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। সেই অধীনতা বিদূরিত হওয়ায় এখন আবার সময় সময় ঐক্য অপেক্ষা বিভেদের উপর কেহ কেহ জোর দিতেছেন। এক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে যোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও স্পেন নেশন হইয়ছিল। বহু সরকারের দ্বারা শাসিত ছিল বলিয়া ইতালি ও জার্মানির বিভিন্ন অংশ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও একতা লাভ করিতে পারে নাই।

এক সরকারের অধীনতা

যে সকল ব্যক্তি একই ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাহারা পরস্পরের মধ্যে প্রবল ঐক্যভাব সম্বন্ধে সচেতন হয়। ফরাসী মনীষী রেনেঁার মত ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া রবীন্দ্রনাথ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন—"নেশন একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ। দুইটি জিনিস এই পদার্থের অন্তঃ-প্রকৃতি গঠিত করিয়াছে। সেই দুইটি জিনিস বস্তুত একই। তাহার মধ্যে একটি অতীতে অবস্থিত, আর একটি বর্তমানে। একটি হইতেছে সর্ব-সাধারণের প্রাচীন স্মৃতি সম্পদ; আর একটি পরস্পরের সম্মতি; একত্রে বাস করিবার ইচ্ছা, যে অখণ্ড উত্তরাধিকার হস্তগত হইয়াছে, তাহাকে উপযুক্ত ভাবে রক্ষা করিবার ইচ্ছা।

রেনেঁার মত

মানুষ উপস্থিত মতো নিজেকে হাতে হাতে তৈয়ারি করে না। নেশনও সেইরূপ সুদীর্ঘ অতীত কালের প্রয়াস, ত্যাগস্বীকার এবং নিষ্ঠা হইতে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। আমরা অনেকটা পরিমাণে আমাদের পূর্বপুরুষের দ্বারা পূর্বেই গঠিত হইয়া আছি। অতীতের বীর্য, মহত্ত্ব, কীর্তি ইহার উপরেই ন্যাশনাল ভাবের মূল পত্তন। অতীতকালে সর্বসাধারণের এক গৌরব এবং বর্তমানকালে সর্বসাধারণের এক ইচ্ছা; পূর্বে একত্রে বড়ো কাজ করা এবং পুনরায় একত্রে সেই কাজ করিবার সংকল্প; ইহাই সম্প্রদায় গঠনের ঐকান্তিক মূল। আমরা যে পরিমাণে ত্যাগ স্বীকার করিতে সম্মত হইয়াছি এবং যে পরিমাণে কষ্ট সহ্য করিয়াছি, আমাদের ভালবাসা সেই পরিমাণ প্রবল হইবে।" এক রাষ্ট্রভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যদি ঐতিহ্যের বিভিন্নতা থাকে তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে সংহতি ব্যাহত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে এবং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইউরোপে ঐরূপ ২৩টি দেশের সরকারের পতন ঘটিয়াছিল।

আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন যে, ন্যাশনালিটির মূল উপাদান হইতেছে সংহতি বোধ। ভৌগোলিক সীমা, জাতি, ভাষা, বৈষয়িক স্বার্থ, এমন কি ঐতিহ্যের মধ্যেও উহার রহস্য খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। ইহাদের প্রত্যেকটিই অপ্রত্যক্ষভাবে ন্যাশনালিটির বোধকে পরিপূর্ণ করিয়াছে, কেননা প্রথমে প্রত্যক্ষরূপে উহাদের প্রভাব পড়ে মানুষের মনের উপর। সংহতিবোধ যখন প্রবল আকার ধারণ করে তখন ন্যাশনালিটির ভাববস্তু হইতে নেশনরূপ সজীব সত্তার উদ্ভব হওয়া সম্ভব হয়।

সংহতি বোধ

স্বামী বিবেকানন্দ 'বর্তমান ভারতে' বলিয়াছেন যে "সাধারণ বিপদ ও ঘৃণা এবং সাধারণ প্রীতি সহানুভূতির কারণ। মৃগয়াজীবী পশুকুল যে নিয়মাধীনে একত্রিত হয়, মনুজবংশও সেই নিয়মাধীনে একত্রিত হইয়া জাতি বা দেশবাসীতে পরিণত হয়। একান্ত স্বজাতি বাৎসল্য ও একান্ত ইরাণ-বিদ্বেষ গ্রীকজাতির, কার্থেজ বিদ্বেষ রোমের, কাফের-বিদ্বেষ আরবজাতির, ফ্রান্স-বিদ্বেষ ইংলণ্ড ও জার্মানির ও ইংলণ্ড-বিদ্বেষ আমেরিকার উন্নতির এক প্রধান কারণ নিশ্চিত।"

স্বামী বিবেকানন্দের মতে সাধারণ বিপদ ও ঘৃণা এবং সাধারণ প্রীতি জাতীয়তার প্রেরণা দেয়

৩। জাতীয় রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশঃ প্রাচীনকালে লোকে এক ভূখণ্ডে বাস করিয়া এক সরকারের বশ্যতা স্বীকার করিলেও জাতীয়তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিল না। পরস্পরের মধ্যে মেলা-মেশার সুযোগ ও ভাবের আদান-প্রদান না হইলে জাতীয় সংহতির ভাব মনে জাগে না। সেকালে যানবাহনের সুবিধা ছিল না, রাস্তাঘাটও ভালো ছিল না। লোকে ইচ্ছামত সভাসমিতিতে মিলিত হইতে পারিত না। প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন জনপদগুলি এবং প্রাচীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্রগুলি ভাষা ও ধর্মের ঐক্য সত্ত্বেও এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবার প্রয়োজন বোধ করে নাই। মৌর্য বংশের সময় তিন পুরুষ, খিল্‌জী বংশের সময় এক পুরুষ ও মুঘলবংশের সময় চার পুরুষকাল ব্যাপিয়া উত্তর ভারতের সহিত দক্ষিণ ভারতের কিয়দংশ এক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু জবরদস্তি করিয়া যে ঐক্য চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহা বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রীতির বন্ধন আনিতে পারে নাই। প্রাচীন মিশর, অ্যাসিরিয়া, বেবিলন, এবং পারস্য সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল, কিন্তু কোথাও জাতীয় ভাবের বিন্দুমাত্রও উৎপন্ন হয় নাই। রোমান্ সাম্রাজ্য ঐসব সাম্রাজ্য অপেক্ষা উদার ছিল। ২১২ খৃষ্টাব্দে রোমানগণের বিশাল সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রজাকে রোমের নাগরিক বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন সম্প্রদায়ই নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া স্বাতন্ত্র্য চাহে নাই। অপর দিকে রোমান্ সম্রাটেরা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রাণের ঐক্য জাগাইতে পারে নাই।

প্রাচীন যুগে জাতীয়-ভাবের অভাব

রোমান্ সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার পর পবিত্র রোমান্ সাম্রাজ্যের উদ্ভব হয়, কিন্তু ব্রাইসের ভাষায় উহা না ছিল পবিত্র, না রোমান্, না সাম্রাজ্য। উহা খৃষ্টীয় জগতের বিভিন্ন দেশের উপর একটা অস্পষ্ট প্রভুত্ব মাত্র দাবি করিত। সেই দাবি লইয়া আবার পোপের সঙ্গে সম্রাটের ঘোরতর বিরোধ চলিত। এই দাবির প্রকোপে কিন্তু ইউরোপের কোন দেশেই জাতীয় রাষ্ট্র সংস্থাপিত হইতে পারে নাই। প্রত্যেক দেশেই অসংখ্য সামন্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধিকার রাজার শক্তিকে দুর্বল করিয়া রাখিয়াছিল। গোলাবারুদের আবিষ্কারের

মধ্য যুগের সাম্রাজ্য, চার্চ ও সামন্ততন্ত্রের বাধা

ফলে সামন্তদের দুর্গ আর দুর্ভেদ্য রহিল না। রাজার পক্ষে সহজেই উহা অধিকার করা সম্ভব হইল। সামন্তেরা রাজার অধীনতা সম্পূর্ণভাবে মানিতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে আবার ইংলণ্ডে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে পোপের ক্ষমতা হ্রাস পাইল এবং পোপ যে সব ক্ষমতা ব্যবহার করিতেন তাহা রাজার হাতে আসিল। বণিকদের বিদেশে বাণিজ্য যাত্রার ফলেও এক দেশের বণিকদের সঙ্গে অন্য দেশের বণিকের পার্থক্য প্রতীয়মান হইল। তাহাতেও জাতীয়তা বোধ বৃদ্ধি পাইল। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও স্পেনে জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপিত হয়। কিন্তু সে সময়ে রাষ্ট্রকে রাজা বা রানীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করা হইত। শাসন-ব্যবস্থায় লোকের কোন হাত ছিল না। তাই জনসাধারণের মনের উপর জাতীয়তাবাদ খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

ফরাসী বিপ্লবের সময়ে গণতন্ত্রের দাবি ঘোষণা করা হয়। তাহারই আনুষঙ্গিক হিসাবে জাতীয়তার দাবি উপস্থিত হইল। নেপোলিয়ন একের পর এক দেশ অধিকার করিতে লাগিলেন। বিজিত দেশের লোকদের মনে বিদেশীর প্রভুত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জাগিতে লাগিল। অবশেষে জার্মানি ও রাশিয়ায় তাঁহার সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইল তাহার প্রচণ্ডতার ফলে নেপোলিয়নের ক্ষমতার অবসান হইল। কিন্তু তাঁহার পতনের পর অস্ট্রিয়ার মন্ত্রী মেটারনিক্ জাতীয়তাবাদকে দমন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অস্ট্রিয়ার অধীনে অনেকগুলি জন-সম্প্রদায় ছিল; তাহাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ বৃদ্ধি পাইলে অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যাইবে এই ভয়ে তিনি ঐরূপ প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। রাশিয়ার সম্রাটও অনুরূপ কারণে তাঁহার সহায়তা করেন। তুরস্কের সাম্রাজ্যের অধীনেও অনেক জনসম্প্রদায় ছিল। বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের মধ্যে ভাষা, ধর্ম, আচার-ব্যবহার, আর্থিক স্বার্থ প্রভৃতির ঘোরতর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মেটারনিক্ জোর করিয়া উভয় দেশকে এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বেলজিয়াম স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। তুর্কিদের বিরুদ্ধে জাতীয় বিদ্রোহের ফলে গ্রীকেরা ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনে সমর্থ হইল। ম্যাট্‌সিনি ইতালিতে জাতীয়ভাব

প্রচার করেন। ইতালির বিভিন্ন অংশ তাঁহার অনুপ্রেরণায় এবং কাভুরের রাজনীতির ফলে ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে এক রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হইল। ঐ সময়ে বিসমার্ক কৌশল ও বল প্রয়োগ করিয়া জার্মানির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে প্রুশিয়ার অধীনে আনিয়া এক শাক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বার্লিনের সন্ধির ফলে সার্বিয়া, মন্টেনিগ্রো ও রুমানিয়া তুরস্কের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইল। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বুলগেরিয়াও তুর্কী সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন হইল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জাতীয়তাবাদ এতই জনপ্রিয় হইয়াছিল যে, লোকে উহাকে এত নূতন ধর্মের মতন শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিল। জাতীয় সংগীত হইল উহার মন্ত্র এবং জাতীয় পতাকা উহার প্রতীক।

নবনব নেশনের উৎপত্তি

প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও তুর্কির সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া গেল। পোল্যাণ্ডকে তাহার তিন শক্তিশালী প্রতিবেশী সাম্রাজ্য (রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও প্রুশিয়া) গ্রাস করিয়াছিল। ১২৫ বৎসর পরে পোল্যাণ্ড আবার স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র হইল। রাশিয়ার কবল হইতে মুক্তি পাইয়া ফিনল্যাণ্ড, এস্থোনিয়া, ল্যাটভিয়া ও লিথুনিয়াও অনুরূপ সম্মান লাভ করিল। বহুকাল অস্ট্রিয়ার অধীনে থাকিবার পর ম্যাগেয়ার জাতি হাঙ্গেরীতে, চেক্ জাতি চেকোস্লোভাকিয়াতে এবং স্লাভেরা যুগোস্লাভিয়াতে নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন করিতে সমর্থ হইল। চারিদিকে জাতীয়তাবাদের জয় জয় ধ্বনি উঠিল। কিন্তু অনেকগুলি জন-সম্প্রদায় তখনও নিজেদের রাষ্ট্র স্থাপন করিতে না পারিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন কবিতে লাগিল। তাহাদের কথা পরে বিস্তারিতভাবে বলিব।

সাম্রাজ্য লোপ ও নেশন স্টেটের উদ্ভব

প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে ইউরোপে জাতীয়তাবাদ জয়যুক্ত হইয়াছিল। আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জনগণ সুদীর্ঘকালের জাতীয় আন্দোলনের পর সাফল্য লাভ করিল। ইউরোপের জাতীয়তাবাদই ইহাদিগকে অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছিল। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ, পাকিস্তান ও সিংহল নামে যাহাই হউক কার্যতঃ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইল। ১৯৪৮

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নেশন

খৃষ্টাব্দে বর্মা ইংরাজদের ৬২ বৎসর ব্যাপী অধিকার হইতে মুক্ত হইল। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ইন্দোনেশিয়া হল্যাণ্ডের ত্রিশতাধিক বৎসরের সাম্রাজ্য হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া স্বাধীন হইল। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে সম্মিলিত জাতিসংঘের চাপে পড়িয়া ফ্রান্সের সরকার লাওস্, কাম্বোডিয়া ও ভিয়েৎনামকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করিলেন। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে মালয় স্বাধীনতা লাভ করিল।

আফ্রিকার নব জাগরণ

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর রাজনৈতিক ঘটনা হইতেছে আফ্রিকা মহাদেশে জাতীয়তাবাদের জয়-জয়কার। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে ফ্রান্স, বেলজিয়াম, পর্তুগাল, ইংলণ্ড প্রভৃতির আফ্রিকাস্থিত সাম্রাজ্য চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে এবং নূতন নূতন জাতীয় রাষ্ট্র জন্ম গ্রহণ করিতেছে। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম আফ্রিকায় ঘানা স্বাধীনতা লাভ করিয়া কমনওয়েলথের সদস্য হইল। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের অধীনতাপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রের সম্মান লাভ করে ক্যামেরুন, টোগোল্যাণ্ড, সেনেগল, মালি (ফরাসী সুদান), মালাগাসি (মাদাগাস্কার), দাহোমে, আপারভোল্টা, আইভরি কোস্ট, ফরাসী, কঙ্গো, চাদ, গাবোঁ, মধ্য আফ্রিকা রিপাব্লিক, নাইজার রিপাব্লিক ও মরিটানিয়া। ব্রিটিশেরা সোমালিয়া ও নাইজেরিয়াকে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে এবং সিয়েরা লিওনকে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে স্বাধীন করিয়া দেন। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে কঙ্গো বেলজিয়ামের নিকট হইতে স্বাধীনতা লাভ করে।

৪। **নেশন ও রাষ্ট্র:** গুড়, চিনি ও মিছরি যেমন একই জিনিস, কিন্তু দানা বাঁধার তারতম্যের দরুণ তিন নামে পরিচিত, ন্যাশনালিটি, নেশন ও রাষ্ট্র তেমনি মূলতঃ একই জিনিস, তবে তাহাদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনার পার্থক্য আছে। ন্যাশনালিটি ভাব বস্তু; ইহার আশা-আকাঙ্ক্ষা যখন পূর্ণ হয়, এক জনসম্প্রদায় যখন একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিতে সমর্থ হয় তখন উহা নেশন বা জাতিপদবাচ্য হয়।

ন্যাশনালিটি ও রাষ্ট্রের মধ্যে কয়েকটি মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। ন্যাশনালিটি শুধু মনের মধ্যে অবস্থিত ঐক্যের ভাব, রাষ্ট্র বাস্তবক্ষেত্রে

প্রকাশমান আইনগত প্রতিষ্ঠান। কাহারও পক্ষে জাতীয়তার ভাব অনুভব করা না করা তাহার নিজের উপর নির্ভর করে, কিন্তু প্রত্যেককে রাষ্ট্রের সদস্য হইতে হয়। রাষ্ট্রের সদস্যতা অপরিহার্য ও বাধ্যতামূলক, কিন্তু ন্যাশনালিটির ভাব স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এবং সেই জন্যই উহার প্রভাব ব্যাপক ও গভীর।

ন্যাশনালিটি ভাবমাত্র, রাষ্ট্র কার্যক্ষেত্রে প্রকাশ

এক ন্যাশনালিটির লোকেরা মনে করে যে তাহারা নিজেদের একটি রাষ্ট্র স্থাপন করিতে পারিলে তাহাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষিত ও বিকশিত হইবে এবং আর্থিকক্ষেত্রে তাহারা অধিকতর উন্নতি লাভ করিতে পারিবে।

ন্যাশনালিটির ভাব হইতে নেশন সংগঠিত হয়। নেশন ও রাষ্ট্র শব্দ পরস্পরের প্রতিশব্দ রূপে অনেক সময় ব্যবহৃত হয়। এখন ইউরোপের মতন এশিয়া ও আফ্রিকাতেও বহু ন্যাশনালিটি নিজেদের রাষ্ট্র গঠন করিয়া নেশন নামে পরিচিত হইতেছে। কিন্তু প্রত্যেক রাষ্ট্র নেশন নাও হইতে পারে। কোন কোন রাষ্ট্রের মধ্যে একাধিক ন্যাশনালিটি থাকিতে পারে। পূর্বে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সাম্রাজ্যে ও তুর্কী সাম্রাজ্যের অধীনে বহু ন্যাশনালিটি ছিল। সেই জন্য ঐ দুইটিকে রাষ্ট্র বলিলেও নেশন বলা হইত না। এখন অবশ্য প্রত্যেক ন্যাশনালিটি লইয়া এক এক রাষ্ট্র গঠনের প্রবৃত্তি দেখা যায়। কিন্তু সর্বত্রই যে এরূপ হইয়াছে বা হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। সোভিয়েট রাশিয়ার ভিতর অনেকগুলি ন্যাশনালিটি বর্তমান, কিন্তু সোভিয়েট সরকার তাহাদের প্রত্যেকের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্য যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে।

এক নেশনের এক রাষ্ট্র

৫। **আত্মনির্ধারণের নীতিঃ** ফরাসী বিপ্লবের পর হইতে জন-সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তার ভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। জন্ স্টুয়ার্ট মিল প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনপ্রণালীর (Representative Government) কথা বিবেচনা করিতে যাইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে যেখানেই জাতীয়তার ভাব বেশ প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে সেইখানেই এক জনসম্প্রদায়ের (Nationality) সকল লোককে এক সরকারের

মিলের মত

শাসনের ঐক্যে স্থাপন করা এবং তাঁহাদিগের জন্য এক স্বতন্ত্র সরকারের ব্যবস্থা করার মোটামুটি যুক্তি রহিয়াছে। একদিকে গণতান্ত্রিক শাসনের প্রচলন, অন্যদিকে এক ন্যাশনালিটির লোককে অন্য ন্যাশনালিটির অধীন করিয়া রাখার মধ্যে যথেষ্ট স্ববিরোধ রহিয়াছে। নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধির দ্বারা শাসিত হইবার অধিকারকে যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে রাষ্ট্রের ভিতর একটি আত্ম-সচেতন জনসম্প্রদায়কে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ জাতীয়তাবাদ এবং গণতান্ত্রিক শাসনপ্রণালীর দাবি একই উৎস হইতে উত্থিত।

আত্মনিধারণবাদের উৎপত্তি

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং রাষ্ট্র বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের লেখক উড্রো উইলসন্ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি রূপে যখন ভার্সাইয়ের সন্ধিসভায় যোগ দিতে আসিলেন তখন তিনি প্রত্যেক ন্যাশনালিটির আত্মনির্ধারণের নীতি ঘোষণা করিলেন। মিলের মতবাদকে তিনি কার্যকরী করিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তির ফলেও বটে, জাতীয়তাবাদের প্রতি রাজনৈতিক নেতাদের সহানুভূতির জন্যও বটে ঐ নীতি সন্ধির ভিত্তিরূপে গৃহীত হইল। জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সাতটি ন্যাশনালিটিকে সাতটি রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করা হইল। উহারা হইতেছে পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, এস্টোনিয়া, ল্যাটভিয়া, লিথুনিয়া, ড্যানজিগ্ ও চেকোস্লোভাকিয়া। কতকগুলি জনসম্প্রদায়কে এমন রাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তরিত করা হইল যাহার সহিত উহাদের ন্যাশনালিটি এক। যেমন শ্লিজউইক ও হলস্টেইন দিনেমার জাতির দ্বারা অধ্যুষিত বলিয়া উহা জার্মানি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ডেনমার্কের সঙ্গে যুক্ত করা হইল। অ্যালসাক্ ও লোরেন পূর্বে ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া পুনরায় জার্মানের নিকট হইতে লইয়া ফ্রান্সের হাতে দেওয়া হইল। কিন্তু বিজয়ী শক্তির জার্মানদের বেলায় আত্মনির্ধারণের নীতি প্রয়োগ করিলেন না। যেমন প্রধানতঃ জার্মান অধ্যুষিত Polish Corridor পোল্যাণ্ডকে দিয়া প্রুশিয়াকে অবশিষ্ট জার্মানি হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইল। ইউপেন ও ম্যালমেডি নামক স্থানের অধিবাসীরা জার্মান হইলেও তাহাদিগকে বেলজিয়মের কর্তৃত্বে রাখা হইল। অস্ট্রিয়া ও জার্মানি উভয় রাষ্ট্রেই এক জার্মান জাতির লোকের

উহার প্রভাব

বসবাস, তাহা সত্ত্বেও উহাদিগকে পৃথক্ করিয়া রাখা হইল এবং জার্মানিকে চুক্তিবদ্ধ করা হইল এই বলিয়া যে সে যেন অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতাকে মান্য করিয়া চলে।

আত্মনির্ধারণের নীতির স্বপক্ষে গণতান্ত্রিক যুক্তি ছাড়া আরো কয়েকটি যুক্তি উপস্থিত করা হয়। প্রথমতঃ প্রত্যেক জাতির কিছু-না-কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। নিজেদের সরকার না হইলে ঐ বৈশিষ্ট্য রক্ষা পাইতে পারে না এবং উহার পরিস্ফুরণও হয় না। নিজের সরকার যেমন মমত্ববোধের সহিত জাতীয় বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটাইতে উদ্যোগী হইবেন, অন্য জাতীয় সরকার নিশ্চয়ই সেরূপ আন্তরিকতা দেখাইবেন না। বিমাতা যতই ভাল হউন মাতার মতন যত্ন করিতে পারেন না।

জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা

দ্বিতীয়তঃ বলা হয় যে কোন নারী যদি একজন পুরুষকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে, অথচ তাহাকে জোর করিয়া ঐ পুরুষের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয় তাহা হইলে উহা যেমন অন্যায় ও অস্বাভাবিক হয়, এক জাতীয়তার ভাবে ঐক্যবদ্ধ কোন জনসম্প্রদায়কে অন্য জাতির শাসনের অধীনে রাখাও তেমনি অনুচিত।

তৃতীয়তঃ ইতিহাসের উদাহরণ দিয়া বলা হয় যে ব্রিটেন আমেরিকাস্থ উপনিবেশগুলির বেলায় আত্মনির্ধারণ নীতি প্রয়োগ করিতে অস্বীকার করিয়াছিল বলিয়া সে উহাদিগকে চিরকালের জন্য হারাইল। আবার সে ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, সিংহল প্রভৃতি দেশকে আত্মনির্ধারণ করিতে দিয়াছে বলিয়া কমনওয়েলথ্ টিকিয়া আছে এবং ব্রিটেন শক্তিশালী রহিয়াছে। ঐ সব রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় কমনওয়েলথের সদস্য রহিয়াছে।

ইতিহাসের সাক্ষ্য

চতুর্থতঃ বলা হয়েছে আত্মনির্ধারণ নীতি শান্তি ও সদ্ভাবের আবহাওয়া সৃষ্টি করে। এক জাতি জোর করিয়া অন্য জাতিকে যদি দাবাইয়া রাখিতে যায়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে হিংসাদ্বেষ বৃদ্ধি পায়। শাসক জাতির শত্রুরা শাসিতদিগকে উস্কানি দিয়া যুদ্ধবিগ্রহও ঘটায়। পরাধীন ভারত ইংরাজকে ভয় করিত, হিংসা করিত, কিন্তু স্বাধীন ভারত ইংরাজের সঙ্গে মৈত্রীর বন্ধনে বদ্ধ।

শান্তি

সর্বশেষে বলা হয় যে প্রত্যেক জাতির নিজ নিজ সরকার যখন তাহাদের বৈশিষ্ট্যকে ফুটাইয়া তুলিবে তখন বিশ্বসভ্যতার বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পাইবে। ব্যক্তির

যেমন জীবনে ব্যক্তিত্ব ফুটাইবার অধিকার আছে, জাতির তেমনি নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যকে বিকশিত করিবার স্বাভাবিক অধিকার আছে। সেই অধিকারকে স্বীকার করিলে মানব-সভ্যতা অধিকতর পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইবে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"বৈচিত্র্য এবং অনেক সময় বিরোধী প্রবৃত্তি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন নেশন সভ্যতা বিস্তারকার্যে সহায়তা করিতেছে। মনুষ্যত্বের মহাসংগীতে প্রত্যেকে এক-একটি সুর যোগ করিয়া দিতেছে, সবটা একত্রে মিলিয়া বাস্তবলোকে যে একটি কল্পনাগম্য মহিমার সৃষ্টি করিতেছে, তাহা কাহারও একক চেষ্টার অতীত" (আত্মশক্তি, নেশন কী)।

বৈচিত্র্য

কিন্তু আত্মনির্ধারণের নীতিকে সকল ক্ষেত্রে নির্বিচারে প্রয়োগ করা যায় না, যাইলেও তাহার ফল ভাল হয় না। ভার্সাই সন্ধির ফলে যে সাতটি রাষ্ট্রকে আত্মনির্ধারণের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল তাহারা ২০।২২ বৎসরের বেশি নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারে নাই। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে জার্মানি পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকার করিয়া লইল, পরের বৎসরে রাশিয়া ফিন্‌ল্যাণ্ড, লিথুনিয়া, এস্টোনিয়া ও ল্যাটভিয়াকে কুক্ষিগত করিল। ডানজিগ্, এত ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ছিল যে তাহার পক্ষেও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভবপর হইল না। রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়া দিলেই হয় না, উহার সার্বভৌমিকতা রক্ষা করিবার ক্ষমতা থাকা দরকার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেও অনেকগুলি ছোট রাষ্ট্র উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে খুব কম রাষ্ট্রেরই নিজের জোরে আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতা আছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সদিচ্ছা এবং পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতার গুণে তাহারা কোন ক্রমে টিকিয়া আছে। সম্মিলিত জাতিসংঘও তাহাদের অস্তিত্বের অনুকূলে আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে।

অপকারিতা

আত্মরক্ষায় অসমর্থ

অনেক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের যেমন আত্মরক্ষার ক্ষমতা নাই তেমনি তাহাদের আর্থিক জীবনও পরমুখাপেক্ষা। কোন রাষ্ট্রই অবশ্য সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভর হইতে পারে না, কিন্তু জীবনযাত্রার পক্ষে অপরিহার্য অধিকাংশ জিনিসের জন্যই যদি অন্য রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করিতে হয় তাহা হইলে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সার্থকতা কোথায় ?

আর্থিক অক্ষমতা

বরং বলা চলে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিলে বিরোধ ও

সংঘাত বৃদ্ধি পাইতে পারে। আজকালকার রাষ্ট্রের আর কোন ক্ষমতা যতটা থাকুক বা না থাকুক অন্যান্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শুল্কের দেওয়াল (Tariff wall) তুলিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা যথেষ্ট আছে। ইহার ফলে অবাধ বাণিজ্য ব্যাহত হয়। মানুষের মধ্যে কৃত্রিম বাধা-নিষেধ অনর্থক বৈরিতা জন্মায়। আত্মনির্ধারণের স্বপক্ষে বলা হয় যে ইহা স্বীকার করিলে যুদ্ধবিগ্রহ কমিবে; কিন্তু উহা রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অশান্তির মাত্রা বাড়াইতেও পারে। আজকাল ছোটখাট রাষ্ট্রগুলি কোন না কোন বড় রাষ্ট্রের তাঁবেদারি করিয়া নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতেছে। কিন্তু কে কোন রাষ্ট্রের উপর কতখানি আর্থিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করিবে, ইহা লইয়া বড় রাষ্ট্রদের মধ্যে সুদীর্ঘকালব্যাপী ঠাণ্ডাযুদ্ধ লাগিয়াই আছে।

বিরোধ বৃদ্ধি

আত্মনির্ধারণের নীতিকে অভ্রান্ত সত্যরূপে মানিতে হইলে অনেক সুপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে হয়। ইউরোপে এখন ২৮টি মাত্র রাষ্ট্র আছে; আত্মনির্ধারণের ক্ষমতা যদি প্রত্যেক *ন্যাশনালিটিকে* দিতে হয় তাহা হইলে একমাত্র ইউরোপেই রাষ্ট্রের সংখ্যা দাঁড়াইবে ৬৮। কিন্তু তাহাতেও যে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে তাহা নহে। যে কোন রাষ্ট্রের মধ্যে ভিন্ন ভাষাভাষী কিংবা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কিছু সংখ্যক লোক জোটবন্দী হইয়া স্বাধীনতার দাবি করিতে পারে। ধর্মের দাবিতে স্বাতন্ত্র্য চাওয়া এখন আর ভারতবর্ষের বাহিরে বড় একটা দেখা যায় না। রাষ্ট্রগুলির মধ্যে নদী, পাহাড়, সমুদ্র প্রভৃতির প্রাকৃতিক ব্যবধান থাকা উচিত বলিয়া অনেকে মনে করেন, যদিও এখন এরোপ্লেন ও আণবিক বোমার কৃপায় আর কোন প্রাকৃতিক সীমাই কোন রাষ্ট্রকে সুরক্ষিত রাখিতে পারে না। তবুও একটি রেলস্টেশনের এপারে এক রাষ্ট্র, ওপারে অন্য রাষ্ট্র থাকা যেন অনেকটা অনৈসর্গিক ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। আত্মনির্ধারণের ক্ষমতা স্বীকার করিতে যাইয়া এ ধরনের ব্যাপার ঘটিয়াছে। ভারতের পার্বত্য-নাগাদের কিংবা বর্মার ক্যারেনদের আত্মনির্ধারণ ক্ষমতা স্বীকার করিতে হইলে রাষ্ট্রের সংহতি নষ্ট হইয়া যাইবে।

রাষ্ট্রের সংহতি নাশ

কেহ কেহ বলেন যে আত্মনিধারণের নীতি মানিতে হইলে গ্রেট্ ব্রিটেনকে স্কট্ল্যাণ্ড, ওয়েল্স্, উত্তর আয়াল্যাণ্ড ও ইংলণ্ড এই চারিটি রাষ্ট্রে এবং *সুইট্জারল্যাণ্ডকে ভাষা ও ধর্মের ভিত্তিতে তিনটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করার প্রয়োজন*

হইবে। এ যুক্তি খুব সঙ্গত মনে হয় না। কেননা ওয়েল্‌স্ বা স্কটল্যাণ্ডের লোক ইংলণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহে, কিংবা সুইট্‌জারল্যাণ্ডের বিভিন্ন ভাষাভাষীরা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্থাপন করিতে চাহে, এমন অদ্ভুত কথা কখনও শোনা যায় নাই। যাহারা মিলিয়া মিশিয়া এক জাতি (নেশন) হইয়া গিয়াছে তাহাদিগকে উস্কানি দিয়া বিভিন্ন করিবার চেষ্টা করা অত্যন্ত অন্যায়।

যেখানে লোকে মিলিয়া মিশিয়া আছে সেখানে উস্কানি দেওয়া অনুচিত

৬। **জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ**: জাতীয়তাবাদ কালক্রমে বিকাশ লাভ করিয়া সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়। পুঁজিপতিরা প্রথমে রাষ্ট্রের মধ্যে উগ্র স্বাদেশিকতা প্রচার করেন। বিদেশী জিনিসের আমদানি বন্ধ করিলে বা উহার উপর উচ্চহারে শুল্ক বসাইলে তাঁহাদের মুনাফা বেশি হয়। বাহিরের প্রতিযোগিতা আইনের সাহায্যে বন্ধ করাইয়া তাঁহারা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার স্থলে সহযোগিতা করিয়া একচেটিয়া অধিকারস্থাপনের চেষ্টা করেন। তাহার ফলে ক্রেতারা ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা বেশি দাম দিতে বাধ্য হন এবং শ্রমিকেরা ন্যায্য বেতনের চেয়ে কম বেতন পান। তাহাদের জিনিস কিনিবার ক্ষমতা বাড়ে না, অথচ উৎপাদনের হার ক্রমাগত না বাড়াইলে পুঁজিপতিদের বেশি লাভ হয় না। সেইজন্য পুঁজিপতিরা বাহিরে বাজার খোঁজেন। কোন অনুন্নত দেশকে অধিকার করিয়া লইতে পারিলে, সেখানে উদ্বৃত্ত মাল বিক্রয় করার সুবিধা হয় এবং সেখানকার কাঁচা মাল সস্তা দামে কেনা যায়। এই সব উদ্দেশ্য লইয়াই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইউরোপীয় জাতিরা এশিয়া ও আফ্রিকাতে সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। তাঁহাদের লোভের সীমা নাই, কিন্তু পৃথিবীর ভূভাগ সসীম। তাই একজাতির সঙ্গে অন্য জাতির বিরোধ বাধে। বিংশ শতাব্দীর দুই মহাযুদ্ধই বিকৃত জাতীয়বাদ সাম্রাজ্যবাদরূপে স্ফীত হওয়ার ফলে উদ্ভুত হইয়াছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে যখন বুয়র যুদ্ধ বাধিয়াছিল তখনই মহাকবি রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের এই বীভৎস পরিণতি লক্ষ্য করিয়া 'নৈবেদ্যে' লিখিয়াছিলেন—

পুঁজিবাদের প্রভাবে জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যলোভী হয়

জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়,
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।

কোন জাতি যখন একটি দেশের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে, তখন

অন্যান্য জাতিরা তাহার প্রতি হিংসাদ্বেষে ক্লিষ্ট হইয়া তাহাকে ছোট করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগে। তাহাদের হানাহানি দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

তাহাতে বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়

ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে,
বাহি স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্বতের পানে।

জাতীয়তাবাদের পণ্যতরী সমুদ্রের মধ্যে লুক্কায়িত পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা খাইয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে—ইহা কবিকল্পনা মাত্র নহে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে জাতীয়তাবাদ প্রচণ্ড শক্তির সঞ্চার করিয়াছে এবং ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিহত করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "Nationalism" নামক গ্রন্থে জাতীয়তাবাদকে মানবতাবিরোধী ও মানবীয় ঐক্যসাধনের প্রধান অন্তরায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বজ্রনির্ঘোষে বলিয়াছেন—"The Nation, with all its paraphernalia of power and prosperity, its Flags and pious hymns, its blasphemous prayers in the Churches and the literary mock thunders of its patriotic bragging can not hide the fact that the Nation is the greatest evil for Nation, that all its precautions are against it, and any new birth of its fellow in the world is always followed in its mind by the dread of a new peril. Its one wish is to trade on the feebleness of the rest of the world, like some insects that are bred in paralysed flesh of victims kept just enough alive to make them toothsome and nutritious. Therefore, it is ready to send its poisonous fluid into the vitals of the other living peoples, who, not being nations, are harmless." ইহার ভাবার্থ এইভাবে করা যায়—এই যে নেশন তার ক্ষমতার ও ঐশ্বর্যের ঢাকঢোল পিটাইতেছে, তাহার পতাকা ও ধর্ম-সংগীত লইয়া গির্জায় গির্জায় ধর্মদ্রোহী প্রার্থনা করিতেছে এবং দেশপ্রেমের বড়াইয়ের শূন্যগর্ভ সাহিত্যিক বজ্রনির্ঘোষ করিতেছে, তাহাতে এই কথাটি চাপা দিতে পারিতেছে না যে জাতিই হইতেছে জাতির পক্ষে অশুভ, তাহারই বিরুদ্ধে

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাদের বিরুদ্ধে বজ্রনির্ঘোষ

ইহাকে কত সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইতেছে; এবং যখন পৃথিবীতে কোন নূতন জাতির উদ্ভব হইতেছে তখনই তাহার মনে এক নূতন আতংকের বিভীষিকা জাগিতেছে। জাতির একমাত্র বাসনা হইতেছে বাকী দুনিয়ার দুর্বলতাকে তেমনি করিয়া আহার্য হিসাবে ভোগ করা, যেমন করিয়া এক রকমের কীটেরা ভক্ষ্য প্রাণীর পঙ্গু দেহের মধ্যে জন্মলাভ করিয়া তাহাকে সেইটুকু পরিমাণ বাঁচাইয়া রাখে যতটুকু তাহাদের চর্বণসুখের ও পরিপুষ্টির জন্য প্রয়োজন। সেইজন্য নেশন অন্যান্য সজীব জনসমাজের পেটের মধ্যে তাহার বিষাক্ত লালা ঢুকাইয়া দেয়; আর তাহারা নেশন নহে বলিয়া কোনই প্রতিকার করিতে পারে না।

লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ

লেনিন তাঁহার সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে পুঁজিবাদ নিজের নিজের দেশের জনসাধারণকে জাতীয়তাবাদের মদিরা পান করাইয়া উন্মত্ত করিয়া তুলে এবং সাম্রাজ্যরক্ষার যুদ্ধে তাহাদিগকে কামানের খোরাক হিসাবে ব্যবহার করে। আধুনিক চীনের আচরণ হইতে কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, সাম্যবাদীরাও সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য কম ব্যগ্র নহেন।

জাতীয়তাবাদ অপরিহার্য

দুর্বল জাতিদের ঐক্যসাধনার শ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে জাতীয়তাবাদ। ঐক্য লাভ করিতে না পারিলে তাহারা প্রবল প্রতিবেশীদের কবল হইতে রক্ষা পাইবে না। কিন্তু পুঁজিবাদকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহার সাম্রাজ্যগ্রাসী লোভকে নিবৃত্ত করা প্রয়োজন। বিশ্বের ঐক্য সাধনের জন্য প্রত্যেক জাতির স্বাতন্ত্র্যকে বিলুপ্ত করা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না।

লোক অপসারণ

সর্বশেষে আত্মনির্ধারণ-নীতির একটি বিষময় ফলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। ঐ নীতির ফলে হাজার হাজার তুর্ককে গ্রীস হইতে এবং বহুসংখ্যক গ্রীকজাতীয় লোককে তুর্কি হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। জার্মানি ও পোল্যাণ্ড এবং জার্মানি ও চেকোস্লোভাকিয়ার মধ্যেও অত্যন্ত ব্যাপকভাবে লোক বদলি করা হইয়াছিল। ইহা যে কিরূপ মর্মান্তিক ও দুঃখপ্রদ ব্যাপার তাহা উদ্বাস্তুসমস্যার সঙ্গে সুপরিচিত বাঙ্গালাভাষীদিগকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। অবশ্য ইউরোপে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তি করিয়া লোক

বিনিময় করা হইয়াছিল বলিয়া সেখানে এক বাস্তুর পরিবর্তে অন্য বাস্তু দেওয়া হইয়াছিল; লোককে উদ্বাস্তু হইয়া পথে দাঁড়াইতে হয় নাই।

৭। রাষ্ট্র এক-জাতিক কিংবা বহু-জাতিক হওয়া ভাল? একটি ন্যাশনালিটি বা জাতি-সম্প্রদায় যদি একটি রাষ্ট্রে থাকে তাহা হইলে আত্মনির্ধারণের নীতিকে মানা হয়। ঐ নীতির ভালমন্দ বিচার করিয়া দেখা গেল যে উহা মোটের উপর ভাল হইলেও, সকল ক্ষেত্রে উহা মানা চলে না। যেখানে জাতীয়তাবাদ প্রবল প্রভাব বিস্তার করে, সেখানে শান্তি ও সদ্ভাব রাখার জন্য তাহাকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্থাপন করিতে দেওয়াই ভাল। এই ধারণার বশেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এত নূতন নূতন রাষ্ট্রকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে সম্মিলিত জাতিসংঘে সদস্য সংখ্যা ছিল ৫১, এখন তাহা ১১১ হইয়াছে।

একজাতিক রাষ্ট্রের প্রভাব

জন স্টুয়ার্ট মিল্ বলেন যে বিভিন্ন ন্যাশনালিটি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক প্রথা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মর্যাদা রাখা প্রায় অসম্ভব। অতীতে রাশিয়ার জার ও তুর্কির সুলতান শাসিত জন-সম্প্রদায়ের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করিয়াছিলেন। এখন সুইট্জারল্যাণ্ডে বহু ভাষাভাষী লোক বাস করে, কিন্তু তাহারা নিজদিগকে সুইস্ ছাড়া আর কিছু ভাবে না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আমেরিকান ন্যাশন্যালিটির প্রভাব এমনই গভীর যে অল্পদিনের মধ্যেই অন্যান্য ভাষাভাষীরা ইংরাজিকেই মাতৃভাষা বলিয়া গ্রহণ করে। সেইজন্য সুইট্জারল্যাণ্ড বা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের সাফল্য দেখাইয়া মিলের মতকে খণ্ডন করা চলে না।

বহুজাতিক রাষ্ট্রে স্বাধীনতা থাকে কি?

সুপ্রসিদ্ধ সমাজবিজ্ঞানী গামপ্লাউইট্স্ বলেন যে এক-জাতিক রাষ্ট্র যে বহুজাতিক রাষ্ট্রের অপেক্ষা অধিক সুবিধাজনক একথা ইতিহাস অথবা সমাজবিজ্ঞান সমর্থন করে না। তিনি সুইট্জারল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিয়াছেন যে বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন ধর্ম থাকা সত্ত্বেও সেখানে যেমন গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা দেখা গিয়াছে এমন আর কোন দেশে নহে। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে, লর্ড অ্যাকটন ইংরাজ সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগে

লিখিয়াছিলেন যে সমাজের মধ্যে যেমন অনেক মানুষের বাস, রাষ্ট্রের মধ্যেও তেমনি অনেক জন-সম্প্রদায়ের একত্র থাকা সভ্যতার লক্ষণ। বিদ্যায় বুদ্ধিতে উন্নত জাতির সংসর্গে আসিয়া হীন জাতিরা (race) উন্নত হয়। রাষ্ট্রের মধ্যেই ঐসব জাতি একীভূত হয় এবং একের জ্ঞান, শৌর্য ও কার্যদক্ষতা অন্যজাতিদের মধ্যে সংক্রামিত হয়। লর্ড অ্যাকৃটনের এই যুক্তি সেই রাষ্ট্রের সম্বন্ধে প্রযোজ্য যেখানে বিভিন্ন জাতি স্বেচ্ছায় এক সরকারের অধীনে থাকিতে সম্মত হইয়াছে। কিন্তু তিনি ছোট ও বড় জাতির (race) কথা তুলিয়াছেন। বড়র পীরিতি বালির বাঁধের মতন। সমানে সমানে না হইলে অন্তরের মিল হয় না।

বহুজাতিক রাষ্ট্র কি কল্যাণকর ?

যে বহু-জাতিক রাষ্ট্র দমন-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা মানবের কল্যাণের বিরোধী। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে অস্ট্রিয়ার জার্মানেরা ও হাঙ্গেরির ম্যাগেয়ার জাতি অন্যান্য জাতিকে নিষ্পেষিত করিতেছিল। রাশিয়ানেরা পোল, ফিনিস্ প্রভৃতি জাতিকে নিজেদের ভাষা পর্যন্ত শিখিবার অধিকার দেয় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর তুরস্ক রাষ্ট্রে গ্রীক, বুলগার, রুমেনিয়ান্, কুর্দ প্রভৃতির লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। জাতীয়তাবাদের প্রবল বন্যায় ঐসব সাম্রাজ্য ভাসিয়া গিয়াছে।

অত্যাচারী বহুজাতিক রাষ্ট্রে

কিন্তু এমন বহু-জাতিক রাষ্ট্রও আছে যেখানে প্রত্যেক ন্যাশনালিটির বৈশিষ্ট্যকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য সকল প্রকার যত্ন গ্রহণ করা হয়। রাশিয়াতে একদিকে যেমন সকল ন্যাশনালিটির ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করা হইতেছে, অন্যদিকে তেমনি একই ভাবধারায় সকলকে অভিসিক্ত করিয়া তাহাদিগকে সোভিয়েট রাষ্ট্রের গৌরবের অংশীদার করা হইতেছে।

সার্থক বহুজাতিক রাষ্ট্র

রাশিয়া ও সুইট্জারল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত হইতে আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, বহুজাতিক রাষ্ট্রকে সংঘীয় রাষ্ট্রে (federal government) পরিণত করিলে তাহা একদিকে যেমন সবল হইবে, অন্যদিকে তেমনি অন্তর্ভুক্ত জাতিসমূহের ভাষা, আচার, প্রথা ও অন্যান্য জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারিবে।

সমাধানের সন্ধান রহিয়াছে সংঘীয় রাষ্ট্রের মধ্যে

৮। জাতীয়তাবাদের বিকৃতি হইতে বিপদ ঃ একদিকে জার্মানির আদর্শবাদী হেগেল, অন্যদিকে ইতালির ঐক্যমন্ত্রের প্রচারক ম্যাট্‌সিনি জাতীয় রাষ্ট্রকে মানবীয় সংগঠনের শ্রেষ্ঠতম রূপ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতি বশ্যতা স্বীকারকে মানবের মৌলিক কর্তব্য বলিয়া নিরূপণ করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদ যেন এক নূতন ধর্মের আকার গ্রহণ করিয়াছিল। একদিক দিয়া ইহা বহু-সংখ্যক ব্যক্তিকে একতাসূত্রে বদ্ধ করে, তাহারা সকলে যেমন নিজেদের মধ্যে ঐক্য অনুভব করে, তেমনি অপর জাতির সঙ্গে পার্থক্য বোধ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়া লয়। জাতীয়তাবাদ এক দুইমুখো দেবতা। যে মুখ তাহার স্বজনের দিকে রহিয়াছে সে মুখে প্রীতি উছলিয়া উঠিতেছে, আর যে মুখ বহির্জগতের দিকে ফেরানো আছে সেখানে অবজ্ঞা, ঘৃণা, হিংসা ও বিদ্বেষ ফুটিয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদকে self-idolatory বা নিজের মূর্তিকে নিজে পূজা করার মূঢ়তার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। উহা শুধু নিজের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে না, নিজের জাতিকে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে। যে নিজেকে বড় মনে করে, সে অপরকে ছোট বলিয়া ঘৃণা করে। সে নিজের প্রাধান্য স্থাপন করিবার জন্য অন্যের উপর অত্যাচার করে। তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ঘটে যুদ্ধে। বিংশ শতাব্দীর দুইটি মহাযুদ্ধই বিকৃত জাতীয়তা-বাদের বিষময় ফল। উভয় যুদ্ধেই জার্মানির অস্বাভাবিক দম্ভ ও গৌরববোধ প্রকট হইয়াছিল।

দুইমুখো দেবতা

হিংসা দ্বেষের বৃদ্ধি

বিকৃত জাতীয়তাবাদ নিজের দেশের লোকের পক্ষেও কল্যাণকর হয় না। জাতীয়তাবাদীরা সকলের চিন্তা ও আচরণকে একই রূপ দিতে চায়। নির্জীব পাথরের টুক্‌রাকে রোলার দিয়া পিষিয়া ফেলা যত সহজ, স্বাধীন ইচ্ছাসম্পন্ন মানুষকে ঢালিয়া সাজা তত সহজ নহে। কিন্তু উগ্র জাতীয়তাবাদীরা কাহারও কোন স্বাতন্ত্র্য বরদাস্ত করিতে পারে না। তাহারা যদি এক প্রকারের বেশভূষা করে বা এক প্রকারে ভাব প্রকাশ করে, অন্য সকলকেও সেইরূপ করিতে বাধ্য করে। ধর্মের গোঁড়ামিও জাতীয়তাবাদের অসহিষ্ণুতার

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিরোধী

কাছে ঠিকে মনে হয়। সাধারণ লোকে নিরুপদ্রবে জীবন যাপন করিতে চায়। কাজেই জাতির নামে যখন প্রকৃতই কোন গুরুতর অন্যায় করা হইতেছে, তখন ভয়ের চোটে তাহারা মুখ বুজিয়া থাকে। জাতীয়তাবাদীরা একটি নিরপরাধ দুর্বল দেশকে গ্রাস করিতে যখন উদ্যত হয়, তখন অসমসাহসিক ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনীষী ছাড়া অন্য কেহ তাহাদের কার্যকে অন্যায় বলিতে সাহসী হয় না। ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যে, ঐরূপ মনীষীকে মত প্রকাশের স্বাধীনতা হইতেও বঞ্চিত করা হইয়াছে।

কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখা দরকার যে, নূতন দেশ জয় করিয়া বা দুর্বল রাষ্ট্রের কাছে অস্ত্রশস্ত্র কিংবা শিল্পজাত দ্রব্য বেচিয়া লাভ হয় কাহার? ভোজের সময় টেবিলের তলায়-বসা কুকুর যেমন দু-এক-টুক্‌রা রুটি পায়, তেমনি দেশের শ্রমিকেরা শ্রমের মূল্যস্বরূপ কিছু কিঞ্চিৎ পাইলেও, পুঁজিপতিরাই মুনাফা ভোগ করেন। তাঁহারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের প্রচারে সর্বাধিক উৎসাহ দেখান। সরকারের বিদেশী বাণিজ্য ও শুল্ক নির্ধারণ নীতির উপর তাঁহাদের অপ্রত্যক্ষ প্রভাব অসাধারণ। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদকে স্বার্থের খাতিরে রাজনীতি ও বাণিজ্যনীতির সংগঠন বলিয়াছেন। অন্য একজন লেখক আরও জোরালো ভাষায় বলিয়াছেন মনুষ্যত্ব হইতে পশুত্বে পৌঁছিবার রাজপথ হইতেছে জাতীয়তাবাদ।

ধনীদের স্বার্থ

এই উক্তি অবশ্য শুধু বিকৃত, উগ্র ও স্বার্থান্ধ জাতীয়তাবাদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। যে জাতীয়তাবাদ শুধু নিজের রাষ্ট্রেরই উন্নতি চাহে, নিজেদের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের মানদণ্ড ন্যায়ধর্মানুসারে উন্নত করিতে চাহে তাহাকে নাৎসী ও ফাসিস্টদের দ্বারা প্রচারিত জাতীয়তাবাদের সঙ্গে এক করিয়া দেখা উচিত নহে। যে জাতীয়তাবাদে অপর রাষ্ট্রের প্রতি ব্যবহারের বেলায় পঞ্চশীল স্বীকৃত হয় তাহা শ্লাঘ্য ও কাম্য।

নিজে বাঁচ ও অন্যকে বাঁচিতে দাও

৯। **জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা:** মানুষের মনের উপর প্রভুত্ব লইয়া আজ জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার মধ্যে প্রবল বিরোধ দেখা দিয়াছে। বড় বড় রাষ্ট্রগুলি মুখে আন্তর্জাতিকতার বুলি আওড়াইতেছে, আর কাজে পরস্পরের গলা কাটিবার জন্য উদ্যোগ আয়োজন করিতেছে।

তাহারা বেশ জানে যে, এই আণবিক যুগে যে কেহ যুদ্ধ বাধাইবে সে অপরকে মারিবে এবং নিজেও মরিবে। আণবিক যুদ্ধে জেতা, বিজেতা, নিরপেক্ষ কেহ থাকিবে না, সকলেই ধ্বংস হইবে। তাহা জানিয়াও তাহারা অস্ত্রশস্ত্রের পিছনে টাকা ঢালিতে কসুর করিতেছে না। নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব মাত্র উঠে, কিন্তু কার্যতঃ কেহই উহাতে পূর্ণ বিশ্বাসী নহে।

মুখে ও মনে তফাৎ

গোলাবারুদ আবিষ্কারের ফলে সামন্ততন্ত্রের ধ্বংস হইয়াছিল। এরোপ্লেনের ও জেপলিনের আবিষ্কারের পর ক্ষুদ্ররাষ্ট্রগুলির পক্ষে স্বাধীনতা রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইল। আর আণবিক বোমা আবিষ্কারের পর বড বড় রাষ্ট্রের পক্ষেও আত্মরক্ষা করা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের কথা ও কাজের মধ্যে যদি সামঞ্জস্য থাকিত তাহা হইলে সম্মিলিত জাতিসংঘের নেতৃত্বে তাহারা শান্তি ও মৈত্রীর সহিত পরস্পরের সঙ্গে একত্রে বাস করিত।

আণবিক যুগে বিশ্ব-মানবের ঐক্য

এইরূপ করাই তো স্বাভাবিক। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে এক দেশের সহিত অন্য দেশের যে দূরত্বের ব্যবধান ছিল তাহা আর এখন নাই। আমরা পরস্পরকে ভাল করিয়া জানি না বলিয়া একে অন্যকে শত্রু মনে করি। এক দেশের পক্ষে অন্য দেশকে জানিবার ও বুঝিবার এখন কত সুবিধা হইয়াছে! তবুও যদি আমরা অন্যের সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকি এবং অন্যকে বিশ্বাস না করিতে পারি সে অপরাধ অমার্জনীয়। আন্তর্জাতিক আদানপ্রদান এখন প্রচুর হইতেছে। মানুষের অবশ্য প্রয়োজনীয় বহু ব্যাপারে আন্তর্জাতিক বিধানকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। ডাক ও তারের আদানপ্রদানের ব্যাপারে আমরা যেমন আন্তর্জাতিক নিয়ম করিয়া সংবাদ আদানপ্রদানের সুবিধা করিয়া লইয়াছি, অন্যান্য ব্যাপারেও সেরূপ করিতে পারিব না কেন? রাষ্ট্রের আয়ের একটা মোটা অংশ আজকাল ব্যয় করা হইতেছে অস্ত্রশস্ত্র, সৈন্য-সামন্ত, জাহাজ ও উড়ো জাহাজের উপর। ঐ ব্যয়ের পরিমাণ প্রত্যেক রাষ্ট্রে ক্রমে বাড়িয়াই যাইতেছে। আমেরিকা ও সোভিয়েট ইউনিয়ন যদি সামরিক ব্যয় দশ গুণ করিয়া বাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাদের আপেক্ষিক শক্তি

দূরত্ব নষ্ট হইয়া গিয়াছে

অস্ত্র-শস্ত্রের প্রতি-যোগিতায় ক্ষতি

সমানই থাকিয়া যায়। অতি বড় বুদ্ধিমান জাতিরা এই সরল সত্যটি উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। ইহার অন্যতম প্রধান কারণ হইতেছে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার মতবাদ। আন্তর্জাতিকার ইহার চেয়ে বড় শত্রু আর নাই। যত শীঘ্র ইহা পরিত্যক্ত হয় ততই মঙ্গল।

জাতীয়তাবাদের বিষ অনেকের মনের উপর কাজ করিতেছে। প্রত্যেক বড় রাষ্ট্রই সকলের চেয়ে বড় হইবার চেষ্টা করিতেছে। সেই জন্য সম্মিলিত

জোটবন্দী হওয়া

জাতিসংঘকে নামে মাত্র মানিয়া আমেরিকা উত্তর আতলান্তিক প্রদেশ, মধ্যপ্রাচ্যে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নানারূপ সামরিক চুক্তি করিতেছে ও জোট পাকাইতেছে। চীন পঞ্চশীল স্বীকার করিয়াও পররাষ্ট্র গ্রাস করিতে উদ্যত হইতেছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন ক্রমাগত নিজের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। এই অবস্থায় বিশ্বশান্তি রক্ষা পাইবে কিরূপে?

জাতীয়তার সার্থকতা যে একেবারে নাই তাহা নহে। রবীন্দ্রনাথ 'আত্মশক্তিতে' লিখিয়াছেন "আইডিয়া যত বড়োই হউক, তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে একটা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ জায়গায় প্রথমে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। তাহা ক্ষুদ্র হউক, দীন হউক, তাহাকে লঙ্ঘন করিলে চলিবে না।" জাতীয়তার ভিতর দিয়া আন্তর্জাতিকতার পুষ্টিসাধন অসম্ভব নহে।

অনুশীলন

১। Discuss the problem of Nationalism vs. Internationalism. (1962)

অষ্টম ও নবম প্রকরণ দেখ।

জাতীয়তাবাদ হইতে যুদ্ধবিগ্রহের ও সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব হয়। আন্তর্জাতিকতার মনোভাব বৃদ্ধি না পাইলে মানুষের অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব হইবে না। নেশন বা জাতীয়রাষ্ট্রই মানবসভ্যতার চরম বিকাশ নহে। শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে শেষ পর্যন্ত এক বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। বিভিন্ন জাতি মিলিয়া এই সংঘাত্মক রাষ্ট্র স্থাপন করিবে। তাহাতে কাহারও প্রভাব কিছু বেশি থাকিবে হয়তো, কিন্তু কেহ কাহারও অধীন হইবে না—

সকলে সমানে হইবে। "The ultimate result must be the formation of a World-State and the most desirable form of it would be a federation of free nationalities in which all subjection or forced inequality and subordination of one to another would have disappeared and, though some might preserve a greater natural influence, all would have an equal status." (The Ideal of Human Unity, P 17)

২। What is meant by the doctrine of self-determination ? Discuss the value and limitations of this doctrine.

Self-determination বা আত্মনির্ধারণের নীতির ব্যাখ্যা পঞ্চম প্রকরণে দেখ। ইহাতে বিভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত ও বিকশিত হয়। কিন্তু ছোট ছোট জাতি আত্মরক্ষায় অসমর্থ। তাহাদের আর্থিক জীবনও পরের উপর নির্ভর করে। এই নীতির উপর বেশি জোর দিলে রাষ্ট্রের সংহতি নষ্ট হইতে পারে ও যুদ্ধবিগ্রহ বাধিতে পারে।

৩। Explain the constituent elements of Nationality with special reference to India. Do you think that Nationalism is a danger to world peace ?

দ্বিতীয় প্রকরণে ভূ-খণ্ড, জাতি, ধর্ম, আর্থিক স্বার্থ, এক সরকারের অধীনতা, ঐতিহ্য ও সংহতি বোধ এই সাতটি উপাদান দেখ। জাতীয়তাবোধ হইতে যুদ্ধবিগ্রহ বাধা স্বাভাবিক—কেননা প্রত্যেক জাতিই অন্যের চেয়ে বড় হইতে চায়।

৪। 'The state is essentially political. Nationality is primarily cultural and only incidentally political.' Discuss with special reference to India.

জাতীয়তার উপাদানে বিচার করিয়া দেখাও যে ভারতে বিভিন্নপ্রদেশে ভাষা ও ধর্ম পৃথক্ পৃথক্ হইলেও প্রাচীন ঐতিহ্য ও আর্থিক স্বার্থ এক। জাতীয়তাবোধ কচিৎ কখনও ভাষা ও ধর্মের পার্থক্যহেতু ব্যাহত হইলেও প্রত্যেক ভারতবাসী এখন এক রাষ্ট্রের মধ্যে থাকার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন।

৫। What are the factors that tend to create a nationality? How does a nation come into being in a country of diverse nationalities?

দ্বিতীয় প্রকরণে ব্যাখ্যাত সাতটি উপাদান দেখ। বিদেশী শাসনের চাপে বা বিদেশী আক্রমণের ভয়ে এবং আর্থিক উন্নতিলাভের আশায় বিভিন্ন জাতি (nationalities) এক রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারে। তাহাদের মধ্যে সংস্কৃতিগত ঐক্য নাও থাকিতে পারে।

অষ্টম অধ্যায়

নাগরিকতা

১। **নাগরিকের সংজ্ঞা :** কোন রাষ্ট্রের সদস্যকে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলে। কিন্তু সদস্য কে তাহা প্রত্যেক রাষ্ট্রের আইনের দ্বারা নির্ণীত হয়। মোটামুটি বলা যায় যে যাহারা স্থায়ীভাবে কোন রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাস করে, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে ও উহার প্রতি নিজের দায়িত্ব পালন করে তাহাদিগকে নাগরিক বলে।

নাগরিকের সঙ্গে ভোটের অধিকার অচ্ছেদ্য নহে

এখানে আমরা ইচ্ছা করিয়াই অধিকারের কথা তুলিলাম না। অধিকার দুই প্রকার। সামাজিক ও রাজনৈতিক। ধনসম্পত্তি রক্ষার, মত প্রকাশের ও সংঘ করিবার অধিকারকে সামাজিক অধিকার বলা যাইতে পারে। আধুনিক রাষ্ট্রে ধন-প্রাণ প্রভৃতি রক্ষার বিষয়ে রাষ্ট্রস্থ বৈদেশিকের সহিত স্বীয় নাগরিকের কোন পার্থক্য রাখে নাই। ভোট দেওয়া, নির্বাচিত হওয়া ও চাকুরি পাওয়া প্রভৃতি রাজনৈতিক অধিকার কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকেরাই ভোগ করিতে পারেন। নাবালক এবং নাবালিকারা পারেন না। যদি নাগরিকের সংজ্ঞা দিতে যাইয়া বলা হয় যে, যাঁহারা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করেন তাঁহারাই মাত্র নাগরিক, তাহা হইলে ২১ বৎসরের কম বয়সের সব ছেলেমেয়েকে নাগরিক সংজ্ঞা হইতে বাদ দিতে হয়। রাজনৈতিক বক্তারা ছাত্রছাত্রীকে 'ভবিষ্যৎ নাগরিক' বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু তাঁহারা বর্তমানে কি ?

যদি বলা যায় যে যাহাদের রাজনৈতিক অধিকার নাই তাহাদিগকে প্রজা বলা হউক তাহা হইলেও দুইটি আপত্তি উঠে। প্রথমতঃ আইনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে যাহারা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে তাহারা সকলেই প্রজা, সুতরাং মাত্র নাবালকদিগকে প্রজা বলার কোন হেতু নাই। দ্বিতীয়তঃ প্রজা শব্দটি রাজার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ; কিন্তু এখন সত্যিকারের রাজা কোথাও নাই। সুতরাং সামন্ততন্ত্রের আমলের ঐ শব্দটি ব্যবহার না করাই ভালো।

ন্যাশনাল ও নাগরিক

কেহ কেহ ফরাসী ভাষায় Citoyen ও Nationaux মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহার অনুসরণ করিয়া বলিতে চান যে নাবালকদিগকে অসম্পূর্ণ নাগরিক বা National বলা হউক। এ মতও গ্রহণ করা যায় না, কেন না আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি রাজ্যের বাহিরে গুয়াম প্রভৃতি স্থানে যাহারা অ-নাগরিকের গর্ভে বা ঔরসে জন্মিযাছে তাহাদিগকে ন্যাশনাল বলে, নাগরিক বলে না।

ছোটবড়, আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই রাষ্ট্রের সদস্য। ভোট দিবার অধিকারের সঙ্গে নাগরিকতার কোন সম্পর্ক নাই। গার্ণার বলেন, "The possession of the electoral privilege is not essential to citizenship and there is no necessary connection between them." সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মিলারের রায়ে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

আরিস্টটল নাগরিকের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন যে সরকারী কার্যপরিচালনায় যে অংশ গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রের প্রদত্ত সম্মানের অধিকারী সেই নাগরিক। তাঁহার সামনে মাত্র নগররাষ্ট্রের আদর্শ ছিল। এরূপ ছোটখাট রাষ্ট্রে সকলে একত্র মিলিয়া সরকারী কাজ নির্বাহ করা সম্ভব ছিল।

আরিস্টটলের সংজ্ঞা এখন মানা যায় না

কিন্তু এখন রাষ্ট্রের কোটি কোটি লোকের পক্ষে সরকারী কাজে অংশ গ্রহণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, পেরিক্লিসের গৌরবময় যুগে এথেন্সের রাষ্ট্রে একলক্ষ উনিশ হাজার লোক বাস করিত, তাহারই মধ্যে বড়জোর চল্লিশ হাজার নাগরিক ছিল। বাকী সকলে দাস শ্রেণীভুক্ত ছিল। ঐ চল্লিশ হাজার নাগরিকের মধ্যে প্রতি বৎসর ছয় হাজার জুরি ও উনিশ হাজার সরকারী কর্মচারীকে লটের (Lot) দ্বারা নির্বাচন করা হইত। আধুনিক রাষ্ট্রে এমনটি হয় না। সেইজন্য আরিস্টটল-প্রদত্ত নাগরিকের সংজ্ঞা এ যুগে অচল।

লাস্কি বলেন যে, সার্বজনীন কল্যাণের জন্য ব্যক্তির সুশিক্ষিত বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগই হইতেছে নাগরিকতা (citizenship "is the contribution of one's instructed judgment to public good.")। ইহাতে নাগরিকতার সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাকে সংজ্ঞা বলা যায় না। কেন না যাহারা বুদ্ধিবিবেচনাপূর্বক

বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন

জনকল্যাণে অংশ গ্রহণ করে না, তাহাদিগকে নাগরিকতার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার কোন নিয়ম কোথাও নাই। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী বলেন যে, রাষ্ট্রের এমন সদস্যকে নাগরিক বলে যিনি সমাজের উচ্চতম নৈতিক কল্যাণ কিসে হয় তাহা বুদ্ধিমত্তার সহিত উপলব্ধিপূর্বক নিজেকে রাষ্ট্রের মধ্যে সার্থক ও সুবিকশিত করিয়া তুলেন। এটিকেও নাগরিকতার আদর্শের অভিব্যক্তি বলা যায়, সংজ্ঞা হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। আমেরিকার

বিচারালয় প্রদত্ত সংজ্ঞা

সুপ্রিম কোর্টের প্রদত্ত সংজ্ঞাটিতে নাগরিকতার লক্ষণ সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। উহা এই প্রকার:—নাগরিকেরা রাজনৈতিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত এবং উহার সদস্য সেই জনসমষ্টি যাহাদের দ্বারা রাষ্ট্র সংগঠিত এবং যাহারা সকলে মিলিয়া তাহাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকার রক্ষার জন্য সরকারের প্রতিষ্ঠা করে বা সরকারের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে ("The citizens are members of the political community to which they belong. They are the people who compose the state and who in their associated capacity have established or subjected themselves to the dominion of a government for the protection of their individual as well as their collective rights.")

২। **নাগরিক ও বিদেশী:** রাষ্ট্রের মধ্যে যাহারা বসবাস করে তাহাদিগকে সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। অধিকাংশ লোকই নাগরিক, আর কিছু সংখ্যক বিদেশী। নাগরিকেরা ঐ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে, আর বিদেশীরা বাহিরের নিজ নিজ রাষ্ট্রের অনুগত। বিদেশীদের মধ্যে যে দুই চারজন দৌত্যাবাসের সহিত সংশ্লিষ্ট তাঁহারা নিজের নিজের রাষ্ট্রের আইনের অধীন, কিন্তু অন্য সকলে যেখানে বাস করিতেছেন সেস্থানের আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য। তাঁহারা

বিদেশীর সঙ্গে স্বদেশীর তফাৎ

আদালতের এলাকার মধ্যে পড়েন অর্থাৎ তাঁহাদের বিরুদ্ধে নালিশ করা যাইতে পারে এবং তাঁহারাও অপরের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে পারেন। তাঁহাদিগকে খাজনা, ট্যাক্স সব কিছু দিতে হয়। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার মতন দুই চারিটি রাষ্ট্র বিদেশীকে স্থাবর সম্পত্তি অর্জন করিতে দেয় না। যুদ্ধের সময়

নাগরিকেরা সৈন্যদলে ভুক্ত হন, বিদেশীদিগকে সাধারণতঃ রক্ষা বা আক্রমণের কার্যে নিযুক্ত করা হয় না। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় কিন্তু যে সকল বিদেশী ইংরাজ উত্তর আমেরিকায় বাস করিতেছিলেন, তাঁহারাও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিদেশীদিগের ধনপ্রাণও রাষ্ট্র কর্তৃক সংরক্ষিত হয়, কিন্তু যদি বিশেষ কোন দেশের লোকের বিরুদ্ধে কোন সময়ে বিদ্বেষ জাগে এবং তাহাদের উপর লুঠতরাজ চলে, তাহা হইলে উহার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে সেই রাষ্ট্র রাজী হয় না। তখন বিদেশীরা নিজ নিজ রাষ্ট্রের মারফৎ ক্ষতিপূরণের দাবি উপস্থিত করিতে পারে।

রাজনৈতিক অধিকার

কোন রাষ্ট্রই বিদেশীকে ভোট দিতে বা নির্বাচিত হইতে দেয় না। তবে আমেরিকায় যে সব বিদেশী ঘোষণা করে যে, তাহারা আমেরিকার নাগরিকতা গ্রহণ করিবে, অথচ ভোটের সময় পর্যন্ত নাগরিকতা গ্রহণ করে নাই তাহাদিগকেও ভোট দিতে দেওয়া হয়। বিদেশীরা মন্ত্রী, সভাপতি প্রভৃতি রাজনৈতিক পদ পায় না, কিন্তু যে সব চাকুরিতে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন সেই সব পদে অন্ততঃ কিছুকালের জন্য বিদেশীরা নিযুক্ত হইতে পারে। অশোক একজন গ্রীককে গবর্ণরপদেও নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নাগরিক ও বিদেশীদের মধ্যে সব চেয়ে বড় পার্থক্য এই যে, নাগরিককে রাষ্ট্র হইতে বিতাড়িত করা যায় না, বিদেশী বিতাড়িত হইতে পারে।

বিদেশীদের দুই ভাগ করা যায়। কোন কোন বিদেশী সাময়িকভাবে ভ্রমণের জন্য অথবা অধ্যয়নের জন্য আসে। আবার কোন কোন বিদেশী সুদীর্ঘকাল ধরিয়া ব্যবসাবাণিজ্য উপলক্ষে বাস করে। যুদ্ধের সময় বিদেশীদিগকে বন্ধুরাষ্ট্রের ও শত্রুরাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে ভাগ করা হয়। শেষোক্তদের গতিবিধি তখন নিয়ন্ত্রিত করা হয়।

রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি

নাগরিকও নহে বিদেশীও নহে এমন লোকও থাকা অসম্ভব নহে। যাহারা সুদীর্ঘকাল বিদেশে বাস করার দরুণ নিজের রাষ্ট্রের নিয়ম অনুসারে নাগরিকতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে অথচ বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকতার অধিকার লাভ করে নাই এই ধরনের লোক না নাগরিক, না বিদেশী। এমন লোক অবশ্য খুবই বিরল। আমেরিকার কিছু জমিদারি হইয়াছে; ঐ সব দেশ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত

পঞ্চাশটি রাজ্যের বাহিরে এবং ঐখানকার লোকেরা যুক্তরাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করিলেও নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হয় না, তাহারা ন্যাশনাল নামে পরিচিত।

বইয়ে পড়া যায় যে, রাষ্ট্রের মধ্যে সকল নাগরিকের সমান অধিকার। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বলিয়া ঘোষণা করিলেও সেখানকার প্রায় শতকরা দশ ভাগ লোক নাগরিকের সমান অধিকার হইতে বঞ্চিত। তাঁহারা হইতেছেন আমেরিকান্ নিগ্রো। তাঁহাদিগকে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে এক বিদ্যালয়ে পড়িতে দেওয়া হয় না; এক হোটেলে থাকিতে বা খাইতে দেওয়া হয় না; এক বাসে ভ্রমণ করিতে দেওয়া হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অংশে ছলে-বলে-কৌশলে তাঁহাদিগকে ভোট দিবার অধিকারও ভোগ করিতে দেওয়া হয় না। প্রাচীন ভারতের শূদ্রদের অপেক্ষাও আধুনিক আমেরিকার নিগ্রোদের অবস্থা হীনতর। কিন্তু ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে একটি আইন করিয়া এই বৈষম্য দূর করার চেষ্টা হইয়াছে।

আমেরিকায় বৈষম্য

৩। নাগরিকতা নির্ধারণের নীতি : রক্তের সম্বন্ধ অথবা জন্মস্থান ধরিয়া নাগরিকতা নির্ণীত হয়। প্রাচীন গ্রীক, রোমান্ ও জার্মানেরা রক্তের সম্বন্ধ ধরিয়া নাগরিকতা স্থির করিতেন। কিন্তু সামন্ত যুগে বিশেষ ভূখণ্ডে জন্ম হইলে বিশেষ রাষ্ট্রের নাগরিক হইবে এই নীতি স্থিরীকৃত হইয়াছিল। এখন জাপান স্থানগত নীতি স্বীকার করে না। বিদেশী পিতা-মাতার সন্তান জাপানে জন্মিলেও তাহারা বিদেশী বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু জাপানী পিতার সন্তান যেখানেই জন্মাক না কেন, সে জাপানী হইবে। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের French nationality code অনুসারে ফরাসী পিতার সন্তান ফরাসী বলিয়া গণ্য হয়; আবার ফ্রান্সে বা তাহার অধীন কোন স্থানে বিদেশী মাতা-পিতার সন্তানও ফরাসী নাগরিক হইতে পারে।

দুইটি নীতি

ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে *Jus sanguinis* বা রক্তের সম্বন্ধের সঙ্গে *Jus soli* বা জন্মস্থানের সম্বন্ধ মিলাইয়া নাগরিক নির্ণয় করা হয়। যে কেহ ব্রিটেনে জন্মিবে সেই ব্রিটিশ নাগরিক; ব্রিটিশ মাতা পিতার সন্তান বিদেশে জন্মিলেও ব্রিটিশ নাগরিকতা

উভয় নীতির সামঞ্জস্য

লাভ করিবে। আমেরিকার আইন অনুসারে আমেরিকান পিতার ঔরসজাত সন্তান বিদেশে জন্মিলে তাহার যখন আঠারো বছর বয়স হয় তখন যদি সে আমেরিকার নাগরিক হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করে তাহা হইলে তাহাকে আমেরিকার নাগরিকতা দেওয়া হয়।

বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রকার নীতি অনুসৃত হয় বলিয়া কখনো কখনো নাগরিকতা নির্ণয় করা কঠিন হইতে পারে। ফরাসী আইন অনুসারে যে ফরাসী দম্পতী আমেরিকায় বেড়াইতে গিয়াছে তাহাদের সেখানে একটি পুত্র হইলে সে ফরাসী বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু আমেরিকার নিয়ম অনুসারে যে কেহ আমেরিকায় জন্মিবে সেই আমেরিকান হইবে। সুতরাং সেই ছেলেটি একই কালে ফরাসী ও আমেরিকান হইতে পারে। কিন্তু এরূপ ঘটিতে দেওয়া হয় না। কেন না, কোন রাষ্ট্র বিদেশে জাত সন্তানের উপর দাবি করে না, যতক্ষণ না সে স্বদেশে ফেরে। আবার ছেলেটি আঠারো বছরের হইলে তাহাকে নাগরিকতা নির্বাচনের স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

স্বামী এক রাষ্ট্রের এবং স্ত্রী অন্য রাষ্ট্রের হইলে সাধারণতঃ স্ত্রীকে স্বামীর রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হয়। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়াতে এরূপ হয় না। কোন আমেরিকান নারী বিদেশীকে বিবাহ করিলেও আমেরিকান নাগরিক বলিয়া গণ্য হয়।

৪। **নাগরিকতা লাভের উপায়ঃ** নাগরিকতা জন্মের দ্বারা নির্ণীত হয়। কিন্তু কর্মের দ্বারাও উহা লাভ করা যায়। কোন রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে বিদেশীকে নাগরিকতা দান করিতে পারে। ইহাকে Naturalisation বা নাগরিক করিয়া লওয়া বলে। কোথাও বা বিচারালয় কোথাও বা উচ্চরাজ কর্মচারী এই ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। আমেরিকায় পাশ্চাত্য জগতে জন্মিয়াছে এমন কোন ব্যক্তির পক্ষ নাগরিকতা লাভ করা কঠিন নহে। কিন্তু আফ্রিকা, এশিয়া এবং প্রশান্ত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে জাতিদের জন্য একটি ক্ষুদ্র সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে। তাহার চেয়ে বেশি সংখ্যককে এক বৎসরের মধ্যে আমেরিকার নাগরিকতা দেওয়া হয় না। যিনি আমেরিকার নাগরিক হইতে চাহেন, তাঁহাকে একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর আমেরিকায় বাস করিতে

কি করিয়া অন্য রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া যায়?

হইবে, নাগরিকতা পাইবার জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে, কর্তৃপক্ষ যদি তাঁহাকে সচ্চরিত্র, ইংরাজী বলিতে সমর্থ এবং বিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশের উপযুক্ত মনে করেন, তাহা হইলে তাহাকে নাগরিকতা দিতে পারেন। সুইট্জারল্যাণ্ড, মেক্সিকো ও আর্জেন্টিনায় মাত্র দুই বছর একাদিক্রমে বাস করিলেই দরখাস্ত করিয়া নাগরিক হওয়া যায়; কিন্তু ফ্রান্সে দশ বৎসরের বসবাসের উপর নাগরিকতা লাভ নির্ভর করে। দরখাস্ত মঞ্জুর হইলে দরখাস্তকারীকে আনুগত্যের শপথ লইতে হয়। সাধারণতঃ যাহাদিগকে নাগরিক করিয়া লওয়া হয় তাহাদের অধিকার ও দায়িত্ব জাতনাগরিকদের তুল্য হয়, কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপ ব্যক্তি রাষ্ট্রের সভাপতি বা উপ-সভাপতি-পদে বৃত হইতে পারে না।

স্বাধীনতার পূর্বে ইংলণ্ডে ভারতবাসীরা ব্রিটিশ প্রজা বলিয়া পরিগণিত হইতেন, কিন্তু এখন তাঁহাদিগকে কমনওয়েলথের প্রজা বলা হয়।

বৃটিশ প্রজা

কমনওয়েলেথের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য রাষ্ট্রের নাগরিকেরাও নিজ রাষ্ট্রের নাগরিক এবং কমনওয়েলথের প্রজা। ভারতবাসীরা রানী এলিজাবেথকে কমনওয়েলথের রানী বলিয়া মানেন, কিন্তু ভারতের উপর তাঁহার কোন অধিকার নাই।

৫। **যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা**ঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ও সুইট্জারল্যাণ্ডে যুগ্ম নাগরিকতা প্রচলিত আছে। এক ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের ও অন্তর্ভুক্ত রাজ্যের উভয়েরই নাগরিক হয়। কিন্তু আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রীয় নাগরিকতাকেই মুখ্য বলিয়া গণনা করা হয়, আর সুইট্জারল্যাণ্ডে প্রথমে

উভয় নাগরিক

একটি ক্যান্টনের নাগরিক হইতে হয় এবং তাহা হইলে স্বভাবতঃই সুইট্জারল্যাণ্ডের সমগ্র রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে পারা যায়। আমেরিকাতে কোন রাজ্যে বাস করিয়া তবে নাগরিকতার জন্য দরখাস্ত করিতে হয়। কিন্তু কোন রাজ্যের নাগরিক না হইয়াও এক ব্যক্তি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হইতে পারে।

সোভিয়েট ইউনিয়নে যে কোন ইউনিয়ন রিপাবলিকের নাগরিক সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া গণ্য হন। আবার U. S. S. R.-এর বা যুক্তরাষ্ট্রের কোন নাগরিক যখন যে Union Republic-এ বাস করেন তখন সেখানকার বলিয়া গণ্য হন।

ভারতবর্ষ একটি যুক্তরাষ্ট্র হইলেও এখানে একমাত্র ভারতীয় নাগরিকতা প্রচলিত আছে। স্বতন্ত্রভাবে কেহ মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম বা বিহারের নাগরিক হইতে পারেন না।

ভারতের এক নাগরিকতা

নাগরিকতার অবলোপঃ নাগরিক ইচ্ছা করিলে এক রাষ্ট্রের নাগরিকতা ত্যাগ করিয়া অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকতার প্রার্থী হইতে পারে। অন্য রাষ্ট্রের নাগরিক হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পূর্ব রাষ্ট্রের নাগরিকতা বিলুপ্ত হয়। এখন কোন রাষ্ট্র তাহার নাগরিককে অন্য রাষ্ট্রের নাগরিক হইবার পক্ষে বিশেষ বাধা সৃষ্টি করে না। কিন্তু অন্য রাষ্ট্রে কয়েক বৎসর বসবাস না করিলে কেহ সে রাষ্ট্রের নাগরিকতা পাইতে পারে না। যখন কোন নাগরিক অন্য দেশে যাইতে চাহে তখন তাঁহার রাষ্ট্র সেখানে যাইতে অনুমতি নাও দিতে পারে।

অনুপস্থিতি

সৈন্যদল হইতে কেহ যদি পলায়ন করে তবে সে নাগরিকতা হইতে বিচ্যুত হইতে পারে। কোন কোন রাষ্ট্রের নিয়ম আছে যে, পররাষ্ট্রের চাকুরি বিনা অনুমতিতে কেহ যদি গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাকে নাগরিকতা হইতে বিচ্যুত করা হয়। পর্তুগাল ও বলিভিয়ার নাগরিক যদি বিদেশী কোন রাষ্ট্রের প্রদত্ত সম্মানজনক উপাধি গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহার নাগরিকতা বিলুপ্ত হয়। ভারতের নাগরিকের পক্ষেও বিদেশী উপাধি গ্রহণ করা নিষিদ্ধ, কিন্তু তাহার দণ্ড ঐরূপ কঠোর নহে। ফ্রান্স ও জার্মানির নাগরিকেরা যদি একাদিক্রমে দশ বৎসর বিদেশে বাস করে তবে তাহারা নাগরিকতা হারাইতে পারে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, অনেক দেশের নিয়ম অনুসারে নারী বিদেশীয়কে বিবাহ করিলে সে তাহার স্বামীর দেশের নাগরিক হইয়া যায়, সুতরাং নিজের দেশের নাগরিকতা হারায়। কিন্তু এখন মেয়েদের মধ্যে আত্মচেতনা জাগিতেছে বলিয়া অনেক রাষ্ট্রে এ নিয়ম পরিবর্তিত হইতেছে।

অপরাধ

৬। **নাগরিকের দায়িত্বঃ** গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে নাগরিকের চরিত্রবল ও কর্তব্যবুদ্ধির উপর। এখন রাষ্ট্রের হাতে অনেক ক্ষমতা। জনকল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র বহু কার্য হাতে লইয়াছে। নাগরিকেরা যদি সর্বদা সতর্ক না থাকে তাহা হইলে গণতন্ত্র, ধনিকতন্ত্র, আমলাতন্ত্রে অথবা একনায়কতন্ত্রে পরিবর্তিত হইবে। শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে

সঙ্গে একদিকে যেমন শিল্পপতি ও বণিকদের ক্ষমতা বাড়িতেছে, অন্যদিকে শ্রমিকের শক্তিও তেমনি সংহতি লাভ করিতেছে। নাগরিক কোন কোন পেশা অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে পেশাগত ও ব্যক্তিগত স্বার্থের উপরে উঠিয়া সার্বজনীন কল্যাণ যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইজন্য নিম্নলিখিত দশটি নিয়ম তাঁহাকে মানিয়া চলিতে হইবে। (১) প্রত্যেককে শিক্ষিত হইতে হইবে। (২) দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যাহাতে প্রকৃত স্বাধীনতা বজায় রাখিতে পারে, তাহার প্রতি কড়া নজর রাখিতে হইবে।

বিবিধ দায়িত্ব

শিক্ষাই নাগরিককে গঠন করে। সেই শিক্ষা যদি ব্যক্তিত্বকে পরিস্ফুট না করিয়া কেবলমাত্র পাশ করানোর যন্ত্রে পরিণত হয় তাহা হইলে গণতন্ত্র সফল হওয়া কঠিন। কোন কোন দেশে শিক্ষাকে শ্রেণীগত স্বার্থের বাহক-রূপে ব্যবহৃত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। প্রত্যেক নাগরিকই সজাগ থাকিলে এই চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। (৩) প্রত্যেক নাগরিককে দেশের সংবিধান মাত্র জানিলেই এ কর্তব্য প্রতিপালিত হয় না। সংবিধান বাস্তব-ক্ষেত্রে কিরূপভাবে কাজ করিতেছে তাহা জানা প্রয়োজন। (৪) প্রত্যেককে ব্যক্তিগত জীবনে সকল প্রকার অসাধু উপায়কে বর্জন করিতে হইবে। প্রত্যেকে এই দায়িত্ব পালন করিলে আর ঘুষ নেওয়াদেওয়া এবং ঠিকাদারের ফাঁকি চলিতে পারে না। (৫) যেখানে অন্যায়, অবিচার ও নিষ্পেষণ চোখে পড়িবে, তাহার বিরুদ্ধে জনমত গঠনের চেষ্টা করিতে হইবে। (৬) পরস্পরের সহিত ব্যবহারে ভদ্র ও সদয় হইতে হইবে এবং অপরের মতামত সহিষ্ণুতার সহিত শুনিতে হইবে। (৭) সরকারের কাজকে প্রত্যেকের কাজ মনে করিতে হইবে এবং প্রত্যেককে যথাসাধ্য উহার সাফল্যের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। (৮) যোগ্য, সুদক্ষ ও অসাধু প্রকৃতির লোক যাহাতে নির্বাচিত হইতে পারে তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। (৯) সুনাগরিকের দায়িত্ব শুধু নিজের রাষ্ট্রের প্রতি নহে, বিশ্ব-মানবসমাজের প্রতিও এই কথা মনে রাখিতে হইবে। বিশ্ব-নাগরিকতার উদ্ভব আজও হয় নাই, কিন্তু বিশ্বশান্তির উপর প্রত্যেকের ধন ও প্রাণ, সুখ ও শান্তি নির্ভর করিতেছে একথা ভুলিলে চলিবে না। (১০) রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির প্রতি সচেতন থাকিতে হইবে। স্বার্থান্ধ অথবা অক্ষম লোকের হাতে

পড়িয়া বৈদেশিক নীতি যুদ্ধ বাধাইতে পারে। যুদ্ধ বাধিলে মানবের সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবারে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

৭। সুনাগরিকতার অন্তরায়ঃ বাইবেলের দশটি আদেশের মতন নাগরিকতার সু-নিয়মদশক পালিত হইবার আশা কম। কেন না লোকে এখন পর্যন্ত বুঝিতে পারে নাই যে, নিজের মঙ্গল সমষ্টিগত কল্যাণের উপর নির্ভর করে। দশের কাজ কাহারই কাজ নহে মনে করিলে, ক্ষমতালোলুপ দুষ্ট লোকেরা নিজেদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা লইবে এবং উহা নিজের ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থের জন্য প্রয়োগ করিবে। এইরূপ যাহাতে না হইতে পারে সেইজন্য কি কি কারণে লোকে সুনাগরিক হইতে পারে না, তাহা বিবেচনা করা প্রয়োজন। মূলতঃ আলস্য (Indolence), ঔদাসীন্য, স্বার্থপরতা ও দলীয় মনোবৃত্তি সুনাগরিকতার অন্তরায় সৃষ্টি করে।

চারিটি মূল বাধা

প্রথমতঃ একজন নাগরিক মনে করেন যে, তিনি তো লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে সামান্য একজন, সুতরাং তিনি তাঁহার নাগরিক দায়িত্ব পালন না করিলে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। সেকালের একা রাজা একটি বিরাট চৌবাচ্চা তৈয়ারি করাইয়া উহা দুধ দিয়া ভরিয়া দিবার জন্য প্রজাদের আদেশ দিয়াছিলেন। প্রত্যেক প্রজাই মনে করিল যে, সকলে তো দুধ দিবেই, আমি এক ঘটি জল দিলে কি আসে যায়? যথাসময়ে রাজা আসিয়া দেখিলেন যে, চৌবাচ্চায় শুধুই জল আছে, এক বিন্দুও দুধ নাই। নাগরিকেরা নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করিয়া সাধারণের কাজে আলস্য, ঔদাসীন্য ও নির্লিপ্ততার ভাব দেখাইলে আমরা জলও পাইব না, বিষ পাইব। কেন না, ঐ আলস্যের সুযোগ লইয়া স্বার্থান্ধ লোক কাজ করিতে আগাইয়া আসিবে এবং কাজের নামে অকাজ করিবে। অধিকাংশ মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশনে যে অব্যবস্থা দেখা যায় তাহার মূল কারণ হইতেছে নাগরিকের ঔদাস্য। ভোট দিবার হাঙ্গামাটুকু না পোহাইলে নিজেদের ইচ্ছামত সরকার পাওয়া যাইবে কি করিয়া?

আলস্য ও ঔদাসীন্য

সংখ্যার বাহুল্য ছাড়া নাগরিকেরা অন্যান্য কাজে ও আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত থাতেন বলিয়াও রাজনৈতিক ব্যাপারে যথোচিত মনোযোগ দেন না। দরিদ্র লোকে অশন-বসনের সংস্থান করিবার জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করেন

অবসরের সময় তাঁহারা খেলাধূলা, গান-বাজনা প্রভৃতি লইয়া একটু চিত্ত-বিনোদনের প্রয়াস পান। যাঁহারা বিজ্ঞ, অধ্যয়নশীল ও ধীর প্রকৃতির লোক তাঁহারা অনেক সময়ে ভাবেন যে রাজনীতির গণ্ডগোলের মধ্যে যাইলে মানসিক শান্তি হারাইতে হইবে। একথা হয়তো অনেকখানি সত্য, কিন্তু সার্বজনীন কাজের যাঁহারা সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত তাঁহারা দূরে থাকিলে অবাঞ্ছনীয় পেশাদার লোক-মাতানো ব্যক্তিরা ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হইবে এবং জন-কল্যাণের আদর্শকে পদদলিত করিবে। দেশের শাসন কার্যে ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, অজ্ঞ-বিজ্ঞ সকলে উৎসাহ না দেখাইলে ঐরূপ কুফল ফলিবেই। স্থানীয় প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় শাসনে কোথায় অপচয় হইতেছে, কোথায় অকর্মণ্যতা প্রকাশ পাইতেছে কোথায় দুর্নীতি আত্মপ্রকাশ করিতেছে তাহা প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু ধরাইয়া দিতে পারেন। নাগরিকেরা প্রত্যেকে সজাগ রহিয়াছে ইহা বুঝিলে শাসকগণ স্বতঃই কর্মঠ ও সৎস্বভাবাপন্ন হইবেন।

ঔদাস্যের বিষময় ফল

প্রাচীন এথেন্সে নিয়ম ছিল যে নাগরিক ব্যাপারে কেহ যদি অংশ গ্রহণ না করে তাহা হইলে তাহাকে রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইবে। আজকালকার বিশালাকায় রাষ্ট্রের পক্ষে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব নহে; সম্ভব হইলেও শাস্তির ভয় দেখাইয়া যে কাজ করানো হয় তাহার প্রতি মানুষের অন্তরের টান থাকে না। নাগরিকতার দায়িত্ব পালনের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ। বাহিরের চাপ দিয়া এই উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না।

ব্যক্তিত্বের বিকাশ

ছোট স্বার্থের বশবর্তী হইয়া লোকে কখনও কখনও উপযুক্ত প্রার্থীকে ভোট না দিয়া যাহার কাছে কিছু সুবিধা আদায় করা যায় তাহাকে ভোট দেয়। অন্যায় পন্থা অবলম্বন করিয়া যাহারা নির্বাচিত হয় তাহারা নির্বাচনের পর ন্যায়পরায়ণ হইবে এ আশা কম। রাজনৈতিক দলের নির্দেশ অনুসারে ভোট দেওয়া দোষের নহে, কিন্তু কোন দলের কি উদ্দেশ্য তাহা বিচার করিয়া দেখা দরকার।

ক্ষুদ্র স্বার্থবোধ

অনুশীলন

১। What is the proper role of the citizen in the modern State? How do you distinguish between aliens and citizens?

নাগরিকের কর্তব্যপালনের উপরেই আধুনিক রাষ্ট্রের উন্নতি নির্ভর করে। সেকালে লোকে ভাবিত রাজা ও রাজকর্মচারীদের কাজ হইতেছে রাজ্যপরিচালনার সকল প্রকার ব্যবস্থা করা। কিন্তু এযুগে নাগরিকদের ভোটের উপর প্রায় সকল দেশেই সরকারের অস্তিত্ব নির্ভর করে। নাগরিক যদি শিক্ষিত না হন এবং অন্যায় অবিচারের প্রতিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর না হন তাহা হইলে রাষ্ট্রে অনাচার চলিতে থাকিবে।

ষষ্ঠ প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

বিদেশী ভোট দিতে পারে না ও যুদ্ধের সময় সৈন্যদলে নাম লিখাইতে পারে না। নাগরিক এই সমস্ত কাজ করিতে পারে। অন্যান্য বিষয়ে উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই।

২। What are the hindrances to good citizenship? How can they be overcome?

সপ্তম প্রকরণে সুনাগরিকতার অন্তরায় দেখ।

সুশিক্ষা ও কর্তব্যবোধের উদ্বোধনই এই অন্তরায় সমূহ দূর করিবার প্রকৃষ্ট উপায়।

৩। What are the different methods of acquiring citizenship? What part does racial discrimination play in it?

চতুর্থ প্রকরণ দেখ। দক্ষিণ আফ্রিকায় অ-শ্বেতকায় ব্যক্তিদের পক্ষে নাগরিকতা পাওয়া অসম্ভব। আমেরিকাতেও বর্ণবিদ্বেষ আছে। আফ্রিকা, এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ হইতে কয়েকজন মাত্র লোককে নাগরিক করা হয়। ঐ নির্দিষ্ট সংখ্যার অতিরিক্ত কাহাকেও করা হয় না।

নবম অধ্যায়

সাম্য, স্বাতন্ত্র্য ও অধিকারতত্ত্ব ঃ সাম্যের তাৎপর্য

১। সাম্যের অর্থ ও গুরুত্ব ঃ প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে গ্রীক নাট্যকার ইউরিপাইডিস্ সাম্যকে মানুষের প্রাকৃতিক বিধান বলিয়াছেন। ফরাসী বিপ্লবের সূচনায় ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের ন্যাশনাল এসেম্বিলি 'অধিকারকে সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঘোষণা করিয়াছিল (Declaration of the Rights of man) যে, "মানুষ স্বতন্ত্র হইয়া জন্মে এবং অধিকারের ক্ষেত্রে সমান ও স্বতন্ত্র থাকে"। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার ঔপনিবেশিকেরা ঘোষণা করিয়াছিলেন যে সকল মানুষ সমান হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে ইহা আমরা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া বিবেচনা করি। আধুনিক গণতন্ত্রের মূল তত্ত্ব হইতেছে সাম্য।

সাম্যের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত

কিন্তু সাম্য শব্দটি কি অর্থে প্রয়োগ করা হয়? বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে 'সাম্য' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"মনুষ্যে মনুষ্যে সমান। কিন্তু একথার এমত উদ্দেশ্য নহে যে, সকল অবস্থার সকল মনুষ্যই সকল অবস্থায় সকল মনুষ্যের সঙ্গে সমান। নৈসর্গিক তারতম্য আছে। কেহ দুর্বল, কেহ বলিষ্ঠ, কেহ বুদ্ধিমান, কেহ বুদ্ধিহীন। নৈসর্গিক তারতম্যে সামাজিক তারতম্য অবশ্য ঘটিয়াছে। যে বুদ্ধিমান্ এবং বলিষ্ঠ, সে আজ্ঞাদাতা; যে বুদ্ধিহীন এবং দুর্বল, সে আজ্ঞাকারী অবশ্য হইবে। রুশোও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সাম্যতত্ত্বের তাৎপর্য এই যে, সামাজিক বৈষম্য নৈসর্গিক বৈষম্যের ফল, তাহার অতিরিক্ত বৈষম্য ন্যায়বিরুদ্ধ এবং মনুষ্যজাতির অনিষ্টকর। যে সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহা অনেকগুলি এইরূপ অপ্রাকৃতিক বৈষম্যের কারণ। সেই ব্যবস্থাগুলির সংশোধন না হইলে মনুষ্যজাতির প্রকৃত উন্নতি নাই; মিল একস্থানে বলিয়াছেন, এক্ষণকার যত সুব্যবস্থা, তাহা পূর্বতন কুব্যবহার-সংশোধক মাত্র। ইহা সত্য কথা। কিন্তু সম্পূর্ণ সংশোধন কালসাপেক্ষ। তাই বলিয়া কেহ মনে না করেন যে, আমি

বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যবাদ

জন্মগুণে বড়লোক হইয়াছি, অন্যে জন্মগুণে ছোটলোক হইয়াছে : "তুমি যে উচ্চকুলে জন্মিয়াছ, সে তোমার কোন গুণ নহে ; যে নীচকুলে জন্মিয়াছে, তাহার দোষ নহে। অতএব পৃথিবীর সুখে তোমার যে অধিকার, নীচকুলোৎপন্নেরও সেই অধিকার। তাহার সুখের বিঘ্নকারী হইও না ; মনে থাকে যেন যে, সেও তোমার ভাই, তোমার সমকক্ষ। যিনি ন্যায়বিরুদ্ধ আইনের দোষে পিতৃ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া, দোর্দণ্ডপ্রচণ্ড-প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধি ধারণ করেন, তাঁহারও যেন স্মরণ থাকে যে, বঙ্গদেশের কৃষক পরাণ মণ্ডল তাঁহার সমকক্ষ এবং তাঁহার ভ্রাতা। জন্ম, দোষগুণের অধীন নহে। তাহার অন্য কোন দোষ নাই। যে সম্পত্তি তিনি একা ভোগ করিতেছেন, পরাণ মণ্ডলও তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকারী।"

এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক সাম্যের কথা বলিতে বলিতে অর্থনৈতিক সাম্যের নীতি ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি সম্পত্তির উত্তরাধিকারকে ন্যায়-বিরুদ্ধ আইনের ফল বলিয়াছেন। ন্যায়-বিরুদ্ধ শব্দটি তিনি প্রাকৃতিক বিধান বা শাশ্বত নীতির বিরুদ্ধ অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার আর্থিক বৈষম্যের মূল এই তত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করিতেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র সাম্য বিষয়ক পঞ্চম প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন। তাহার উপসংহারে তিনি বলেন—"সাম্যনীতির এরূপ ব্যাখ্যা করি না যে, সকল মনুষ্য সমানাবস্থাপন্ন হওয়া আবশ্যক বলিয়া স্থির করিতে হইবে। তাহা কখন হইতে পারে না। যেখানে বুদ্ধি, মানসিক শক্তি, শিক্ষা, বল প্রভৃতির স্বাভাবিক তারতম্য আছে, সেখানে অবশ্য অবস্থার তারতম্য ঘটিবে,—কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। তবে অধিকারের সাম্য আবশ্যক, কাহারও শক্তি থাকিলে অধিকার নাই বলিয়া বিমুখ না হয়। সকলের উন্নতির পথ মুক্ত চাহি"। উদারনৈতিক রাজনীতির দিক হইতে বঙ্কিমচন্দ্র সাম্যের সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে মানুষে মানুষে সাম্য যেমন দেখিতে পাওয়া যায় বৈষম্যও তেমনি লক্ষিত হয়। পশুদের তুলনায় মানুষের দেহ এক ধরনের ; সকলেরই একই

প্রকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, অস্থিচর্ম, রক্ত প্রভৃতি আছে। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের রক্ত নীল রংয়ের (Blue blood) ইহা নিছক কবিকল্পনা। কিন্তু আবার মানুষের গায়ের রং, দৈর্ঘ্য, মুখের আকার, চোখের জ্যোতি এক প্রকার নহে। মানসিক দিক দিয়া সকলেরই সুখদুঃখ বোধ করিবার ক্ষমতা আছে, সকলেই প্রজ্ঞা ও সংস্কারের বলে জীবন যাপন করে, কিন্তু সকলের মানসিক শক্তি সমান নহে, এমন কি সুখদুঃখের বোধের তীব্রতাও অসমান। নৈতিক বিচারে দেখা যায় যে, প্রত্যেক মানুষই ভালমন্দ বুঝিতে পারে এবং শ্রেয় কি, প্রেয়ই বা কি (অর্থাৎ কি ভাল লাগা উচিত এবং কি ভালো লাগিতেছে তাহার পার্থক্য) তাহার তারতম্য জানে। কিন্তু সকলের শ্রেয়ঃ একরকম নহে। কাহারও লক্ষ্য উচ্চতম আদর্শ, কাহারও সাধারণ। আবার কেহ বা স্বভাবতঃ নীতিপথে চলে, অন্যেরা অনেক অন্তর্দ্বন্দ্বের পরে নৈতিক জীবন লাভ করে। আধ্যাত্মিক বিচারে সকলেই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, এবং চৈতন্যস্বরূপ। সেণ্ট পলের ভাষায় ভগবানের দৃষ্টিতে সকল মানুষই সমান। কিন্তু সকলে অধ্যাত্ম উপলব্ধির জন্য সমান উৎসুক নহে।

দৈহিক, মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সাম্য ও বৈষম্য

ঊনবিংশ শতাব্দীর উদারনৈতিক মতবাদীরা সাম্য বলিতে যাহা বুঝিতেন, বিংশ শতাব্দীর সমাজতন্ত্রীরা তাহার চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপক অর্থে ঐ শব্দ প্রয়োগ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর সাম্য ছিল আইনের চোখে সকলে সমান এবং ভোট দিবার ও নির্বাচিত হইবার অধিকার সকলের সমান। আদালতের দরজা সকলের কাছেই উন্মুক্ত এবং বিচারক একই নীতিতে সকলের বিচার করেন, একই অপরাধে ছোট বড় সকলের সমান দণ্ড পায় একথা সত্য। কিন্তু উকীল মোক্তারের ফি এবং আদালতের শুল্ক দিবার ক্ষমতা যাহাদের নাই তাহারা আদালতে নালিশ করিতে পারে না। যদি বা কোন রকমে পারে, বড় লোক প্রতিপক্ষ হইলে বড় বড় উকীল ব্যারিস্টার নিযুক্ত করিয়া যে সুবিধা পাইতে পারে দরিদ্রের পক্ষে তাহা পাওয়া সম্ভব নহে। জেলের কয়েদীদের মধ্যেও প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী আছে। বড় লোকেরা জেলে গেলেও প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর সুখ-সুবিধা ভোগ করেন।

আইনের চোখে সমতা

ধনী, দরিদ্র, বিজ্ঞ, মূর্খ সকলের ভোটের সমান মূল্য সন্দেহ নাই ; কিন্তু ভোট দেওয়াই রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের একমাত্র উপায় নহে।

যাঁহারা ভাল বলিতে পারেন বা ভাল প্রবন্ধ লিখিতে পারেন তাঁহাদের জনমত গঠনে অধিক প্রভাব দেখা যায়। নির্বাচনের ক্ষেত্রে আজকাল রাজনৈতিক দলের সমর্থন পাইলে দরিদ্র প্রার্থীও রাজা-মহারাজার ছেলেদের হারাইয়া দিতেছে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংঘ গঠনের স্বাধীনতা প্রভৃতিতে ধনী ও দরিদ্রের সমান অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

রাজনৈতিক সাম্য

সামাজিক সাম্য কিছুটা স্থাপিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে এখন হরিজনেরা মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারেন, কূপতড়াগাদি হইতে জল লইতে পারেন এবং রেলে ও বাসে সকলের সঙ্গে বসিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু আমেরিকার নিগ্রোরা এ সব অধিকার হইতে বঞ্চিত। দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণবর্ণের লোক সাদা চামড়ার মেয়েকে বিবাহ করিলে ঐ বিবাহকে অগ্রাহ্য করিয়া উভয়কে দুর্নীতির অভিযোগে দণ্ড দেওয়া হয়। আরিস্টটলের ন্যায় সুবিজ্ঞ দার্শনিক দাসগণের কোনপ্রকার অধিকার স্বীকার করেন নাই। এক শ্রেণীর লোক শাসন করিবে এবং অন্য শ্রেণীর লোক শাসিত হইবে ইহা তিনি স্বাভাবিক মনে করিতেন। তবে নাগরিকদের মধ্যে অর্থাৎ শাসকশ্রেণীর মধ্যে সাম্য রাখার প্রয়োজন তিনি স্বীকার করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে বৈষম্য থাকিলে উহা বিপ্লবের কারণ হয়। বার্ক এবং মেকলে কেবলমাত্র সম্পত্তির অধিকারীদের মধ্যে সাম্যকে সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহিয়াছিলেন।

সামাজিক সাম্য

বিংশ শতাব্দীতে আর্থিক সাম্যের উপর বেশি জোর দেওয়া হইতেছে। বিদ্যা ও বুদ্ধির পার্থক্য যে অনেকটা ধনসম্পত্তির পার্থক্য হইতে জাত এমত স্বীকৃত হইয়াছে। আর্থিক বৈষম্য থাকিলে সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্য আসিতে পারে না ইহাও প্রবল সমর্থন লাভ করিতেছে। যাঁহাদের ধনসম্পত্তিও আছে তাঁহারা বিধানমণ্ডলী ও শাসকমণ্ডলীকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করিতে পারেন। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে Pressure groups এবং lobbyingএর দ্বারা শিল্প ও বাণিজ্যপতিদের অনেক সুবিধা জুটিতেছে। কিন্তু কম্যুনিস্ট দেশগুলিতে সম্পূর্ণ আর্থিক

আর্থিক সাম্য

সাম্য স্থাপিত হয় নাই। সেখানে অবশ্য মুষ্টিমেয় লোক বিলাসে গা ভাসাইয়া অলস জীবন যাপন করে না এবং বহুসংখ্যক ব্যক্তি অন্নবস্ত্রের ও চিকিৎসার অভাবে মারা যায় না, কিন্তু দক্ষতা ও বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে বেতনের তারতম্য ঐ সব দেশেও আছে। যাঁহারা শিল্প প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজারের কাজ করেন, সরকারী দপ্তরে বড় চাকুরি করেন এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান ও চারুকলায় পারদর্শী তাঁহাদের অবস্থা অন্যান্যের তুলনায় অনেক স্বচ্ছল।

২। সাম্য কি স্বাতন্ত্র্যের পরিপন্থী? লর্ড অ্যাক্টনের মতে সাম্যনীতি ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে সীমিত করে। তিনি অবশ্য স্বাতন্ত্র্য বলিতে লোকের উৎপাদনে, ভূসম্পত্তি প্রভৃতি অর্জনে, বেতন নির্ধারণে ও উৎপন্ন ধনের ভোগের অবাধ স্বাধীনতা বুঝিয়াছেন। সরকার যদি সাম্যরক্ষার জন্য তৎপর হন, তাহা হইলে বড়লোকদের অর্থ রোজগারের একটা সীমা নির্ধারিত করিয়া দেন। বড়লোকদের নিকট হইতে বেশি হারে আয়কর লওয়া হয়, মধ্যবিত্তদের নিকট হইতে কম হারে। বড়লোকদের মৃত্যুর পর তাঁহাদের সম্পত্তির একটা বড় অংশ রাষ্ট্রের হাতে যাহাতে আসে তাহার ব্যবস্থা করা হয়। কোন দ্রব্য যদি প্রয়োজনের তুলনায় কম উৎপন্ন হয় তাহা হইলে সরকার উহা কাহারও যথেচ্ছ পরিমাণে কিনিবার স্বাধীনতা রাখেন না; উহা যাহাতে সমভাবে সকলের মধ্যে বণ্টিত হয় সেই উদ্দেশ্যে ক্রয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া অনুমতিপত্র দেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে শিল্পপতিরা মজুরদের যাহা খুসি বেতন দিতেন। এখন অধিকাংশ সভ্যরাষ্ট্রে নিম্নতম বেতন কত হইবে তাহা নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়। সাধারণ ব্যাপারেও দেখা যায় যে, সকলের মধ্যে সমতা রাখিতে হইলে ব্যক্তিবিশেষের গতি নিয়ন্ত্রণ করা দরকার হয়। রাস্তা দিয়া চলিবার সকলের সমান অধিকার আছে, তাই সকলকেই বাম বা ডান ধার দিয়া চলিতে বাধ্য করা হয়; না হইলে ধাক্কাধাক্কি হইবে। এই অর্থে সাম্যের অনুরোধে স্বাতন্ত্র্যকে সীমাবদ্ধ করিতে হয়।

আর্থিক সাম্য

আবার স্বাতন্ত্র্যহীন সাম্য কি ভয়ানক বস্তু তাহা স্বামী বিবেকানন্দ অতি অল্প কথায় বলিয়াছেন—"অপ্রতিহতশক্তি সম্রাটের সকল প্রজারই সমান

অধিকার, অর্থাৎ কোনও প্রজারই রাজশক্তির নিয়মে কিছুমাত্র অধিকার নাই।" (বর্তমান ভারত)

স্বাতন্ত্র্য না থাকিলে সাম্য শুধু দাসত্বের শৃঙ্খলের সমান বোঝা বহিবার সমান অধিকারে পর্যবসিত হয়। ইংলণ্ডের শ্রমিকদের এবং ভারতের হরিজনদের যখন ভোটের অধিকার জন্মিল তখনই তাঁহারা সামাজিক ও আর্থিক বিষয়ে অধিকতর সাম্যলাভ করিলেন। আবার যে সমাজে সাম্য নাই সেখানে স্বাতন্ত্র্য শুধু কতিপয় ব্যক্তির বিশেষ সুবিধাভোগে পরিণত হয়। কেন না বড়লোকেরা গরীবদিগকে ক্রমাগত শোষণ করিতে থাকিবে এবং অবশেষে তাহাদের মধ্যে প্রভু ও দাসের সম্বন্ধ দাঁড়াইবে।

স্বাতন্ত্র্যহীন সাম্য নিরর্থক

সাম্য ও স্বাতন্ত্র্য একে অপরের পরিপূরক। আইন যদি সকলের জন্য এক না হয় তাহা হইলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মূল্য কিছুই থাকে না। ব্রিটিশ আমলে চা-বাগানের সাহেব যদি সবুট পদাঘাতে সেখানকার শ্রমিকের প্লীহা ফাটাইয়া দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বজাতীয় জুরিদের বিচারে তাঁহার অর্থদণ্ড মাত্র হইত। এরূপ হইলে শ্রমিকের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, চলাফেরার স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতির কোন অর্থ হয় কি? প্রাচীন ভারতেও ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড হইত না। কেবল কৌটিল্যের মতন প্রবল যুক্তিবাদী বলিয়াছেন যে, রাজদ্রোহ করিলে ব্রাহ্মণকেও জলে ডুবাইয়া মারিয়া ফেলা যাইতে পারে। রুশো বলিয়াছেন যে, সমাজে ধনী ও ভিক্ষুককে থাকিতে দিলে ধনীরা শাসনক্ষমতা ভিক্ষুকদের নিকট হইতে খরিদ করিয়া লইবে। একশ্রেণী পেটের দায়ে স্বাধীনতা বিক্রয় করিবে, অন্য শ্রেণী ক্ষমতার লোভে উহা খরিদ করিবে। সেই জন্য স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য সাম্য চাই এবং সাম্যমূলক সমাজের প্রতিষ্ঠা রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ছাড়া হইতে পারে না।

একে অপরের পরিপূরক

৩। **স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ :** 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়'—এই কথা যখন কবি লিখিয়াছেন, তখন তিনি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কথা বলেন নাই; দেশের স্বাধীনতার কথা বলিয়াছেন। বাংলা ভাষায় 'স্বাধীনতা শব্দটি জাতীয় স্বাধীনতা অর্থেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। সেইজন্য

আমরা উহার চেয়ে ব্যাপক অর্থে স্বাতন্ত্র্য শব্দটি প্রয়োগ করিব—যদিও নিজের স্বাধীনতা এবং নিজের তন্ত্রের অনুগত হওয়া স্বাতন্ত্র্যতা। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত অর্থ উভয়েরই এক।

স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য

শব্দ দুইটিই অধীনতা এবং আনুগত্যের প্রতি জোর দিতেছে। আর কাহারও অধীনতা মানি বা না মানি নিজের সত্তার অধীন হইয়া চলিতেই হইবে। মানুষ ক্ষুধাতৃষ্ণার অধীন, নিজের প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের অধীন এবং সকলের উপর আত্মোপলব্ধি করিবার মৌলিক প্রেরণার অধীন।

স্বাতন্ত্র্য বলিতে যদি পরের বা বাহিরের সকল প্রকার অধীনতা হইতে মুক্তি বুঝি তাহা হইলে সে স্বাতন্ত্র্য মনুষ্য সমাজে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। সমাজে বাস করিতে হইলে নিজে যে সুখ-সুবিধা পাইতে চাই, অপরেও যাহাতে তাহা পায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন হয়। প্রত্যেকে যদি অবাধ, সীমাহীন স্বাতন্ত্র্য চায়, তাহা হইলে একের ইচ্ছার সঙ্গে অপরের বিরোধ বাধিবে এবং 'জোর যার মুলুক তার' নীতি অনুসৃত হইবে। আমি যদি আমার ধনপ্রাণের অধিকার

স্বাতন্ত্র্যের সীমা

রক্ষা করিতে চাই, তাহা হইলে চুরি, ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ড হইতে প্রত্যেককে নিবৃত্ত হইতে হইবে. না হইলে কাহারও ধনপ্রাণ রক্ষা পাইবে না। পরের আদেশে কোন কাজ হইতে নিবৃত্ত হওয়াকে স্বাতন্ত্র্যের বিঘ্নকর মনে হইতে পারে। কিন্তু লোকে যদি নিজ নিজ প্রবৃত্তির বলে চলিবার অবাধ স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিতে চায়, তাহা হইলে পরিণামে সর্বাপেক্ষা চতুর ও বলবানের নিকট সকলকে দাসত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

স্বাতন্ত্র্য ও সামাজিক দায়িত্বপালন পরস্পরের পরিপূরক। আমার স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলা অন্যের দায়িত্ব এবং অন্যের স্বাতন্ত্র্য যাহাতে আমার দ্বারা ব্যাহত না হয় তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা আমার দায়িত্ব। সেই জন্য ডিইয়ে (Dewey) বলিয়াছেন যে স্বাতন্ত্র্য যদি দায়িত্ব-জ্ঞানের দ্বারা সংযত না হয় তাহা হইলে উহা উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হয় এবং দায়িত্ব পালন করিবার বেলায় স্বাতন্ত্র্যের কথা মনে না রাখিলে যথেচ্ছাচারী শক্তির উদ্ভব হয়। উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক প্রধান সমস্যা।

কোন যুগে মনীষীরা সরকারের ক্ষমতার উপর জোর দিয়াছেন, আবার কোন সময়ে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের দাবি বেশি করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। স্বাতন্ত্র্যের সীমা টানিতে যাইয়া বহু পণ্ডিত বহু মতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতামত বিচার করিবার পূর্বে কি কি অর্থে স্বাতন্ত্র্য শব্দ প্রয়োগ করা হয় তাহা দেখা যাউক।

স্বাতন্ত্র্যের বিভিন্ন অর্থ

প্রাচীনকালে সব দেশেই দাসত্ব প্রথা ছিল। স্বাতন্ত্র্য বলিতে প্রথমতঃ দাসত্বের শৃঙ্খল হইতে মুক্তি বুঝায়। দ্বিতীয়তঃ স্বাতন্ত্র্য বলিতে সরকারের খেয়াল খুসিমত কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া লইবার অধিকার হইতে মুক্তি বুঝায়। তৃতীয়তঃ বিদেশী সরকারের শাসন-পাশ হইতে মুক্ত অবস্থাকে স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা বলে। চতুর্থতঃ স্বৈরতন্ত্রের বদলে জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা নির্বাচনমূলক শাসনপদ্ধতিকে স্বাতন্ত্র্য বলা হয়। পঞ্চমতঃ সরকারের সর্বাত্মক শাসনের পরিবর্তে শুধু কয়েকটি ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকেও স্বাতন্ত্র্য বলা হয়।

জন স্টুয়ার্ট মিল স্বাতন্ত্র্যের একজন শ্রেষ্ঠ পুরোহিত। তিনি ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে Liberty নামক গ্রন্থে লেখেন যে অপরের স্বাতন্ত্র্যের উপর ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে হস্তক্ষেপ করা একটি মাত্র ক্ষেত্রে সমর্থন করা যায়; সেটি হইতেছে আত্মরক্ষা। কেবল অন্যের অনিষ্ট করা হইতে নিবৃত্ত করিবার বেলায় কোন সুসভ্য সমাজের সদস্যকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করা সমর্থনযোগ্য। তাহার শারীরিক বা মানসিক উপকার হইবে এই অজুহাতে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করানো উচিত নহে। কেন না তাহার কিসে ভাল হইবে তাহা তাহাকে বুঝানো যাইতে পারে, তাহাকে অনুরোধ করা যাইতে পারে, এমন কি তাহার নিকট প্রার্থনা করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাকে দিয়া জোর করিয়া কিছু করানো যায় না। তিনি ব্যক্তির মানসিক চিন্তাধারা প্রকাশের অব্যাহত ক্ষমতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে প্রবল দাবি উপস্থিত করিয়াছেন। মিল মানুষের কাজকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, আত্মসম্বন্ধীয়, এবং অপরসম্বন্ধীয়। যাহাতে সমাজের অন্য কাহারও কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কেবলমাত্র কোন বিশেষ ব্যক্তির ভালমন্দ যাহার উপর নির্ভর করে তাহাকে তিনি আত্মসম্বন্ধীয় (self-regarding) কাজ

মিলের মতবাদ

বলিয়াছেন। তাঁহার মতে কেহ যদি মদ খায়, সমাজের পক্ষে তাহাকে জোর করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করা উচিত নয়, কেন না সে মদ খাইলে অপরের কোন লোকসান নাই। এই যুক্তির উত্তরে বলা যায় যে সে মদ খাইয়া মাতাল হইলে শান্তিভঙ্গ হইবার আশংকা আছে; সেইজন্য রাত্রি ৮টা বা ৯টার পর মদের দোকান বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়; কোথাও কোথাও মদের কারবারই নিষিদ্ধ হইয়াছে। মিলের মতে শিল্পপতি ও বণিকদিগকে শ্রমিকদের কাজের সময়, বেতনের হার প্রভৃতি বিষয়ে রাষ্ট্রের অনুশাসন মানিতে বাধ্য করা উচিত, কেন না তাহা না করিলে শ্রমিকদের আত্মরক্ষা করা কঠিন হয়। কিন্তু মিল কাহাকেও তাহার ঘরদুয়ার পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন রাখিতে অথবা ছোট ছেলেমেয়েকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে বাধ্য করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। একজনের অপরিচ্ছন্নতা অপরের ব্যাধির কারণ হইতে পারে এবং শিশুদের অশিক্ষা তাহাদের আত্মোপলব্ধির বাধাস্বরূপ হইতে পারে একথা মিল বিবেচনা করেন নাই। সেইজন্য বার্কার বলিয়াছেন যে, মিল শূন্যগর্ভ স্বাধীনতার এবং বাস্তবতারহিত ব্যক্তিত্বের প্রচারক ছিলেন। ("Mill was the prophet of an empty liberty and an abstract individual").

উহার সমালোচনা

ঐতিহাসিক র‍্যামজে মুইর স্বাতন্ত্র্যের ব্যাপক সংজ্ঞা দিতে যাইয়া বলিয়াছেন, স্বাতন্ত্র্য বলিতে আমি ব্যক্তিদের দ্বারা এবং জাতি (নেশান), ধর্মসম্প্রদায়, ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতি স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত সংঘদের দ্বারা তাহাদের নিজের ভাবনা নিজে ভাবিবার এবং সেই অনুসারে কাজ করিবার ক্ষমতার সুনিশ্চিত উপভোগ বুঝি: তাহারা আইনের ছত্রছায়ায় বসিয়া নিজ নিজ শক্তির নিজের অভিপ্রায় অনুসারে ব্যবহার করিবে এবং অন্যের অনুরূপ ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ করিবে না। ("By liberty I mean the secure enjoyment by individuals, and by natural and spontaneous groups of individuals, such as nation, church, trade union, of the power to think their own thought and to express and act upon them; using their own gifts in their own way under the shelter of the law, provided they do not impair the corresponding rights of others.")

একটি ব্যাপক সংজ্ঞা

এখানে আইনের ছত্রছায়ায় স্বাতন্ত্র্যের উপভোগ করিবার কথা কেন বলা হইয়াছে তাহা পরে ব্যাখ্যা করিব। এখানে বলা প্রয়োজন যে, নৈতিক দৃষ্টিতে আইন সব সময়ে ভালো নাও হইতে পারে। লাস্কি বলেন যে, এক হিসাবে কদাচারের প্রতিরোধের গঠনই স্বাধীনতা ("liberty is the organisation of resistance to abuse.") তিনি থোরোর (Thoreau) মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, যদি কোন সরকার এক ব্যক্তিকেও অন্যায়ভাবে জেলে পাঠায়, তাহা হইলে সেখানে ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির উপযুক্ত স্থান হইতেছে জেল। সময় বিশেষে সরকারের প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা না থাকিলে স্বাতন্ত্র্য কখনই ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশের অনুকূল হইতে পারে না। লাস্কি স্বাতন্ত্র্যকে সেই প্রকার পরিবেশের সাদর সংরক্ষণ বলিয়াছেন যাহাতে ব্যক্তি তাহার সর্বোৎকৃষ্ট অভিব্যক্তির সুযোগ পায়। ("By liberty I mean the eager maintenance of that atmosphere in which men have the opportunity to be their best selves.") তিনি আরও বিশদ করিয়া বলিয়াছেন যে, শেষ পর্যন্ত স্বাতন্ত্র্যকে সচেতনভাবে ও সংগঠিতরূপে প্রতিরোধের ক্ষমতা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। ("Liberty is nothing if it is not the organised and conscious power to resist in the last resort.")

প্রতিরোধের স্বাতন্ত্র্য

৪। **স্বাতন্ত্র্যের অনুকূল ও প্রতিকূল পরিবেশ :** স্বাতন্ত্র্যের জন্য বিশেষ পরিবেশের প্রয়োজন। যখন দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়, তখন সরকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অধিকার খর্ব করিতে বাধ্য হন। যুদ্ধের সময়ে সন্দেহজনক চরিত্রের লোককে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়, লোকের অবাধ চলাফেরার স্বাধীনতাকে খানিকটা ব্যহত করিতে হয়, কেন না যেখানে সৈন্যদল ছাউনি ফেলে সেখানে সাধারণকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। আবার মত প্রকাশের স্বাধীনতাও এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়, যাহাতে শত্রুপক্ষ গোপনীয় কোন তথ্য না জানিতে পারে। যুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধের আশংকা স্বাতন্ত্র্যের পরিপন্থী। যে সমাজে সংহতির অভাব, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যেখানে হিংসাদ্বেষ প্রবল, সেখানে সরকারকে প্রায়শঃই লোকের সভা করিবার, সংঘ স্থাপন করিবার কিংবা শোভাযাত্রা-সহকারে

পথ চলিবার অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করিতে হয়, তাহা না হইলে মারামারি কাটাকাটি হইতে পারে। সেখানে ভাষাগত, ধর্মগত বা প্রদেশগত আন্দোলন ও উত্তেজনার সময় পাঁচজনের বেশি লোককে একসঙ্গে চলাফেরা নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়, কখনও কখনও সান্ধ্য আইন জারি করিয়া রাত্রি বেলায় লোকের চলাচলও বন্ধ করা হয়। যে দেশের অধিকাংশ লোক নিরন্ন ও অশিক্ষিত, সেখানে সরকার সাধারণতঃ স্বাতন্ত্র্যের উপর হস্তক্ষেপ করিতে উৎসাহিত বোধ করেন। নাগরিকের প্রতিবাদের ক্ষমতা না থাকিলে সরকার স্বৈরাচারী হইতে বাধ্য। আবার লোক শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন হইলেও যদি নৈতিক এবং মানসিক উৎকর্ষহীন হয়, তাহা হইলে তাহারা মুখ বুজিয়া অন্যায় ও অবিচার সহ্য করে; প্রতিবাদ করিবার হাঙ্গামা পোহাইতে চায় না।

প্রতিকূল অবস্থা

অন্যদিকে যেখানে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য প্রচুর, সেইখানে বেকারির ভয়ে লোকে সন্ত্রস্ত; অথবা যেখানে লোকের চরিত্রে দৃঢ়তা ও উৎসাহের অভাব সেইখানে স্বাতন্ত্র্য পূর্ণরূপে বিকশিত হইতে পারে না।

বৈষম্য

আজকাল রেডিও, গ্রামোফোন, শ্লোগান ও লাউডস্পীকারের উপদ্রবে নাগরিকের পক্ষে চিন্তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা কঠিন। সমাজ-মনের উপর রোলার চালাইয়া যেন সকলের মনের ভাবকে এক ধরনে ঢালাই করিবার উদ্যোগ চলিতেছে। পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্নের তৈয়ারি-করা উত্তরের মতন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সরকার-অনুমোদিত সমাধান লোককে গলাধঃকরণ করানো হইতেছে। যে সব দেশে সরকার কর্তৃক সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রিত হয়, সেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রহসনে পরিণত হয়। বিভিন্ন মতের ও বিভিন্ন দলের অনেকগুলি সংবাদপত্র প্রচারিত হইলে তাহাদের তুলনা-মূলক অধ্যয়ন হইতে কতকটা সত্যের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যেখানে সরকারী মত ছাড়া অন্য কিছু প্রকাশ করা হয় না, সেখানে লোকে নিজেদের মতামত কিভাবে প্রকাশ ও প্রচার করিবে?

কলের উপদ্রব

বৈচিত্র্যে বিধাতার আনন্দ, কিন্তু সাধারণ মানুষ অশনে বসনে, বেশভূষায়, চিন্তায় ও অভ্যাসে আর দশজনের মতন হইতে চায়। দলের

সহিত খাপ খায় না এমন চিন্তা বা আচরণ করিতে সে ভয় পায়। কারণ স্বাতন্ত্র্যের দায়িত্ব অনেক এবং লোকে সাধারণতঃ দায়িত্ব লইতে চাহে না। সেইজন্য মেয়েরা হয়তো পোষাক-পরিচ্ছদে একটু-আধটু স্বাতন্ত্র্য পছন্দ করে; কিন্তু কি নারী কি পুরুষ চিন্তার ক্ষেত্রে দশজনে যাহা সত্য বলিয়া মানে তাহাই নির্বিচারে গ্রহণ করিয়া থাকে। ব্রাইস বলিয়াছেন যে, লোকে স্ব-শাসন ততটা চাহে না, যতটা শাসন চাহে। গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতিতেও গড্ডালিকার ন্যায় পুরোবর্তী নেতাকে অন্ধ অনুসরণ করা বিরল নহে। সেইজন্য কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী প্রশ্ন তুলিয়াছেন সাধারণ মানুষ সত্যই স্বাতন্ত্র্য চাহে কিনা। ইঁহারা হয়তো নিজেদের অসাধারণত্ব দেখাইবার জন্য সাধারণকে অত্যন্ত তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়াছেন। আমাদের চলাফেরা, ধর্ম ও নীতি, পছন্দমত জিনিস কেনা ও ব্যবহার করা প্রভৃতিতে আমরা স্বাতন্ত্র্য চাহি না, পরের দ্বারা চালিত হইতে চাই—এ মত মানিয়া লওয়া যায় না।

স্বাতন্ত্র্যের ভীতি

মানুষ কি স্বাতন্ত্র্য-কামী ?

৫। **স্বাতন্ত্র্যের সহিত আইন ও কর্তৃত্বের সম্বন্ধ :** যে স্বাতন্ত্র্য সমাজের মধ্যে দশজনের সহিত একত্র থাকিয়া ভোগ করা যায় তাহাই প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য। কেহ যদি সমাজ হইতে পলায়ন করিয়া জনহীন অরণ্যে একা বাস করিতে যায়, তাহা হইলে সে কয়দিন জীবন রক্ষা করিতে পারিবে? সুগঠিত ও সুসংবদ্ধ সমাজের মধ্যেই স্বাতন্ত্র্যের সার্থকতা। সমাজে বাস করিতে হইলে কেহ অবাধ স্বাধীনতা দাবি করিতে পারে না। একের স্বাতন্ত্র্য যেন অন্যের স্বাতন্ত্র্যের বিঘ্ন উৎপাদন না করে। পথ দিয়া চলিবার স্বাতন্ত্র্য আছে বলিয়াই যে একজন অপর সকলকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিবে তাহা নহে। সকলের আচরণের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রক্ষিত না হইলে কেহই স্বাতন্ত্র্য উপভোগ করিতে পারে না। কিন্তু সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে কিরূপে? মানুষের বিবেক-বুদ্ধির উপর সুসংগতি রাখিবার ভার ছাড়িয়া দিলে, যাহাদের বিবেকের বালাই নাই, তাহাদের অত্যাচারে অন্য লোকের জীবনযাত্রা নির্বাহ করা কঠিন হইবে। নীতি, ধর্ম, স্নেহপ্রীতি প্রভৃতি অনেক ব্যাপারে সামাজিক ন্যায়বোধের দ্বারা চালিত হইয়া লোকে নিজেদের আচরণকে

পরস্পরের সুখসুবিধা

নিয়ন্ত্রিত করে ও পরস্পর সুখেস্বাচ্ছন্দ্যে বাস করে। কিন্তু যখন তাহাদের মধ্যে বিরোধ বাধে তখন আইনের সাহায্য লওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

একজনের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আছে বলিয়াই হয়ত তিনি অন্যের কুৎসা করিবেন বা অপরের সুনাম নষ্ট করিবেন তাহা হইতে পারে না। সেইজন্য আইন দ্বারা প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্যের সীমা নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়। আলোক ও অন্ধকার যেমন একই জিনিসের এপিঠ ওপিঠ; স্বাতন্ত্র্য ও নিয়ন্ত্রণও সেইরূপ পরস্পরের পরিপূরক। একজনের যেখানে স্বাতন্ত্র্য আছে, অন্যকে সেখানে নিজের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়।

স্বাতন্ত্র্য মানেই নিয়ন্ত্রণ

আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণের সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়। যদি আইন না থাকে, তবে কেহই স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিতে পারে না। আইনই প্রত্যেকের অধিকারের সীমা নির্দেশ করিয়া দেয়। কোনপ্রকার স্বাতন্ত্র্যই অবাধ বা নিয়ন্ত্রণহীন হইতে পারে না। এইজন্যই বার্কার বলিয়াছেন যে, প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজনীয়তা সকলের স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজনের দ্বারা স্বভাবতই সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত ("The need of liberty for each is necessarily qualified and conditioned by the need of liberty for all.") উইলোবিও বলেন যে, নিয়ন্ত্রণ আছে বলিয়াই স্বাতন্ত্র্যের অস্তিত্ব আছে। নিয়ন্ত্রণকে যদি তুলিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে হব্‌সের কল্পিত প্রাকৃতিক অবস্থা বা ভীষ্ম কথিত মাৎস্যন্যায় (বড় মাছ ছোট মাছকে গিলিয়া ফেলে) ফিরিয়া আসিবে। কাহারও জীবন, সুনাম ও ধনসম্পত্তি সুরক্ষিত হইবে না।

আইনের প্রয়োজনীয়তা

রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের উপর সকলের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ভার। স্বাতন্ত্র্য ও অধিকার রাষ্ট্রের দ্বারা সৃষ্ট কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে, কিন্তু রাষ্ট্রই যে উহা রক্ষা করে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যাহারা অসামাজিক বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া অপরের স্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করে, রাষ্ট্র তাহাদিগকে দণ্ড দেয়। সুতরাং রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব না মানিলে কেহই স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিতে পারে না।

সমাজের আদিম অবস্থায় একই ব্যক্তি মাঠে কাজ করিত, গোরু, মহিষ প্রতিপালন করিত, ঘর তৈয়ারি করিত ও কাপড় বুনিত। সভ্যতার

বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে ঐ সব কাজের মধ্যে যেটি সে সব চেয়ে ভালভাবে করিতে পারে, সেইটি নিজের জীবিকা অর্জনের উপায়স্বরূপ নির্বাচন করিয়া লইল। সে ঐ নির্বাচনের স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিতে পারিল কিন্তু এই শর্তে যে, অন্যান্য কাজে যাহাদের নিপুণতা আছে তাহাদের হাতে ঐ সব কাজের ভার ছাড়িয়া দিবে। অন্যভাবে বলিতে গেলে বলা যায় যে সে জীবনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্তু ও সেবার (goods and services) জন্য বিশেষজ্ঞের কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া তবে নিজের জীবিকা অর্জনের একটি মাত্র উপায় বাছিয়া লওয়ার স্বাতন্ত্র্য ভোগ করে। রাজনীতি লইয়া যাঁহারা ব্যাপৃত থাকেন তাঁহারা উহার বিশেষজ্ঞ। সেইজন্য সাধারণ লোকে তাঁহাদের হাতে পরস্পরের মধ্যে শান্তি ও সামঞ্জস্য রক্ষার ভার ন্যস্ত করিয়া নিজের নিজের পছন্দমত কাজ করেন। যাহারা নিজে একপ্রকার কাজে বিশেষজ্ঞ, অন্য সব কাজে বিশেষজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ সহ্য করিয়া তবে তাহারা স্বাতন্ত্র্য ভোগ করে। এইভাবে ব্যাপারটিকে দেখিলে আর স্বাতন্ত্র্য ও কর্তৃত্বের মধ্যে কোন স্বাভাবিক বিরোধ থাকে না।

বিশেষজ্ঞের স্বাতন্ত্র্য

স্বাতন্ত্র্য আত্মবিকাশের প্রকৃত সুযোগ দেয়, কিন্তু ইহা আইনের দ্বারা যতক্ষণ না স্বীকৃত হয় ততক্ষণ একের স্বাতন্ত্র্য অপরে মানিতে বাধ্য হয় না। সেইজন্য আইনের দ্বারা সমর্থিত নহে এমন স্বাতন্ত্র্য নীতিসঙ্গত হইলেও কার্যক্ষেত্রে ভোগ করা যায় না। তাই রীচি (Ritchie) বলিয়াছেন, "Liberty in the sense of positive opportunity for self-development is the creation of law and not something that could exist apart from the action of the state." আমার স্বাতন্ত্র্য অন্যের দ্বারা যাহাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় তাহা দেখিবার ভার রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের হাতে। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ অবশ্য খেয়ালখুসিমত উহা রক্ষা করিবেন না; আইন অনুসারে প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য প্রতিপালনের ব্যবস্থা করিবেন। অধিকাংশ রাষ্ট্রের সংবিধানে নাগরিকের কতকগুলি অধিকারকে মৌলিক বলিয়া স্বীকার করা হয়। ইংলণ্ডের সংবিধান অলিখিত হইলেও ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা হইতেই উহা উৎপন্ন, সুতরাং সেখানে স্বাতন্ত্র্যের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি।

৬। স্বাতন্ত্র্য ও অধিকারঃ স্বাতন্ত্র্য ও অধিকার মূলতঃ পৃথক বস্তু নহে। স্বাতন্ত্র্য নেতিবাচক—আমার চলাফেরায় হস্তক্ষেপ করিও না, আমার মত প্রকাশে বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করিও না, আমার ধনসম্পত্তি তুমি লইও না। লোকে কেন এই সব নিষেধ মানিয়া চলিবে? কেন না ব্যক্তির ইচ্ছামত যাতায়াতের, মত প্রকাশের ও ধনসম্পত্তি অর্জন ও ভোগের অধিকার রাষ্ট্র দিয়াছে। লাস্কী বলেন যে, রাষ্ট্র অধিকার দিয়াছে না বলিয়া রাষ্ট্র অধিকার মানিয়া লইয়াছে বলাই অধিকতর সঙ্গত। যাহা হউক, অধিকার হইতেই স্বাতন্ত্র্যের উৎপত্তি। প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের যে অধিকার আছে, তাহা হইতে স্বাতন্ত্র্য জন্মিয়াছে। কোলের (G. D. H. Cole) মতে বিনা বাধায় নিজের ব্যক্তিত্বের বিকাশ করিবার অধিকারই স্বাতন্ত্র্য। কিন্তু রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ যত কম হইবে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য তত বেশি হইবে—হার্বার্ট স্পেনসরের এই মত এখন আর স্বীকৃত হয় না। তাই বলা হয় যে, "The liberty of the individual is not always in inverse ratio to the amount of state regulation" এই তত্ত্বটি পরিকল্পনার (Planning) সহিত স্বাতন্ত্র্যের সম্বন্ধ বিচারে পরিস্ফুট হইবে।

৭। আর্থিক পরিকল্পনা কি স্বাতন্ত্র্যের পরিপন্থী? আর্থিক পরিকল্পনা দুই প্রকারের। কম্যুনিস্ট মতবাদী রাষ্ট্রসমূহে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলুপ্ত করা হইয়াছে এবং লাভের লোভে উৎপাদন ও বিনিময় নিষিদ্ধ হইয়াছে। ঐ সব দেশে পরিকল্পনার ব্যাপ্তি জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রে। আর ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মত রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মুনাফার জন্য উৎপাদনের প্রবৃত্তিকে বজায় রাখিয়া পরিকল্পনা করা হইতেছে। এইরূপ পরিকল্পনার পরিধি অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ।

রাশিয়াতে কোন্ জমিতে কি ফসল বুনিতে হইবে এবং কতটা পরিমাণ জন্মাইতে হইবে তাহা কর্তৃপক্ষ ঠিক করিয়া দেন। ভারতবর্ষে সরকার কৃষকের স্বাতন্ত্র্যের উপর হস্তক্ষেপ করেন না। যে যাহা খুসী উৎপন্ন করিতে পারে, তবে সরকার হইতে উপদেশ দেওয়া হয় যে এই জিনিসটার চাহিদা বাড়িবে বা কমিবে, সেই জন্য ইহার চাষ বাড়ানো বা কমানো ভাল। সাধারণতঃ এইরূপ উপদেশ দেওয়া ছাড়া কোন প্রকার জোরজবরদস্তি করা হয় না। বাংলা দেশে যখন পাটের দর খুব কমিয়া যাইতেছিল তখন

অবশ্য সরকার পাটের উৎপাদন কোথায় কোথায় কতটা হইবে তাহার নির্দেশ দিয়াছিলেন।

শিল্পের ক্ষেত্রে কম্যুনিস্ট দেশগুলি ঠিক করিয়া দেয় যে কোন কোন শিল্পের উৎপাদনে কত শ্রমিক, মূলধন ও জমি কি ভাবে নিযুক্ত হইবে। সাধারণ লোকে হয়তো বেশি মাখন, বেশি জুতা, বেশি রেডিয়োসেট্ কিনিতে উৎসুক এবং তাহার জন্য বেশি দাম দিতেও প্রস্তুত। কিন্তু পরিকল্পনার কর্তৃপক্ষ যদি ঠিক করিয়া থাকেন যে গুলিবারুদ, আণবিক বোমা ও চন্দ্র গ্রহে মানুষ প্রেরণের জন্য বেশি ব্যয় করা হইবে, তাহা হইলে জনসাধারণের ভোগ্যপদার্থ বেশি পরিমাণে পাইবার ইচ্ছা অপূর্ণ রহিয়া যায়।

পরিকল্পনা যেখানে সর্বব্যাপী সেখানে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের অনেকখানি বলি দিতে হয়। একজন একখানি বই লিখিলেন; তাহার মতবাদ বা বক্তব্য যদি কর্তৃপক্ষের পছন্দসই না হয়, তাহা হইলে উহা প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। সংবাদপত্রসমূহ রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, সুতরাং তাহাতেও কেহ রাষ্ট্রের অননুমোদিত মত প্রকাশ করিতে পারে না।

ভারতবর্ষে যে প্রকার পরিকল্পনা রূপায়িত হইতেছে তাহাতে কারখানার মালিক ও বণিকদের স্বাতন্ত্র্য কিছুটা অবশ্যই ক্ষুণ্ণ হইতেছে। শিল্পপতিরা যাহা খুশী তৈয়ারি করিয়া যে কোন দামে বিক্রয় করিবার স্বাতন্ত্র্য হারাইয়াছেন। তাঁহারা শ্রমিকদিগকে অনেক প্রকার সুখ-সুবিধা দিতে বাধ্য হইতেছেন। শ্রমিকেরা কোন কোন ব্যাপারে মালিকদের ব্যবহারের বিরুদ্ধে নালিশ করিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন। লোহা, সিমেণ্ট প্রভৃতি যে সব জিনিসের চাহিদা উৎপাদনের তুলনায় কম সে সব জিনিস কেহ যথেষ্ট পরিমাণে ক্রয় করিতে পারে না। সরকার হইতে যাঁহাকে যতখানি কিনিবার অনুমতি দিবেন তিনি ততখানি কিনিতে পারিবেন—তাহার বেশি নহে।

সকল প্রকার পরিকল্পনাতেই ভোক্তা ও উৎপাদক হিসাবে মানুষের স্বাতন্ত্র্য খানিকটা ক্ষুণ্ণ হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু কম্যুনিস্টেরা বলেন যে খালি-পেটে গালভরা কথা বলার স্বাতন্ত্র্য লইয়া লোকে কি করিবে? ধনতান্ত্রিক দেশে লোকের যাহা ইচ্ছা খরিদ করিবার এবং যেখানে খুশী প্রমোদভ্রমণে

যাইবার স্বাতন্ত্র্য আছে, কিন্তু শতকরা কয়জন এই স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিতে পারে? দেশের উৎপাদনের উপাদানগুলি কয়েকজন বড়লোকের খেয়াল মিটাইবার জিনিস উৎপাদনে নিয়োজিত না করিয়া অসংখ্য বিত্তহীনের অবশ্য প্রয়োজনীয় পদার্থ উৎপাদনে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। ভারতীয় পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে ইহাতে জোরজবরদস্তি মোটেই করা হয় না। পরিবার-নিয়ন্ত্রণের মতন গুরুতর প্রয়োজনীয় ব্যাপারেও রুগ্ন, বিকলাঙ্গ এবং জড়বুদ্ধি ব্যক্তিদের পরিবার বৃদ্ধি করিবার স্বাতন্ত্র্য কাড়িয়া লওয়া হয় নাই।

৮। অধিকারের অর্থ ও বর্গীকরণঃ অধিকার কোথা হইতে আসিল, ইহার স্বরূপ কি, ইহার সীমা কতদূর ইহা লইয়া অনেক মতভেদ আছে। আমরা পরে উহা বিচার করিব। মোটামুটিভাবে বলিতে পারা যায় যে, অধিকার ব্যক্তির, গোষ্ঠীর অথবা সংঘের এমন দাবি যাহা অপর ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সংঘ মানিয়া চলে ও স্বীকার করে। এই দাবি কাহারও খেয়ালের উপর নির্ভর করে না। কেবল মাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যেই দাবি উপস্থিত করা হয় না। যে দাবি সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হয় না, সে দাবিকে অধিকার বলা চলে না। একজনের অধিকার অপরের কর্তব্যরূপে পরিণত হয়। সার্বজনীন কল্যাণের অংশে একজনের যেমন দাবি আছে, তেমনি ঐ কল্যাণের জন্য তাহার দেয়ও কিছু আছে। অন্যের অধিকারকে মানিয়া চলিয়া সে তাহার কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারে। অধিকারের মূল উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুরণ। অধিকার ব্যতিরেকে কাহারও শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না। সেই জন্য কাহারও অধিকার যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, তাহার প্রতি সকলের সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

অধিকার কি?

অধিকার সমূহকে সামাজিক (Civil), রাজনৈতিক (Political) এবং অর্থনৈতিক (Economic) এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। সামাজিক অধিকার বলিতে সেইসব অধিকার বুঝায়, যাহার উপভোগের দ্বারা নিজের ব্যক্তিত্বের বিকাশ অন্যান্যের বিকাশের সঙ্গে সম্ভব হয় এবং যাহা সাধারণতঃ অপরে মানিয়া চলিবে বলিয়া দাবি করা যায়। আইনের দ্বারা সাধারণতঃ

তিন প্রকারের অধিকার

এই অধিকার সমর্থিত হয়। আইনের চোখে সকলে সমান। রাজনীতি পরিচালনায় প্রত্যক্ষ অংশ না লইলেও লোকে যে সব অধিকার সমাজের মধ্যে ভোগ করে ও অন্যকে ভোগ করিতে দেয় সেগুলিকে সামাজিক অধিকার বলা হয়। ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করা, নির্বাচিত হওয়া, সরকারী কাজে নিযুক্ত হওয়া প্রভৃতি অধিকারের দ্বারা শাসনপদ্ধতিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশ গ্রহণের দাবিকে রাজনৈতিক অধিকার বলে। অর্থনৈতিক অধিকারকে সামাজিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত বলা যায়, কিন্তু উহার গুরুত্ব এত বেশি যে, উহাকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করাই সঙ্গত।

৯। **বিশেষ বিশেষ সামাজিক অধিকার** ঃ সামাজিক অধিকারের মধ্যে কোন্‌গুলিকে ধরা হইবে, কোন্‌গুলি ছাড়া হইবে, ইহা লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে কিছু মতভেদ ছিল। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘ মানবের সার্বজনীন ও মৌলিক অধিকারের ঘোষণা পাশ করেন। এখন সামাজিক অধিকার সম্বন্ধে সকলে অনেকটা একমত হইয়াছেন।

সকল অধিকারের মূল হইতেছে নিজ নিজ জীবন রক্ষার অধিকার। প্রাণ ধারণের অধিকার সকলের চেয়ে বড় অধিকার। প্রাণে না বাঁচিলে আর অন্যান্য অধিকার কে ভোগ করিবে? সেইজন্য সকল দেশের সরকারই প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনধারণের অধিকারকে সুরক্ষিত রাখেন। গর্ভের সন্তানের জীবন রক্ষার দায়িত্বও সরকার গ্রহণ করেন। তাই গর্ভপাতের দ্বারা ভ্রূণহত্যা করা দণ্ডনীয় অপরাধ। কেহ যদি জীবনে বিতৃষ্ণ হইয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে সে আইন অনুসারে শাস্তি পায়। প্রত্যেকের জীবন রক্ষার অধিকার আছে, কিন্তু জীবন নষ্ট করিবার নহে। এই নীতির একমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় হত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ডদানে। হত্যাকারীকে প্রাণদণ্ড না দিলে সমাজে নরহত্যা আরও বাড়িয়া যাইবে, এই ভয়ে প্রাণের বদলে প্রাণ লওয়া হয়। কিন্তু অনেক মনীষী মনে করেন যে, প্রাণদণ্ড দেওয়া বর্বরোচিত প্রথা। প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মরক্ষা করিবার অধিকার আছে। আততায়ীর আক্রমণ হইতে নিজেকে বাঁচাইবার জন্য প্রয়োজন হইলে তাহাকে হত্যা পর্যন্ত করা যায়।

জীবন রক্ষা

ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের উপর সকলেরই অধিকার আছে। কাহাকেও দাসরূপে রাখিবার অধিকার কাহারও নাই। দাসত্ব প্রথা আজকাল কোথাও আইনের দ্বারা স্বীকৃত হয় না। স্বাধীনভাবে একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াতের অধিকারকেও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের অঙ্গ হিসাবে গণনা করা হয়। বিদেশ যাইতে হইলে অবশ্য অনুমতি লওয়া প্রয়োজন।

ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য

দেশের মধ্যে বিনা বিচারে কাহাকেও যেন আটক না করা হয় বা নির্বাসিত না করা হয়। যেখানে সরকার খেয়ালখুসী অনুসারে লোককে বন্দী করিয়া রাখিতে পারে সেখানে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য থাকিতে পারে না। যুদ্ধের সময় যখন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হয় তখন সরকার সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া কাহাকে কাহাকেও বন্দী করিয়া রাখেন। মৌলিক অধিকারের ঘোষণা অনুসারে ঐরূপ করা অন্যায়। যদি কাহারও বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী অভিযোগ আনা হয় তবে সে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালতের কাছে ন্যায্য বিচার দাবি করিতে পারে। যতক্ষণ না ঐ আদালতের দ্বারা সে দোষী বলিয়া নির্ণীত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে নির্দোষ বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার পরিবার, সুনাম ও চিঠিপত্রের গোপনীয়তা রক্ষায় আইনের সহায়তা দাবি করিতে পারে। পারিবারিক ব্যাপারে অন্যের হস্তক্ষেপ করা অন্যায়। তাই বলিয়া স্বামী মদ খাইয়া আসিয়া স্ত্রীকে মারিবে এমন কোন অধিকার কোথাও স্বীকৃত হয় না। সরকারের নিকট স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব যেমন মূল্যবান, স্বামীর ব্যক্তিত্বও সেইরূপ। যেখানে পিতামাতার উভয়েই উচ্ছৃঙ্খল সেখানে তাহাদের কাছে শিশু সন্তানেরা উপযুক্ত ভাবে শিক্ষালাভ করিতে পারে না। কিন্তু বিনা বিচারে কাহাকেও তাহার সন্তান পালনের অধিকার হইতে বিচ্যুত করা উচিত নহে। মৌলিক অধিকারের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর প্রত্যেকের জাতিধর্ম-নির্বিশেষে বিবাহ করিবার ও পরিবার প্রতিষ্ঠার অধিকার ঘোষিত হইয়াছে। উভয় পক্ষের পূর্ণ সম্মতি ছাড়া বিবাহ হইতে পারে না।

আধুনিক রাষ্ট্রে সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার সকলকে দেওয়া হয়। তাই বলিয়া চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি করিবার জন্য কেহ দল বাঁধিতে পারে না—

কেননা ঐরূপ দলের উদ্দেশ্য হইল অপরের অধিকারকে বিনষ্ট করা। যেরূপ কাজকে নীতি বিরুদ্ধ মনে করা হয় সেরূপ কাজের জন্য সংঘবদ্ধ হওয়ার দাবিকে সরকার স্বীকার করেন না। নগ্ন হইয়া চলাফেরার জন্য বা রৌদ্র পোহাইবার জন্য সংঘকে নীতি-বিরুদ্ধ বলা চলে কিনা সন্দেহ। এদেশে নাগা সন্ন্যাসী আছে, বিদেশে ন্যুডিস্ট ক্লাব আছে। সরকার তাহাদের উপর কতগুলি বিধিনিষেধ প্রয়োগ করেন, কিন্তু তাহাদের সংঘবদ্ধ হইবার অধিকারকে অস্বীকার করেন না। এ যুগে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হইবার ও ধর্মঘট করিবার অধিকার অনেক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। শ্রমিকরা ব্যক্তিগত ভাবে শিল্পপতিদের সঙ্গে পারিয়া উঠেন না বলিয়া তাঁহারা সংঘ বা ট্রেড ইউনিয়ন স্থাপন করিয়া বেতনের হার, কাজের সময়, বসবাসের সুবিধা এবং শিল্প পরিচালনায় অংশ গ্রহণের দাবি লইয়া আলাপ-আলোচনা করেন। কোন সমস্যা যদি উভয় পক্ষের নিকট সন্তোষজনক বিবেচিত না হয় তাহা হইলে শ্রমিকেরা ধর্মঘট করেন, কিংবা মালিকেরা কারখানায় তালা লাগাইয়া দেন। এইরূপ আচরণের ফলে সমাজের এবং সাধারণ লোকের অনেক ক্ষতি হয়। বিশেষ করিয়া আজকাল বৈদ্যুতিক বাতি, কলের জল, ডাকঘর, রেলপথ প্রভৃতি জীবনযাত্রার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া ধরা হয়। ঐ সব প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট হইলে লোকের দুর্ভোগের সীমা থাকে না। সেই জন্য আইনের দ্বারা কতগুলি শিল্পকে অপরিহার্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া উহাতে ধর্মঘট বেআইনী বলিয়া গণ্য করা হয়। এরূপ করিয়াও ধর্মঘট বন্ধ করা যায় না। যেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আছে সেইখানেই ধর্মঘট করিবার দাবিকে স্বীকার করা হয়। কিন্তু ধর্মঘট হইল ঔষধের মতন, তাহাকে পথ্য হিসাবে রোজ বা হামেশা ব্যবহার করিলে সাধারণের শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়, এ কথা আমরা যেন ভুলিয়া না যাই। প্রত্যেক ব্যক্তির শিক্ষার অধিকার এবং তাহার সংস্কৃতির বিকাশের অধিকার আছে।

সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার

মত প্রকাশের স্বাধীনতা একটি মৌলিক অধিকার। চিন্তার স্বাধীনতা আইন করিয়া বা জোরজবরদস্তি করিয়া খর্ব করা যায় না; চিন্তার প্রকাশের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। লোকে কথা বলিয়া বা সভায় বক্তৃতা

করিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে, কিংবা প্রবন্ধ লিখিয়া বা পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া অপরকে নিজের মতে আনিবার চেষ্টা করিতে পারে। বাক্‌-স্বাধীনতা হইতে সভা করিয়া মতামত প্রকাশের অধিকার আসে। বাক্যের স্বাধীনতা অপেক্ষা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা অধিক গুরুত্বপূর্ণ, কেননা মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে আমরা লক্ষ লক্ষ লোকের কাছে নিজের মতামত জানাইতে পারি, আর বক্তৃতা লাউড্‌স্পীকারের সাহায্যে বড়জোর কয়েক হাজার লোককে শুনাইতে পারি। তবে বক্তৃতার শ্রোতা ও বক্তার মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপিত হয় বলিয়া অনেক সময়ে উহার প্রভাব ছাপার অক্ষরের প্রভাব অপেক্ষা বেশি হয়। রেডিয়োতে যে বক্তৃতা দেওয়া হয় তাহাতে অবশ্য ব্যক্তিগত যোগাযোগ থাকে না। তবে অধিকাংশ দেশেই রেডিও রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীন বলিয়া সরকারের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশের সুযোগ ইহাতে অল্প। মত প্রকাশের স্বাধীনতার দ্বারাই সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার উন্নতি সাধিত হইয়াছে। সত্যের সন্ধান যিনি পাইয়াছেন তিনি জগদ্বাসীর সহিত উহার আনন্দ ভাগ করিয়া লইতে চাহেন। গ্যালিলিও প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীই সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে; এই সত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে জীয়ন্ত পুড়াইয়া মারা হইয়াছিল। কিন্তু ব্যক্তিকে মারিলেও সত্যকে গলা টিপিয়া মারা যায় না। পরস্পরের মধ্যে বিচার বিতর্কের দ্বারাই সত্য নির্ধারিত হয়। যাঁহাদের হাতে সরকারী ক্ষমতা আছে তাঁহারা যদি মনে করেন যে সত্যের তত্ত্ব কেবলমাত্র তাঁহাদের নিকটেই উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, এবং সেই সত্যের নিরিখে তাঁহারা অন্যের বিরুদ্ধ মতকে চাপিয়া রাখিবার অধিকার পাইয়াছেন তাহা হইলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ বন্ধ হইয়া যাইবে। আজ যাহা মিথ্যা বলিয়া ধারণা জন্মিতেছে কাল তাহা সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে। এরূপ ঘটনা প্রায়শই ঘটে। সেইজন্য কোন প্রকার মতের প্রকাশে বাধা দেওয়া অন্যায়। কোন কোন মনীষী দুর্নীতির অভিযোগেও কোন কবিতা, গল্প বা উপন্যাসের প্রচার বন্ধ করিবার ক্ষমতা সরকারকে দিতে রাজী নহেন।

স্বাধীনমত প্রকাশ

মুদ্রাযন্ত্রের তথা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক শাসন প্রণালীর স্তম্ভস্বরূপ। জনসাধারণের কি অভাব-অভিযোগ আছে সরকারের কোন

প্রস্তাবিত আইনের প্রতি তাহাদের মনোভাব কিরূপ, সরকারী কর্মচারীরা যেভাবে তাঁহাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেছেন, তাহা সন্তোষজনক কিনা এসব তথ্য মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হইতেই জানা যায়। সরকার যদি কাহারও কিছু বলিবার অধিকার স্বীকার না করেন, তাহা হইলে অসন্তোষ গোপনে গোপনে ছড়াইয়া পড়িবে এবং অবশেষে বিপ্লবে পরিণত হইবে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছিল না বলিয়া বুঝা যায় নাই যে স্টালিনের বিরুদ্ধে জনমত কতটা বিক্ষুব্ধ। রাজা রামমোহন রায় বলিয়াছেন, সরকারের নিজের স্বার্থেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মানিয়া চলা উচিত। আজকাল বড় বড় সংবাদপত্র ধনিকশ্রেণীর মুখপত্র হইয়াছে সত্য, কিন্তু শ্রমিকেরাও নিজেদের সংবাদপত্র বাহির করিতেছেন।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা

ধর্মের অধিকার একটি প্রধান সামাজিক অধিকার। প্রত্যেক নরনারী নিজ নিজ ধারণা ও চিন্তা অনুসারে ধর্ম অনুসরণ করিবেন। সরকার কাহারও উপর কোন ধর্ম চাপাইয়া দিবেন না, কোন ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। এই নীতি মোটামুটি সকল রাষ্ট্রই মানিয়া লইয়াছে।

সম্পত্তির অধিকার, এবং চুক্তির অধিকারও সামাজিক অধিকার। কিন্তু এই সকল অধিকারের সহিত অর্থনৈতিক প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট। আজকাল আর্থিক প্রশ্নের গুরুত্ব এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে উহা স্বতন্ত্রভাবে বিচার করা প্রয়োজন।

১০। রাজনৈতিক অধিকার : রাজনৈতিক অধিকার বলিতে রাষ্ট্রের মধ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করা এবং বিদেশে অবস্থানকালেও রাষ্ট্রের দূতাবাসের সাহায্যে অন্য কোন রাষ্ট্রের ব্যক্তি বা সরকারের বিরুদ্ধে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করাও বুঝায় বটে, কিন্তু মুখ্যতঃ প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার, নির্বাচিত হইবার ও সরকারী কাজে নিযুক্ত হইবার অধিকার বুঝায়। রাজনৈতিক অধিকার না থাকিলে সামাজিক অধিকার রক্ষা করা যায় না। যদি শাসকবর্গ জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত না হন, কিংবা সাধারণ লোকের পক্ষে নির্বাচিত হইবার অধিকার না থাকে, তাহা হইলে যাঁহাদের হাতে আইন প্রণয়ন করিবার, শাসন করিবার ও বিচার করিবার ভার থাকিবে তাঁহারা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অধিকার মানিয়া চলিতে বাধ্য হইবেন না।

সামাজিক অধিকারের সহিত রাজনৈতিক অধিকারের সম্বন্ধ

রামচন্দ্রের মতন আদর্শ নৃপতি হয়তো লোকের ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবেন না। কিন্তু রামরাজ্য কয়বার দেখা গিয়াছে? ক্ষমতার উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকিলে কুশাসনই স্বাভাবিক, কেন না অবাধ ক্ষমতা বাধাহীন দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয়।

ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যে যেমন যেমন ভোটের অধিকারের প্রসার পাইয়াছে, তেমনি তেমনি নূতন শ্রেণীর ভোটারদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের চলাফেরার স্বাধীনতা স্বীকার করা হইয়াছে। সোভিয়েট-শাসিত দেশে ভোটের অধিকার ও নির্বাচিত হইবার অধিকার থাকিলেও সেখানে মত-প্রকাশের অধিকার অনেকটা ক্ষুণ্ণ এবং ধর্মঘট করিবার অধিকার সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। যেখানে শ্রেণী বৈষম্যের পরিবর্তে শ্রমিক ও কৃষকের একনায়কত্ব প্রবর্তিত হইয়াছে সেখানে ধর্মঘট করিবার সার্থকতাও নাই।

পূর্বে রাজনৈতিক অধিকার অনেকটা নেতিবাচক ছিল অর্থাৎ শাসক-মণ্ডলী যাহাতে স্বেচ্ছাচারী না হইতে পারেন তাহার জন্য প্রজার আবেদনের অধিকার, যে ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহাকে বিচারালয়ে উপস্থিত করিবার দাবি প্রভৃতি। এখন নাগরিক যাহাতে শাসন ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা রাজনৈতিক অধিকারে করা হইয়াছে।

১১। **অর্থনৈতিক অধিকার**ঃ যোগ্যতা অনুসারে কর্মে নিযুক্ত হইবার, পরিবার প্রতিপালনের, উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইবার ও উপযুক্ত অবসর লাভের দাবিকে অর্থনৈতিক অধিকারের মধ্যে প্রধান স্থান দেওয়া হইতেছে। খালি পেটে ভোট দেওয়ার সখ খুব কম লোকেরই থাকে। নিঃস্ব ব্যক্তির পক্ষে বিধান-মণ্ডলীতে বা স্বায়ত্ত-শাসনের সংস্থায় নির্বাচিত হওয়া খুবই কঠিন। নিরন্ন ও আশ্রয়হীন ব্যক্তি মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা লইয়া কি করিবে? সেইজন্য মৌলিক অধিকারের ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেকের কাজ করিবার, নিজের ইচ্ছামত কাজ বাছিয়া লইবার, ন্যায্য ও সঙ্গত বিধিব্যবস্থার মধ্যে শ্রম করিবার অধিকার থাকা উচিত। সম্মিলিত জাতিসংঘ প্রত্যেক রাষ্ট্রের দৃষ্টি আরও কয়েকটি আর্থিক বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করিয়াছেন। যথা রাষ্ট্র এমনভাবে নীতি নির্ধারণ করিবে, যাহাতে প্রত্যেক নরনারী জীবনযাত্রার পক্ষে পর্যাপ্ত আয় পাইতে পারে;

উৎপাদনের সাধনগুলির সত্ত্ব ও নিয়ন্ত্রণ এমনভাবে যেন রাখা হয়, যাহাতে সার্বজনীন কল্যাণের শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা হয়; ধনসম্পত্তি যেন এমনভাবে কয়েক-জনের হাতে কেন্দ্রীভূত না হয়, যাহাতে সাধারণের অনিষ্ট ঘটিতে পারে, নর ও নারী সমান কাজের জন্য যেন সমান হারে বেতন পায়; ছোট ছেলেদের দিয়া যেন খনি বা কারখানায় কাজ করাইয়া লওয়া না হয়; শ্রমিকদের যেন স্বাস্থ্যহানি না হয়; প্রত্যেক রাষ্ট্র যেন জনসাধারণের পুষ্টির এবং জীবনের মান উন্নয়নকে মুখ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করে। এইগুলিকে অধিকার বলিয়া স্বীকার করা যায় না, সম্মিলিত জাতিসংঘের সাধু ইচ্ছা বলিয়া ধরা যায়। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র কি আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলে ভাল হয়, তাহার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করাই ইহার উদ্দেশ্য। অধিকাংশ রাষ্ট্রের আইনে এই সব অধিকার স্বীকৃত হয় নাই। সেইজন্য এই আদর্শ যদি কোথাও অবহেলিত হয় তাহা হইলে নালিশ করা চলে না।

কাজ করিবার সামর্থ্য ও ইচ্ছা আছে, অথচ কাজ পাওয়া যাইতেছে না—ইহার চেয়ে শোচনীয় ব্যাপার খুব কমই আছে। পরিকল্পনার দ্বারা বেকারি উৎসন্ন করিবার চেষ্টা করা যায়; কিন্তু ভারতে জনসংখ্যা এত দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইতেছে যে, প্রত্যেক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বেকারের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়িতেছে। যে সব রাষ্ট্রে অর্থ নৈতিক জীবনকে সামূহিক-ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, সেখানে প্রত্যেককে কোন না কোন কাজে নিযুক্ত করা হইতেছে। কিন্তু কর্মে নিযুক্ত হইবার অধিকারের বিনিময়ে সামাজিক অনেক অধিকারকে ছাড়িতে হইয়াছে। ধনতান্ত্রিক দেশে সম্পত্তির ও চুক্তি করিবার অধিকারের উপর জোর দেওয়া হয়, কিন্তু সোভিয়েট-শাসিত দেশে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপ করা হইয়াছে।

১২। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিষয়ক মতবাদঃ ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকা উচিত কিনা এই প্রশ্ন লইয়া যেরূপ গুরুতর মতভেদ দেখা গিয়াছে, এমন বোধ হয় আর অন্য কিছু লইয়া দেখা যায় নাই। এ মতভেদ শুধু পণ্ডিতে পণ্ডিতে নহে, দেশের সঙ্গে দেশের। বর্তমান জগৎ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া দুই যুধ্যমান সংঘে বিভক্ত হইয়াছে। হেগেলের ও প্রুধনের সিদ্ধান্তে দুই দিকের দুই চরম মতের নিদর্শন পাওয়া যায়। হেগেলের মতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকিলে স্বাধীনতাই থাকিতে পারে

না; সম্পত্তিকে তিনি 'স্বাতন্ত্র্যের উপলব্ধি' বলিয়াছেন। আবার প্রুধন 'সম্পত্তি কি'? শীর্ষক গ্রন্থে শেষ পর্যন্ত সম্পত্তিকে ডাকাতি বলিয়াছেন।

প্লেটো হইতে আরম্ভ করিয়া রুশো পর্যন্ত সকল মনীষীই সম্পত্তি বলিতে প্রধানতঃ জমি বুঝিয়াছেন। ধনবিজ্ঞানের পরিভাষায় জমি বলিতে শুধু মাটির উপরিভাগ বুঝায় না, উহার তলায় যে খনিজ সম্পদ আছে তাহা এবং নদ-নদী, খাল-বিল ও তাহার ভিতরের মৎস্যাদি সব কিছু বুঝায়। কিন্তু আজকাল শুধু জমি নহে, কল-কারখানা, ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, রেল, বাস, জাহাজ, এরোপ্লেন প্রভৃতি অসংখ্য জিনিসকে সম্পত্তি বলিয়া ধরা হয়। এক টুকরা কাগজে লক্ষ লক্ষ টাকার শেয়ারের কিংবা ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানতের প্রমাণ থাকে। তাই সকল সম্পত্তির পরিমাণ চোখে দেখিয়া বুঝা যায় না। ব্যক্তিগত সম্পত্তি একেবারে বিলুপ্ত হইতে পারে না। সব কিছু সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া ঘোষণা করিলেও, পরিধেয় জামা, কাপড় এবং জল খাইবার বাসনপত্র অন্ততঃ ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া ধরিতেই হইবে। লেনিনের ন্যায় সাম্যবাদীও এক গেলাসে সকলের জল খাওয়া পছন্দ করিতেন না।

ভূমি কি?

অদৃশ্য সম্পত্তি

ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব কি করিয়া হইল তাহা লইয়া নৃতত্ত্ববিদ্, ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা আলোচনা করিয়াছেন। জমির উপর মালিকানা সত্ত্ব প্রথমেই স্থাপিত হয় নাই। যে যুগে মানুষ দলবদ্ধ হইয়া পশু শিকার করিয়া বেড়াইত, সে যুগে শিকারের মাংসের উপর সকলের অধিকার থাকিলেও, শাণিত প্রস্তর বা তীর-ধনুক প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ছিল। যে সব পশুপক্ষী দেখিতে ভাল লাগিত তাহাদিগকে না মারিয়া পুষিবার চেষ্টা হইতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বোধ জন্মিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে গোরু-ঘোড়াকে পোষ মানাইয়া তাহাদিগকে মানুষের কাজে লাগানো হইল। গৃহপালিত পশুদলের খাদ্য যখন এক জায়গায় ফুরাইয়া যাইত, তখন দলের সকলে অন্যত্র যাইত। পশু-পালনের যুগে জমির ব্যক্তিগত অধিকার জন্মে নাই, কেন না এক জমিতে বেশিদিন বাস করিবার রীতি ছিল না। লোকে যখন চাষ-আবাদ করিতে শিখিল, তখন জমির

ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব

উপকারিতা বুঝিতে পারিল। জমি প্রথমে সকলের ছিল এবং ন্যাসরূপে (Custody) ব্যবহৃত হইত; পরে উহার উপর দখল স্থাপন এবং শেষে অধিকার স্থাপন করা হইল। পরিবারের সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গে দলগত সম্পত্তি পরিবারগত সম্পত্তিতে পরিণত হইল। প্রত্যেক পরিবার সমান পরিমাণ জমির অধিকারী হইয়াছিল এরূপ মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। যাহাদের গায়ের জোর বেশি, পরিশ্রম করিতে যাহারা ভালবাসিত এবং যাহাদের বুদ্ধি অন্যের চেয়ে বেশি ছিল, তাহারা বেশি জমি দখল করিত। সমাজ সংগঠনের পূর্বে অবশ্য অধিকারের প্রশ্ন উঠিতে পারে না। কেন না একের অধিকার অন্য সকলের দ্বারা স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য অন্যান্য অনেক ব্যাপারের মতন এখানেও যৌনকে সম্পত্তির লক্ষণ বলিয়া ধরা হইত। জমি যখন প্রচুর ছিল, তখন কেহ কাহারও জমির ওপর হস্তক্ষেপ করিত না। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমির চাহিদা বাড়িতে লাগিল। প্রবলেরা সেই সময় হইতে দুর্বলের জমি কাড়িয়া লইতে লাগিল। এক উপজাতি অন্য উপজাতিকে পরাজিত করিয়া তাহাদের সমস্ত জমি কাড়িয়া লইত। বিজয়ী দলের নেতারা নিজের দখলে বেশি জমি রাখিতেন; হৃত-সর্বস্ব ব্যক্তিরা পরের জমি চাষ করিয়া জীবিকা অর্জন করিত। সামন্ততন্ত্রের অবসানকালে ভূমিহীন শ্রমিকেরা কারখানায় কাজ পাইল। কারখানা স্থাপন করিবার মতন বুদ্ধি ও শক্তি যাহাদের ছিল, তাহারা অপরকে খাটাইয়া লইয়া উৎপন্ন ধনের কিছু অংশ মাত্র তাহাদিগকে মজুরি দিয়া বাকীটা নিজেরা মুনাফা হিসাবে লইত। তাহাদের বংশধরেরা হয়তো কারখানা চালাইবার হাঙ্গামা পোহাইতে রাজী হইল না। তাহারা অপরকে মূলধন জোগাইয়া বসিয়া বসিয়া সুদ খাইত কিংবা শেয়ারের লভ্যাংশ ভোগ করিতে লাগিল।

কারখানার যুগ

প্লেটো তাঁহার 'রিপাবলিক' গ্রন্থে শাসক ও রক্ষক শ্রেণীকে কোন প্রকার সম্পত্তি রাখিতে দেন নাই। তাঁহার মতে যাঁহাদের উপর সাধারণের মঙ্গল বিধানের ভার আছে, তাঁহাদের যদি সম্পত্তি বা পরিবার থাকে তাহা হইলে তাঁহারা নির্লোভ ও নিরপেক্ষ হইয়া শাসন কার্য চালাইতে পারিবেন না। কিন্তু তাঁহার পরবর্তী গ্রন্থ 'Laws'-য়ে তিনি খানিকটা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্বীকার করিয়াছেন। আজকাল

প্লেটোর মত

যেমন আমাদের দেশে আইন করিয়া নির্দেশ দেওয়া হইতেছে যে, এত একর জমির বেশি কেহ রাখিতে পারিবে না, প্লেটো তেমনি বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্র যে পরিমাণ জমি প্রত্যেককে দিবার ব্যবস্থা করিবে তাহার চেয়ে দুইগুণ, তিনগুণ বা চারগুণ বেশি জমি কেহ ভোগ করিতে পাইবে না। ধনের বৈষম্য হইতে যে বিপ্লবের উদ্ভব হয়, সে বিষয়ে প্লেটো খুব সজাগ ছিলেন।

আরিস্টটলের মত

আরিস্টটল ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে প্রয়োজনীয় মনে করিতেন, কিন্তু তিনিও বলিয়াছেন যে, সম্পত্তি যদি মুষ্টিমেয় লোকের হাতে থাকে তবে তাহারা নিজেদের হাতে শাসন ক্ষমতাও রাখিবার চেষ্টা করিবে। জনসাধারণের অসন্তোষের ফলে তাহারা ক্ষমতাচ্যুত হইবে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, নেহেরু সরকারের মতন তিনি সমবায় মূলক কৃষিকর্মের সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে জমি সাধারণের দখলে ও সাধারণের দ্বারা একত্রে ব্যবহৃত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কেহই মন দিয়া চাষ করিবে না। কিংবা জমি ব্যক্তির অধিকারে রাখিয়া সকলে মিলিয়া একত্রে চাষ করিতে পারে অথবা উহা সাধারণের অধিকারে রাখিয়া ব্যক্তিগতভাবে চাষ-আবাদ করা যাইতে পারে। জমির উপর মমত্ব-বোধ না জন্মিলে চাষবাস ভাল হয় না বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। তাঁহার মতে দান-ধ্যান, আতিথ্য প্রভৃতি সৎকার্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর নির্ভর করে।

লকের মত

শ্রমের ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া জন লক্ মনে করিয়াছেন। কিন্তু যতটা সম্পত্তির সদ্ব্যবহার করা যায় তাহার চেয়ে বেশি সম্পত্তি দখল করাকে তিনি অন্যায় মনে করিয়াছেন। ভাগবত পুরাণে আছে যে যতটা খাদ্যে পেট ভরে তাহার চেয়ে বেশি যে রাখে সে চুরি করে। রুশো ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে অপরিহার্য সামাজিক অধিকার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি সর্বপ্রথমে এক খণ্ড জমিকে ঘিরিয়া লইয়া বলিয়াছিল ইহা আমার এবং লোকে বোকা ছিল বলিয়া তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়াছিল, সেই পৌর-সমাজের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। কেহ যদি সেই সময়ে তাহার বেড়া ভাঙ্গিয়া ফেলিত এবং বলিত "এই ধূর্ত হইতে সাবধান হও; জমির ফসল আমাদের সকলের এবং জমি কাহারও নহে এই কথা ভুলিলে

সর্বনাশ হইবে" তাহা হইলে মনুষ্যজাতি কত যুদ্ধ, কত হত্যা, কত বিভীষিকা ও দুর্দৈব হইতে বাঁচিয়া যাইত।

আদর্শবাদী গ্রীন্ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশের পক্ষে সম্পত্তির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি সমাজের বৈচিত্র্য রক্ষার জন্য সম্পত্তির বৈষম্যকেও সমর্থন করিয়াছেন। ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা কার্যে পরিণত করিবার স্বাতন্ত্র্য উপভোগ না করিলে সমাজের কল্যাণ হয় না, উহা করিতে গেলে কাহারো কম, কাহারো বেশি সম্পত্তি হইবেই। এই বৈষম্যকে ঐ স্বাতন্ত্র্যের মূল্যস্বরূপ ধরা যাইতে পারে।

গ্রীনের মত

ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বপক্ষে ও বিপক্ষে আর্থিক, নৈতিক, দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক যুক্তি উত্থাপিত করা হয়। আমরা সংক্ষেপে এই সব যুক্তির যাথার্থ্য বিচার করিব।

আর্থিক দিক হইতে সম্পত্তির সমর্থন-কল্পে বলা হয় যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি কিছু না থাকিলে লোকে নিরাপত্তা ভোগ করিতে পারে না। আধিব্যাধি, বিপদে-আপদে, সন্তানদিগকে লেখাপড়া শিখাইতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি খুব কাজে লাগে। যাহার কিছুই নাই সে সব সময়ে বিপদের ভয়ে অস্থির হয়। যাহাদের কিছু বিষয়-সম্পত্তি আছে তাহারা দেশের প্রতি বেশি মমত্ব বোধ করে এবং দেশের উন্নতির জন্য চেষ্টা করে। যাহারা বিত্তহীন তাহারা বেপরোয়া হইয়া বিপ্লবের সমর্থন করে। সমাজের প্রকৃত চাহিদা, যাহা পূরণ করিবার জন্য লোকে টাকা খরচ করিতে প্রস্তুত আছে, তাহা মিটাইয়া লোকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন করে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকিলে লোকের সকল চাহিদা মেটাইবার জন্য যথোপযুক্ত প্রচেষ্টা দেখা যাইবে না।

সম্পত্তির সমর্থন

এই তিনটি যুক্তির উত্তরে বলা যায় যে, আমেরিকার মতন ধনী দেশেও কি সকলের ব্যক্তিগত সম্পত্তি আছে? যাহাদের নাই তাহাদের নিরাপত্তা রক্ষিত হইবে কিরূপে? রাষ্ট্র হইতে যদি অসুখের সময় চিকিৎসার ও আর্থিক সাহায্যের এবং সকল শিশুর নিঃশুল্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে প্রত্যেকে অনেক বেশি নিরাপত্তা ভোগ করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এখন ধনীদরিদ্র সকলকেই

উহার বিরুদ্ধে বক্তব্য

ভোটের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। গরীবেরা একজোট হইয়া চেষ্টা করিলে বৈধানিক উপায়েই শাসকমণ্ডলীকে বদলাইতে পারে। যুদ্ধের সময় গরীবেরা যেভাবে দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে ব্যগ্রতা দেখাইয়াছে তাহাতে আর বলা চলে না যে দেশের প্রতি মমত্ববোধ সম্পত্তিবানদের একচেটিয়া অধিকার। বড়লোকেরা তাহাদের বিলাসব্যসনের জন্য অনেক জিনিস চায়, তাহাদের ঐ সব চাহিদা পূরণ করিতে যাইয়া গরীবের জন্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদনে শৈথিল্য দেখা দিতে পারে। দুধের অভাবে শিশুরা শীর্ণবিশীর্ণ হইতে পারে, কিন্তু বিত্তবানদের জন্য ভালো মদের বা খারাপ বইয়ের সরবরাহ কম হয় না।

নৈতিক দৃষ্টিকোণ

নৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে বলা হয় যে যাহার যেমন কাজ করিবার ক্ষমতা সে তেমনি সম্পত্তি অর্জন করিতে পারে। উপযুক্ত লোকদের সম্পত্তি দেখিয়া যাহারা ঈর্ষা বোধ করে তাহারা নৈতিক দোষে দুষ্ট। কিন্তু সম্পত্তিবানদের মধ্যে অনেকেই তো পূর্বপুরুষের অর্জিত ধন ভোগ করিতেছেন। যাঁহারা প্রথমে সম্পত্তি অর্জন করিয়াছিলেন তাঁহারা কাহাকেও ঠকান নাই স্বীকার করিলেও তাঁহাদের উত্তরাধিকারীদের অলস জীবন যাপন করাকে সমর্থন করা যায় কি করিয়া? যাঁহারা এখন শিল্প-বাণিজ্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন তাঁহারা কি সকলেই নীতিসম্মত পন্থায় অর্থ উপার্জন করিতেছেন? একদিকে শ্রমিকগণকে, অন্যদিকে ক্রেতা সাধারণকে বঞ্চিত না করিয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে ব্যবহার করিলে জনসাধারণের বেশি কল্যাণ হইবে ইহা যেখানে প্রমাণ করা যায় সেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে সমর্থন করা চলে।

দার্শনিক দৃষ্টিকোণ

দার্শনিক দৃষ্টিতে বলা হয় যে সম্পত্তি না হইলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ফুটিতে পারে না। কিন্তু গোবর যদি এক জায়গায় স্তূপাকারে জমা করা হয় তাহা হইলে উহার দুর্গন্ধে যেমন লোকে টিকিতে পারে না, অথচ উহা ছড়াইয়া দিলে উৎকৃষ্ট সার হয়, তেমনি ধনসম্পত্তি কয়েকজনের হাতে স্তূপীকৃত হইলে তাহারা মানুষ না হইয়া অমানুষ হয়। আমেরিকার একজন কোটিপতি নিজে সার্বজনীন হিতের জন্য অধিকাংশ সম্পত্তি দান করিয়া অন্যান্য কোটিপতিকেও তাঁহার মতন করিতে বলিয়াছেন এই জন্য যে বেশি সম্পত্তি থাকিলে তাঁহাদের ছেলেরা

জীবনে কোন উৎসাহ ও কার্যক্ষমতা দেখাইতে পারিবে না—আলস্যে তাহাদের জীবন দুর্বিসহ হইয়া উঠিবে।

মনস্তাত্ত্বিক যুক্তি প্রয়োগ করিয়া বলা হয় যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির লোভেই লোকে প্রাণপণে পরিশ্রম করে। উহার বিলোপ সাধন করিলে কেহ মন দিয়া কাজ করিবে না, ফলে উৎপাদন হ্রাস পাইবে। কিন্তু টাকা পয়সার লোভে বা পুরস্কারের আশায় অধিকাংশ লোক কাজ করে স্বীকার করিলেও উৎপাদনের সাধনের উপর ব্যক্তিগত অধিকার স্থাপনের সমর্থন করা যায় না। শ্রমের ও দক্ষতার তারতম্য অনুসারে পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করিলে উৎপাদনও হ্রাস পায় না, অথচ ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব বজায় রাখিবারও প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া মানুষ কেবল ব্যক্তিগত লাভের আশাতেই কাজ করে তাহা নহে। প্রত্যেক শিল্পী—সে কারুশিল্পীই হউক, চারুশিল্পীই হউক—মনের আনন্দে সৃষ্টি করে। সে সুন্দর কাজ, সুন্দর জিনিসের উৎপাদনই তাহার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বলিয়া মনে করে। দশের মঙ্গলে আমারও মঙ্গল এরূপ বুদ্ধি যে লোকের একেবারে নাই তাহা বলা যায় না। ভূমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার যেসব দেশে লোপ করা হইয়াছে সেখানে কৃষিবস্তুর উৎপাদনের হার বাড়িয়াই গিয়াছে—কমে নাই।

মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ

ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে এখন আর কোন দেশেই পবিত্র এবং সেইহেতু রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে বলিয়া মনে করা হয় না। ধনগত বৈষম্য দূর করা করপ্রথার অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া সর্বত্র স্বীকার করা হয়। আয়কর, উত্তরাধিকার কর, ব্যয় কর প্রভৃতি উপায়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে সীমিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। ভারতবর্ষে প্রথমে করদ নৃপতিদের এবং পরে জমিদারদের ভূসম্পত্তিকে উচ্ছেদ করা হইয়াছে। অন্যপক্ষে আবার রাশিয়াতেও কৃষকদিগকে তরিতরকারী, ফুলফল উৎপাদন করিবার মতন টুকরা জমি নিজস্ব করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভগবান্ বুদ্ধের ঘোষিত মধ্যপন্থাই শ্রেয়ঃ।

ধনবৈষম্য দূর করা স্বীকৃত নীতি

১৩। **অধিকার তত্ত্ব**ঃ অধিকারকে কেহ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে, কেহ আইনের দৃষ্টিতে, কেহ নৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে, আবার কেহ বা সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে

পণ্ডিতেরা প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকারের কথা বলিতেন। রোমান্ সম্রাট জাস্টিনিয়ানের আইনে আছে যে, প্রাকৃতিক আইনবলে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীন হইয়া জন্মগ্রহণ করে। হবৃস প্রাক্-সামাজিক যুগের মানুষের নিজের ইচ্ছা অপরের উপর চাপাইবার প্রাকৃতিক অধিকারের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাহার ফলে পরস্পরের মধ্যে বিবাদবিসম্বাদ হইত বলিয়া লোকেরা নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া ঐ অধিকার ছাড়িয়া দিল এবং সার্বভৌমের কর্তৃত্ব স্বীকার করিল। জন লক্ এবং টমাস্ পেন্ কিন্তু বলেন যে, জীবন, স্বাতন্ত্র্য, সম্পত্তি প্রভৃতির উপর প্রাকৃতিক অধিকার কখনই নষ্ট হয় না। আমেরিকার অন্তর্গত ভার্জিনিয়া রাজ্যের সংবিধানেও এই মতের প্রতিধ্বনি দেখিতে পাওয়া যায়। উহাতে লিখিত আছে যে, প্রকৃতির বশে সকল মানুষ মুক্ত ও স্বাধীন এবং তাহাদের কতকগুলি মৌলিক অধিকার আছে। যখন তাহারা সমাজবন্ধন মানিয়া লয়, তখন কোন চুক্তিই তাহাদিগকে উহা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না; ভবিষ্যতের কোন বিধানও উহা কাড়িয়া লইতে পারে না। এই সব প্রাকৃতিক অধিকার হইতেছে জীবন, স্বাতন্ত্র্য, সম্পত্তি অর্জন ও ভোগ করা, সুখের সন্ধান ও প্রাপ্তি এবং নিরাপত্তা। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্ল্যাকস্টোন তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'ইংলণ্ডের আইনের ভাষ্যে' লেখেন যে, মানুষ প্রকৃতির অমোঘ বিধানে কতকগুলি অবাধ অধিকার ভোগের ক্ষমতা পাইয়াছে। যেমন খুসী তেমনি কাজ করিবার ক্ষমতাকে তিনি প্রাকৃতিক স্বাতন্ত্র্য বলিলেও সামাজিক জীবনে উহা পরিত্যাগ করা দরকার হয়।

প্রাকৃতিক অধিকার

মহামতি বেন্থাম্ প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকারের মতবাদকে যুক্তিতর্কের সাহায্যে খণ্ডন করেন। তিনি বলেন যে, প্রকৃতি শব্দের কোন নির্দিষ্ট অর্থ নাই। কেহ বা প্রকৃতি বলিতে ভগবানকে বুঝে, কেহ বা সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে বুঝে, কেহ বা মানুষের এক্তিয়ারের বাহিরে যাহা কিছু সবকে প্রকৃতি বলে। এ রকম একটা ধোঁয়াটে শব্দের ব্যবহার না করাই ভাল। তিনি আরও বলেন যে, সমাজ সংগঠনের পূর্বে কোন অধিকার ছিল না; সমাজের বাহিরে কোন অধিকার থাকিতেও পারে না। সমাজের স্বীকৃতি না থাকিলে অধিকার

বেন্থামের যুক্তি

নিরর্থক হয়। অপরে যে দাবি মানিয়া লয় তাহাই একের অধিকার হয়। অধিকার ও কর্তব্য একই জিনিস। একের যাহা অধিকার তাহা অন্যরা মানিয়া লইয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ না করাকে কর্তব্য মনে করে। অবশ্য বেন্থামের মতে লোকে স্বার্থ-বুদ্ধির প্রেরণায় অন্যের অধিকারকে মানা কর্তব্য বলিয়া স্বীকার করে। বেন্থাম আইনগত অধিকারের সঙ্গে নৈতিক অধিকারের পার্থক্য সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। রাষ্ট্রের প্রধান শক্তির বিরুদ্ধে কাহারও কোন আইনগত অধিকার থাকিতে পারে না। আইন অনুসারে সকলকে ঐ শক্তির আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিরই অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার নৈতিক অধিকার আছে।

ইউটিলিটিরিয়ান্ মত

বেন্থামের মতে অধিকতম সংখ্যার প্রচুরতম কল্যাণের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত। যাহাতে অধিকাংশ ব্যক্তির অধিকসংখ্যক সুখ হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া যদি ব্যক্তির অধিকার স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে সংখ্যালঘিষ্ঠদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অধিকার অস্বীকার করিতে হয়।

আইনগত ব্যাখ্যা

বেন্থামের পরে আইনবিদেরা বলিলেন যে, রাষ্ট্রের ইচ্ছা হইল আইন। আইন যাহাকে অধিকার বলিয়া স্বীকার করে, তাহাই কোন ব্যক্তি অপরের বিরুদ্ধে রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্রের সাহায্য লাভ করে। হল্যাণ্ডের মতে অধিকার হইতেছে, কোন ব্যক্তির সেই ক্ষমতা, যাহার দ্বারা সে রাষ্ট্রের সম্মতি ও সাহায্যবলে অপরের কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। ("Capacity residing in one man of controlling with the assent and assistance of the state, the actions of others")। এই মত অনুসারে আইন অধিকার সৃষ্টি করে ও স্বীকার করে। তাই এক ব্যক্তি উহা দাবি করে এবং অন্য সকলে ঐ দাবি মানিয়া চলাকে কর্তব্য মনে করে। এই মতবাদের গুণ হইতেছে এই যে, ইহা খুব সুনির্দিষ্ট ; প্রাকৃতিক অধিকারের মতন অস্পষ্ট নহে। কিন্তু প্রথাই অধিকাংশ অধিকারের জনক ; আইন যখন প্রথাকে অঙ্গীভূত করে, তখন অধিকারকেও স্বীকার করিয়া লয়, সৃষ্টি করে না। অনেক পণ্ডিত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কেমন করিয়া প্রাচীনকালে প্রথার দ্বারা অধিকার স্থিরীকৃত হইত তাহা দেখাইয়াছেন।

আইন সব দেশে একরকম নহে ; এক দেশেও সকল যুগে একপ্রকার নহে। আইনের পরিবর্তন প্রায়ই হয়। সুতরাং আইনগত অধিকারও অপরিবর্তনীয় হইতে পারে না।

অধিকারের পিছনে নৈতিক সমর্থনও থাকা প্রয়োজন। যাহা আইন-সঙ্গত তাহা নীতি-সঙ্গত নাও হইতে পারে। রাশিয়াতে একসময়ে ভ্রূণ হত্যা আইনের দ্বারা সমর্থিত হইত ; ভারতবর্ষে স্ত্রীকে স্বামীর মৃতদেহের সহিত পুড়াইয়া মারা বেআইনী ছিল না। এখনও এক ব্যক্তি তাহার ধনসম্পত্তি যাহাকে খুসী দিয়া যাইতে পারে। এইরূপ অধিকার সমাজের হিতকর কিংবা ন্যায়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নাও হইতে পারে।

নৈতিক অধিকার

রাষ্ট্র মানুক বা না মানুক সমাজ যে সব অধিকারকে মানে তাহাকে আমরা নৈতিক অধিকার বলিতে পারি। এরূপ অধিকারের পিছনে ন্যায়বোধ ও নীতির সমর্থন থাকে। কিন্তু নীতি সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকের ও বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন যুগের ধারণা একরকম নহে। সেই জন্য নৈতিক অধিকার কি সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকা অসম্ভব নহে।

আদর্শবাদীর ব্যাখ্যা

আদর্শবাদীরা অধিকারকে ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির বা ব্যক্তিত্বের বিকাশ করিবার সর্বজনস্বীকৃত দাবি বলিয়াছেন। গ্রীনের মতে ব্যক্তির নিজের আদর্শগুলিকে ইচ্ছা করিবার বা চরিতার্থ করিবার দাবিই অধিকার ("Right is the claim of an individual to will his own ideal objects")। সামাজিক মানুষের নৈতিক প্রকৃতির ভিতর যে অধিকার অন্তর্নিহিত আছে তাহাকে তিনি প্রাকৃতিক অধিকার আখ্যা দিয়াছেন। নৈতিক জীবন যাপন করিতে হইলে সমাজের যে অবস্থা থাকা অবশ্য প্রয়োজন সে অবস্থা রক্ষা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। একজনে যে স্বাতন্ত্র্য পাইতেছে অন্যেও যেন সেরূপ স্বাতন্ত্র্য পাইতে পারে ইহাই অধিকার-তত্ত্বের মূল কথা। ঐ স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা সে সর্বাঙ্গীন বিকাশ লাভ করিতে পারে, এবং সমাজ-কল্যাণে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। রাষ্ট্র অধিকার স্বীকার করিয়া এবং রক্ষা করিয়া লোকের ব্যক্তিত্ব-বিকাশের অন্তরায় দূর করিতে পারে, কিন্তু বিকাশ করাইতে পারে না।

গামপ্লাউইটস্ ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে আদর্শবাদের বিরুদ্ধে বাস্তববাদ প্রচার

করেন। তাঁহার মতে অধিকার ন্যায় বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। রাষ্ট্রে যে অধিকার বাস্তবিকপক্ষে স্বীকার করিয়া লওয়া হইতেছে তাহারই উপর ন্যায়বিচার নির্ভর করে। তিনি নৈতিক সত্তাকে অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মত গ্রহণযোগ্য নহে।

বাস্তববাদ

সমাজবিজ্ঞানী গিডিংস্ প্রাকৃতিক অধিকার শব্দটি এক নূতন অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে মানুষের ভিতর সহিষ্ণুতার অভ্যাস জন্মে। অভ্যাসকে কেহ সৃষ্টি করে না, আবিষ্কারও করে না, উহা কালক্রমে জন্মে। সহিষ্ণুতার ফলে ক্রমে একের পক্ষে অপর সকলের স্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করা নিষিদ্ধ হইল। এই রূপে সকলের সমষ্টিগত ব্যবহারের ফলে সামাজিক সংহতির উৎপত্তি হইল এবং পরে রাজনৈতিক সংগঠন আসিল। সমাজ ও ব্যক্তি উভয়েরই টিকিয়া থাকিবার ও বিকাশত হইবার প্রাকৃতিক অধিকার আছে।

বর্তমানে অধ্যাপক লাস্কীর বিখ্যাত সৃজনাত্মক অধিকারতত্ত্ব (creative theory of Rights) সর্বাপেক্ষা সুসঙ্গত বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়। তিনি বলেন যে অধিকারের সঙ্গে কার্যের (Function) সম্বন্ধ আছে। অধিকারের উদ্দেশ্য হইল সামাজিক কল্যাণে অংশ গ্রহণ করা; সমাজের ক্ষতিকর কিছু করার অধিকার কাহারও নাই। ব্যক্তির, সংঘের ও সমাজের জীবনকে একই সঙ্গে সুসমৃদ্ধ করা অধিকারের উদ্দেশ্য। ব্যক্তি কেবলমাত্র রাষ্ট্রের সদস্য নহে, শুধু রাষ্ট্রের দ্বারা তাহার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব নহে। পরিবার, ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতি সংঘেরও ব্যক্তিত্ব বিকাশে অংশ আছে, এবং সেইজন্য তাহাদেরও অধিকার আছে। আমাদের অধিকার সমাজ-নিরপেক্ষ নহে; সমাজের মধ্যেই ইহা অন্তর্নিহিত। অধিকারের দ্বারা সমাজও রক্ষা পায়, ব্যক্তিও রক্ষা পায়। কাহারও যাহা খুসী করিবার অধিকার নাই। সমাজের মঙ্গলের জন্য আমি কি করি তাহার উপর ভিত্তি করিয়া আমার অধিকার গড়িয়া উঠিয়াছে; আমার নির্দিষ্ট কর্তব্য ভালো ভাবে সম্পাদন করিবার জন্য যতখানি প্রয়োজন কেবলমাত্র ততখানি অধিকার আমি দাবি করিতে পারি ("My rights are built at always

লাস্কীর সৃজনাত্মক অধিকারবাদ

upon the relation my function has to the wellbeing of society, and the claims I make must, clearly enough, be claims that are necessary to the proper performance of my function.")

১৪। অধিকার কি উপায়ে সংরক্ষিত হয়? অধিকার ঘোষণা করা যত সহজ তাহা রক্ষা করা তত সহজ নহে। সরকারের হাতে শাসন চালাইবার ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। সরকার যদি বুঝিতে পারেন যে, তাঁহাদের কাজকর্মের খুঁটিনাটি বিচার করিবার কোন ব্যবস্থা নাই তাহা হইলে তাঁহারাই ব্যক্তির অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করেন। ক্ষমতার উপভোগে মানুষের ক্ষমতা-লোলুপতা আরও বাড়াইয়া দেয়। সরকারও এই নীতির ঊর্ধ্বে নহে। সেইজন্য গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার সময় হইতে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সরকারের হাত হইতে অধিকারকে সংরক্ষণ করিবার উপায় বাহির করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন।

ফরাসী বিপ্লবের সময় মানুষের অধিকার ঘোষণা করা হইয়াছিল, কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই নেপোলিয়নের শাসনে ফরাসীদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অধিকার বিলুপ্ত হইল। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে সংবিধানের মধ্যে কতকগুলি মৌলিক অধিকার নিবদ্ধ করিবার রীতি প্রবর্তিত হয়। ইহাতে জনসাধারণ জানিতে পারে তাহাদের কি কি অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। সরকার যদি কোন অধিকার ভঙ্গ করেন তাহা হইলে লোকে সরকারের বিরুদ্ধে বিচারালয়ে নালিশ করিতে পারে। যদি বিচারকমণ্ডলী স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হন তাহা হইলে সরকারকে অধিকার ভঙ্গের জন্য খেসারত দিতে বাধ্য করিতে পারেন। কিন্তু যুদ্ধের বা গৃহযুদ্ধের আশংকা দেখা দিলে সরকারের হাতে সংবিধানের অধিকার-ঘটিত অধ্যায়টি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে মুলতুবি রাখিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। সেই ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করিয়া সরকার জনসাধারণের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারেন। হিট্‌লার সর্বেসর্বা হইবার পূর্বে জার্মানির সংবিধানকে এইভাবে এড়াইয়া গিয়াছিলেন।

সংবিধান

ইংলণ্ডের সংবিধান লিখিত নহে বলিয়া সেখানে মৌলিক অধিকারের কোন ঘোষণা নাই। কিন্তু সেখানে আইনের অনুশাসন (Rule of law) প্রচলিত আছে এবং উহার ফলে অধিকার রক্ষা করা সহজ হয়। আইনের

অনুশাসনের নীতি হইল এই যে, কাহাকেও সাধারণ বিচারালয়ের ন্যায্য বিচার ছাড়া বন্দী করিয়া রাখা হইবে না। বিনা বিচারে বেশি দিন কাহাকেও আটক রাখা চলে না। বন্দী বা তাহার বন্ধুবান্ধবের আবেদনক্রমে নির্দিষ্ট দিনে তাহাকে বিচারকের সমক্ষে উপস্থিত করিতে হয় এবং কেন বন্দী করা হইল তাহার কারণ দেখাইতে হয়। যদি উপযুক্ত কারণ না দেখানো হয়, তাহা হইলে বন্দী মুক্তি পায়। যিনি যত উচ্চ পদেই অধিষ্ঠিত থাকুন না কেন, সকলেই সাধারণ আইনের অধীন। কোনপ্রকার অন্যায়ের অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে তাঁহাকে সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় সাধারণ বিচারালয়ে বিচার করা হয়। এই সব নিয়ম থাকায় ইংলণ্ডে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় আছে। তবে যুদ্ধের সময় হেবিয়াস্ কর্পাস আইন (বিচারকের সামনে বন্দীকে উপস্থিত করা) ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কার্যকরী রাখা সম্ভব হয় না।

হেবিয়াস্ কর্পাস আইন

ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য অনেকাংশে নির্ভর করে বিচারকমণ্ডলীর নিরপেক্ষতার ও স্বাধীনতার উপর। যেখানে বিচারকগণের চাকুরির স্থায়িত্ব শাসকমণ্ডলীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে সেখানে বিচারকেরা নির্ভয়ে ও নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে পারে না। সেইজন্য সকল সুসভ্য দেশেই এখন বিচারকগণের চাকুরি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত স্থায়ী করা হইয়াছে। তাঁহাদের বিচারের উপর হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার কাহারও নাই। কোন একনায়কতন্ত্রে সেইজন্য জনসাধারণের অধিকার-ঘটিত মামলা সাধারণ বিচারালয়ে পাঠানো হয় না, বিশেষভাবে গঠিত ট্রাইব্যুনালে প্রেরিত হয়। এরূপক্ষেত্রে অধিকারের বিশেষ কোন মূল্য থাকে না।

বিচারকের স্বাধীনতা

সরকারকে আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল রাখিলে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য অনেকটা রক্ষা পাইতে পারে। আইনসভা জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত হয়। ব্যক্তির অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিলে সরকারের অধীনে যে কোন কর্মচারীকে জবাবদিহি করিতে হয়। কিন্তু আইনসভার সমালোচনা প্রত্যক্ষরূপে ব্যক্তির অধিকার রক্ষা করিতে পারে না; পরোক্ষভাবে শাসকমণ্ডলীকে সংযত রাখিতে পারে।

নির্ভীক এবং সুশিক্ষিত নাগরিকের সদাজাগ্রত সতর্কতা অধিকারের

সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাবশালী রক্ষাকবচ। যে কোন ঘোষণা বা প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এড়াইয়া চলিবার মতন দুষ্টবুদ্ধি সরকারের মনে আসিতে পারে, কিন্তু লোকে যদি সঙ্গে সঙ্গে উহার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে তাঁহারা সংযত হইয়া চলিতে বাধ্য হন।

নাগরিকের সতর্কতা

১৫। অধিকার ও কর্তব্যঃ আমরা এ পর্যন্ত কর্তব্যের কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করি নাই। তাহার কারণ ইহা নহে যে, অধিকারই মুখ্য, কর্তব্য গৌণ। নাগরিক-শাস্ত্র অধ্যয়নের সময়ে সকলেই শিখিয়াছেন যে, আইন মানিয়া চলা, কর প্রদান করা, যুদ্ধের সময় দেশকে রক্ষা করা নাগরিকের প্রধান কর্তব্য। সেইজন্য আমরা এখানে অধিকারের দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করিলাম। ইহাতে দেখা গেল যে অধিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত থাকিলেও সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে কর্তব্য ছাড়া অধিকার থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ কর্তব্য ও অধিকার উভয়েই মানুষের সমাজবোধ হইতে জন্মিয়াছে; কেবল বিভিন্ন দৃষ্টি-কোণ হইতে দেখিলে ইহাদিগকে পৃথক্ মনে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যে আমার অধিকার মানিয়া না চলে, ততক্ষণ পর্যন্ত উহা অধিকার বলিয়াই গণ্য হইতে পারে না। আমার যাহা অধিকার অন্যের তাহা কর্তব্য; আবার অন্যের অধিকার মানিয়া চলা আমার কর্তব্য। যে কোন মত প্রকাশের স্বাধীনতা যদি আমি ভোগ করিতে চাই তাহা হইলে অন্যকেও ঐরূপ মতপ্রকাশের সুযোগ দেওয়া আমার কর্তব্য। আমি যদি পরমতে অসহিষ্ণু হই, তাহা হইলে সমাজের সংহতি নষ্ট হইবে। আমার কু-আচরণ অন্যকে অসহিষ্ণু করিয়া তুলিবে। যাহা খুসী বলিতে পারি বলিয়াই যে আমি অপরের সুনামের বিরুদ্ধে বা ধর্মমতের বিরুদ্ধে কটুক্তি করিব তাহা নহে। তাহারাও আমার প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিতে পারে বুঝিয়া আমাকে সংযত হইয়া মতামত প্রকাশ করিতে হইবে।

উভয়ই একই জিনিস

অধিকার রক্ষার জন্য আইন-আদালত আছে বটে, কিন্তু নাগরিকেরা যদি পরস্পরের প্রতি কর্তব্য পালনে বিমুখ হয় তাহা হইলে দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে প্রত্যেকের অধিকার রক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠে। কোন দেশে

যদি সমাজ-বিরোধী ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে রেলগাড়িতে ধনপ্রাণ ও মর্যাদা রক্ষা করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। আইন-আদালত, পুলিশ প্রভৃতি থাকা সত্ত্বেও সামাজিক কর্তব্যবোধ-বিরহিত দুর্বৃত্তদিগকে দমন করা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ নাগরিকেরা পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়া দুষ্ট লোকদিগকে প্রতিরোধ করিতে ও ধরাইয়া দিতে বদ্ধপরিকর হইতে পারেন। রেলপথে অরাজকতা সহ্য করিব না এরূপ দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিলে বিনাটিকিটে ভ্রমণ, ট্রেণের আসবাবপত্র চুরি, যাত্রীদের টাকাপয়সা, অলংকার ছিনাইয়া লওয়া প্রভৃতি অপরাধের প্রতিকার করা সম্ভব হয়। অবশ্য সরকারকেও জনমতের সাহায্যে তাঁহাদের অবশ্য করণীয় কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করা প্রয়োজন।

ব্যক্তির যেমন অধিকার আছে, পরিবার, ট্রেড ইউনিয়ন, ধর্মসভা প্রভৃতি সংঘেরও সেইরূপ অধিকার আছে। রাষ্ট্রের দ্বারা ঐ সব অধিকার যাহাতে খর্বীকৃত না হয় তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখাও সকলের কর্তব্য।

অনুশীলন

১। What is the meaning of Liberty in Political Science? What are the safeguards of Liberty in a modern State? (1963)

স্বাতন্ত্র্য মানে যাহা ইচ্ছা করিবার স্বাধীনতা নহে। স্বাতন্ত্র্য ও নিয়ন্ত্রণ পরস্পরের পরিপূরক। একের স্বাতন্ত্র্য যেন অন্যের স্বাতন্ত্র্যের বিঘ্ন না জন্মায়। যে স্বাতন্ত্র্য সমাজের মধ্যে দশজনের সহিত একত্র থাকিয়া ভোগ করা যায় তাহাই প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য।

আধুনিক রাষ্ট্রে বিচারকদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা, আইনের রক্ষণাবেক্ষণ ও সংবিধানের রক্ষাকবচ দ্বারা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য সুরক্ষিত হয়।

তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকরণ দেখ।

২। What is meant by equality? What is its relation to liberty?

সাম্য বলিতে আইনের কাছে সকলের সমতা, রাজনৈতিক অধিকারের সমতা এবং আর্থিক সাম্য বুঝায়। যেখানে ধনীদের সহিত দরিদ্রগণের

আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে সেখানে গরিবেরা স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিতে পারে না। সাম্য ও স্বাতন্ত্র্য একে অপরের পরিপূরক।

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকরণ দেখ।

৩। (a) What do you understand by Rights? Examine the implications of the right to work.

(b) What makes a claim a right is not the mere fact that it is recognised by law, but that it is morally justifiable. Discuss.

(c) Why are rights necessary in a modern democratic state?

অধিকার কোন ব্যক্তির, গোষ্ঠীর বা সংঘের এমন দাবি যাহা অপর ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সংঘ মানিয়া লয়। ইহা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। কার্যে নিযুক্ত হইবার অধিকার যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু রাষ্ট্র যদি কাজ দিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে নাগরিকেরা রাষ্ট্রের হাতে উৎপাদন, বিনিময় ও বণ্টন ব্যবস্থা সমর্পণ করিতে বাধ্য। তাহাতে ধনিকশ্রেণীর লোকেরা সম্মত নহেন।

ত্রয়োদশ প্রকরণে অধিকারতত্ত্ব দেখ।

অধিকার সমাজের মধ্যেই ভোগ করা যায়। ইহার দ্বারা ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়। সমাজের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তি যাহা করে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া অধিকারতত্ত্ব বাড়িয়া উঠিয়াছে।

৪। How is it true that Law is an essential condition of Liberty?

আইন না থাকিলে কেহই স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিতে পারে না। কোন প্রকার স্বাতন্ত্র্যই অবাধ বা নিয়ন্ত্রণহীন হইতে পারে না। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব না মানিলে কেহ স্বাতন্ত্র্য ভোগ করিতে পারে না।

পঞ্চম প্রকরণ দেখ।

৫। Discuss the 'right of resistance to the State' with special reference to the views of Green and Laski on the question.

ষষ্ঠ অধ্যায়ের দশম প্রকরণ দেখ।

৬। Discuss the justification for the maintenance of individual property.

ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রয়োজন আছে কিনা তাহা লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। সম্পত্তি মানুষকে অলস করে। তাহার বিলাস ব্যসনের জোগান দিতে যাইয়া গরীবের অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন অবহেলিত হয়। কিন্তু সম্পত্তির লোভে অনেকে যে প্রাণপণে কাজ করে তাহা অস্বীকার করা যায় না।

দ্বাদশ প্রকরণ দেখ।

দশম অধ্যায়

রাষ্ট্রের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মক্ষেত্রের সীমা

১। **রাষ্ট্রের লক্ষ্য সম্বন্ধে মতভেদঃ** শুনিতে পাওয়া যায় যে আমাদের দেশের নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা এককালে তর্ক করিতেন তৈলাধার পাত্র কি পাত্রাধার তৈল। আমরা তাঁহাদের বাস্তবজ্ঞানের স্বল্পতা লইয়া হাসিঠাট্টা করি। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বড় বড় পণ্ডিতেরা আজ আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া তর্ক করিয়া আসিতেছেন এই লইয়া যে, ব্যক্তি রাষ্ট্রের জন্য, কি রাষ্ট্র ব্যক্তির জন্য। প্লেটো, আরিস্টটল হইতে আরম্ভ করিয়া হিট্‌লার মুসোলিনী পর্যন্ত অনেকে রাষ্ট্রকেই মুখ্যস্থান দিয়াছেন এবং ব্যক্তির সুখদুঃখকে রাষ্ট্রের বেদীমূলে উৎসর্গ করা যাইতে পারে বলিয়াছেন। অন্যদিকে ব্যাসদেব হইতে আরম্ভ করিয়া লাস্কি পর্যন্ত অসংখ্য মনীষী বলেন যে, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই ;' ব্যক্তির জন্যই রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের কোন কল্পিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে পদদলিত করা যায় না। সমাজ-বিজ্ঞানীরা রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে কোন দ্বন্দ্বকে বাস্তব বলিয়া স্বীকার করেন না।

রাষ্ট্র ব্যক্তির জন্য না ব্যক্তি রাষ্ট্রের জন্য

প্রাচীন ভারতে ধর্মশাস্ত্রকারগণের সহিত অর্থশাস্ত্রকারগণের একটি বিরোধ দেখা যায়। মনু, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকারেরা বলেন যে, ধর্মই সকলের উপরে ; ধর্মকে মানিতে রাজ্যও বাধ্য এবং রাজার কর্তব্য হইল ধর্মকে রক্ষা করা ও প্রতিষ্ঠিত করা। কৌটিল্য, শুক্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি অর্থশাস্ত্রকারদের মতে রাষ্ট্র না থাকিলে ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের কিছুই টিকিতে পারে না। মহাভারতকার বলেন যে, রাষ্ট্রের সাহায্যেই লোক ধর্ম, অর্থ ও কাম ভোগ করিতে পারে। তিনি রাষ্ট্রকে ত্রিবর্গ-লাভের উপায় মাত্র মনে করিয়াছেন, রাষ্ট্রকে উন্নত করা মানবজীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য এরূপ কথা বলেন নাই। ইংরাজীতে বলা যায় যে প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রকে as a means to an end

প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রের লক্ষ্য

ব্যক্তিকে ধর্ম, অর্থ ও কাম উপলব্ধির সুযোগ দেওয়া

বলিয়া ধরা হইত, রাষ্ট্রকেই an end in itself বলা হইত না। রাষ্ট্র উদ্দেশ্য সাধনের উপায়মাত্র, উপেয় নহে।

কিন্তু তাই বলিয়া সেকালে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা কেহ চিন্তা করিতেন বলিলে অতিশয়োক্তি করা হইবে। বস্তুতঃ প্রাচীনকালে কি হিন্দুদের মধ্যে কি ইহুদিদের মধ্যে, কি গ্রীকদের মধ্যে ব্যক্তির জীবনকে সামাজিক প্রথা ও নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা হইত। সে কি খাইবে, কি পরিবে, কাহাকে বিবাহ করিবে, কোন্ বয়সে বিবাহ করিবে ইত্যাদি ব্যাপারে ব্যক্তির কোন স্বাতন্ত্র্য ছিল না।

আরিস্টটলের মত

আরিস্টটলের মতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কেবল জীবন রক্ষা নহে, মহত্তর জীবনের উপলব্ধির সুযোগ দেওয়া। কিন্তু তিনি ব্যক্তিকে সমাজের নিয়ন্ত্রণের অধীনে রাখিবার পক্ষপাতী। তাঁহার মতে সেই রাষ্ট্রই শ্রেষ্ঠ, যাহাতে সুনাগরিকেরা স্বেচ্ছায় আইন মানিতে প্রবৃত্ত হয়। গ্রীক চিন্তানায়কেরা জীবনের সামান্যতম অংশও রাষ্ট্রের আয়ত্তের বাহিরে রাখিবার কল্পনা করিতে পারেন নাই। মানুষের সকল ইচ্ছারই চরিতার্থতা সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে হয়।

লাস্কীর মত

লাস্কীর মতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল সকল মানুষকে সর্বাধিক আকারে সামাজিক-কল্যাণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ করা। রাষ্ট্র কেবল লোকের বাহিরের আচরণের সমতা আনিতে পারে। ধর্ম, চারুকলা প্রভৃতি মানসিক ব্যাপারে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব অবাঞ্ছনীয়।

আধুনিক পণ্ডিতদের মতে সমাজ ও রাষ্ট্রকে এক মনে করা উচিত নহে। রাষ্ট্র সমাজের অন্যতম এক শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। সমাজের সকল ক্ষমতা রাষ্ট্র একচেটিয়া করিয়া লইতে পারে না। রাষ্ট্রের ইচ্ছা বাস্তবপক্ষে শাসকমণ্ডলীর

আধুনিক মতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য

ইচ্ছা। মানুষের সমগ্র জীবনকে রাষ্ট্রের অধীনে আনা যায় না এবং যাইলেও আনা উচিত নহে। সেইজন্য রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইতেছে **জনগণের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া প্রত্যেককে এমন অধিকার ভোগ করিতে দেওয়া, যাহাতে সকলে নিজ নিজ অন্তর্নিহিত শক্তি অনুসারে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইতে পারে।** এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় রাষ্ট্রকে একটি উপায়রূপে দেখা হইল এবং জনকল্যাণ যে ব্যক্তির কল্যাণের

অতিরিক্ত একটা কিছু নহে তাহারও ইঙ্গিত দেওয়া হইল। জনকল্যাণ বলিতে কি বুঝায় তাহা লইয়া মতভেদের অন্ত নাই। তাই ঐ শব্দটি এখানে ব্যবহার করা হইল না। ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তির "পরিপূর্ণভাবে বিকাশ"কে অধ্যাপক রীচি ব্যক্তির মহত্তম জীবনের উপলব্ধি বলিয়াছেন ("the realisation of the best life by the individuals")। পরিপূর্ণ বিকাশের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া অন্য একজন ফরাসী মনীষী বলিয়াছেন—ব্যক্তির দৈহিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানসিক শক্তির পূর্ণতম উপভোগ।

২। **রাষ্ট্রের ত্রিবিধ উদ্দেশ্য:** রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ও আদর্শবাদীদের মতের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে যাইয়া আমেরিকার মনীষী বার্জেস্ ও গার্ণার তিন তিনটি উদ্দেশ্যের কথা বলিয়াছেন। বার্জেস্ বলেন যে, রাষ্ট্রের চরম উদ্দেশ্য হইল মানবিকতার পরম বিকাশ, জগতের সভ্যতার উৎকর্ষ সাধন এবং পৃথিবীতে নীতি ও ধর্মের রাজ্য স্থাপন করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইতেছে রাষ্ট্রের মধ্যে জাতির প্রতিভার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তোলা। তৃতীয়, কিন্তু গুরুত্বের দিক দিয়া মূল কর্তব্য হইতেছে শাসনের শৃঙ্খলার সহিত ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের সামঞ্জস্য সাধন করা। তাঁহার মতে ঐতিহাসিক কালক্রমের দিক দিয়া দেখিতে গেলে তৃতীয় উদ্দেশ্যই প্রথমে সাধিত হয়। শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ না করিয়া ব্যক্তিকে যতখানি স্বাতন্ত্র্য দেওয়া যায় তাহা দেওয়া রাষ্ট্রের মৌলিক উদ্দেশ্য। ব্যক্তির বিকাশের উপর সমাজের বিকাশ নির্ভর করে। কিন্তু সমষ্টির উন্নতি ছাড়া ব্যক্তির উন্নতি হইতে পারে না। বৈচিত্র্যময় জগতে যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য আছে, তেমনি প্রত্যেক জাতিরও নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য আছে। কোন জাতি দর্শনশাস্ত্রে, কোনও জাতি কাব্য ও চিত্রকলায়, কোন জাতি দৈহিক শক্তিতে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইতে পারে। জাতির প্রতিভা যাহাতে ফুটিতে পারে সেইজন্য প্রথা, আইন ও সংস্থাসমূহকে সুযোগসুবিধা দিতে হইবে। তৃতীয়তঃ ব্যক্তি যেমন একা থাকিতে পারে না, পৃথিবীতে তেমনি একটি মাত্র রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্বন্ধচ্যুত হইয়া থাকিতে পারে না। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতার ফলে বিশ্বসভ্যতার বিকাশ হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রের উচ্চতম লক্ষ্য হওয়া উচিত মানবজাতির সামগ্রিক কল্যাণ সাধন। এই প্রসঙ্গে স্বামী

বিবেকানন্দের একটি মহতী বাণী স্মরণযোগ্য—"সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য জগতের মূল ভিত্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে সহানুভূতিযোগে তাঁহার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্তব্য। শুধু কর্তব্য নহে, ইহার ব্যতিক্রমে মৃত্যু, পালনে অমরত্ব" (বর্তমান ভারত, পৃঃ ৩০)।

স্বামী বিবেকানন্দের মত

অধ্যাপক গার্ণার এই মত সামান্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে রাষ্ট্রের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তিগণের মধ্যে শান্তি, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও সুবিচারের ব্যবস্থা করা। একজনের অধিকারে অন্যে যেন বাধা না দিতে পারে। সকলে যেন নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য অপর ব্যক্তির, সংঘের এবং বিশেষ করিয়া সরকারের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে। এই কর্তব্য যে রাষ্ট্র পালন করিতে পারে না, তাহাকে রাষ্ট্র নাম দেওয়াই চলে না। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইল সমষ্টির কল্যাণসাধন। যে সব কাজ ব্যক্তিগত চেষ্টায় সম্পাদন করা যায় না সেগুলি সরকারের চেষ্টায় অনায়াসে করা যায়। বসন্ত, কলেরা, যক্ষ্মা প্রভৃতির বীজাণু দূর করিবার সাধ্য একা বা দশজনের নাই। ইহাতে সরকারের এমন কি বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের শক্তি প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হয়। বিদ্যালয়ের সকল ছেলেমেয়েকে খাঁটি দুধ খাওয়াইবার ব্যবস্থা ব্যক্তিগত চেষ্টায় হওয়া অসম্ভব। এই ধরনের কল্যাণকর কাজকে ছাড়িয়া দিয়া জাতীয় কল্যাণ সাধন করিতে যাওয়া আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। জাতির বৈশিষ্ট্যকে ব্যক্তির স্বাস্থ্য ও সম্পদের ভিত্তিতে বিকশিত করা কর্তব্য। গার্ণারও বার্জেসের সঙ্গে একমত হইয়া বলেন, রাষ্ট্রের চরম ও শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হইতেছে বিশ্বসভ্যতার উন্নতি বিধান। প্রথমে ব্যক্তির ব্যষ্টিগত, পরে তাহাদের সমষ্টিগত কল্যাণসাধন করিয়া বিশ্বের উন্নতি সাধন করাকে রাষ্ট্রের লক্ষ্য বলিলে জাতিতে জাতিতে বিরোধের অবসান ঘটিবে। বিংশ শতাব্দীর দুইটি মহাযুদ্ধের ইতিহাস হইতে দেখা গিয়াছে যে, কোন রাষ্ট্র যদি অপর সকল রাষ্ট্রকে দাবাইয়া নিজে বড় হইতে চায় তাহা হইলে তাহার পতন অনিবার্য হয়। জাতীয়তাবাদের

গার্ণারের মত

সহিত আন্তর্জাতিকতার সামঞ্জস্য বিধান যাহাতে হয় এমনভাবে রাষ্ট্রের লক্ষ্য নির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

৩। **রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি বিস্তারের ইতিহাসঃ** রাষ্ট্রের কার্যের সীমা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে তাহা চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট হইয়া নাই। এক এক যুগে রাষ্ট্রের কর্মের পরিধি নিতান্ত ক্ষুদ্র হইয়াছে, আবার অন্য যুগে তাহা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। একই যুগে বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র যে কতটা বিভিন্ন হইতে পারে তাহা একদিকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র অন্যদিকে সোভিয়েৎ রাশিয়ার রাষ্ট্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে। সামাজিক চেতনা ও আর্থিক বিকাশের উপর রাষ্ট্রের কার্যের সীমা অনেকখানি নির্ভর করে। গ্রীকেরা রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে কোন পার্থক্য মানিতেন না। কাজেই ব্যক্তির রাষ্ট্র ছাড়া কোনপ্রকার সত্তা আছে তাহা তাঁহারা স্বীকার করিতেন না।

প্রাচীনকালে রাষ্ট্রের কার্য খুব সীমাবদ্ধ ছিল। সেকালে মানুষ প্রথার দাস ছিল। সমাজ মানুষের সকল আচরণ ও ব্যবহারকে অনুশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিত। কেমন করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে হইবে, কি কি জিনিস খাইতে হইবে, কেমন করিয়া শুইতে হইবে সব কিছু প্রথার উপর নির্ভর করিত। সুতরাং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্র কেবল পরস্পরের মধ্যে শান্তি রক্ষা করিত এবং বিবাদ বাধিলে তাহার মীমাংসা করিয়া দিত। সে মীমাংসাও অবশ্য চিরাচরিত প্রথা অনুসারে করা হইত। রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় কাজ ছিল, বিদেশীর বা অন্য জাতির লোকের আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করা এবং অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ করা। যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব খুব বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু প্রাচীন ভারতে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকাকে প্রশংসা করা হইত না। মহাভারতে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—"ভূপতি প্রথমে আপনার চিত্তকে পরাজয় করিয়া পরিশেষে অরি-বিজয়ে প্রবৃত্ত হইবেন। চিত্ত পরাজয় না হইলে অরি-পরাজয়ের সম্ভাবনা নাই।" তিনি বৃহস্পতির মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি সাম, দান ও ভেদের দ্বারা কার্যসিদ্ধি হইলে যুদ্ধে কদাচ প্রবৃত্ত হইবেন না। যাহা হউক মহাভারতের রাজধর্মানুশাসনের মতে প্রজার ধন ও প্রাণকে দুষ্ট ব্যক্তি হইতে রক্ষা করা এবং দুষ্টদিগকে দণ্ডদান করা

রাজার প্রধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ধর্মের উদ্ভবের পর অধ্যাত্ম ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অন্যায় বলিয়া মনে করা হইত।

মধ্যযুগে কি ইউরোপে, কি ভারতবর্ষে সামন্ততন্ত্রের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। ছোট বড় অনেক সামন্ত রাজা নিজের নিজের এলাকায় প্রজাদের রক্ষা করিতেন, তাহাদের মামলামোকদ্দমার বিচার করিতেন এবং কখন কখন রাজাকে সৈন্য ও অর্থ দিয়া সাহায্য করিতেন। সামন্ততন্ত্র বা ফিউড্যালিজমের ফলে রাজার ক্ষমতা নিতান্ত সীমাবদ্ধ ছিল। কৃষিকর্ম, পশুপালন এবং কৃষকসমাজের উপযোগী কুটির শিল্পের দ্বারা তখন লোকে জীবিকা অর্জন করিত। কারুশিল্পীদের নিজ নিজ সংঘ ছিল। সেই সংঘের নির্দেশক্রমে বস্তুর উৎপাদন হইত। লোকেরা গ্রামে বাস করিত, সহরের সংখ্যা এবং আয়তন ছিল কম। যাতায়াতের পথঘাট ভাল ছিল না। সেইজন্য কি রাজা, কি সামন্ত কাহারও পক্ষেই আর্থিক ও সামাজিক জীবনে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব ছিল না।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে ও স্পেনে সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসস্তূপের উপর জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। তখন সামন্তদের ক্ষমতাগুলি রাজার হাতে আসে। কিন্তু ভারতবর্ষে কর্ণওয়ালিশের সময় পর্যন্ত জমিদারেরা নিজের নিজের পুলিশবাহিনী রাখিতেন। দেশের শান্তিরক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল তাঁহাদের। কিন্তু যে রক্ষক সেই ভক্ষক হইত, অনেক সময়ে জমিদারেরাও ডাকাতি করিতেন। ইউরোপে জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পরে আর্থিক জীবনের নিয়ন্ত্রণ করিবার কতকটা ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে আসে। তাহারই প্রতিক্রিয়ার ফলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উদ্ভব হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লবের সময় হইতে রাষ্ট্রের কার্যের পরিধি বাড়িতে লাগিল। কলকারখানায় অনেক শ্রমিক একসঙ্গে কাজ করিতেন, মালিকেরা তাঁহাদিগকে যত সম্ভব কম বেতন দিয়া যত সম্ভব বেশি সময় খাটাইয়া লইতেন। শ্রমিক পরিবারের বেতন এত কম ছিল যে বাধ্য হইয়া মেয়েদিগকেও রাত্রিকালে খনির নীচে কাজ করিতে যাইতে হইত। ৭।৮ বৎসরের শিশুদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার কোন ব্যবস্থা না করিয়া তাহাদিগকে কারখানায় কাজ করিতে পাঠানো হইত। এইরূপ ব্যবস্থা বা অব্যবস্থার ফলে পারিবারিক জীবন ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল।

ছেলেমেয়েরা দুর্বল ও অশিক্ষিত হইতে লাগিল। তখনকার দিনে প্রচলিত ধারণা ছিল যে রাষ্ট্রের পক্ষে শান্তি-শৃঙ্খলা ও দেশ রক্ষার অতিরিক্ত কিছু করা অন্যায়। প্রত্যেকে নিজের নিজের স্বার্থ ভাল বোঝে। সেইজন্য তাহাদিগকে স্বাধীনভাবে পরস্পরের মধ্যে চুক্তি করিয়া বেতন নির্ধারণ, জিনিসপত্র কেনাবেচা প্রভৃতি করিতে দেওয়া ভালো। কিন্তু এই নীতির ফলে মালিকেরা এমন বেতন দিতে লাগিলেন যে শ্রমিকদের পক্ষে জীবন ধারণ করাই কঠিন হইয়া উঠিল। শ্রমিকেরাই তো সংখ্যাবহুল। তাহাদের দুর্বলতায় জাতির দুর্বলতা। তাই রাষ্ট্র বাধ্য হইয়া শিশুদের দিয়া কাজ করানো, মেয়েদের দিয়া রাত্রিকালে খনি হইতে কয়লা তোলা প্রভৃতি কাজ বন্ধ করিয়া দিল এবং সকলের শ্রমের সময় বাঁধিয়া দিল। এগুলি কিন্তু রাষ্ট্রের নেতিবাচক কার্যমাত্র ছিল। ক্রমে শ্রমিকদের শিক্ষার, বাসস্থানের, স্বাস্থ্যরক্ষার ও চিকিৎসার ব্যবস্থাও রাষ্ট্র নিজের হাতে লইল।

কল-কারখানা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী বাণিজ্য ও দেশের মধ্যে বেচাকেনা বাড়িতে লাগিল। বিদেশের মাল আমদানির উপর যদি নিয়ন্ত্রণ রাখা যায় তাহা হইলে দেশের কারখানায় উৎপন্ন জিনিস বেশি বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা। ধনী কারখানার মালিকদের চাপে পড়িয়া সরকার অবাধ বাণিজ্যনীতি পরিত্যাগ করিলেন। ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকেও নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রয়োজন হইল। বড় বড় উৎপাদকেরা নিজেদের মধ্যে ঐক্য সাধন করিয়া পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা হইতে বাঁচিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের একচেটিয়া অধিকারের ফলে ক্রেতারা বেশি দাম দিতে বাধ্য হইল। কাজেই ক্রেতৃবর্গের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য সরকারকে শিল্প-বাণিজ্যের উপর হস্তক্ষেপ করিতে হইল।

এত করিয়াও দেখা গেল যে শিল্পপতিরা জনসাধারণের কল্যাণকে নিজেদের কর্মের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন না। যেখানে অরণ্য সংরক্ষণ দেশের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, সেখানে আশু লোভের আশায় তাঁহারা হয়তো বন কাটিয়া কাঠ বেচিতে লাগিলেন। আবার জমির জন্য রাসায়নিক সার তৈয়ারি না করিয়া তাঁহারা মদ চোলাইয়ের ব্যবসায়ে ধনের নিয়োগ করিলেন। তাই রাষ্ট্রকে বনসংরক্ষণের এবং সার তৈয়ারির কারখানার ভার লইতে হইল। এইভাবে রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্র ক্রমে বাড়িয়া

যাইতেছে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সরকারী কর্তৃত্ব দেখা যাইতেছে। শিক্ষা, নীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতি পর্যন্ত রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। উদারনৈতিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয়।

৪। রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্রের বৃদ্ধির সীমা কোথায়? রাষ্ট্রের কার্যের সীমা ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র কি জীবনের সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করিবার ক্ষমতা গ্রহণ করিবে? গণতান্ত্রিক বলিবেন এরূপ উচিত নহে। কেননা রাষ্ট্র মানুষের সকল প্রকার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারে না। যে, প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা যতটা, তাহার ক্ষমতা ততটা হওয়া উচিত। রাষ্ট্র কেবল আমাদের বাহিরের কতকগুলি আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। মানুষের মনের উপর, তাহার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের উপর রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয়।

গণতান্ত্রিক মতবাদে রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্র

শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে মানবের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব অস্বাভাবিক। সরকার শিক্ষার জন্য অর্থ জোগাইতে বাধ্য, কেন না ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় অত টাকা সংগ্রহ করা অসম্ভব। কিন্তু সরকার যদি কি কি শেখানো হইবে, কেমনভাবে শেখানো হইবে, কে শিক্ষা দিবার উপযুক্ত এই সব প্রশ্ন সম্বন্ধে নিজেদের মতামত চালাইতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে জ্ঞানের বিকাশ স্থগিত হইবে এবং মানুষের মন সংকীর্ণ হইবে। সরকার জ্ঞান ও বুদ্ধির একচেটিয়া অধিকার পান নাই। তাঁহারা শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের মতকে অগ্রাহ্য করিবেন কোন অধিকারে? নেপোলিয়ন, হিট্‌লার প্রভৃতির একাধিপত্য কালে শিক্ষাপ্রণালীকে রাষ্ট্রের অধীন করা হইয়াছিল। ছোটবেলা হইতে ছাত্রদের মনে কতকগুলি বিশেষ ধারণা ও মতবাদ ঢুকাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু এত করিয়াও তাঁহারা নিজেদের ক্ষমতা চিরস্থায়ী করিতে পারেন নাই। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তাঁহাদের সময়ে ফরাসী ও জার্মান সংস্কৃতি একটুও অগ্রসর হয় নাই। বিশ্বের স্থায়ী সম্পদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে এমন একখানি বইও লেখা হয় নাই। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, আমেরিকার কোন কোন

শিক্ষা ও সংস্কৃতি রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত নহে

রাজ্যে এখনও ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ পড়াইতে দেওয়া হয় না। পঠনপাঠনেও অনেক জায়গায় বাধা দেওয়া হয়। মতের স্বাতন্ত্র্য বজায় না থাকিলে মানুষ যন্ত্রে পরিণত হয়।

আধ্যাত্মিক বিকাশ ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। যিনি যেভাবে ধ্যানধারণা করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করেন তাঁহাকে সেইভাবে চিন্তা করিবার সুযোগ দেওয়া উচিত। জোর করিয়া দেশশুদ্ধ লোককে নাস্তিক করা যায় না। আবার আইন করিয়া সকলকে ভগবানের প্রতি আস্থাশীলও করা যায় না। "যত মত তত পথ" পরমহংস দেবের এই বাণী স্মরণ করিয়া রাষ্ট্র কোন একটি বিশেষ মতকে সরকারী ধর্ম বলিয়া চালানোর অপচেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইলে ভালো হয়। কিন্তু ধর্মের নামে যখন একদল লোক অন্য দলের পূজা-অর্চনায় বা ধর্মবিশ্বাসের ব্যাঘাত করে সেখানে রাষ্ট্রকে শান্তিরক্ষা করিতে হয়। কোন রাষ্ট্র ধর্মের নামে নরবলি বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সহ্য করিতে পারে না।

আধ্যাত্মিক জীবনে সরকারের হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয়

নীতির ক্ষেত্রও সরকারের কাজের বাহিরে থাকা উচিত। রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলেও সকল নৈতিক কর্তব্যকে আইনগত কর্তব্যে পরিণত করিতে পারে না। ভাইয়ে ভাইয়ে স্নেহপ্রীতি থাকা দরকার, কিন্তু আইন বা পুলিশের সাহায্যে কি তাহাদিগের সৌভ্রাত্র বৃদ্ধি করা যায়? আইন যেমন সকলের জন্য এক, নীতি সেরূপ নহে। নৈতিক আচরণের ধারণা বিভিন্ন লোকের মনে বিভিন্ন প্রকার। বিবেকবুদ্ধি যাহাকে অন্যায় বলে তাহা লোকের দ্বারা আইনের জোরে করানো যায় না। কিন্তু সকলের বিবেকবুদ্ধি যে একই নির্দেশ দিবে তাহা নহে।

নীতি

লোকের চালচলন, ফ্যাসন ও প্রথার উপর সরকারী কর্তৃত্ব সুফল দেয় না। রাশিয়ার জার পিটার দি গ্রেট্ নিজের হাতে তাঁহার সভাসদদের দাড়ি কাটিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছিল। মেয়েদের পোষাক ও প্রসাধনের উপর সরকারী হুকুম কেহ সহ্য করিবে না। মোটের উপর

চালচলন

রাষ্ট্রের কার্যের একটা সুনির্দিষ্ট সীমা আছে। সেই সীমা লঙ্ঘিত হইলে মানুষের ব্যক্তিত্ব বজায় থাকে না; গড্ডালিকা প্রবাহের মতন মানুষ চালিত হয়।

৫। রাষ্ট্রের কার্যকলাপের শ্রেণীবিভাগঃ সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মানুষের জীবন-সম্পর্কিত যাবতীয় কার্য ও চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। সেখানে রাষ্ট্রের সব কিছু কাজই অবশ্য করণীয় বলিয়া গণ্য করা হয়। আবার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্তির হাতে অনেক কিছু ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সেইজন্য আমেরিকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রের কার্যকলাপের বর্গীকরণ বা শ্রেণীবিভাগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে ব্যক্তির হাতে যে কাজের ভার রাখিলে সকলের পক্ষে অধিক সন্তোষজনক হইবে সে কাজ রাষ্ট্রের নিজের হাতে লওয়া উচিত নহে। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে সকলেরই স্বাধীনতা কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ন হয়। সেইজন্য যেখানে এক ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য অন্য সকলের অধিকার ও স্বার্থের ক্ষতিকর যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ তাহাতে হস্তক্ষেপ করা কর্তব্য নহে। আমেরিকান্ মনীষীদের মতে কৃষিশিল্প বাণিজ্যব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তির পরিচালনাকে স্বাভাবিক এবং রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণকে ব্যতিক্রম মাত্র মনে করা উচিত। আমেরিকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানী উইলোবি রাষ্ট্রের কার্যকলাপকে অবশ্য-করণীয় ও ঐচ্ছিক (Optional) এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ঐচ্ছিক কার্যকলাপকে আবার সমাজতান্ত্রিক ও অসমাজতান্ত্রিক এই দুই অংশে ভাগ করা হইয়াছে। অবশ্য করণীয় কার্যের মধ্যে তিনি বিদেশী আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা, জাতীয় জীবনের সংরক্ষণ ও বিকাশ এবং ব্যক্তিবর্গের ধনসম্পত্তি ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষাকে ধরিয়াছেন। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে সৈন্যবাহিনী, জাহাজ, এরোপ্লেন, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ প্রভৃতি রাখা দরকার। শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে গেলে পরিবারের সম্বন্ধ, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বিনিময়, ধার ও চুক্তির নিয়ম প্রভৃতি এবং ফৌজদারী দণ্ডবিধি সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া প্রয়োজন ও অপরাধীর শাস্তি দিবার ব্যবস্থা রাখা কর্তব্য। এই সব কার্য করিতে হইলে অর্থের দরকার। সুতরাং কর স্থাপন এবং রাজস্ব হইতে ব্যয় নির্বাহ করাও রাষ্ট্রের অবশ্যকরণীয় কার্য। জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের আদর্শ যখন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই তখন রাষ্ট্র

পুলিশের মতন ঐ সব টহলদারী কার্য মাত্র করিত, তাই সেকালের রাষ্ট্রকে পুলিশ রাষ্ট্র বলা হয়।

ঐচ্ছিক কার্য তাহাকেই বলা হয়, যাহা না করিলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নষ্ট হইবে না, কিন্তু করিলে জনসাধারণের সুবিধা হইবে। রাষ্ট্র যদি এই কার্য না করে তাহা হইলে ব্যক্তিরা হয় ইহা করিবে না, কিংবা করিলেও যা তা করিয়া করিবে। ঐচ্ছিক কার্যের মধ্যে সেইগুলিকে সমাজতান্ত্রিক কার্য বলা হইয়াছে যাহা ব্যক্তিও করিতে পারে অথবা রাষ্ট্র নিজের হাতে লইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ রেল ও সেতু নির্মাণ, খাল খনন, ডক নির্মাণ, ও ঐ সবের পরিচালনা, বাজার, ব্যাঙ্ক, মুদ্রা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা, কিন্তু আমাদের মতে মুদ্রার ব্যবস্থা করা, বিশেষ করিয়া, নোট চালানোকে ঐচ্ছিক কার্য বলা চলে না। মুদ্রানীতি বেসরকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হাতে দিলে তাঁহারা উহা ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত স্বার্থের জন্য ব্যবহার করেন।

ঐচ্ছিক কার্য

ঐচ্ছিক কার্যের মধ্যে যেগুলির সহিত সমাজতন্ত্রের সম্পর্ক নাই তাহা হইতেছে বিজ্ঞান মন্দির, পরিসংখ্যান সংস্থা, স্বাস্থ্য ও নীতিরক্ষা এবং সেই সব শিল্প-বাণিজ্যের পরিচালনা করা যাহা কেহ মুনাফার লোভে করিবে না, অথচ যাহা জনসাধারণের স্বার্থের অনুকূল। এ যেন "উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ।" যেখানে মুনাফার আশা আছে সেখানে ব্যক্তিকে মুনাফার সম্ভাবনা হইতে বঞ্চিত না করা, আর যেখানে লাভের আশা নাই সেইখানেই রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব অনুমোদন করা।

সমাজতান্ত্রিকতার সম্পর্কমূলক কার্য

গার্ণার রাষ্ট্রের কার্যকলাপের যে বর্গীকরণ করিয়াছেন তাহাও বিশেষ সন্তোষজনক মনে হয় না। তাঁহার মতে রাষ্ট্রের কার্যের তিন বিভাগ হইতেছে, প্রয়োজনায়, স্বাভাবিক, কিন্তু প্রয়োজনীয় নহে এবং স্বাভাবিকও নহে, প্রয়োজনীয়ও নহে তথাপি আধুনিক রাষ্ট্র সাধারণতঃ যে সব কার্য করে তাহা। প্রথমোক্ত বিভাগ উইলোবি কথিত অবশ্য করণীয়ের সহিত অভিন্ন। দ্বিতীয় বিভাগে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা, দরিদ্র ও অসমর্থের যত্ন গ্রহণ, ডাকঘর, রাস্তাঘাট তৈয়ারি, বন্দর নির্মাণ স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি কাজকে ফেলিয়াছেন। তৃতীয় বিভাগের বেসরকারী এবং সরকারী উভয় প্রকার

কর্তৃত্বেই সম্পাদিত হইতে পারে—যেমন, রেলপথ তার ও টেলিফোন চালানো, আলোর এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা, উপনিবেশ স্থাপন, ব্যাঙ্ক, বীমা, হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির পরিচালনা। রাষ্ট্র যেখানে কর্তৃত্ব না করিয়া নিয়ন্ত্রণ মাত্র করে—যেমন মাংসের জন্য পশুহননশালা তাহাও এই বিভাগের অন্তর্গত। তার বিভাগ, টেলিফোন ও রেলপথকে রাষ্ট্রের হাতে সমর্পণ করিতে অনিচ্ছুক বলিয়াই বোধ হয় গার্ণার এগুলির রাষ্ট্রীয় পরিচালনাকে স্বাভাবিকও নহে, প্রয়োজনীয়ও নহে বলিয়াছেন। কিন্তু সকলের সুখ-সুবিধার জন্য যাহা একান্ত প্রয়োজনীয় তাহা বেসরকারী যৌথ কারবারের হাতে রাখিবার পক্ষে কি যুক্তি থাকিতে পারে? যৌথকারবারের কর্মচারীরা কি সরকারী কর্মচারীদের চেয়ে বেশি কার্যক্ষম ও দায়িত্বশীল? সরকারী চাকুরিতে যেমন স্থায়িত্ব ও সম্মান আছে, বেসরকারী চাকুরিতে তাহা নাই। সরকার সকল শ্রেণীর সুখ-সুবিধার জন্য যতটা চেষ্টা করিবেন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তাহা করিবে কিনা সন্দেহ। কলিকাতার সরকারী বাসের সঙ্গে বেসরকারী বাসের ভীড় ও সময় না মানিয়া চলাফেরার তুলনা করিলে এই বিষয়ে কতকটা ধারণা জন্মিবে।

সরকারী ও বেসরকারী কর্তৃত্ব

ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে রাষ্ট্রকে এখন জনকল্যাণের বাহক বলিয়া ধরা হয়। এই দুই রাষ্ট্র পুরাপুরি সমাজতান্ত্রিকও নহে, আবার সম্পূর্ণরূপে মুনাফার সমর্থকও নহে। সেইজন্য জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কার্যাবলী স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

৬। **জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কার্যাবলী**ঃ জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে না, আবার উহার যথেচ্ছ ব্যবহারও অনুমোদন করে না। এই রাষ্ট্র ব্যক্তি বিশেষ বা শ্রেণী বিশেষের স্বার্থরক্ষার জন্য পরিচালিত হয় না; সকল শ্রেণীর লোকের যাহাতে কল্যাণ হয় তাহার চেষ্টা করে। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রেণীর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। ধনিক ও শ্রমিকের স্বার্থের মধ্যে যাহাতে সংঘাত না বাধে রাষ্ট্র সেই চেষ্টা করে। সকল ধনীর স্বার্থ আবার এক নহে। ছোট শিল্পপতিকে বড় শিল্পপতি গ্রাস করিতে চায়। এক উৎপাদক সংঘের সঙ্গে অন্য উৎপাদক সংঘের বাজার অধিকার

এই রাষ্ট্র শ্রেণীস্বার্থের ঊর্ধ্বে

করা লইয়া বিবাদ বাধে। যাঁহারা খনির মালিক তাঁহাদের সহিত কারখানার মালিকদের দামদস্তর লইয়া অবনিবনাও হয়। কৃষিজাত বস্তু যাঁহারা উৎপন্ন করেন তাঁহাদের স্বার্থ হইতেছে বেশি দামে ফসল বেচা। অথচ শ্রমিক ও শিল্পপতিরা চাহেন যে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য কম হউক। কৃষি ও শিল্পকে অর্থ সরবরাহ করে ব্যাঙ্ক। এইরূপ অসংখ্য স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কার্য। রাষ্ট্র যদি কোন শ্রেণী বিশেষের স্বার্থরক্ষার জন্য ব্যগ্রতা দেখায় তাহা হইলে সাধারণের কল্যাণ ব্যাহত হইবে। সকল রাষ্ট্রই নাগরিকের ধনপ্রাণ রক্ষা করে। জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রও নিরাপত্তা রক্ষা, নাগরিকের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা, যাতায়াতের ব্যবস্থা, মুদ্রা প্রচলন প্রভৃতি কার্য করে।

ইহার সাধারণ কার্য

সকল শ্রেণীর সমান কল্যাণ সাধন করিতে হইলে রাষ্ট্রকে কতকগুলি ক্ষেত্রে উৎপাদনের ভার নিজের হাতে লইতে হয়। এ সব উৎপাদন এতই গুরুত্বপূর্ণ যে কোন বেসরকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হাতে উহা ন্যস্ত করা যায় না। যেমন অস্ত্র-শস্ত্র, যুদ্ধ জাহাজ, এরোপ্লেন, রেলগাড়ি নির্মাণ ও পরিচালনা, দেশের ভিতরে যাতায়াত ও সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা, রেডিও প্রভৃতি। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সার তৈয়ারি, কৃষির জন্য জল সরবরাহ করা প্রভৃতি কাজ এমন ব্যয়সাধ্য যে, কোন ব্যক্তি বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ঐ কার্যে অগ্রসর হইতে চাহে না। ইংলণ্ডে কয়লার খনি রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীনে আসিয়াছে। ভারতবর্ষে এরূপ ব্যবস্থা করা হয় নাই। ইংলণ্ডে লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদনও রাষ্ট্রের হাতে আসিয়াছিল, কিন্তু আবার উহাতে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করা হইয়াছে। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয় রাষ্ট্রেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত। ১৯৩০-৩১ সালে যখন অর্থনৈতিক সংকটে আমেরিকার জীবন বিপর্যস্ত হইয়াছিল তখন সেখানেও রাষ্ট্র জন-কল্যাণমূলক নীতি অবলম্বন করিয়া কৃষি ও শিল্পকে নিয়ন্ত্রিত করিতে আরম্ভ করে।

উৎপাদনে কর্তৃত্ব

কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ব্যক্তিকে সুরক্ষা করিবার জন্য সর্বতোভাবে প্রয়াস পায়। কেবলমাত্র চোর, ডাকাত বা বিদেশীর আক্রমণ হইতে ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়াই এই রাষ্ট্র তৃপ্ত থাকে না। দেশের মধ্যে সকলে যাহাতে খাইতে

পরিতে পায়, মাথা গুঁজিবার মতন বাসস্থান পায়, অসুখের সময় ঔষধপথ্য পায়, ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শিখাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা রাষ্ট্র হইতে করা হয়। ইংলণ্ডের আর্থিক শক্তি ভারতবর্ষের চেয়ে বেশি, লোকসংখ্যাও সেখানে খুব কম। তাই সেখানে বেকারদিগকে, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাগণকে ও অসহায়া বিধবাকে গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত অর্থ সাহায্য করা হয়। আমাদের দেশে পরিবার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে গৃহীত না হইলে এ সব সুবিধার কথা কল্পনাও করা যায় না।

নিরাপত্তার ব্যাপক অর্থ

কল্যাণমূলক রাষ্ট্র শিক্ষাবিস্তার ও সংস্কৃতির প্রসারের জন্য মুক্তহস্তে ব্যয় করে, কিন্তু শিক্ষাকে সরকারী নিয়ন্ত্রণের নাগপাশে বাঁধিতে চায় না এবং সংস্কৃতিকে ফরমাস দিয়া ঢালিয়া সাজিতে অগ্রসর হয় না। কলাকেন্দ্র, থিয়েটার, মিউজিয়াম, চিত্রশালা, গ্রন্থাগার প্রভৃতি স্থাপন ও পোষণ করিবার জন্য এবং কবি, শিল্পী ও বিদ্বজ্জনগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য প্রচুর খরচ করা হয়।

শিক্ষা সংস্কৃতি

চাষবাস ও কলকারখানা সাধারণতঃ ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। কিন্তু জনসাধারণের স্বার্থের খাতিরে তাহার উপর কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়। যেমন চিনির কল ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইলেও রাষ্ট্র হইতে আখের দর ও চিনির দর বাঁধিয়া দেওয়া হয়। সিমেণ্টের যেখানে অভাব বেশি অভাব সেখানে সরকার হইতে ঋণ দিয়া সিমেণ্টের কারখানা তৈয়ারি করিতে উৎসাহ দেওয়া হয়, কিন্তু কারখানার মালিকেরা যাহাতে যথেচ্ছ মূল্য না লইতে পারেন সেইজন্য সিমেণ্টের দাম ঠিক করিয়া দেওয়া হয়। সম্পত্তি লইয়া ব্যক্তি যাহা খুশী করিতে পারে না; জনস্বার্থের খাতিরে রাষ্ট্র ব্যক্তির অধিকার সংকুচিত করিতে পারে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ

কল্যাণমূলক রাষ্ট্র কর-নীতির দ্বারা ধনের বৈষম্য হ্রাস করিতে চেষ্টা করে। ধনীরা যাহাতে আরও ধনী এবং দরিদ্রেরা আরও গরীব না হইয়া পড়েন সেদিকে এই রাষ্ট্রের সতর্ক দৃষ্টি থাকে। ইংলণ্ডে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে সুদ, জমির খাজনা ও কারবারের লভ্যাংশ জাতীয় আয়ের ২২ ভাগ ছিল, বিশ বছর পরে তাহা কমিয়া শতকরা ১১ ভাগ হইয়াছে। কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে শ্রমিকদের

ধন-বৈষম্য দুরীকরণ

ন্যূনতম বেতন নির্দিষ্ট করা, তাঁহাদের কাজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা এবং তাঁহাদের জন্য ঘর বাড়ি প্রভৃতি তৈয়ারি করিতে মালিককে বাধ্য করা হয়। পূরা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কয়টির বাহিরে সর্বত্র অল্পাধিক পরিমাণে জনকল্যাণের আদর্শ অনুসৃত হইতেছে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিকেরা বলেন যে, কয়েকটি মাত্র সুবিধা দিয়া শ্রমিকদিগকে ভুলাইয়া রাখাই ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসকদিগের মূল উদ্দেশ্য।

মিশ্র অর্থনীতির ভবিষ্যৎ

ভারতবর্ষের রাষ্ট্র নেহেরুজীর অনুপ্রেরণায় মিশ্র অর্থনীতি ও যোজনার সাহায্যে জনকল্যাণ সম্পাদনের ব্রত লইয়াছে। জোরজবরদস্তি না করিয়া বুঝাইয়া-সুঝাইয়া বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেশের অভাব পূরণের কার্যে নিয়োজিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। যে যে উৎপাদনের ক্ষেত্রে এরূপ চেষ্টা সফল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, সেই সেই ক্ষেত্রে সরকার নিজে উৎপাদন করিতে অগ্রসর হইতেছেন। সরকারী শিল্পের সঙ্গে বেসরকারী শিল্পের সহযোগ যদি স্থাপিত হয়, তাহা হইলে বিনা বিপ্লবে ও রক্তপাতে রাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণের আদর্শ পূর্ণ করা সম্ভব হইবে।

৭। রাষ্ট্রের কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদঃ রাষ্ট্রের কার্যের পরিধি কতটুকু বা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়া উচিত ইহা লইয়া অনেক মত প্রচলিত আছে। একদিকে নৈরাজ্যবাদীরা বলেন রাষ্ট্রেরই প্রয়োজন নাই, তাহার আবার কার্যের সীমা নির্দেশ করিয়া কি হইবে? অন্যদিকে সমাজতন্ত্রবাদীদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, রাষ্ট্রের কার্যের কোন সীমা থাকিতে পারে না; রাষ্ট্র সব কিছু করিবে। এই দুই মতের বহু শাখা-প্রশাখা। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, আদর্শবাদ ও সমূহতন্ত্রবাদ (Collectivism) এই তিনটি প্রধান। ইহাদের মধ্যে সমূহতন্ত্রবাদ হইতে পরস্পর বিরোধী জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রবাদ, ফ্যাসিস্তবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব হইয়াছে। সমাজতন্ত্রবাদ যে কত প্রকারের হইতে পারে তাহা গণিয়া ঠিক করা কঠিন। একজন পণ্ডিত ২৫৪ প্রকারের সমাজতন্ত্রবাদের বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার বই লেখার পরে আরও অনেক ধরনের সমাজতন্ত্রবাদের নিশ্চয়ই উদ্ভুত হইয়াছে। আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে সমাজতন্ত্রবাদের কয়েকটি প্রধান শাখার পরিচয় দিব।

৮। **নৈরাজ্যবাদ** (Anarchism): নৈরাজ্যবাদের মূল কথা হইল এই যে, মানুষ স্বভাবতঃ সৎ, সরল ও সহযোগপরায়ণ, কিন্তু রাষ্ট্র শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য তাহার উপর জবরদস্তি করিয়া আইনকানুন চাপাইয়া দিয়াছে, সুতরাং রাষ্ট্রকে বিলুপ্ত করিতে পারিলে লোকে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা করিয়া পরম আনন্দে কাল কাটাইতে পারিবে। রাষ্ট্র ও ধর্ম ভালো মানুষদিগকে ধোঁকা দিয়া দুর্নীতিপরায়ণ করিয়াছে। মানুষ যে ধরনের নৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করিতে বাধ্য হইতেছে তাহা রাষ্ট্রের সাহায্যে অপসারিত হইবে না, এমন কি মন্দীভূতও হইবে না। কেন না রাষ্ট্র হইতেই এই সব অন্যায়ের জন্ম হইয়াছে।

নৈরাজ্যবাদের উৎপত্তি হইয়াছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। কিন্তু ইহার মূল খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে স্টোয়িক দার্শনিক জেনো (Zeno)-র মতবাদের মধ্যে পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের অপেক্ষা না রাখিয়া নিজে নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। ফরাসী বিপ্লবের সমকালে ইংরাজ মনীষী উইলিয়ম গডউইন্ তাঁহার একখানি গ্রন্থে রাষ্ট্রের তীব্র নিন্দা করেন, কেন না রাষ্ট্রই জোর করিয়া অন্যায্য আর্থিক ব্যবস্থা বজায় রাখিয়াছে। কিন্তু তিনি রাষ্ট্রকে সমূলে উচ্ছেদ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী মনীষী প্রুঁদ (Proudhon) তাঁহার "সম্পত্তি কি" নামক গ্রন্থে রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ বিলুপ্ত ঘটাইবার জন্য সর্বপ্রথম যুক্তিতর্ক উপস্থিত করেন। তাঁহার মতে সমবায় ব্যাঙ্কের সাহায্যে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করা সম্ভব, যাহার ফলে খাজনা, সুদ ও মুনাফা হইতে উদ্ভূত ব্যক্তিগত সম্পত্তি অকেজো হইয়া যাইবে। সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রও তিরোহিত হইবে এবং তাহার স্থানে স্বেচ্ছামূলক সমবায় সমিতির ও তাহাদের সংঘের উদ্ভব হইবে।

মাইকেল ব্যাকুনীন (১৮১৪-১৮৭৬) ও ক্রপট্‌কীনের (১৮৪২-১৯২১) দ্বারা রাশিয়াতে নৈরাজ্যবাদের বিকাশ হয়। ব্যাকুনীন বলেন যে, সকল প্রকার শাসনপ্রণালীই খারাপ; গণতন্ত্রও শ্রমিকদের শোষণ সমর্থন করে। রাজনৈতিক ক্ষমতা এতই খারাপ জিনিস যে, যে উহা হাতে পায় সেই অত্যাচারী হয়। সেইজন্য জগতে যাহা কিছু শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করে তাহারই ধ্বংস সাধন আবশ্যক। ব্যাকুনীনের লেখার মধ্যে যতটা জোর

আছে ততটা যুক্তি নাই। কিন্তু প্রিন্স পিটার ক্রপ্‌টকীনের রচনা বেশ যুক্তিপূর্ণ এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুকরণে লেখা। তিনি বলেন যে, রাষ্ট্রের পরিবর্তে লোকে এমন এক সমাজ স্থাপন করিবে, যেখানে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ নির্ণীত হইবে নিজেদের মধ্যে সম্মতির দ্বারা। সেই সমাজে কোন আইন থাকিবে না, কোন কর্তৃপক্ষ থাকিবে না, কেবল প্রথা ও অভ্যাসের বশে লোকে সুখেস্বচ্ছন্দে থাকিবে। প্রথাও চিরস্থায়ী হইবে না, লোকের প্রয়োজন অনুসারে ক্রমাগত উহা বিকশিত হইবে। ক্রপ্‌টকীন জীবজগতে এবং আদিম সমাজে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা দেখিয়া স্থির করেন যে, সভ্যসমাজের জীবনযাত্রাও ঐভাবে চলিতে পারে। জোরজবরদস্তির অবসান ঘটাইতে পারিলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ উপলব্ধি ঘটিবে। লোকে স্বেচ্ছায় নিজের মধ্যে কাজ বণ্টন করিয়া লইবে এবং রোজ চার ঘণ্টা করিয়া অন্ন-বস্ত্র প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত থাকিলে তাহাদের সকল অভাব মিটিবে।

নৈরাজ্যবাদীরা জবরদস্তি বিনাশ করিতে চান জবরদস্তির দ্বারা। রাশিয়ার নৈরাজ্যবাদীরা রক্তাক্ত বিপ্লবের সমর্থন করেন, কেন না তাঁহাদের মতে আইনসঙ্গত প্রণালীতে রাষ্ট্র ও সম্পত্তির উচ্ছেদ সাধন অসম্ভব।

নৈরাজ্যবাদ বাস্তবের ধার ধারে না। কীট, পতঙ্গ ও পশুর সমাজেও দলপতির শাসন আছে। ইতিহাসে এমন কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না যে, মানুষ কর্তৃত্ব ও বশ্যতা ছাড়া পরস্পরের মধ্যে শান্তি রক্ষা করিয়াছে। রাষ্ট্রকে ধ্বংস করিলেও তাহার স্থানে কোন না কোন প্রকার কর্তৃত্বের আবির্ভাব ঘটিবে। বিভিন্ন ব্যক্তি ও বিভিন্ন সংঘের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন। রাষ্ট্রের অভাবে মাৎস্যন্যায় আসিবে, বড় ছোটকে পিষিয়া ফেলিবে। মানুষের স্বভাবকে নৈরাজ্যবাদীরা যত সাধু ও একমুখী মনে করিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহা নহে। মানুষের মনে ভালো মন্দ দুইটি তার সমানভাবে বাজিতেছে। যে মতবাদ মানুষের স্বভাবের শুধু একদিক দেখে তাহা অবাস্তব।

৯। **ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদঃ** অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি রাষ্ট্রের অত্যধিক নিয়ন্ত্রণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল।

মার্কেন্টিলিস্ট নামে খ্যাত একদল পণ্ডিত রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণকে সমর্থন করিতেন। তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধে ফিজিওক্র্যাট (Physiocrats) নামক পণ্ডিতেরা আর্থিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য দাবি করিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে লোকের যত বেশি স্বাধীনতা থাকিবে ততই সমাজের উন্নতি হইবে এই ছিল তাঁহাদের মত। উনবিংশ শতাব্দীতে এই মত পরিবর্ধিত হইয়া ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের আকার ধারণ করিল।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উৎপত্তি

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের শ্রেষ্ঠ পুরোহিত জন স্টুয়ার্ট মিল বলেন যে কেবলমাত্র অপরের অনিষ্ট করা হইতে নিবৃত্ত করা ছাড়া কাহাকেও তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু করিতে সমাজ বাধ্য করিতে পারে না। আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে মাত্র অপর ব্যক্তির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা চলিতে পারে না। হার্বার্ট স্পেন্সর বলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নিজের ইচ্ছামত যাহা কিছু করিতে পারে শুধু একটি মাত্র শর্তে যে, সে অপর কাহারও অনুরূপ স্বাতন্ত্র্যের উপর হস্তক্ষেপ না করে। তাঁহার মতে রাষ্ট্রের মাত্র তিনটি কাজ—বিচার করা, ব্যক্তির অধিকার রক্ষা করা এবং বিদেশীর আক্রমণ প্রতিরোধ করা। এ তিনটি কাজ না করিলে লোকদের একসঙ্গে বসবাস করা অসম্ভব হয় বলিয়া তিনি রাষ্ট্রকে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে উহা করিবার অধিকার মানিয়াছেন। এ তিনটি কাজ ছাড়া আর অন্য কিছু করিতে গেলে রাষ্ট্র রক্ষক না হইয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভক্ষক হইয়া দাঁড়ায়। তিনি এমন উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী যে, রাস্তাঘাটের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং লোকের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য, কিংবা শিক্ষার জন্য সরকারী খরচকে অযৌক্তিক বলিয়াছেন। কেন না এ সব কাজ রাষ্ট্রের অবশ্য করণীয় নহে। স্পেন্সরের দলে এখনও দু'একজন এমন লোককে দেখা যায় যাঁহারা লোককে কলেরা, বসন্ত বা যক্ষ্মারোগের প্রতিরোধক টীকা লইতে বাধ্য করাকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের হানিকর মনে করেন। ইঁহারাই বুঝি কবির সঙ্গে সুর মিলাইয়া বলিতে চাহেন "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে"। কলেরা বসন্তে মরিবার অধিকারই যদি গেল তবে বাঁচিয়া কি লাভ? কিন্তু মুস্কিল এই যে, এরূপ স্বাতন্ত্র্যকামীরা একা একা মরেন

মিল ও স্পেন্সরের মত

মতের যৌক্তিকতা বিচার

না, সংক্রামক রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইলে আরো দশজনের প্রাণহানির কারণ হন।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ আর্থিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ সহ্য করিতে পারে না। এই মত অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের নিজের স্বার্থ ভাল রকম বুঝে। নিজের ভাল সকলেই চায়। তাই নিজের নিজের স্বাধীন ইচ্ছা মত কাজ করিলে, বেতন লইলে, চুক্তি করিলে সকলের সবচেয়ে বেশি সুখ-সুবিধা হইবে। এরূপ করার ফলে কম খরচে জিনিস তৈয়ারি করা যাইবে এবং সকলে সেইজন্য অল্পদামে জিনিস ভোগ করিতে পাইবে। এ যুক্তি কিন্তু কারখানার মালিকদের নিজস্ব যুক্তি। গরীব শ্রমিকদের না খাইয়া মরিবার স্বাধীনতা আছে বটে, কিন্তু হতভাগ্যরা সে স্বাধীনতা ভোগ করিতে চায় না। তাহারা পেটের জ্বালায় যে বেতন পায় তাহাতেই কাজ করিতে প্রস্তুত হয়। সে বেতনে পেট ভরে না বলিয়া স্ত্রী ও নাবালক পুত্রকেও কাজ করিতে পাঠায়। শ্রমিককে কম বেতন দিলে যে উৎপাদনের খরচা কম পড়ে এ ভ্রম এখন বিদূরিত হইয়াছে। অর্ধাহারে জীর্ণ ও অশিক্ষিত শ্রমিকের কাছে পূর্ণ শ্রম আশা করা যায় না। যদি বা তর্কের খাতিরে স্বীকার করা যায় যে, কম বেতন দিলে খরচা কম পড়ে, তবুও মনে রাখা দরকার মানুষ জিনিস তৈয়ারির জন্য নহে, জিনিস তৈয়ারি হয় মানুষের জন্য। যাহারা শ্রমিক তাহারাই আবার ক্রেতা। তাহাদের কিনিবার ক্ষমতা হ্রাস পাইলে জিনিস বেচিবার জন্য সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিতে হয়। শ্রমিকের বেতন নিয়ন্ত্রণ করা, ছোট শিল্পকে বড় শিল্পের গ্রাস হইতে বাঁচাইয়া রাখা, একচেটিয়া শিল্প-বাণিজ্যের কবল হইতে ক্রেতাদিগকে রক্ষা করা, আমদানিকে নিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানিকে উৎসাহদান করা এখন রাষ্ট্রের বাঞ্ছনীয় কার্যের মধ্যে গণ্য করা হয়।

আর্থিক যুক্তি

উহার বিচার

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা তাঁহাদের মতকে সমর্থন করিবার জন্য নৈতিক ও দার্শনিক যুক্তিও উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে ব্যক্তিকে বিনা নিয়ন্ত্রণে কাজ করিবার স্বাতন্ত্র্য দিলে সে তাহার জীবনকে চরিতার্থ করিতে পারিবে। মানুষ যত বেশি আত্মনির্ভর হইবে এবং নিজের পথ নিজে বাছিয়া লইবে

নৈতিক ও দার্শনিক যুক্তি

তত তাহার আত্মোন্নতি হইবে। রাষ্ট্র হইতে বাধানিষেধ উপস্থিত করিলে ব্যক্তির দায়িত্ববোধ জন্মে না। রাষ্ট্রের কতৃর্ত্ব বৃদ্ধি করা ইঁহাদের মতে মনুষ্যত্বের অপমানজনক। এ যুক্তিও নিতান্ত দুর্বল। ছোট ছেলের সঙ্গে একজন পালোয়ানকে লড়াই করিতে দিলে ছোট ছেলেটির মর্যাদা বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিন্তু তাহার প্রাণ রক্ষা পাইবে কিনা সন্দেহ। দুর্বলকে সাহায্য দিয়া প্রথমে সবল করা প্রয়োজন। প্রত্যেক ব্যক্তিরই যে ভালমন্দ বুঝিবার সমান ক্ষমতা আছে তাহা নহে; থাকিলে লোকে অনিষ্টকর খাদ্য খাইত না। কলেরার সময় কাহাকেও কাটা ফল বেচিতে দেওয়া হয় না। ইহাতে লোকের প্রাণ বাঁচে।

জীবন সংগ্রামে যোগ্যতমের উদ্বর্তন

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা ডারুইনের জীবন-সংগ্রামের ও যোগ্যতমের উদ্বর্তন-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া বলেন যে, দুর্বলকে সরকারী সাহায্যে বাঁচাইয়া রাখিলে সবল ও কার্যক্ষম ব্যক্তির দ্বারা সমাজকে পূর্ণ করা যাইবে না, জাতির উন্নতিও সম্ভব হইবে না; সেইজন্য হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়া কিংবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়ে বা অর্থ কষ্টের সময়ে অন্নদান করিয়া দুর্বলকে বাঁচাইয়া রাখা অন্যায়। জীবন সংগ্রামের প্রতিযোগিতায় যাহারা আত্মশক্তিতে বাঁচিবার উপযুক্ত তাহারাই সমাজের যোগ্যতম সদস্য। সুতরাং রাষ্ট্র তথাকথিত জনহিতকর কার্য হইতে বিরত থাকিলেই ভাল হয়। এই প্রকার যুক্তি এতই হাস্যকর যে ইহার বিপক্ষে কোন যুক্তি উপস্থিত করিবার দরকার হয় না। প্রাণীজগতের উদ্বর্তন নীতি বিবেকবান্ মনুষ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না।

সরকারের অকর্মণ্যতা

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের আর একটি প্রিয় যুক্তি হইতেছে এই যে সরকারের হাতে কোন কাজ ছাড়িয়া দিলে তাহা দক্ষতার সহিত নিষ্পন্ন হইবার সম্ভাবনা কম। সরকারী কাজে কাহারই মমত্ব বোধ থাকে না। সরকার যেখানেই দাম ও মজুরি বাঁধিয়া দিতে গিয়াছেন, সেইখানেই ব্যর্থ হইয়াছেন। এই যুক্তিও এ যুগে অচল। সরকার যে মজুরি ঠিক করিয়া দেন, শ্রমিকেরা সংঘবদ্ধভাবে তাহা দাবি করেন, তাহার চেয়ে কম মজুরিতে কাহাকেও কাজ করিতে দেন না। মূল্য নিয়ন্ত্রণ যদি কোথাও চোরাকারবার বা কালোবাজারের উদ্ভব করিয়া

থাকে, সে দোষ একা রাষ্ট্রের নয়, সামাজিক কর্তব্যজ্ঞানহীন ক্রেতাদেরও বটে। কি সরকারী কারখানায়, কি মালিকানা কারখানায়, কাজকর্মের ভার থাকে বেতনভুক্ কর্মচারীদের উপর। সেইজন্যই সরকারী কারখানার কর্মচারীরা কম নিপুণ কেন হইবেন? অনেক সরকারী কারখানার দক্ষতা অসাধারণ।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের বিরোধ কল্পনা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ কোন বিরোধ এই দুইয়ের মধ্যে নাই। এখন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতিতে রাষ্ট্রের কার্য অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয় নাই। রাষ্ট্র দুর্বলকে সবল করিতেছে; শিক্ষা ও সংস্কৃতির পোষকতা করিয়া এবং কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশ সাধন করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করিয়াছে। এই অসামান্য সাফল্যেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ যে অসার তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

ইতিহাস ইহার অসারতা প্রমাণ করিতেছে

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের যুক্তিহীনতা সত্ত্বেও ইহার ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল। ছোটখাটো ব্যাপারে অনর্থক সরকারী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার ফলে অনেক অবাঞ্ছনীয় নিয়ন্ত্রণের হাত হইতে মানুষ মুক্তি পাইয়াছে। এই মতবাদের দ্বারা সমাজে ব্যক্তির গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে।

ইহার উপযোগিতা

ব্যক্তিকে এখন আর সমাজ হইতে বিশ্লিষ্ট সত্তারূপে দেখা হয় না। ব্যক্তিমাত্রেই আর্থিক সংঘ, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, পরিবার প্রভৃতির সদস্য। একক জীবন কেহই যাপন করে না। সেইজন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলিতে কোন না কোন সংঘের সদস্যরূপে ব্যক্তির স্বাধীনতাকে বুঝায়। রাষ্ট্র সংঘসমূহের মধ্যে অন্যতম। একজন মনীষী রাষ্ট্রের কাজের সঙ্গে অর্কেস্ট্রার পরিচালকের তুলনা করিয়াছেন। অর্কেস্ট্রায় পরিচালক কোন যন্ত্রই বাজান না, কোন সুরই তিনি সৃষ্টি করেন না, কেবলমাত্র বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র যাহাতে ঐক্যতান সৃষ্টি করিতে পারে তাহার সংকেত তিনি প্রদান করেন। রাষ্ট্রও তেমনি বিভিন্ন সংঘের কার্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। সংঘগুলির স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে। ইহা মানিয়া চলা

নব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ

রাষ্ট্রের কর্তব্য। ইহাকে নব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ নামে অভিহিত করা হয়। সার্বভৌম শক্তির বহুত্ববাদের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া আমরা এই মতের সমর্থকদের মধ্যে মেট্‌ল্যাণ্ড, ফিগিস্, গ্রাহাম্, ওয়ালেস্, লাস্কী প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিয়াছি। গিল্ড স্যোশালিজম্, সিণ্ডিক্যালিজম্ প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া পুনরায় সংঘবাদীদের মত ব্যাখ্যা করা হইবে।

১০। **আদর্শবাদ (Idealism):** আদর্শবাদের প্রতিষ্ঠাতা হেগেল ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে রাষ্ট্রের পদতলে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে রাষ্ট্র সকলের উপরে, নীতি ও ধর্মও তাহার আশ্রিত। রাষ্ট্র ভগবানের প্রতীকস্বরূপ। সমষ্টিই সত্য, ব্যষ্টি সমষ্টির মধ্যেই নিজের পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করে। সমাজ কেবল মানুষের প্রয়োজন মেটায়, কিন্তু রাষ্ট্র তাহার নৈতিক উন্নয়ন সম্পাদন করে। কিন্তু রাষ্ট্র উপায় মাত্র নহে, উহাই প্রজ্ঞার চরম অভিব্যক্তি এবং যথার্থ স্বাতন্ত্র্যের প্রতিমূর্তি। মানুষ যখন স্বার্থবশে কাজ করে তখন সে স্বাধীনতা হারায়; প্রজ্ঞাবুদ্ধির দ্বারা চালিত হইলেই সে যথার্থ স্বাধীনতা উপলব্ধি করে। রাষ্ট্রই প্রকৃত প্রজ্ঞার অধিকারী। সুতরাং রাষ্ট্রের অধীনতাতেই মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা। রাষ্ট্র সব কিছু 'নিয়ন্ত্রণ' করিতে পারে। হেগেল এইরূপে রাষ্ট্রকে বাড়াইয়া তুলিয়াছিলেন বলিয়া বিংশ শতাব্দীতে হিট্‌লার জার্মানিতে সর্বাত্মক শাসন (Totalitarian State) প্রবর্তন করিতে পারিয়াছিলেন।

হেগেলের মতবাদ সর্বাত্মক রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করে

গ্রীন্ হেগেলের আদর্শবাদের কিছুটা অনুসরণ করিলেও তিনি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে একেবারে অগ্রাহ্য করেন নাই। বস্তুতঃ তিনি গণতান্ত্রিক উদার নীতির (Liberalism) সঙ্গে আদর্শবাদের একটা সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। তিনি স্বাতন্ত্র্য বলিতে কেবল নেতিবাচক নিয়ন্ত্রণের অভাব বুঝেন নাই, কিন্তু ইতিবাচক উপযুক্ত কিছু করিবার বা ভোগ করিবার স্বাধীনতা বুঝিয়াছেন। স্বাতন্ত্র্য হইতেছে মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণতম বিকাশের নৈতিক উপায়। এই উদ্দেশ্য যাহার দ্বারা সাধিত হয় তাহাই প্রকৃত অধিকার এবং সমাজের কর্তব্য ব্যক্তিকে ঐ অধিকার ভোগ করিতে দেওয়া। রাষ্ট্র সকলের কল্যাণ চায়। সেইজন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির

গ্রীন্ উদার নীতির সঙ্গে আদর্শবাদের সামঞ্জস্য করেন

কোন বিরোধ নাই বা হইতে পারে না। যাহাতে ব্যক্তির মহত্তর জীবনের উপলব্ধি সম্ভব হয় তাহাই রাষ্ট্র করিতে পারে। গ্রীন্ ব্যক্তির সমালোচনার অধিকার স্বীকার করিয়াছেন। তাহাদের সমালোচনার ভয়ে শাসকেরা সংযত হইয়া চলেন। মনে হয় তিনিও কোলরিজের সঙ্গে বলিতে রাজী ছিলেন যে শাসকেরা সব যুগেই যতটা খারাপ হইতে সাহস করেন, ততটা খারাপ হন।

অনুশীলন

১। Discuss the theories of Individualism and Socialism regarding the functions of Government. What is the modern trend in the matter ? (1963)

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা বলেন যে রাষ্ট্র শুধু ধনপ্রাণ রক্ষা করিবে, বিদেশী আক্রমণ হইতে বাঁচাইবে ও নাগরিকদের মধ্যে মামলামোকদ্দমা বাধিলে তাহার বিচার করিবে। নবীন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা বলেন যে রাষ্ট্র অর্কেষ্ট্রা পরিচালকের মতন বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সংঘের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিবে। সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে রাষ্ট্রের কার্যের সীমানা সুদূর প্রসারিত। এখন রাষ্ট্র আর শুধু পুলিশী কাজ করে না, জনহিতকর কার্যে ব্যাপৃত।

তৃতীয় প্রকরণের শেষ দুই অনুচ্ছেদ ও ষষ্ঠ প্রকরণ দেখ। নবম প্রকরণে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের কথা পাইবে।

২। Discuss why a true theory of the State must be socialistic and individualistic at once.

দ্বিতীয় ও ষষ্ট প্রকরণ দেখ।

৩। Explain the theoretical basis of the concept of Welfare State.

ষষ্ট প্রকরণ দেখ।

৪। Can any limit be put to the proper sphere of the State in modern times ? Give reasons for your answer.

চতুর্থ প্রকরণ দেখ।

রাষ্ট্র শিক্ষা ও সংস্কৃতি, নীতি ও আধ্যাত্মিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করিলে লাভ অপেক্ষা ক্ষতি বেশী হয়।

৫। "The State has no positive function of making its members better; it has the negative moral function of removing the obstacles which prevent them from making themselves better." Explain.

এই মত ঠিক নহে। রাষ্ট্র জোর করিয়া লোককে সাধু করিতে পারে না বটে, কিন্তু শিক্ষা, জীবিকা ও খেলাধূলার এমন ব্যবস্থা করিতে পারে যাহার ফলে ব্যক্তি মহত্তর জীবন লাভ করে।

একাদশ অধ্যায়

সমাজতন্ত্রবাদ ও মহাত্মা গান্ধীর চিন্তাধারা

১। সমূহতন্ত্রবাদ (Collectivism) ও সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism) : ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যে মতবাদের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহাকে সমূহতন্ত্রবাদ বা রাষ্ট্রায়ত্ত সমাজতন্ত্রবাদ (State Socialism) বলা হয়। উৎপাদনের উপাদানসমূহ ব্যক্তির হাতে রাখিলে জনসাধারণের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধি পায় না, বরং ধনীরা শ্রমিকদিগকে শোষণ করে এবং ক্রেতাদিগের নিকট বেশি দাম লয়, এই ধারণার বশে কোন কোন চিন্তানায়ক প্রস্তাব করেন যে, উহা রাষ্ট্রের আয়ত্তে থাকুক। রাষ্ট্র সকলের স্বার্থ সংরক্ষণ করিবে। সমাজতন্ত্রবাদীরাও বলেন যে, উৎপাদনের উপাদানের উপর ব্যক্তিগত অধিকার বিলোপ করা উচিত। কিভাবে ইহার বিলোপ সাধন করা হইবে, কিভাবেই বা উৎপাদনের পরিচালনা করা হইবে ইহা লইয়া পরস্পর-বিরোধী বহু মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে। মোটামুটি বলা যায় যে, সমূহতন্ত্রবাদ শব্দটি ইংলণ্ডের পিগু প্রভৃতি অর্থনীতিবিদদের দ্বারা ব্যবহৃত হইলেও শব্দটি জনপ্রিয় হয় নাই। সমূহতন্ত্রবাদীরা বিপ্লবের দ্বারা ব্যক্তিগত অধিকার নষ্ট করিতে চাহেন না। তাঁহারা সংবিধান-সম্মত উপায়ে ধীরে ধীরে সমস্ত উৎপাদনের উপাদান এবং ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, যাতায়াতের যানবাহন প্রভৃতি রাষ্ট্রের আয়ত্তে আনিবার পক্ষপাতী। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ (Fabian Socialism) ইহার এক বিশেষ রূপ।

সমাজতন্ত্রবাদের বহু শাখার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটির বিবরণ এখানে দেওয়া যাইতেছে—(১) কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদ (Utopianism) (২) খৃষ্টীয় সমাজতন্ত্রবাদ (৩) সাম্যবাদ (Communism) (৪) রাষ্ট্রহীন সংঘাত্মক সমাজতন্ত্রবাদ (Syndicalism) (৫) পেশাগত সমিতিভিত্তিক বা সমাজ-তন্ত্রবাদ (Guild Socialism) (৬) গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদ (Fabian Socialism)।

২। উটোপিয়ান্ স্যোশালিজিম্ বা কল্পনাবিলাসী সমাজ-তন্ত্রবাদ : শিল্পায়িত সমাজের দুঃখ-দারিদ্র্য ও ধন-বৈষম্যের প্রতিকার

করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব হইয়াছে। সমাজতন্ত্রবাদীদের মধ্যে যাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে বাস্তব অপেক্ষা কল্পনার প্রভাব বেশি তাঁহাদিগকে উটোপিয়ান্ স্যোশালিস্ট বলে। ইংলণ্ডের অধীশ্বর অষ্টম হেন্‌রির রাজ্যকালে তাঁহার চান্সেলর স্যার টমাস্ ম্যুর "উটোপিয়া" নামে যে গ্রন্থ ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে রচনা করেন, তাহার নাম হইতে উটোপিয়ান্ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। গ্রীক ভাষায় "উটোপিয়ার" মানে "কোথাও না"। ইংলণ্ডে সে সময়ে উল বা পশমের দাম খুব বাড়িয়া যাওয়াতে বড়লোকেরা জমিতে ফসল না জন্মাইয়া ভেড়ার খাইবার ঘাস চাষ করিতে লাগিলেন। প্রজাদের কাছ হইতে টুকরা টুকরা জমি কাড়িয়া লইয়া তাঁহারা উহা বেড়া দিয়া ঘিরিয়া ফেলিলেন। তাহার মধ্যে ভেড়া চরানো হইত। যাহারা চাষ করিয়া জীবিকা অর্জন করিত তাহারা বেকার হইল। তাই ম্যুর লিখিলেন যে, এখন ভেড়াতে মানুষ খাইতেছে—মানুষ খাওয়া মানে তিনি মানুষের জীবিকাহরণ করা বুঝাইয়াছেন।

ম্যুরের উটোপিয়া

তিনি যে উটোপিয়ার কল্পনা করিলেন সেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নাই। লোকে প্রতিযোগিতা না করিয়া সহযোগিতা করে। সেখানে কেহই ধনী নহে, আবার কেহই নিরন্ন দরিদ্র নহে। দিনে ছয় ঘণ্টার বেশি কাহাকেও খাটিতে হয় না, আবার কেহই অলসভাবে কাল কাটাইতে পারে না। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের বিনাশ্রমে খাইতে দিবার ব্যবস্থা আছে। সেখানে সরকার সাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হয় এবং সাধারণের নিকট দায়িত্বশীল। প্রত্যেকের লেখা-পড়া শিখাইবার ব্যবস্থা আছে, অসুখের সময় প্রত্যেকের চিকিৎসাপত্রের বন্দোবস্ত করা হয়। যে যাহার মত ধর্মচর্চা করে, সরকারী ধর্ম কিছু নাই। স্ত্রী-পুরুষের সেখানে সমান অধিকার। ষোড়শ শতাব্দীতে এ ধরনের চিন্তা করা খুবই বিস্ময়কর। তখনও শিল্প-বিপ্লব শুরু হয় নাই, কেবলমাত্র বাণিজ্য-বিপ্লবের সূত্রপাত হইতেছে। ম্যুর সাম্যবাদের চিত্র অংকন করিয়াছেন, কিন্তু কি করিয়া তাঁহার 'উটোপিয়া'কে মর্ত্যজগতে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে সে সন্ধান তিনি দিতে পারেন নাই। তাই তাঁহাকে কল্পনাবিলাসীদের শ্রেণীতে ফেলা হয়।

ম্যুরের কল্পিত সমাজ-ব্যবস্থা

ক্রমওয়েলের সময়ে (১৬৫৬ খৃষ্টাব্দ) জেম্‌স হ্যারিংটন 'ওসিয়ানার কমনওয়েলথ' নামক গ্রন্থে শাসন করিবার অধিকার মানুষের হাতে না দিয়া আইনের উপর ন্যস্ত করেন। তাঁহার মতে যাঁহাদের হাতে সম্পত্তি থাকে তাঁহারাই শাসন করেন। সেই জন্য সম্পত্তি প্রত্যেকের সমান সমান হইলে শাসনতন্ত্রে জনগণের অধিকার সংরক্ষিত হইবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তিই যে সকল বিরোধের মূল সে কথা তিনি সুন্দররূপে দেখান।

হ্যারিংটনের ওসিয়ানা

ইঁহাদের দুই জনের পর উনবিংশ শতাব্দীর শিল্পায়িত সমাজে স্যাঁ সিমঁ (Saint Simon), ফুরিয়ে (Fourier), রবার্ট ওয়েন, এডোয়ার্ড বেললামি প্রভৃতি মনীষী কল্পলোক প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। ইঁহারা সকলেই শিল্পযন্ত্রকে বিশ্বমানবের কল্যাণে নিয়োজিত করিবার কথা ভাবিয়াছিলেন এবং শোষণ ও প্রতিযোগিতার স্থানে সহযোগিতা এবং উৎপন্ন ধনের সমান বণ্টনের নীতি ঘোষণা করিয়াছিলেন। স্যাঁ সিমঁ তাঁহার New Christianity-তে সমাজকে সৌভ্রাত্রের ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। সকলে নিজের নিজের শক্তি অনুসারে উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করিবে, পারিশ্রমিক পাইবে। উত্তরাধিকারসূত্রে ধনসম্পত্তি লাভকে তিনি বিলোপ করার পক্ষে ছিলেন। তিনি মহাত্মা গান্ধীর মতন সকল শ্রেণীর লোকের বিবেকবুদ্ধিকে জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফুরিয়ে নিজে একজন সুদক্ষ শিল্পপতি হইলেও কৃষি-কর্মের ভিত্তিতে তিনি আর্থিক জীবনকে পুনর্গঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। শিল্প উৎপাদনকে তিনি সৃজনী প্রতিভার বিকাশের সহায়ক করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। সমবায় সমিতির সাহায্যে সমস্ত আর্থিক কার্য পরিচালনা করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। রবার্ট ওয়েন ইংলণ্ডের নিউ লানার্ক নামক স্থানে হাতে-কলমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তিনি ছিলেন এক কাপড়ের কলের মালিক। তিনি শ্রমিকদিগের মধ্যে সমবায় সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতি প্রচারের অগ্রণী ছিলেন। তিনি দশ বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়েকে কারখানার কাজে লাগানো এবং প্রাপ্তবয়স্কদের দিনে বারো ঘণ্টার বেশি কাজ করানো আইন করিয়া বন্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন! কিন্তু তখনকার দিনে ইংলণ্ড এমন ছোট দাবিও মানিয়া লয় নাই। তাঁহার

শিল্পায়িত সমাজে সমাজতন্ত্রের কল্পনা

মতবাদকে তখন লোকে পাগলামি বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল, কিন্তু এখন তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান হন। ফ্রান্সের লুই ব্লাঁ (Louis Blanc) সাম্যবাদের মূল নীতি ঘোষণা করিয়া বলেন, প্রত্যেকে নিজের মতামত মত কাজ করিবে কিন্তু প্রয়োজনমত অর্থ পাইবে। তিনি বিপ্লবের পরিবর্তে বৈধানিক উপায়ে পরিবর্তন আনিবার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এডোয়ার্ড বেললামি "Looking Backward" নামক গ্রন্থে কল্পনা করেন যে, ২০০০ খৃষ্টাব্দে শিল্পপদ্ধতির এমন উন্নতি সাধিত হইবে যে প্রত্যেকে উন্নততর জীবন যাপনে সমর্থ হইবে। জমি, কারখানা প্রভৃতি সব কিছু সাধারণের সম্পত্তি হইবে, কিন্তু মুদ্রার ও ব্যাঙ্কের প্রচলন তিরোহিত হইবে। ২১ বৎসর হইতে ৪৫ বছর বয়সের প্রত্যেক নরনারীকে কাজ করিতে হইবে। রাষ্ট্রের পরিবর্তে শ্রমিকদের সংঘ (গিল্ড) আর্থিক ও রাজনৈতিক জীবন পরিচালনা করিবে।

এই সব কল্পনাবিলাসীদের চিন্তাধারা বাস্তবকে অগ্রাহ্য করিয়াছে। সাধারণ লোক চিরাচরিত প্রথা অনুসারে চলিতে চায়; যাঁহাদের কায়েমী স্বার্থ আছে, তাঁহারা দুর্যোধনের মতন বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্রভূমিও দিতে রাজী নয়, এ সব কথা তাঁহারা বিবেচনা করেন নাই। সমাজ-জীবন বিভিন্ন প্রকারের শক্তির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে নিয়ন্ত্রিত হয় একথা তাঁহারা ভুলিয়া যান। তাঁহারা ভাবেন বিধাতা-পুরুষের মতন তাঁহারা যাহা ঠিক করিয়া দিবেন সকলে বুঝি তাহাই অনুসরণ করিবে। কিন্তু এসব দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁহারা যে বলিষ্ঠ আদর্শ অনুসরণ করিবার প্রেরণা দিয়াছেন তাহা লোকের মনে আশা ও আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়াছে। বর্তমান অবস্থাকে নির্বিচারে না মানিবার সুবুদ্ধি তাঁহারা জোগাইয়াছেন। তাঁহাদের অনেক দাবি এখন বহু রাষ্ট্রে স্বীকৃত হইয়াছে।

ইঁহাদের মতের মূল্য নিরূপণ

৩। **খৃষ্টীয় সমাজতন্ত্রবাদ** (Christian Socialism): ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোন কোন খৃষ্টীয় ধর্মযাজকদের মধ্যে শোষণমূলক ধনতন্ত্রের সংশোধন করিবার প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ পায়। তাঁহারা যীশুখৃষ্টের জীবনী ও বাণীর অনুসরণ করিয়া সমাজ-জীবনের পুনর্গঠন করিতে চান। কিন্তু

ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে পোপ ত্রয়োদশ লিয়ো ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এবং পোপ একাদশ পায়াস্ ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের যে অনুশাসন প্রকাশ করেন তাহাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপ করিবার কোন ইঙ্গিত নাই; তবে লোকে ধনসম্পত্তি সমাজের মঙ্গলের জন্য প্রয়োগ করুক এরূপ অভিপ্রায় ঘোষিত হইয়াছে। শ্রমিককে ন্যায্য বেতন দেওয়া ও কর্মক্ষম ব্যক্তিমাত্রকেই কার্যে নিয়োগ করিবার কথাও ইহাতে আছে। এ সব থাকা সত্ত্বেও ক্যাথলিক সম্প্রদায়কে কোনক্রমে সমাজতন্ত্রবাদী বলা চলে না।

ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মত

প্রোটেস্ট্যাণ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত সমাজতন্ত্রীবাদীরা একদিকে যেমন শোষিত শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিবিধানের জন্য আন্তরিক আগ্রহ দেখাইয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি লোকের ক্ষীয়মাণ ধর্ম-বিশ্বাসকে বলশালী করিতে চাহিয়াছেন। ধর্মের ভিত্তিতে সমাজ-জীবনকে পুনর্গঠিত করা তাঁহাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। তাঁহারা উৎপাদনের উপযোগী প্রত্যেক প্রকার সম্পত্তিকে সাধারণের আয়ত্তে রাখার পক্ষপাতী। উৎপাদক শ্রেণীদের সমবায় সমিতিগুলি উৎপাদনের এবং ভোক্তাদের (Consumers) সমবায় সমিতিসমূহ বণ্টন সম্পর্কিত কাজের নিয়ন্ত্রণ করুক—ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা।

প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মযাজক-দের মতবাদ

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ফরাসী ধর্মযাজক রবার্ট দ্য লামানে (Robert de Lamennaiste ১৭৮২-১৮৫৪) খৃষ্টীয় সমাজতন্ত্রবাদের সমর্থন করিতে যাইয়া বলেন যে, বৈপ্লবিক নীতির বলে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হইবার এবং সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি মানিয়া লওয়া উচিত। তৃতীয় ফরাসী বিপ্লবের সময়ে অর্থাৎ ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে চার্লস্ কিংসলে, মরিস্ লুড্‌লো প্রভৃতি ধর্মযাজকেরা শ্রমিকদের শোষণ ও কৃষকদের দুর্দশার করুণ চিত্র অংকন করিয়া অনেক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তাঁহারা বলেন যে, শুধু সমাজতন্ত্র মানুষের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনকে অস্বীকার করে। সেইজন্য খৃষ্টীয় সমাজতন্ত্র এমনভাবে প্রচার করা প্রয়োজন যাহাতে ধর্মবোধের উপর জনকল্যাণ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ইঁহাদের মতবাদ খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু ইঁহাদের প্রচারের ফলে

প্রধান প্রধান ব্যাখ্যাতা

সমাজতান্ত্রিক মতবাদ সংরক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মধ্যেও কিছুটা জনপ্রিয়তা লাভ করে।

৪। **মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদ**ঃ সমাজতন্ত্রবাদ কল্পনাবিলাসীদের ও খৃষ্টীয় ধর্মযাজকদের হাতে অবাস্তব ভাবধারা মাত্র ছিল। কার্ল মার্কসই উহাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐতিহাসিক কার্যকারণের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া এবং সুচিন্তিত কার্যপদ্ধতির সন্ধান দিয়া সমাজতন্ত্রকে কিভাবে স্থাপন করা যাইতে পারে তাহা এই মনীষীই প্রথম ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার মতবাদের চারটি প্রধান স্তম্ভ। যথা (১) ঐতিহাসিক জড়বাদ বা Historical Materialism (২) শ্রেণী সংগ্রাম (৩) উদ্বৃত্ত মূল্যের মতবাদ (৪) অতিরিক্ত উৎপাদন ও মূল্যহ্রাসের আবর্তনচক্রে ধনতন্ত্রের বিনাশ এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের উদ্ভব।

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের চারটি স্তম্ভ

কার্ল মার্কসের বিচারধারা হেগেলের দর্শনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। কিন্তু হেগেলের Dialectics বা দ্বন্দ্ববাদের মূলে আছে চৈতন্যের বা ভাবের ক্রিয়া, আর মার্কসের মতে জড়বস্তু। অনাদি ও অনন্ত দ্বন্দ্বের অন্তর্নিহিত সংঘাতের মধ্যে সৃষ্টি সমন্বয়ের পথে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু এক সমন্বয় আবার নূতন এক সংঘাতের ফলে ভগ্ন হয়, পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধারায় পুরাতন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও নূতন জয়লাভ করে। প্রাকৃতিক সংঘাতের ধারা কালক্রমে সামাজিক ধারায় অনুপ্রবিষ্ট হইল এবং ধনোৎপাদনের পদ্ধতি ও বিত্তকে কেন্দ্র করিয়া নূতন নূতন সংঘাত সৃষ্ট হইতে লাগিল। ধন উৎপাদনে কে কতখানি কর্তৃত্ব করে এবং কতটা অংশ পায় তাহার উপর শ্রেণীবিভাগ নির্ভর করে। প্রত্যেক সমাজের আইন-কানুন, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, নৈতিক মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতি তৎকালীন শাসক সম্প্রদায়ের সুখ-সুবিধা রক্ষার জন্য উদ্ভূত হয়। আর্থিক পরিবেশই মানুষের ভাবনা ও আদর্শকে সর্বাধিক প্রভাবান্বিত করে। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ, সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতির প্রভাব মার্কস্ অস্বীকার করেন নাই, তবে তিনি বলেন যে ঐ সব আদর্শও কোন বিশেষ সামাজিক পরিবেশের ফল।

ঐতিহাসিক জড়বাদের যুক্তি প্রণালী

মার্কসের মতে মানুষের ইতিহাস নিছক শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। ধন

উৎপাদনের পদ্ধতির ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটিতেছে। যাহাদের হাতে ধন উৎপাদনের উপাদান থাকে তাহারা অন্য শ্রেণীকে নিজেদের পদানত করিয়া রাখিতে চাহে, রোমের পেট্রিশিয়ানগণ প্লেবদিগকে, মধ্যযুগের সামন্তবর্গ ভূমিদাস বা সার্ফদিগকে এবং শিল্পযুগে কলকারখানার মালিকেরা শ্রমিকদিগকে খাটাইয়া লইয়া নিজেদের সুখ-সুবিধা ভোগ করিত। কিন্তু বিত্তহীনেরা বেশিদিন চুপচাপ থাকে না। তাহারা উৎপন্ন ধনের অধিকতর অংশ পাইবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিতে থাকে। যাহাদের হাতে ধনসম্পত্তি আছে তাহারা তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রকে নিজেদের আয়ত্তের অথবা প্রভাবের অধীন করে। রাষ্ট্রের হাতে পুলিশ, সৈন্যদল প্রভৃতি থাকে। সেগুলিকে তাহারা বঞ্চিত বিত্তহীনদের দমন করিবার জন্য প্রয়োগ করে। উৎপাদনের পদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাতসারেই কর্তৃত্ব হস্তান্তরের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়; কিন্তু যাহাদের হাতে ধন আছে তাহারা কর্তৃত্বকে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরে। এইরূপে শ্রেণীসংঘাত তীব্রতর হইয়া উঠে। নূতন শ্রেণী অবশেষে জোর করিয়া রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করিয়া লয়, পুরাতন ধনীসম্প্রদায়কে উৎখাত করে এবং নূতন ধরনের আইন পাশ করাইয়া নিজেদের ধনের অধিকারকে আইনসঙ্গত করিয়া লয়। যুগে যুগে আইন শ্রেণীবিশেষের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রণীত হয়।

ইতিহাসের শ্রেণী সংঘর্ষ

ধনতন্ত্রের যুগে ধনী ও শ্রমিকদের সংঘর্ষ প্রবল আকার ধারণ করে। জমি, পুঁজি, কলকারখানা, ব্যাঙ্ক, বীমা, যানবাহন প্রভৃতি উৎপাদনের যাবতীয় উৎপাদন পুঁজিপতিদের হাতে। শ্রমিকদের কায়িক শক্তি, কার্যে দক্ষতা ও বুদ্ধিবল ছাড়া আর কিছুই নাই। তাহারা সেইজন্য নিজে নিজে কিছু উৎপাদন করিতে পারে না। পুঁজিপতিদের নিকট তাহাদিগকে শ্রম বিক্রয় করিতে হয়। তাহারা যতটা ধন উৎপাদন করে, তাহার চেয়ে অনেক কম ধন বেতন হিসাবে পায়। বাকীটা পুঁজিপতিরা মুনাফা হিসাবে লাভ করে। ইহাকেই মার্ক্স উদ্বৃত্ত মূল্য বা Surplus Value বলিয়াছেন। ইহা জমির খাজনা, পুঁজির সুদ ও পুঁজিপতির মুনাফা এই তিন আকার ধারণ করে। এইগুলির বিলোপ সাধন করাই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের উদ্দেশ্য।

উদ্বৃত্ত মূল্য

প্রত্যেক অবস্থার বিনাশের বীজ তাহার নিজের ভিতরেই লুকাইয়া থাকে। ধনতন্ত্রও এই নিয়মের অধীন। শ্রমিকেরা ন্যায্য বেতন পায় না বলিয়া তাহাদের কিনিবার ক্ষমতা কম হয়। অথচ শিল্পপতিরা ক্রমাগত বেশি লাভের আশায় বেশি উৎপাদন করিতে থাকেন। শেষে এমন একটা সময় আসে যে উৎপন্ন দ্রব্য আর বিক্রয় করা যায় না। তখন অনুন্নত দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া সেখানে বিক্রয় করিবার চেষ্টা চলে। প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করিয়া লাভ করা যায় না বলিয়া বিলাসের দ্রব্য অধিকতর পরিমাণে উৎপন্ন করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক দেশের সহিত অন্য দেশের বাজার লইয়া সংগ্রাম বাধে। পুঁজিপতিরা প্রথমে ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানকে গ্রাস করিয়া বড় হয় এবং পরে নিজেদের ভিতর প্রতিযোগিতা না করিয়া সংঘবদ্ধ হইয়া উৎপাদনের উপর একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করে। ক্রমে শ্রমিকের অবস্থা খারাপ হইতে থাকে। একদিকে পুঁজিপতিদের সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকে এবং ধনসম্পত্তি অল্পতর সংখ্যক লোকের হাতে পুঞ্জীভূত হইতে থাকে ; অন্যদিকে শ্রমিক ও বেকারদের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। ইহাতে শ্রেণীসংঘর্ষ আরও প্রচণ্ড আকারে দেখা দেয়। শ্রমিকেরা সংঘবদ্ধ হয়, শ্রেণী-স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতনতা লাভ করে এবং ধনতন্ত্রকে পরাভব করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে উদ্বুদ্ধ হয়। তাহারা সৈন্যদলকে স্বপক্ষে আনিয়া রাষ্ট্রযন্ত্র অধিকার করিয়া লয় এবং পুঁজিপতিদিগকে উৎসন্ন করে।

ধনতন্ত্রে দেশে দেশে ও শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংগ্রাম অনিবার্য

বিপ্লবের পর বিত্তহীনদের একনায়কত্ব স্থাপিত হয়। জমির ও পুঁজির অধিকার আর ব্যক্তিবিশেষের হাতে থাকে না, রাষ্ট্রের আয়ত্তে আসে। লাভের জন্য উৎপাদন করা হয় না, সকলের মঙ্গলের জন্য হয়। সমাজে শ্রেণীবিভাগ লোপ পায়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপ পাইবে বলিয়া কেহ আর অপরকে খাটাইয়া লইয়া উদ্বৃত্ত মূল্য দখল করিতে পারিবে না। উদ্বৃত্ত মূল্য জিনিসটারই আর অস্তিত্ব থাকিবে না। বেশ ভাল করিয়া হিসাবনিকাশ করিয়া যে সব জিনিসের উৎপাদন করা সবচেয়ে বেশি দরকার বলিয়া বুঝা যাইবে সেই সব জিনিস পরিকল্পনা অনুসারে উৎপন্ন হইবে। প্রতিযোগিতার

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার রূপ

বাজারে বিজ্ঞাপন দিয়া বা রেষারেষি করিয়া যে অপব্যয় করা হইত তাহা আর হইবে না। যাহারা কাজ করিতে সমর্থ তাহারা প্রত্যেকে কাজ পাইবে। কাহাকেও বেকারি জীবন ভোগ করিতে হইবে না আবার কাহাকেও বিনা কারণে আলস্যে জীবনযাপন করিতে দেওয়া হইবে না। প্রত্যেকের রোগে, ভোগে, আকস্মিক বিপৎপাতে—ভরণপোষণ ও চিকিৎসা করিবার ভার রাষ্ট্র লইবে। অনিশ্চয়তার, দুশ্চিন্তার পরিবর্তে সুখ শান্তি ও পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা আসিবে। সমাজতন্ত্রব্যবস্থা দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর প্রত্যেককে তাহার প্রয়োজন মত ভোগ্যবস্তু প্রভৃতি দেওয়া হইবে এবং তাহার পরিবর্তে তাহার নিকট হইতে তাহার সামর্থ্যানুযায়ী কাজ লওয়া হইবে।

কার্ল মার্কস্ ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো বা সাম্যবাদী ঘোষণায় ধনতন্ত্র হইতে সাম্যবাদ কি করিয়া আসিবে তাহার বর্ণনা করেন—

কমিউনিজিমের মূল কথা

(১) জমির উপর মালিকানা স্বত্ব বিলোপ করিয়া খাজনার আয় সাধারণের কাজে নিয়োগ; (২) যাহার যত বেশি আয় হইবে তাহার নিকট হইতে তত বেশি হারে আয়কর লওয়া; (৩) উত্তরাধিকার প্রথার বিলোপ; (৪) যাহারা বিদ্রোহ করিবে বা দেশ হইতে পলায়ন করিবে তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা; (৫) রাষ্ট্রের আয়ত্তে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া তাহার হাতে টাকা ধার দেওয়ার একচেটিয়া অধিকার সমর্পণ; (৬) যাতায়াত ও সংবাদ আদানপ্রদানের সমস্ত ব্যবস্থা রাষ্ট্রের হাতে আনয়ন; (৭) ক্রমে ক্রমে উৎপাদনের যন্ত্র ও উপাদান রাষ্ট্রের আয়ত্তে আনা; (৮) প্রত্যেককে শ্রম করিতে বাধ্য করা; (৯) কৃষিকর্মের সহিত শিল্পোদ্যোগের এমনভাবে সমবায় করা যাহাতে গ্রামে ও সহরে লোকসংখ্যার সমতা রক্ষা পায়; (১০) সাধারণ বিদ্যালয়ে সকল ছেলেমেয়েকে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া।

ইহার পর ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ক্যাপিটাল নামক গ্রন্থে তিনি সাম্যবাদী সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কিভাবে সম্ভব তাহা ব্যাখ্যা করেন। রক্তাক্ত বিপ্লব ছাড়া সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না বলিয়া কমিউনিস্টরা মত প্রকাশ করেন। মার্কস্ অনেক স্থলে বলিয়াছেন যে, পুঁজিপতিরা

বিবেকবুদ্ধির বশে অথবা যুক্তিতর্কের প্রভাবে তাহাদের কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দিতে রাজী হইবেন না। কিন্তু ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রথম আন্তর্জাতিক সংস্থার (First International) আমস্টার্ডমের সভায় তিনি বলিয়াছেন যে, "সব স্থানেই যে একই পদ্ধতিতে উদ্দেশ্য সাধিত হইবে তাহা নহে। বিভিন্ন দেশের প্রথা, আচরণ ও প্রতিষ্ঠান বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। আমরা অস্বীকার করিতে পারি না যে, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ও হল্যাণ্ডে শ্রমিকেরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাহাদের লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে। কিন্তু সকল দেশে এরূপ সম্ভব নহে।" তাঁহার এই মত রাশিয়ার জননায়ক ক্রুশ্চেভও স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে সমাজতন্ত্র স্থাপনের পক্ষে বিপ্লব অপরিহার্য নহে, পার্লামেণ্টারী শাসন-পদ্ধতির দ্বারা সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

বিপ্লব কি অপরিহার্য ?

মার্কসের মতে সাম্যবাদের চরম উদ্দেশ্য হইতেছে প্রত্যেকের নিকট হইতে সামর্থ্য অনুসারে কাজ লওয়া, কিন্তু প্রত্যেককে তাহার প্রয়োজন অনুসারে পারিশ্রমিক দেওয়া। কায়িক ও মানসিক শ্রমের মূল্যের মধ্যে তফাৎ থাকা উচিত নহে। যখন সকলে মিলিয়া স্বেচ্ছায় ও সানন্দে সহযোগ করিয়া উৎপাদনে প্রবৃত্ত হইবে তখন উৎপন্ন সামগ্রীর পরিমাণ খুব বৃদ্ধি পাইবে এবং যাহার যতটা দরকার ততটা দেওয়া সম্ভবপর হইবে।

সাম্যবাদের লক্ষ্য

মার্কসের মতে সাম্যবাদী সমাজতন্ত্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হইলে রাষ্ট্রের আর বিশেষ কোন কাজ থাকিবে না। সকলেই যদি স্বেচ্ছায় নিজ নিজ কর্তব্য করিয়া যায় তাহা হইলে কাহারও উপর জোরজবরদস্তি করিবার প্রশ্নই উঠে না। রাষ্ট্র মূলতঃ জোর করিয়া লোকের বাধ্যতা আদায় করিবার সংগঠন। সেইজন্য সাম্যবাদ এমন এক স্তরে পৌঁছিতে পারে যখন রাষ্ট্র আপনা আপনি শুকাইয়া যাইবে।

সমাজতন্ত্র বিকাশের ইতিহাসে রাষ্ট্রের স্থান

মার্কস্ শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রভাবে আস্থাশীল ছিলেন। বিশ্বের সকল শ্রমিকের স্বার্থ এক এবং তাহাদের শ্রেণীগত স্বার্থ জাতীয়তা ও দেশপ্রেমের উপরে স্থান পাইবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন।

সেইজন্য তিনি ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমজীবীদের আন্তর্জাতিক সমিতি স্থাপন করেন। ইহাকে ফার্স্ট ইণ্টারন্যাশনাল বলা হয়। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহার অস্তিত্ব বজায় ছিল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই নরমপন্থীরা বিপ্লবের পরিবর্তে সংস্কার সাধনের কথা বলিতেছিলেন। তাঁহারা ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে শক্তিসঞ্চয় করিয়া প্যারি সহরে সেকেণ্ড ইণ্টারন্যাশনালের প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময়ে কার্ল মার্কস্ আর ইহলোকে ছিলেন না। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শুধু নামেই আন্তর্জাতিক ছিল, কিন্তু কার্যতঃ জাতীয়তাবাদের প্রভাব ইহার উপর খুব বেশি ছিল। পার্লামেণ্টারী প্রথায় এবং আইনসঙ্গত উপায়ে ইঁহারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সমিতি বিলুপ্ত হইল। রাশিয়ার বিপ্লবের পর ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে লেনিন ১৯টি দেশের বিপ্লবীদলের প্রতিনিধিদের লইয়া মস্কোতে তৃতীয় আন্তর্জাতিক বা Third International প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন দেশে বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে ধ্বংস করিয়া বিত্তহীনদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। লেনিন ইহার নেতৃত্ব করেন। দেশে দেশে বিপ্লবের আগুন জ্বালাইয়া সমাজতন্ত্রবাদের স্থাপন করিবার প্রচেষ্টাকে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে স্টালিন ইহার বিলোপ সাধন করেন। রাশিয়ার বর্তমান নায়কেরা অন্যান্য দেশের সঙ্গে মৈত্রী কামনা করেন। তাই তাঁহারা এখন বিভিন্ন দেশে উস্কানি দিয়া বিপ্লব বাধাইবার নীতি পরিত্যাগ করিয়াছেন।

তিনটি ইণ্টারন্যাশনালের ইতিহাস

৫। মার্কস্‌বাদের মূল্য নিরূপণ: কার্ল মার্কসের চিন্তাধারা এ যুগের রাষ্ট্র ও সমাজের ভিত্তিমূলকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। তাঁহার মতবাদ যাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহারাও তাঁহার প্রভাব এড়াইয়া যাইতে পারেন নাই। পৃথিবীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক তাঁহার বাণীকে বেদ ও বাইবেলের সমান মনে করে।

কিন্তু তাঁহার কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয় নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ড বা জার্মানির ন্যায় সবচেয়ে অগ্রসর শিল্পায়িত দেশে সাম্যবাদ

প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু কাজের বেলায় দেখা গেল যে, রাশিয়া ও চীনের ন্যায় শিল্পে অনগ্রসর দেশেই সাম্যবাদ স্থাপনের প্রথম প্রচেষ্টা করা হইল। দ্বিতীয়তঃ মার্কস্ বলিয়াছিলেন যে, বিশ্বের শ্রমিকদের স্বার্থ এক, সুতরাং তাহারা জাতীয়তার ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া একীভূত হইবে। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি শ্রমিকদের প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি তাহাদিগকে একত্রিত হইতে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাহাদের পায়ের শৃঙ্খল ছাড়া আর কিছুই হারাইবার ভয় নাই। তথাপি তাঁহারা নেশনের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই। বিংশ শতাব্দীর তুইটি মহাযুদ্ধের সময় শ্রমিকেরা নিজের নিজের দেশের হইয়া লড়িয়াছে। আজ রাশিয়া ও চীনেও জাতীয়তাবাদের প্রভাব প্রবল। তৃতীয়তঃ মার্কস্ বলিয়াছিলেন যে, ধনতন্ত্র তাহার অন্তর্নিহিত বিরোধের ফলে অচিরে ধ্বংস পাইবে। কিন্তু ইংলণ্ড ও আমেরিকায় শ্রমিকদের জীবনের মান অনেক উচ্চস্তরে পৌঁছিয়াছে। পুঁজিপতিরা বুঝিয়াছে যে, দরিদ্রকে দরিদ্রতর করিলে তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য। এরূপ বুদ্ধি জাগিবার মূলে অবশ্য মার্কসের প্রভাব স্বীকার করিতে হইবে। ধনতন্ত্র নিজেকে সংশোধন করিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছে। সেইজন্য তাহার ধ্বংসের কোন চিহ্ন এখন দেখা যাইতেছে না।

মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী কতটা সফল হইয়াছে

চতুর্থতঃ মার্কস্ আকারইঙ্গিতে ও এঙ্গেল্‌স স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র আপনা হইতেই শুকাইয়া মরিয়া যাইবে। রাশিয়ায় প্রায় অর্ধশতাব্দী হইল সাম্যবাদ স্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু সেখানে যতই দিন যাইতেছে রাষ্ট্র ততই শক্তিশালী হইতেছে। মার্কসবাদীরা বলেন যে, শাসকশ্রেণী তাহাদের শ্রেণীগত স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য সৈন্যদল, পুলিশ, জেল প্রভৃতি কায়েম রাখে; কিন্তু সমাজ হইতে শ্রেণী-বিভাগ যখন বিলুপ্ত হইবে তখন রাষ্ট্র আর শ্রেণী শোষণের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইবে—এই অর্থেই মার্কস্ ও এঙ্গেল্‌স রাষ্ট্রের লোপ পাইবার কথা বলিয়াছেন। শ্রেণীহীন সমাজে কোনরূপ রাজনৈতিক সংগঠন থাকিবে না, এ কথা তাঁহারা বলেন নাই। যাহা হউক, এখন রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রের পরিধি এত বৃদ্ধি পাইয়াছে

কোন্ হিসাবে রাষ্ট্র বিলুপ্ত হইবে?

যে, মানুষের প্রায় গোটা জীবনটাই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আসিয়াছে। রাষ্ট্র ছাড়া কোনকালে যে মানুষ নিজেদের কাজকর্ম চালাইতে পারিবে তাহা মনে হয় না।

কার্ল মার্কসের ইতিহাস ও অর্থনীতির ব্যাখ্যার মধ্যে প্রচুর সত্য নিহিত থাকিলেও উহা একদেশদর্শী। মানুষের ইতিহাসে শ্রেণীগত সংঘর্ষ যেমন সত্য, পরস্পরের সহযোগিতার ফলে ধর্ম, সাহিত্য, কলা এবং ব্যাপকভাবে বলিতে গেলে সামাজিক জীবনের বিকাশও তেমনি সত্য। মানুষ একমাত্র আর্থিক কারণেই সব কিছু করে বা করিয়াছে একথা মানিয়া লওয়া কঠিন। জীবনে স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা, মহৎ কার্যে আত্মদানের ইচ্ছাও আর্থিক প্রেরণার চেয়ে কম জোরালো নহে। ভৌগোলিক অবস্থার প্রভাব, মহাপুরুষদের জীবনী ও চিন্তাধারা এবং ধর্মের উদ্দীপনাকে আর্থিক পরিবেশের প্রতিক্রিয়া মাত্র বলিয়া দেখিলে ভুল হইবে।

আর্থিক ব্যাখ্যার একদেশদর্শিতা

মার্কস্ উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্বে শ্রমকেই মূল্য নিরূপণের একমাত্র কারণ বলিয়াছেন। জমি এখন যে অবস্থায় চাষবাস করা হইতেছে তাহা অতীতের শ্রমেরই ফল, কল-কারখানা প্রভৃতিও তাই বটে। কিন্তু এখন প্রত্যেকটি জিনিস তৈয়ারি করিতে এত বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় যে, কোন্ জিনিসটার পিছনে কতখানি বা কত মূল্যের শ্রম ব্যয়িত হইয়াছে তাহা নিরূপণ করা অসম্ভব। শ্রমও তো এক ধরনের নহে। শারীরিক শ্রম যেমন উৎপাদনের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়, মানসিক শ্রমও তাহার চেয়ে বেশি বই কম প্রয়োজনীয় নহে। মার্কস্ শারীরিক ও মানসিক শ্রমের বেতনের হারের মধ্যে পার্থক্য রাখা পছন্দ করিতেন না। কিন্তু রাশিয়াতে মানসিক শ্রমজীবীরা অনেক বেশি রোজগার করিতেছেন।

উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব

মার্কস্ একদিকে রাষ্ট্রের আয়ত্তে সকল প্রকার উৎপাদনের উপাদান আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, অন্যদিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মূল্যেও বিশ্বাস রাখিয়াছেন। কিন্তু রাষ্ট্র যদি আর্থিক জীবনের সর্বাংশ নিয়ন্ত্রণ করে, তাহা হইলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব প্রকাশের ক্ষেত্র অত্যন্ত সংকুচিত হয়।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা না থাকিলে কেহ নিজের ইচ্ছামত মতামত প্রকাশও করিতে পারে না। মার্কসপন্থীরা বলেন যে, সাম্যবাদ যখন পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন লোকে প্রচুর স্বাধীনতা ভোগ করিতে পাইবে। কিন্তু সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ব্যক্তিস্বাধীনতা কোনকালে প্রকট হইবে কি না সন্দেহ।

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সংকোচন

ইংলণ্ড, আমেরিকা ও সম্ভবতঃ হল্যাণ্ডের বেলায় মার্কস্ সংবৈধানিক উপায়ে শ্রমিকদের একনায়কত্ব স্থাপনের সম্ভাবনা স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু বিপ্লবের দ্বারাই উহা অন্যান্য দেশে প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন। মারামারি কাটাকাটির দ্বারা যাহার উদ্ভব, তাহাতে শান্তি, প্রীতি ও সহযোগিতার অবাধ প্রভাব সম্ভব কিনা সন্দেহ। সাম্যবাদীরা মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন করিয়া তাহার স্বভাব বদলানো সম্ভব মনে করেন। মানুষ টাকা পয়সার জন্য লালায়িত হইবে না, সকলের সুখ-সুবিধার জন্য প্রাণপণে কাজ করিবে এবং জনহিতকেই নিজের পরম কল্যাণ বলিয়া বিবেচনা করিবে বলিয়া সাম্যবাদীরা বিশ্বাস করেন। তাঁহাদের এই আশা কতখানি এবং কতদিনে সফল হইবে বলা কঠিন।

আশাবাদী মার্কস্

মার্কস্‌বাদের প্রচারের ফলে শ্রমজীবীদের অবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি হইয়াছে। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিও তাঁহার মতবাদের কিছু কিছু অংশ স্বীকার করিয়া লইয়াছে। একশত বৎসর পূর্বে ধনতন্ত্রের যে নির্মম স্বার্থপর রূপ ছিল, এখন তাহা নাই। উগ্র সাম্যবাদীরা মনে করেন যে, ধনতন্ত্র নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য শ্রমিক শক্তির সঙ্গে আপোষ করিতেছে; কিন্তু তাঁহারা আপোষহীন সংগ্রাম চালাইয়া যাইবার পক্ষপাতী। শ্রেণী-স্বার্থের উপর সব সময়ে তাঁহারা জোর দিয়া দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ করিয়া তুলিয়াছেন।

মার্কস্‌বাদের প্রভাব

৬। **রাশিয়ার সাম্যবাদ:** ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে শ্রমিক ও সৈনিকদের সহযোগিতার ফলে রাশিয়ার রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং ঐ সালের ৭ই নভেম্বর তারিখে লেনিন বলশেভিকদলের নেতারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁহার নেতৃত্বে অল্পাধিক ছয় বৎসরের মধ্যে মার্কস্-ব্যাখ্যাত সাম্যবাদ রাশিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়। লেনিন ১৯২৪

খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী পরলোক গমন করেন। রাশিয়াতে জমি, খনিজ সম্পদ, কলকারখানা, রেল, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি রাষ্ট্রের আয়ত্তে আনা হইল। পূর্বের জমিদারেরা অধিকাংশ নিহত হইলেন, কেহ কেহ বা গোপনে অন্যদেশে পলায়ন করিলেন। শ্রমিক ও কৃষকদের একনায়কত্ব ঘোষিত হইল বটে, কিন্তু লেনিন কমিউনিস্ট দলের এক্তিয়ারে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিলেন। মার্কসের মতবাদে দলের এরূপ প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। লেনিনই দলের অধিনায়কত্ব স্থাপনে প্রথম উদ্যোগী হন। তিনি মার্কস্‌বাদের সঙ্গে আর একটি সিদ্ধান্ত যোগ করেন। সেটি হইতেছে সাম্রাজ্যবাদের ব্যাখ্যা। ধনতন্ত্র নিজের আত্মরক্ষার তাগিদে সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে অগ্রসর হয়। সেখানে কাঁচামাল সংগ্রহ করিয়া কারখানায় তৈয়ারি মাল বেচিবার ও উচ্চ-হারে উদ্বৃত্ত ধন নিয়োগ করিবার ব্যবস্থা করিয়া ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতি নিজের অত্যুৎপাদনের সমস্যা সমাধান করিতে চায়। কিন্তু সাম্রাজ্যের অধিকার লইয়া এক রাষ্ট্রের সহিত অন্য রাষ্ট্রের বিরোধ বাধিয়া উঠে। ফলে তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ অপরিহার্য হয়। অনুন্নত অবিকশিত উপনিবেশগুলিও আত্মসচেতন হয়, এবং সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করিতে চায়।

লেনিনের ব্যাখ্যাত সাম্রাজ্যবাদ

লেনিন তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সংগঠন করিয়া পৃথিবীর সর্বত্র কমিউনিজিমের বাজ ছড়াইয়া দিতে চাহেন। বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট দল রাশিয়ার নিকট হইতে উপদেশ ও আর্থিক সাহায্য পাইতে লাগিল। লেনিন আমলাতন্ত্রের হাতে বেশি ক্ষমতা দিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। সমাজতন্ত্রে আমলাশাহীর কোন স্থান নাই বলিয়া তিনি মনে করিতেন। তাঁহার মনে শেষ পর্যন্ত ধারণা ছিল যে, রাশিয়াতে সাম্যবাদ এমন এক স্তরে উপনীত হইবে, যখন রাষ্ট্রের আর টিকিয়া থাকার দরকার হইবে না।

লেনিন-নীতির বৈশিষ্ট্য

১৯২১ খৃষ্টাব্দে লেনিনকে খানিকটা পিছু হটিতে হইয়াছিল। রাশিয়াতে সাম্যবাদ রক্ষা করার জন্য তিনি ধনতন্ত্রের কয়েকটি অঙ্গকে স্বীকার করিয়া লন। তিনি ব্যক্তিগত ব্যবসাবাণিজ্যের ও বিনিময় নীতির পুনঃ প্রবর্তন করেন এবং বাধ্যতামূলক শ্রমনীতি ত্যাগ করেন। কৃষকেরা কিছু শস্য কররূপে দিয়া বাকীটা ইচ্ছামত

সাময়িক পশ্চাদপসরণ

ভোগদখল করিবার ও বেচিবার অধিকার পাইল। এটি নিতান্ত সাময়িক নীতি ছিল।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে লেনিনের মৃত্যুর পর স্টালিন ও ট্রট্স্কির মধ্যে নেতৃত্ব লইয়া প্রবল বিরোধ দেখা দেয়। ট্রট্স্কি অবশেষে পরাজিত হইয়া দেশান্তরে চলিয়া যান। স্টালিন তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী একনায়কত্বের সময়ে রাশিয়ার সাম্যবাদে অনেক পরিবর্তন সাধন করেন। তিনি আন্তর্জাতিক বিপ্লবের নীতিকে পরিহার করিয়া একমাত্র রাশিয়াতেই সাম্যবাদের সাফল্যের জন্য সকল শক্তি সংহত করিলেন। তাঁহার মতে একটি দেশে যদি সাম্যবাদ সফল হয় তাহা হইলে অন্যান্য দেশে ইহার অনুকরণ হইতে বাধ্য। ট্রট্স্কির মত ছিল যে ধনতান্ত্রিক সমাজের বেড়াজালের মধ্যে একটি মাত্র দেশে সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষা চলিতে পারে না। স্টালিন রাশিয়ার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশগুলির ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নতির উপায় বিধান করিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার জাতীয়তাবাদের ভাব যাহাতে প্রত্যেক নাগরিকের মনে বদ্ধমূল হয় তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাশিয়ার জাতীয় সংহতির প্রতীকরূপে তিনি নিজেকে খাড়া করিলেন। ফলে—স্টালিন-উপাসনার ভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এখন রাশিয়ার নেতারা বলিতেছেন যে, ব্যক্তিবিশেষকে এরূপ প্রাধান্য দেওয়া সাম্যবাদের বিরোধী। লেনিন আমলাতন্ত্রকে সন্দেহের চোখে দেখিতেন, কিন্তু স্টালিন উহার হাতে অনেক ক্ষমতা দিলেন। তাই অনেকে বলেন যে, স্টালিন যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেন তাহা আমলাতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র এবং উহা সোনার পাথর বাটির মতন অবাস্তব। তিনি বিশেষজ্ঞদের উপর খুব বেশি নির্ভর করিতেন।

স্টালিন-নীতির বৈশিষ্ট্য

রাশিয়াতে কমিউনিস্ট ছাড়া অন্য কোন দল নাই। এই দল রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। সেইজন্য এই দলের সম্পাদক হিসাবে স্টালিন একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ট্রট্স্কি তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন যে, স্টালিন কমিউনিস্ট দলের আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র বিনষ্ট করেন। কেহ যদি সরকারী নীতির কোনরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা করিত, তবে তাহাকে প্রচ্ছন্ন প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দিয়া নির্যাতন করা হইত। দলের সাধারণ সদস্যেরা মুখ বুজিয়া

দলের প্রাধান্য ও দলীয় বিরোধ

সরকারী নীতি সমর্থন করিতেন। বিদেশ হইতে ট্রট্স্কি ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন—"বলশেভিক দলের সকল ঐতিহ্য অবহেলা করিয়া গত কয়েক বৎসর ধরিয়া দলের আভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক নীতিকে লোপ করা হইয়াছে। দলের কর্মকর্তা নির্বাচনের প্রথা প্রকৃত প্রস্তাবে বাতিল হইয়া গিয়াছে। উপরওয়ালাদের ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিম্নতন দলকোষগুলির অধিকার হ্রাস পাইতেছে।" স্টালিনের জীবনকাল ধরিয়া এইরূপ চলিয়াছিল এবং যাঁহারা উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই নির্বাসিত অথবা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ১৯২৬ হইতে ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি নামে না হইলেও কার্যত রাশিয়ার ডিক্‌টেটার ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে তাঁহার মৃতদেহ ক্রেমলিনের কবর হইতে তুলিয়া ফেলিয়া এক অজ্ঞাত অখ্যাত স্থানে রাখা হইয়াছে।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কমিউনিস্ট দলের বিংশতি কংগ্রেসে ঘোষণা করা হয় যে, বিভিন্ন দেশ তাহাদের সুযোগ ও সুবিধা অনুসারে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। রাশিয়ার বর্তমান শাসকেরা মার্কস্ ও লেনিনের মতের বিরুদ্ধে বিশ্বাস করেন যে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র পাশাপাশি অবস্থান করিতে পারে। সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া বিপ্লব ঘটাইবার নীতি তাঁহারা পরিহার করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। এরূপ ঘোষণা কতটা আন্তরিক বা কতটা সুবিধাবাদী কৌশলমাত্র তাহা বলা কঠিন। স্টালিনের সময় যেমন ক্ষমতা ও আর্থিক উৎপাদনকে কেন্দ্রীভূত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, এখন তাহার পরিবর্তে বিকেন্দ্রীকরণের চেষ্টা চলিতেছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়ন রিপাবলিকগুলিকে অনেক বেশি স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে এবং তাহাদিগকে দ্রুতবেগে শিল্পায়িত করিবার প্রয়াস দেখা যাইতেছে। ক্রুশ্চেভ প্রচার করিয়াছিলেন যে, পার্লামেণ্টারী শাসনপদ্ধতি অনুসরণ করিয়াও ক্রমে ক্রমে সমাজতন্ত্র স্থাপন করা অসম্ভব নহে। এতকাল মার্কস্‌বাদীরা বিপ্লবকে অবশ্যম্ভাবী মনে করিতেন। ক্রুশ্চেভের মতবাদের ফলে ইংলণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতির সহিত রাশিয়ার সহযোগিতা করার চেষ্টা চলিতে পারে। স্টালিন রাশিয়াকে যেমন লৌহ যবনিকার অন্তরালে রাখিয়াছিলেন, ক্রুশ্চেভ সেরূপ রাখিবার পক্ষপাতী ছিলেন না।

ক্রুশ্চেভ নীতির সহিত পূর্বতন নীতির পার্থক্য

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যদি উন্নততর ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার বোঝাপড়া হয়, তাহা হইলে মানবজাতি ঠাণ্ডাযুদ্ধের এবং পরিণামে আণবিক যুদ্ধের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

রাশিয়ার সাম্যবাদের ত্রুটি ও কৃতকার্যতা

রাশিয়ায় এখনও সাম্যবাদ পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। লোকের প্রয়োজন অনুসারে বেতন না দিয়া যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুসারে উহা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক দেশে নিম্নতম ও ঊর্ধ্বতন বেতনের হারের মধ্যে যেমন আকাশপাতাল পার্থক্য দেখা যায় তেমনটি রাশিয়াতে নাই। তবুও সেখানে শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্প সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ম্যানেজারগণ সাধারণ শ্রমিকদের তুলনায় রাজার হালে দিন কাটাইতেছেন। রাশিয়াতে কেহ বেকার নাই, কেহ বিনা চিকিৎসায় মারা যায় না এবং শক্তি থাকা সত্ত্বেও কেহ উচ্চতম শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হয় না। এই সব ব্যবস্থার জন্য রাশিয়া প্রগতিশীল রাষ্ট্রগুলির আদর্শস্থানীয় হইয়াছে।

রাশিয়াতে শ্রমজীবীদের যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার প্রভাবে অন্যান্য দেশের শ্রমিকদের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে স্বামী বিবেকানন্দ দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়া বলিয়াছিলেন—"এমন সময় আসিবে যখন শূদ্রত্ব সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য বিকাশ করিতেছে, তাহা নহে, শূদ্রধর্মকর্ম সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে" (বর্তমান ভারত, পৃঃ ৩৬-৩৭)। এ পর্যন্ত পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশে এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে।

৭। চীনের সাম্যবাদ ঃ চীনের সাম্যবাদ তাহার প্রাচীন ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা একদিকে মার্কসের প্রতিধ্বনিমাত্র নহে, অন্যদিকে তেমনি রাশিয়ার সোভিয়েট প্রথার অন্ধ অনুকরণও নহে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে মহামতি সান ইয়াৎ সেন বুদ্ধদেবের সমসাময়িক কনফুসিয়াসের সমাজ চেতনার ধারণা এবং সামাজিক বন্ধনের নীতিগত ও আদর্শগত ঐক্যের কথা শ্রদ্ধার সহিত মানিয়া লইয়া জাতীয়তামূলক ত্রি-নীতি ঘোষণা করেন। তাঁহার মতে বিপ্লব তিনটি পর্যায়ে সংঘটিত হইবে। প্রথমে নূতন মতবাদের শিক্ষকেরা

চীনের সাম্যবাদের বৈশিষ্ট্য

ক্ষমতা অধিকার করিয়া লইবেন। তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ে দেশের লোক শিক্ষানবিশী করিবে এবং সর্বশেষে নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইবে। এখানে শ্রেণীসংগ্রামের উপর জোর দেওয়া হয় নাই। শ্রমিক ও কৃষকের একনায়কত্বের পরিবর্তে বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বের কথা তিনি বলিয়াছেন। সানের মতে শাসনযন্ত্র চালাইবেন বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে অগ্রণী বুদ্ধিজীবীরা। তিনি বলেন যে, চীনে সোভিয়েট প্রথা প্রবর্তন করা সম্ভব নহে, কেন না সাম্যবাদ বা সোভিয়েট শাসনের উপযোগী সামাজিক অবস্থা সেখানে অনুপস্থিত। চীনের প্রধান সমস্যা ছিল বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের পাশ হইতে মুক্তি লাভ করা। রাশিয়াতে এরূপ অবস্থা ছিল না। সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভ করা শুধু শ্রমিক বা কৃষকদের দ্বারা সম্ভব ছিল না। সেইজন্য সামন্তশ্রেণীর ও মধ্যবিত্তদের সহযোগিতা লাভ করা চীনের জাতীয় সংগ্রামের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল। অর্থনৈতিক দিক হইতে চীনে পুঁজিবাদকে একেবারে ধ্বংস করিবার কথা উঠে নাই। এই সব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া লেনিন চীনের সমাজতন্ত্রবাদকে বস্তুগত না বলিয়া ভাবগত বলিয়াছিলেন (Subjective Socialism)।

বিপ্লবের পরিবর্তে বিবর্তন

চীনে রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের আশ্রয় না লইয়া ধীরে ধীরে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিবর্তনের দ্বারা কৃষি, কুটীরশিল্প ও পুঁজির উপর নির্ভরশীল শিল্পে সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধন করার কথা বলা হইয়াছে।

নব্য গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

নব্যচীনের কর্ণধার মাও সে তুং নব্য গণতন্ত্রের সমর্থক। এই শাসনতন্ত্র বিভিন্ন শ্রেণীর বিপ্লবীদের সমবেত পরিচালনার অধীন এবং ইহাতে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ নীতি অনুসৃত হয়। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে চীনে জনসাধারণের সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে ইহার সংবিধান নির্মিত হয়। সম্মিলিত জাতিসংঘ এখনও এই সরকারকে মানিয়া লন নাই ; তবে ফর্মোজা ও অন্যান্য কয়েকটি ছোটখাট দ্বীপ ছাড়া মহাচীনের সর্বত্র ইহার ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মার্কসীয় মতবাদের সহিত চীনের বিপ্লবের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য দেখা যায়। চীনে বিত্তহীন প্রলেটেরিয়েট নেতৃত্ব করে নাই ; ইহা মধ্যবিত্ত

বা বুর্জোয়া শ্রেণীর দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল এবং এখন ক্রমশঃ প্রলেটেরিয়েটের অধিকার স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। মার্কস্‌ বলিয়াছেন যে, দেশ প্রথমে শিল্পায়িত হয় এবং পরে সমাজতন্ত্র স্থাপিত হয়। কিন্তু চীনে শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। মার্কস্‌ বলেন যে, উৎপাদন প্রণালীর উপর শাসনব্যবস্থা নির্ভর করে, কিন্তু চীনে দেখা যাইতেছে যে, নব্য গণতন্ত্র উৎপাদন প্রণালী কিরূপ হইবে তাহা নির্ধারিত করিয়া দিতেছে। মার্কস্‌বাদীরা সকলের উপর এক মত, এক পথ, এক সুনির্দিষ্ট উপায় চাপাইয়া দিতে চাহেন; কোনপ্রকার বিভিন্নতা তাঁহারা বরদাস্ত করেন না। মাও সে তুং বলেন "শত পুষ্পের বিকাশ সম্ভব হউক; শত মতের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা চলুক।" এরূপ ঘোষণা সত্ত্বেও চীনে এক রোলারে সকল পাথর চূর্ণ করিবার উপায় বিধান করা হইয়াছে।

মার্কস্‌বাদের সহিত
চৈনিক সাম্যবাদের
পার্থক্য

৮। সিণ্ডিক্যালিজিম্‌ (Syndicalism) বা রাষ্ট্রহীন সংঘাত্মক সাম্যবাদঃ ফরাসী ভাষায় সিণ্ডিকেট্‌ শব্দের অর্থ হইতেছে, শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংঘ। সিণ্ডিক্যালিজিমের উৎপত্তি হয় ফ্রান্সেই। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে, রাষ্ট্রকে বাদ দিয়া উৎপাদন ও বিতরণের কর্তৃত্ব বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত শ্রমিকদিগের সংঘের হাতে ন্যস্ত করা। নৈরাজ্যবাদের নিকট হইতে সিণ্ডিক্যালিজিম রাষ্ট্রকে শোষণ ও নিষ্পেষণের যন্ত্ররূপে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছে। আবার মার্কস্‌বাদের নিকট হইতে শ্রেণীসংগ্রাম, বিপ্লব ও শ্রমিকদের নায়কত্বের ধারণা ঋণ করিয়াছে।

উদ্দেশ্য

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রান্সে এই মতের উদ্ভব হইবার কারণ এই যে, সেখানে ট্রেড ইউনিয়নকে পুঁজিপতিরা দাবাইয়া রাখিত এবং সরকার হইতেও উহার উপর অনেক রকম বিধিনিষেধ জারী করা হইয়াছিল। তাহারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ শ্রমিক সংঘের পক্ষ হইতে দাবি করা হইল যে, তাহাদের হাতেই সকল ক্ষমতা ন্যস্ত করা হউক; তাহারা কেবল বেতন বৃদ্ধি, কাজের সময় হ্রাস, কাজের সুবিধা প্রভৃতি ছোটখাট জিনিসে সন্তুষ্ট হইবে না। ইতালি, স্পেন প্রভৃতি দেশেও এই মতের প্রভাব দেখা দিয়াছিল।

ফ্রান্সে উদ্ভূত হইবার
কারণ

সিণ্ডিক্যালিস্টরা কারখানার মালিকদের সঙ্গে কোন রকম আপোষ নিষ্পত্তি করার পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা সরাসরিভাবে ক্ষমতা অধিকার করিবার জন্য ধর্মঘট, কল ও জিনিসপত্রের ক্ষতিসাধন (sabotage), ক্রেতা-দিগকে কোন কোন কোম্পানীর জিনিস না কিনিতে অনুরোধ করা (Label) এবং বয়কট—এই চারিটি উপায় অবলম্বন করার কথা বলেন। একসঙ্গে সকল রকম কল কারখানায় ও যানবাহন প্রভৃতিতে ধর্মঘট করিয়া দেশের আর্থিক-জীবনকে পঙ্গু করিবার ভয় দেখানোকে ইঁহারা খুব প্রয়োজনীয় মনে করেন। সিণ্ডিক্যালিজিমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জর্জ সরেল (George Sorel ১৮৪৭-১৯২২) বলেন যে, সর্বব্যাপী ধর্মঘটের আদর্শ শ্রমিকদিগকে একত্রিত করিবে ও তাহাদের মনে কৃতকার্যতা সম্বন্ধে আস্থা আনিয়া দিবে। আন্দোলনের সাফল্যের জন্য ইহাই দরকার। কিন্তু কার্যকালে দেখা গিয়াছে যে, সাধারণ ধর্মঘট বিশেষ সফলতা লাভ করিতে পারে নাই।

উদ্দেশ্য সাধনের উপায়

সিণ্ডিক্যালিস্টরা বলেন যে, রাষ্ট্র ও পুঁজিপতিদের হাত হইতে ক্ষমতা ছিনাইয়া লইবার পর কৃষি ও শিল্পের প্রত্যেক বিভাগের সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের উপর জমি, কারখানা, উৎপাদনের অন্যান্য সরঞ্জাম প্রভৃতির মালিকানা স্বত্ব বর্তিবে। উৎপাদনকারীরা পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা করিয়া উৎপন্ন দ্রব্য ভোগ করিবে। শ্রমিকেরা মনের আনন্দে কাজ করিবেন, তাঁহাদের সৃজনী-প্রতিভা স্বাতন্ত্র্যের আবহাওয়ায় বিকশিত হইবে। রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজন থাকিবে না। তবে পরস্পরের মধ্যে বিলিব্যবস্থার কাজ চালাইবার ভার দেওয়া হইবে শ্রমিক সংঘের সমিতির উপর। এই সব সমিতি পেশা হিসাবে প্রতিনিধি নির্বাচনের দ্বারা গঠিত হইবে; যেমন ইঞ্জিনীয়ার, ম্যানেজার, কেরানী, বিক্রেতা, উৎপাদনকারী প্রভৃতি প্রতিনিধি পাঠাইয়া সমিতি গঠন করিবে। একটি এলাকার সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান একটি সংঘে সংযুক্ত হইবে, আবার বিভিন্ন এলাকার একই শিল্প (যথা যন্ত্র বা লৌহ) এক সংঘে মিলিত হইবে। স্থানীয় সংঘগুলি স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী হইবে, কেন্দ্রের পদানত হইবে না।

রাষ্ট্রের অপ্রয়োজনীয়তা

সিণ্ডিক্যালিস্টরা সৈন্য, পুলিশ প্রভৃতি রাখার প্রয়োজনকে অস্বীকার করেন। বিদেশীরা আক্রমণ করিলে কিরূপে তাঁহারা আত্মরক্ষা করিবেন

তাহা জানা যায় না। সমাজতন্ত্রবাদের দেশের জনসাধারণের সুখসুবিধার ব্যবস্থা করা হয়, সিণ্ডিক্যালিজিম্ কিন্তু শুধু উৎপাদক শ্রেণীরই স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। তাঁহাদের মতে প্রত্যেক ব্যক্তিই উৎপাদনের অংশ গ্রহণ করিবে এবং নিজ নিজ উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবহার ও বিনিময় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবে। এই ব্যবস্থাকে বিদ্রুপ করিয়া বলা হয় যে, তাহা হইলে রাস্তার ঝাড়ুদারেরা ধুলা ও আবর্জনা মাত্র লাভ করিবে। সিণ্ডিক্যালিস্টেরা ইহার উত্তরে বলেন যে, ক্ষমতা অধিকার করিবার পর কার্যের ধারা কি হইবে তাহা আগে ঠিক করিয়া বলা যায় না এবং বলা উচিতও নহে। সময় উপস্থিত হইলে উচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইবে এই ভরসা তাঁহারা দেন। তাঁহাদের কোন বক্তৃতায় বা লেখায় ভবিষ্যৎ সমাজব্যবস্থায় সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায় না।

ইহার দোষত্রুটি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধিবার পর হইতে সিণ্ডিক্যালিজিমের প্রভাব হ্রাস পাইতে থাকে। যুদ্ধের সময় শ্রমিকেরা শ্রেণীস্বার্থের পরিবর্তে জাতীয় স্বার্থের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্সের সিণ্ডিক্যালিস্টরা ক্রমিক সংস্কারের নীতি মানিয়া লইলেন এবং ক্রমশঃ বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে লাগিলেন। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে স্পেনে ও ইতালিতে কঠোর নির্যাতনের দ্বারা এই মতবাদকে নিষ্পেষিত করা হয়। আমেরিকায় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে Industrial Workers of the World (I W W) নাম দিয়া ইহার এক সংগঠন উদ্ভূত হইয়াছিল এবং উহা প্রায় এক লক্ষ সদস্য সংগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে যখন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিল সেই সময়ে ইহাতে ভাঙ্গন দেখা দিল। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের পর আমেরিকায় ইহার প্রভাব অকিঞ্চিৎকর হইয়াছিল।

বিলুপ্তির কারণ

৯। **গিল্ড স্যোশালিজম্ (Guild Socialism) বা পেশাগত সমিতিভিত্তিক সমাজতন্ত্রবাদঃ** ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে গিল্ড স্যোশালিজম্ ইংলণ্ডের কয়েকজন মনীষীর প্রচেষ্টায় উদ্ভূত হয়, কিন্তু ৫।৭ বৎসরের মধ্যেই ইহার প্রভাব প্রতিপত্তি হ্রাস পাইয়াছিল। সিণ্ডিক্যালিজিমের মতন গিল্ড স্যোশালিজমে শ্রমিকের কর্তৃত্ব দাবি করা হয়, কিন্তু বৈপ্লবিক কার্যের

পরিবর্তে আইনসঙ্গত আন্দোলনের দ্বারা ধীরে ধীরে পুঁজিপতিদের ও রাষ্ট্রের মালিকানার স্থলে শ্রমিকদের বিভিন্ন গিল্ডের প্রভুত্ব স্থাপন করা ইহার উদ্দেশ্য। সিণ্ডিক্যালিস্ট শুধু উৎপাদকেরই স্বার্থ সংরক্ষণ করেন, আর গিল্ড স্যোশালিজিমে ভোক্তা (Consumers) ও উৎপাদক উভয়শ্রেণীর স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়। সিণ্ডিক্যালিজিম্ রাষ্ট্রকে পরিহার করিতে চাহে, কিন্তু গিল্ড স্যোশালিস্টগণ রাষ্ট্রের ক্ষমতা হ্রাস করিতে চাহেন।

সিণ্ডিক্যালিজিমের সহিত পার্থক্য

কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদীরা যেমন আমলাতন্ত্রের হাতে বিপুল ক্ষমতা ন্যস্ত করিতে চাহেন, গিল্ড স্যোশালিস্টরা মোটেই সেরূপ করিতে রাজী নহেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ন্যাশনাল গিল্ডস্ লিগ্ প্রতিষ্ঠার সময় ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, মজুরি দিবার প্রথাকে রহিত করিয়া শিল্পসমূহে শ্রমিকদের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং পেশাগত প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগে জাতীয় গিল্ডসমূহের কর্তৃত্ব স্থাপন করা ইহার উদ্দেশ্য ("the abolition of the wage-system, and the establishment of self-government in industry through a system of national guilds working in conjunction with other democratic functional organisations in the community.")

সমাজতন্ত্রের সঙ্গে পার্থক্য

মূল উদ্দেশ্য

গিল্ড স্যোশালিজিমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এ জে পেন্টি (A. J. Penty) মধ্যযুগের গিল্ডের মধ্যে কারুকার্য, শ্রমিকের স্বাতন্ত্র্য ও ক্রেতাদের সম্বন্ধে ন্যায়পরায়ণতা লক্ষ্য করিয়া উহার পুনরাবির্ভাবের জন্য লেখনী ধারণ করেন। কিন্তু বর্তমান যুগের সুবৃহৎ কারখানার মধ্যে গিল্ডের আদর্শ কি করিয়া ফিরাইয়া আনা যায় সে সম্বন্ধে তিনি কোন হদিশ্ দিতে পারেন নাই। এস্ জি হবসন এবং এ আর ওরেজ (Orage) বলেন যে, ট্রেড ইউনিয়নকেই পরিবর্তিত ও পরিশোধিত করিয়া গিল্ডে পরিণত করা যাইতে পারে। ট্রেড ইউনিয়নে শুধু শ্রমিকদিগকে না রাখিয়া ম্যানেজার হইতে আরম্ভ করিয়া চাপরাসি পর্যন্ত সকলশ্রেণীর কর্মীকে সদস্য করিতে হইবে। এক একটি শিল্পে এক একটি গিল্ড গঠিত হইবে। উহার কাজ ট্রেড ইউনিয়নের মতন শুধু বেতন

গিল্ড ও ট্রেড ইউনিয়ন

বৃদ্ধি, কাজের সময় হ্রাস ইত্যাদি হইবে না, কিন্তু ফোরম্যান, পরিদর্শক প্রভৃতিকে নির্বাচন করিয়া ও প্রয়োজন হইলে তাঁহাদিগকে বরখাস্ত করিয়া আত্ম-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করাও হইবে। গিল্ড সমবেতভাবে কাজের ঠিকা (collective contract) লইবে এবং কি ভাবে কতটা উৎপাদন করা হইবে এবং কর্মীরা কতদিন কি শর্তে কাজ করিবেন তাহার নিরুপণ করিবেন।

গিল্ড স্তোশালিজিমে রাষ্ট্রের কোন স্থান থাকিবে কিনা তাহা লইয়া মতভেদ দেখা যায়। হব্‌সন বলেন যে, রাষ্ট্র কারখানা ও যন্ত্রপাতির মালিক হইবে বটে, কিন্তু বিভিন্ন গিল্ডকে নির্দিষ্ট কালের জন্য ঐগুলি ভাড়া দিবে। রাষ্ট্র নিজে শিল্পের উপর কোন কর্তৃত্ব করিবে না; কেবল গিল্ডগুলির মধ্যে যাহাতে শান্তি ও সামঞ্জস্য থাকে এবং দেশ যাহাতে বিদেশীদের দ্বারা আক্রান্ত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবে। গিল্ডসমূহ রাষ্ট্র হইতে অর্থ সাহায্য লাভ করিয়া নিজ নিজ সদস্যদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবে। অধ্যাপক জি. ডি. এইচ কোল প্রথমে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, রাষ্ট্রও অন্যান্য গিল্ডের ন্যায় একটি গিল্ডের স্থান গ্রহণ করিয়া ক্রেতাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করিবে, দাম বাঁধিয়া দিবে ও আয় বণ্টন করিবে কিন্তু রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি থাকিবে না। গিল্ডসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের ভার ও রাষ্ট্রের সহিত গিল্ডের বিবাদ-বিসংবাদ মিটাইবার জন্য ক্ষমতা অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত করা হইবে এবং তাহাকেই সার্বভৌম বলিয়া মানা হইবে।

রাষ্ট্রের স্থান কোথায় তাহা লইয়া মতভেদ

কিন্তু কিছুদিন পরে কোল্ তাঁহার Guild Socialism Restated নামক গ্রন্থে বলেন যে, রাষ্ট্রের মূল ক্ষমতাগুলি যখন কাড়িয়া লওয়া হইবে বা অব্যবহারের ফলে অকেজো হইয়া যাইবে তখন রাষ্ট্র একেবারেই বিলুপ্ত হইবে। কিন্তু রাষ্ট্রকে স্থান না দিলেও তিনি সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য কমিউনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন।

বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান চাই

গিল্ড স্তোশালিস্টেরা পেশাগত প্রতিনিধি নির্বাচনের উপর খুব জোর দিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে বর্তমানে যে ধরনের ভৌগোলিক অঞ্চল হিসাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয় তাহা একেবারেই ভুয়া। পেশা হিসাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করিলে

পেশাগত প্রতিনিধিত্ব

জনসাধারণের স্বার্থ অধিক সংরক্ষিত হইবে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, ইতালিতে ফাসিস্টরা যে ধরনের পেশাগত প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার বিধি প্রচলন করিয়াছিলেন তাহাতে শ্রমিকদিগকে বঞ্চিত করা হইয়াছিল, কেন না নিয়োগকর্তারা সংখ্যায় খুব কম হইলেও তাঁহারা শ্রমিকদের সঙ্গে সমসংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকারী হইয়াছিলেন।

ইংলণ্ডে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে গিল্ড সোশালিজিমের কার্যকারিতা কতখানি তাহা পরীক্ষা করিবার সুযোগ জুটিয়াছিল। লণ্ডন ও ম্যাঞ্চেস্টারের রাজমিস্ত্রীরা পৌরসভার নিকট হইতে শ্রমিকদের জন্য গৃহনির্মাণের ঠিকা লইয়াছিল। তাহারা ছোট ছোট অঞ্চলে এক একটি গিল্ড কমিটি নির্বাচিত করিয়াছিল; তাহার উপরে ছিল আঞ্চলিক কমিটি ও সকলের উপরে ছিল জাতীয় গৃহনির্মাতাদের গিল্ড। জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি টাকা ও জিনিসপত্র সরবরাহ করিত, আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান ঠিকার শর্ত ঠিক করিত এবং স্থানীয় গিল্ডকমিটি শ্রমিক সরবরাহ করিত এবং ফোরম্যান নির্বাচন করিত। কিন্তু এই উদ্যম সফল হয় নাই। বিভিন্ন রকমের শ্রমিকদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখা খুবই কঠিন হইয়াছিল। তাহার উপর বাজারে মন্দা আসায় গিল্ডের কাজকর্ম প্রায় বন্ধ হইয়া গেল। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ন্যাশনাল গিল্ডস্ লীগ্ ভাঙ্গিয়া গেল।

গৃহনির্মাণকারীদের গিল্ড

গিল্ড সোশালিজিমে বিভিন্ন শিল্পে আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে ক্রেতৃবর্গের স্বার্থ বজায় রাখা কঠিন হইবে। প্রত্যেক গিল্ড নিজেদের আয় বাড়াইতে চেষ্টা করিবে। তাহারা উৎপাদনের পদ্ধতির উন্নতি বিধানের জন্য সব সময় চেষ্টা করিবে কিনা সন্দেহ। পেশাগত প্রতিনিধি নির্বাচনের দ্বারা জনসাধারণের কল্যাণ কতটা সাধিত হইবে তাহাও সন্দেহের বিষয়। অনেক দোষত্রুটি সত্ত্বেও কিন্তু গিল্ড-সোশালিজিম শিল্পে শ্রমিক কর্তৃত্ব ও অধিকার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সমাজের মহৎ উপকার সাধন করিয়াছে। গিল্ডসোশালিস্টদের কয়েকটি দাবি লেবারপার্টি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং যে সব শিল্পে জাতীয়নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হইয়াছে সেই সব শিল্পে উহা প্রবর্তন করা হইয়াছে।

ইহার ত্রুটি

১০। ফেবিয়ান স্যোশালিজিম বা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদঃ ভারতবর্ষে জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হইবার এক বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ফেবিয়ান স্যোশালিজিমের উৎপত্তি হয়। সেই সময়ে সিড্‌নি ওয়েব, জর্জ বার্ণার্ড শ, গ্রাহাম ওয়ালাস, এইচ্‌ জি. ওয়েলস, মিসেস্ অ্যানি বেসান্ত প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বুদ্ধিজীবীরা এই মতবাদ স্থাপনে অগ্রণী হন। ইহা একটি মতবাদ মাত্র নহে; সামাজিক বিষয়ে গবেষণার একটি কেন্দ্র। গত ৭৫ বৎসরের অধিককাল ধরিয়া এই কেন্দ্র হইতে বহু মূল্যবান পুস্তকপুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইংলণ্ডের ও অন্যান্য দেশের শাসকমণ্ডলী, বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ও জনসাধারণের উপর প্রভূত পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইংলণ্ডের লেবার পার্টি ফেবিয়ান স্যোশালিস্টদের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়া অনেক সংস্কার প্রবর্তন করিয়াছেন।

উৎপত্তি ও প্রভাব

প্রাচীন রোম যখন কার্থেজের অধিনায়ক হ্যানিবালের সহিত সংগ্রামে রত ছিল, সেই সময় ফেবিয়াস্ (সম্পূর্ণ নাম কুইন্টাস্ ফেবিয়াস্ ম্যাক্সিমাস্) সরাসরি আক্রমণ না করিয়া সুদীর্ঘকাল ধরিয়া প্রস্তুত হইতেছিলেন, কিন্তু সময় ও সুযোগ আসামাত্র প্রচণ্ড-বেগে শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার এই অপেক্ষা করিবার নীতি অনুসরণ করিবার জন্য ইংলণ্ডের এই আন্দোলন ফেবিয়ান সমাজতন্ত্র নামে পরিচিত হয়। ইহাতে অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ফ্রাঙ্ক পোডমোর বলেন যে অনেকদিন ধরিয়া জমি তৈয়ারি করিয়া সময় আসিলে বিনা দ্বিধায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজে অগ্রসর হইতে হইবে। মার্কস্‌বাদের সহিত ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রের আকাশপাতাল পার্থক্য। ফেবিয়ান সমাজতন্ত্র রক্তাক্ত বিপ্লব চাহে না—লোককে বুঝাইয়া নিয়মতান্ত্রিক প্রণালীতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে। এই মতবাদীরা শ্রেণী সংগ্রামের পরিবর্তে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সহযোগিতা কামনা করেন। পার্লামেণ্টারী শাসনপ্রথাকে ইঁহারা বজায় রাখিতে চাহেন। কিন্তু ধন উৎপাদনের সমস্ত উপাদান ও যন্ত্রপাতি রাষ্ট্রের অধীনে না আসা পর্যন্ত গণতন্ত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রীরা সামাজিক বিকাশের ক্রমান্বয়ী ধারায় আস্থাশীল। মানুষের

ফেবিয়ান নামের অর্থ

মার্কস্‌বাদের সহিত পার্থক্য

সদিচ্ছা ও স্বভাবের উন্নতির সম্ভাবনার প্রতি ইঁহাদের অগাধ বিশ্বাস আছে ; তাই ইঁহারা যুক্তিতর্ক ও প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া লোকের মত পরিবর্তন করিতে চাহেন।

ফেবিয়ান মতবাদীরা বলেন যে, বিনাশ্রমে যাঁহারা উপস্বত্ব ভোগ করিতেছেন তাঁহাদের মুনাফা, সুদ ও বাড়তি খাজনা, উৎপাদনে রত শ্রমিক, ইঞ্জিনীয়ার, ম্যানেজার প্রভৃতিকে দেওয়া উচিত। জমির মূল্য বৃদ্ধি পায় সামাজিক কারণে; লোকসংখ্যা বাড়িলে ও সহরবাজারের পত্তন হইলে জমির দাম ও খাজনা বাড়ে। এই বাড়তি আয় জমির মালিক একা ভোগ করিবেন কেন? রাষ্ট্রের সাহায্যে কর স্থাপন করিয়া ঐ আয় সকলের ভোগে লাগাইবার ব্যবস্থা করা উচিত। উৎপাদনের যন্ত্রপাতি হইতে যাহা লাভ করা হয় তাহাও সাধারণের অধিকারে আনা প্রয়োজন। ঐ অর্থ বেকারদিগের সাহায্য, বৃদ্ধদের পেন্সন, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ এবং রোগার্ত ব্যক্তিদের ঔষধ ও চিকিৎসার জন্য ব্যয় করা কর্তব্য।

কার্যনীতি

তাঁহাদের এই মতবাদ অনুসরণ করিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইংলণ্ডের লেবারপার্টি শাসনভার হাতে পাইয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, কয়লার খনি, বিদ্যুৎ সরবরাহ, রেল, জলপথ ও স্থলপথের যানবাহন প্রভৃতির উপর সরকারী কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। তাঁহারা সামাজিক সুরক্ষার কাজে পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে ইংলণ্ডকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়াছেন।

উহা ইংলণ্ডে অনুসৃত হইয়াছে

১১। **সমাজতন্ত্রবাদের দোষগুণ বিচার :** সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্ন ধারা ও বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। কিন্তু প্রত্যেক প্রকারের সমাজতন্ত্রবাদের উদ্দেশ্য হইতেছে ধনতন্ত্রবাদের বৈষম্য ও অনিশ্চয়তাকে দূরীভূত করা। ধনতন্ত্রে অল্পসংখ্যক মালিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য অসংখ্য কৃষক ও শ্রমিককে বঞ্চিত রাখা হয়। জমি, খনিজ সম্পত্তি প্রভৃতি প্রকৃতির দান, তাহার উপর কাহারও ব্যক্তিগত মালিকানা থাকা উচিত নহে। সমাজতন্ত্র মুখ্যত উৎকৃষ্টতর ধনবণ্টনপ্রথা প্রবর্তন করিয়া আর্থিক বৈষম্য দূর করিতে বা হ্রাস করিতে চেষ্টা করে এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উৎকৃষ্টতর ধন উৎপাদনের পদ্ধতি প্রবর্তন করে। তাই একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা

হইতেছে এই যে, উৎপাদন ও ধনবণ্টনের উৎসগুলির উপর সার্বজনিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রমিক শ্রেণীর শোষণের বিলোপ সাধন করিবার রাজনৈতিক আন্দোলনের নাম সমাজতন্ত্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে পৃথিবীর সকল প্রগতিশীল রাষ্ট্রই অল্পাধিক পরিমাণে সমাজতান্ত্রিক নীতি অবলম্বন করিয়াছে।

সমাজতন্ত্রের সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য

সমাজতন্ত্রের সমালোচকেরা বলেন যে, উৎপাদনের উৎসগুলি রাষ্ট্রের আয়ত্তে আসিলে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। আমলারাও মানুষ, তাঁহাদের ভুলভ্রান্তি হইতে পারে, তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের প্রতি পক্ষপাত থাকিতে পারে এবং লোভের বশবর্তী হইয়া তাঁহারা অন্যায় আচরণও করিতে পারেন। অথচ কর্মচারীদের দক্ষতা ও সততার উপর রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসমূহের কৃতকার্যতা নির্ভর করে। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, আমলাদের হাতে কার্যভার ন্যস্ত করিয়া যদি কোন দেশের জনসাধারণ সুখে নিদ্রা যাইতে থাকে, তাহা হইলে দুর্নীতি ও অযোগ্যতা দেখা দেওয়া অসম্ভব নহে। ধনতন্ত্রে যৌথ কারবারগুলিও বেতনভুক কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অযোগ্যতার অভিযোগ কম শুনা যায়। তাঁহাদের চেয়ে সরকারী কর্মচারীদের বেশি অযোগ্য বা বেশি ঘুষখোর হইবার কারণ নাই।

আমলাশাহী স্থাপনের ভয়

শিল্প ও যানবাহনের রাষ্ট্রীয়করণ হইলে সরকারী চাকুরিয়ার সংখ্যা খুব বৃদ্ধি পায় এবং আশংকা হয় যে তাঁহারা জোটবন্দি হইয়া নিজেদের বেতন, ভাতা প্রভৃতি বাড়াইয়া লইবেন। তাঁহাতে উৎপাদনের খরচ বাড়িবে এবং ক্রেতা ও করদাতাদের উপর বেশি চাপ পড়িবে। কিন্তু যেখানে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিমাত্রেই ভোটের অধিকারী, সেখানে আমলারা ভোটারদের একটি নগণ্য অংশমাত্র। সুতরাং অধিকাংশ ভোটারকে বোকা বানাইয়া নিজেদের সুখসুবিধা করিয়া লওয়া তাঁহাদের পক্ষে খুব সহজ ব্যাপার নহে।

সরকারী চাকুরেদের জোটবন্দি

সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের ক্ষমতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। জীবনের বহু ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয়। ইহাতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হ্রাস পায়।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য খুব অল্পই আছে। আচারব্যবহার, চিন্তা ও ধারণায় সকলকে একমুখী করিয়া সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র যেন এক জগদ্দল পাথরের মতন সকলকে পিষিয়া ফেলে। সমাজতন্ত্রের এই ত্রুটি সাময়িক কি স্থায়ী তাহা বলা কঠিন। ধনতন্ত্র হইতে সমাজতন্ত্রের পরিবর্তনের সময়ে লোককে নিজেদের খেয়ালখুসি মতন কাজ করিবার অধিকার দেওয়া যায় না।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতার হ্রাস

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে একটিমাত্র দলের অস্তিত্ব থাকে। এবং সেই দলের নেতা ডিক্টেটার বা একাধিনায়কের ক্ষমতা পরিচালনা করেন। আজ পর্যন্ত পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সহিত গণতন্ত্রের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই।

দলের ও তাহার নায়কের অসীম ক্ষমতা

সমাজতন্ত্রে শ্রমিকদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। কিন্তু ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান রাশিয়া, চীন প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শ্রমিকদের চেয়ে উঁচু। কিন্তু ইহাতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয় কিনা সন্দেহ। কেন না ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্র বহুকাল হইতে শিল্পবিপ্লবের সুবিধা ভোগ করিতেছে অথচ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি পঞ্চাশ বৎসরের কম সময়ে শিল্পপথে পা বাড়াইয়াছে।

শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান

ধনতান্ত্রিকেরা বলেন যে, ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করিলে লোকে আর মন দিয়া কাজ করিবে না, কেন না লভ্যাংশ তাহাদের ভোগে আসিবে না। এ কথা ঠিক যে, লোকে নিজের কাজ যত মন দিয়া করে, পরের কাজ তত মন দিয়া করে না। কিন্তু শিল্পাদি যখন রাষ্ট্রের আয়ত্তে আসিবে তখন শ্রমিকেরা বরং বেশি মন দিয়া কাজ করিবেন, কেন না তখন তাঁহারা বুঝিবেন যে তাঁহারা মালিকদের লাভের জন্য খাটিয়া মরিতেছেন না; যাহা কিছু লাভ হইবে তাহা সকলের হিতার্থে ব্যয় করা হইবে। তা ছাড়া লোকে শুধু টাকা পয়সার লোভেই কাজ করে না। ভাল করিয়া কাজ করার মধ্যে যে আনন্দ আছে তাহার নেশায় অনেকেই কাজ করেন।

ব্যক্তিগত লাভের আশা

সমাজতন্ত্রের সমালোচকেরা বলেন যে, এতদিন ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও

সমাজতন্ত্রবাদীরা রাশিয়া ও চীনে আয়ের বৈষম্য ও সামাজিক মর্যাদার বৈষম্য দূর করিতে পারেন নাই। যাঁহাদের হাতে শিল্প পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত আছে সেই ম্যানেজার শ্রেণীর লোক প্রচুর বেতন পান। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তাঁহারাই হইতেছেন নূতন অভিজাত শ্রেণী। তাঁহাদের হাতে প্রচুর ক্ষমতা। এ কথা সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও স্বীকার করিতে হয় যে ধনতান্ত্রিক দেশে বড় বড় শিল্প-পতিদের সঙ্গে মজুরদের আয় ও ক্ষমতার যতটা তফাৎ, তার চেয়ে অনেক কম তফাৎ সমাজতান্ত্রিক দেশে দেখা যায়। সমাজতান্ত্রিক দেশে খাইতে না পাইয়া কেহই মরে না। ধনতান্ত্রিক দেশে নিরন্নের সংখ্যা সামান্য নহে।

সাম্য কতটা প্রকৃত

কয়েকটি ব্যাপারে সমাজতন্ত্র অসামান্য সাফল্য লাভ করিয়াছে। কোন ধনতান্ত্রিক দেশই বেকার সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করিতে পারে নাই। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বেকার নাই। খালি পেটে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করা ভাল কি ভরা পেটে সমাজতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ মানিয়া চলা ভাল তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার। ধনতন্ত্রে ধনী দরিদ্র সকলেই ভবিষ্যতে কি হইবে এই দুশ্চিন্তায় আকুল। চাকুরি না থাকিলে বা অসুখ হইলে কিংবা জরাগ্রস্ত হইলে কোথায় মাথা গুঁজিবার জায়গা পাওয়া যাইবে, কোথায় খাবার ও ঔষধ মিলিবে এই ভাবনায় ব্যাকুল হয় না এমন লোক নাই। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই অনিশ্চয়তা বহুল পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে। তবে এ কথাও বলা প্রয়োজন যে ইংলণ্ডের ন্যায় ধনতান্ত্রিক দেশেও বেকার রুগ্ন ও বৃদ্ধদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অবশ্য ঐরূপ ব্যবস্থা ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রের প্রচারের ফল বলিয়া মনে হয়।

নিরাপত্তার ব্যবস্থা

সমাজতন্ত্র অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা বিনষ্ট করিয়া কল্যাণকর সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করিয়াছে। একই জিনিসের বিভিন্ন উৎপাদকেরা বিজ্ঞাপন দিয়া বহু অর্থ নাশ করেন। পূর্বে তাঁহাদের মধ্যে জিনিস ভাল করিবার ও দাম কমাইবার প্রতিযোগিতা চলিত, কিন্তু এখন তাঁহারা আর গলাকাটা প্রতিযোগিতা করেন না; আপোসে মিলিয়া মিশিয়া নিজেদের সাধারণ সমস্যা সমাধান করিয়া লন। ধনতন্ত্রে দেখা যায় যে, উৎপাদক

অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা ও দালাল

ও ভোক্তার মধ্যে অসংখ্য ফড়ে বা দালাল থাকেন; তাঁহারা প্রত্যেকেই কিছু কিছু মুনাফা পান; ফলে ভোক্তাকে জিনিসের দাম অনেক বেশি দিতে হয়। সরকারী দোকান অথবা সমবায় সমিতির মারফতে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলে এই মধ্যবর্তী শ্রেণীর (middle men) মুনাফা হইতে বাঁচা যায়। তবে সরকারী শাসনব্যবস্থা যেখানে সুষ্ঠু, সুদক্ষ ও নীতিপরায়ণ নহে সেখানে সরকারী গুদামে মাল পচিয়া যায় বা চাউল গমের মধ্যে কাঁকর ভেজাল দেওয়া হয়। ধনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে সামান্য একটু সমাজতন্ত্র গুঁজিয়া দিতে গেলে এরূপ দুর্নীতির প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষা করা সহজ নহে। সমাজতন্ত্রে মানুষের পরিবেশ বদলাইয়া তাহার স্বভাব-চরিত্র উন্নততর করিবার প্রয়াস করা হয়। ছেলেমেয়েরা শিশুকাল হইতে শিক্ষা করে যে, সমাজের হিতে নিজের হিত, দেশের ভিতর হইতে যদি যক্ষা, ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগকে বিতাড়িত করা যায় তাহা হইলে প্রত্যেকেরই উপকার হয়; সকলে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করার মধ্যে অপার আনন্দ আছে। তাই তাহাদের ব্যক্তিত্ব সুন্দরভাবে বিকশিত হয়। ধনতন্ত্রে এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায় যে কাহারও প্রতিভা আছে, কিন্তু উচ্চশিক্ষা-লাভের আর্থিক ক্ষমতা নাই। সমাজতন্ত্রে এরূপ হয় না, সেখানে প্রতিভাবান ছাত্রেরা প্রচুর বৃত্তি পায়। পড়িতে পড়িতে অর্থ উপার্জনের সুযোগও সেখানে আছে।

মানবের স্বভাব পরিবর্তনের আশা

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভূতপূর্ব প্রসার হইয়াছে। সকলেই লেখাপড়া করিবার অবসর পায়। চাকুরি ও অন্যান্য কাজের ঘণ্টার সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস করা হইতেছে। তাই সাংস্কৃতিক চর্চার অবকাশ ঘটে। তবে সেখানে এখন পর্যন্ত কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে, দর্শনে ও ইতিহাসে বৈচিত্র্যের আস্বাদ মিলে না। সবই যেন এক ছাঁচে ঢালা। নিয়ন্ত্রণের আবহাওয়ায় বাঁধাধরা ছককাটা জীবনের বাহিরে কেহ যেন পদক্ষেপ করিতে সাহসী হন না মনে হয়।

শিক্ষা সংস্কৃতি

ধনতধন্ত্রের অন্তর্নিহিত বিরোধ হইতে যুদ্ধের উদ্ভব হয়। যুদ্ধ না হইলে পুঁজিপতিদের লাভের অংশ হ্রাস পায়। তাই তাঁহারা যুদ্ধ বাধাইবার

উস্কানি দেন। সমাজতন্ত্রের দৃষ্টি বিশ্বমানবের কল্যাণের দিকে নিবদ্ধ। সেইজন্য সমাজতন্ত্রীরা যুদ্ধবিরোধী। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্যই হউক বা গৌরববৃদ্ধির জন্যই হউক তাঁহারাও অস্ত্রশস্ত্রের জন্য কম খরচ করেন না। আণবিক বোমার আয়োজনে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চেয়ে কম অগ্রসর নহে।

যুদ্ধ

পরিশেষে বক্তব্য যে, কিছু পরিমাণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে কেবলমাত্র রাজনীতির ক্ষেত্রে গণতন্ত্র সফল হইতে পারে না। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ধনগত বৈষম্য যদি বেশি হয়, তাহা হইলে গণতন্ত্র কার্যত ধনীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শাসনে পরিণত হয়।

পুরাতন হইলেও কিছুটা সমাজতন্ত্র দরকার

১২। সমূহতন্ত্রবাদ (Collectivism) সমূহতন্ত্রবাদের আভিধানিক অর্থ হইতেছে যে, ভূমি ও উৎপাদনের সাধনসমূহ জনসমাজের আয়ত্তে থাকিবে এবং সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত হইবে ("The theory that land and the means of production should be owned by the community for the benefit of the people as a whole".)। এইরূপ ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিলে রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রবাদ, রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ, জনকল্যাণ রাষ্ট্রবাদ, সর্বাত্মক ফাসিস্ট ও নাৎসাবাদ এবং বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রবাদ সব কিছুকেই সমূহতন্ত্রের আওতায় ফেলা যায়। অধ্যাপক কে সি হুইয়ার বলেন যে, রাষ্ট্রের বিভিন্ন রকমের নিয়ন্ত্রণ বা হস্তক্ষেপকে সমূহতন্ত্র বলা হয়; বস্তুতঃ নানা প্রকারের সমাজতন্ত্র ও সমবায়কে এইরূপ একটি আবছাওয়া নাম দেওয়া হয়। ইংলণ্ডের ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রবাদকে বিশেষ করিয়া সমূহতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়া থাকে। ধনবিজ্ঞানের পণ্ডিত মহামতি পিগু শিল্প-বাণিজ্যাদির রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে সমূহতন্ত্র বলিয়াছেন। এই অর্থে ব্যবহৃত সমূহতন্ত্রকে বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করিয়া বৈপরীত্য দেখান হয়। সমূহবাদ ক্রমবিকাশে এবং বৈধানিক উপায়ে বিশ্বাস করে, বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্র রক্তাক্ত বিপ্লবের দ্বারা সমাজব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধন করিতে চায়। প্রথমোক্তবাদ গণতন্ত্রে আস্থাশীল এবং জনগণের আত্মসচেতনতা উদ্বুদ্ধ

উদ্দেশ্য ও শাখাবিভাগ

মার্কসবাদের সহিত পার্থক্য

করিয়া ধীরে ধীরে পরিবর্তন আনিতে চায়; কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত মতবাদ রাষ্ট্রকে শ্রেণীগত স্বার্থ সংরক্ষণের যন্ত্র মাত্র বলিয়া মনে করে এবং পুঁজিপতিদের হাত হইতে উহার শাসনক্ষমতা ছিনাইয়া লইয়া শ্রমিকদের হাতে ন্যস্ত করিতে চায়। সমূহতন্ত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি একেবারে বিলুপ্ত করা হয় না। তবে কোন শ্রেণীকেই বিশেষ সুবিধা ভোগ করিতে দেওয়া হইবে না।

ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে ধনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্রমশঃ অনুসৃত হইতেছে। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ধনগত বৈষম্য হ্রাস করিয়া দুঃখ, দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও রোগভোগ বিদূরিত করার নীতিকে জনকল্যাণ সমূহতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র বলা হয়। কিন্তু সমূহতন্ত্র নামটি সমাজতন্ত্রের মতন জনপ্রিয় হয় নাই।

১৩। ধনতন্ত্রবাদঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উৎপাদনকারীর, বিশেষ করিয়া কলকারখানার মালিকের শ্রমিক দল নিযুক্ত করিয়া মুনাফার লোভে যথেচ্ছভাবে উৎপাদন ও বিক্রয় করিবার স্বাধীনতাকে ধনতন্ত্রবাদ নাম দেওয়া হয়। ইহা এমন এক ধরনের সমাজব্যবস্থা, যাহাতে উৎপাদনের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় মূলধন মুষ্টিমেয় লোকদের হাতে থাকে এবং তাহারা ইচ্ছামত ভোগ্য পদার্থ বা শিল্প উৎপাদনের উপযোগী বস্তু উৎপাদন করিতে পারে ও অসংখ্য শ্রমিকদের নিযুক্ত করিতে ও বরখাস্ত করিতে পারে। এই ব্যবস্থা কেহ যে মতলব খাটাইয়া প্রবর্তন করিয়াছে তাহা নহে। ঐতিহাসিক কার্যপরম্পরার ফলে ইহার উদ্ভব। ইহার ধরনধারন বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে. ইহাকে কোন ব্যবস্থার অভাব বলিলে ইহার স্বরূপ বেশি প্রকট হয়। ইংলণ্ডের টোরি ও হুইগ দলের নাম যেমন পরস্পরের শত্রু-পক্ষের দেওয়া, তেমনি ধনতন্ত্রবাদ শব্দটাও ধনতন্ত্রের শত্রুপক্ষ, সমাজতন্ত্র-বাদীদের দেওয়া।

ধনতন্ত্রবাদের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে কারুশিল্পীরা সামান্য কিছু হাতিয়ারের সাহায্যে নিজ নিজ কুটিরে কিম্বা সংঘের আশ্রয়ে জিনিসপত্র তৈয়ারি করিতেন। তাঁহারা ছিলেন স্বাধীন। যখন খুসি কাজ করিতে পারিতেন, যখন খুসি বিশ্রাম করিতে পারিতেন। কিন্তু কালক্রমে মানুষের অভাববোধ যত বাড়িতে

ইহার ক্রমবিকাশ ও শ্রমিকের স্বাতন্ত্র্যবিলোপ

লাগিল তত বেশি জিনিসপত্র তৈয়ারি করিবার দরকার হইল। সেইজন্য ভোগ্য বস্তু তৈয়ারি করা অপেক্ষা উৎপাদনের উপযোগী যন্ত্রপাতি তৈয়ারি করা বেশি লাভজনক হইল। যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন করিলে অনেক কম লোক নিযুক্ত করা দরকার হয়, কিন্তু ঐ সব মেশিনের দর এত বেশি যে, সাধারণ কুটিরশিল্পীরা তাহা খরিদ করিতে পারেন না। এবং পারিলেও তাহা বসাইয়া কাজ করিবাব মতন জায়গা জোগাড় করিতে পারেন না। যাঁহাদের হাতে পুঁজি ছিল তাঁহারা মেশিন কিনিয়া কারখানা স্থাপন করিলেন। মেশিনে তৈয়ারি জিনিসের দাম হাতে তৈয়ারি জিনিসের চেয়ে অনেক কম। তাই কুটির শিল্পীরা প্রতিযোগিতায় হটিয়া যাইয়া পেটের দায়ে কারখানায় নিজেদের শ্রম বেচিতে আসিলেন। এইরূপে স্বাধীন শিল্পী দিন দিন মজুরে পরিণত হইলেন। কারখানার মালিকেরা যতটা সম্ভব কম মজুরি দিয়া শ্রমিক নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। মজুরির হার কম বলিয়া শ্রমিকেরা নিরুপায় হইয়া নিজেদের স্ত্রী ও নাবালক ছেলেমেয়েদিগকেও কারখানায় ও খনিতে মজুরি করিতে পাঠাইলেন। একজন মালিক অনেক শ্রমিককে নিযুক্ত করেন, সুতরাং সংঘহীন মজুরেরা মালিকের সঙ্গে দরদস্তুর করিতে পারিতেন না।

মার্কেন্টিলিস্ট নীতিতে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ছিল, ধনতন্ত্রে নিয়ন্ত্রণ-হীনতা

ইংলণ্ডে এই নূতন ধরনের উৎপাদন প্রণালীর উদ্ভব হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। সে সময় পর্যন্ত ইউরোপে মার্কেন্টিলিজিম্ (Mercantilism) নামে যে মতবাদ প্রচলিত ছিল তাহাতে রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক বিধি-নিষেধ প্রয়োগ করিত। কি ধরনের জিনিস তৈয়ারি করা হইবে, কতটা তৈয়ারি হইবে, কি দামে বিক্রয় করা হইবে, সুদ ও মজুরির হার কত হইবে এসব বিষয়ে রাষ্ট্র হইতে নির্দেশ দেওয়া হইত। সে সময়ে বণিকেরা রাষ্ট্রের সাহায্যে বাণিজ্যের ক্ষেত্র বাড়াইতেছিলেন, কাজেই তাঁহারা এই সব বিধি-নিষেধ মানিয়া লইতেন এবং কুটিরশিল্পীদিগকে মানিতে বাধ্য করিতেন। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের ফলে যে নূতন পুঁজিপতিদের হাতে কলকারখানার মালিকানা আসিল, তাঁহারা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণকে গ্রহণ করিতে চাহিলেন না। তাঁহারা রাষ্ট্রকে নিরপেক্ষ দর্শকের মতন খাড়া করিয়া রাখিয়া আর্থিক ব্যাপারে নিজেদের খুসিমত কাজ করিবার ক্ষমতা

চাহিলেন। জমিদার শ্রেণীর লোকের হাত হইতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ক্রমে ইঁহাদের হাতে আসিল। ইঁহারা রাষ্ট্রের Laissez faire বা 'হস্তক্ষেপ করিও না' নীতি সমর্থন করিলেন।

ধনতন্ত্রবাদ অক্টোপাসের মতন অষ্টভুজ দিয়া রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থাকে ঘিরিয়া ধরিল। এই অষ্টভুজ হইতেছে—(১) ব্যক্তিগত সম্পত্তি (২) উৎপাদনের স্বাতন্ত্র্য (৩) মুনাফার লোভে উৎপাদন (৪) পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতার মহিমা ঘোষণা, (৫) যে কোনপ্রকার চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার স্বাধীনতা (৬) মজুরি লইয়া শ্রম বিক্রয় করা (৭) ধন বিনিয়োগের জটিল ব্যবস্থা এবং (৮) শ্রমিকের পরিবর্তে ক্রমাগত মেশিনের ব্যবহারের দ্বারা ও অন্যান্য উপায়ে বৈজ্ঞানিক পরিচালনা-পদ্ধতির প্রবর্তন।

ধনতন্ত্রের অষ্টভুজ

নিজের ব্যবহারের উপযোগী কাপড়চোপড়, বাসনপত্র প্রভৃতি ভোগ্য বস্তুর উপর ব্যক্তিগত অধিকার সমাজতন্ত্রে ও ধনতন্ত্রে স্বীকৃত হয়। কিন্তু জমি, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা প্রভৃতি উৎপাদনের অবশ্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে রাখাই ধনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। মালিক ইচ্ছামত এগুলি যে কোনরূপে ব্যবহার করিতে পারেন অথবা অব্যবহার্য করিয়া রাখিয়া দিতে পারেন। ধনতন্ত্রবাদের প্রথম যুগে ব্যক্তিগত সম্পত্তির যথেচ্ছ ব্যবহারের উপর রাষ্ট্রের কোন নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকারকে স্বীকার করা হইত না।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি

উৎপাদনের স্বাতন্ত্র্যনীতি ব্যক্তিগত সম্পতি হইতেই উদ্ভূত। আমার জমিতে আমি ধান বুনিব বা লঙ্কামরিচ বুনিব তাহা আমিই ঠিক করিব ; মানুষের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য ধান হইতে চাউল করা হইবে কিংবা উহা দিয়া মদ চোলাই করা হইবে তাহাও শিল্পপতি নিজের লাভের হিসাব করিয়া স্থির করিবেন। দেশের বহু লোক না খাইতে পারিয়া মরিলেও মদ চোলাইয়ে অধিক লাভ হইলে মদই তৈয়ারি করা হইবে। বলা হয় যে, শিল্পপতিদের যেমন যে কোন দ্রব্য যতটা পরিমাণ খুসি উৎপন্ন করিবার স্বাধীনতা আছে, তেমন ক্রেতাদেরও কোন জিনিস কেনা অথবা না কেনার বা অল্প পরিমাণে কেনার স্বাধীনতা আছে। সেইজন্য উৎপাদকেরা ক্রেতাদের রুচি ও প্রয়োজন

উৎপাদনের স্বাতন্ত্র্য ও ক্রেতার অভিরুচি

মতন জিনিস সরবরাহ করিতে বাধ্য। আবার শ্রমিকদেরও যে কোন শিল্পে যোগ দিবার স্বাতন্ত্র্য আছে। প্রত্যেকেই নিজের নিজের স্বার্থ ভাল রকম বুঝে। সুতরাং সেই স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নিজের ইচ্ছামত কাজ করিবার অধিকার যদি প্রত্যেকের থাকে, তাহা হইলে ফলে সকলেরই সুখসুবিধা বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু ক্রেতাদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক আছে। বড়লোকেরা নিজেদের খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য বা বিলাসবাসনা পরিতৃপ্তির জন্য অনেক মূল্য দিতে রাজী থাকেন। সেইজন্য গরিবদের, অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করা অপেক্ষা বড় লোকের সখ মিটাইবার জিনিস তৈয়ারি করিলে বেশি লাভ হয়। তাই দেখা যায় যে, একদিকে পুষ্টির অভাবে বহু শিশু কংকালসার হইতেছে, অন্যদিকে সুন্দরীরা দুধ দিয়া স্নান করিতেছেন। শ্রমিকেরা পেটের দায়ে কাজ করিতে বাধ্য হন। কাজ পছন্দ হইল না বলিয়া বসিয়া থাকিলে তাঁহাদের চলে না।

বড়লোকের চাহিদা

উৎপাদনে আনন্দ পাওয়া যায় বলিয়া ধনতন্ত্রে উৎপাদন করা হয় না। মুনাফার লোভেই সকল প্রকার উৎপাদন করা হয়। কখন কখন এমন ঘটে যে, উৎপাদকেরা যে দামে বিক্রয় করিয়া লাভবান হইতে চাহেন সে দামে অতটা জিনিস কিনিবার ক্ষমতা বেশি লোকের নাই। এরূপ ক্ষেত্রে অল্প দামে জিনিস বেচার চেয়ে উঁহারা উৎপন্নদ্রব্য নষ্ট করিয়া ফেলেন। এইজন্য আমেরিকায় কয়েকবার উদ্বৃত্ত গম পুড়াইয়া ফেলা হইয়াছে এবং দুধ সমুদ্রে ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য এরূপ ঘটনা কদাচিৎ ঘটে। শিল্পপতিরা নিজেদের মুনাফার কথাই চিন্তা করেন। সমাজের কতটা ক্ষতিবৃদ্ধি হইল তাহা ভাবেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে সহরে কলকারখানা বাড়িলে ধোঁয়ার চোটে লোকের ফুস্‌ফুস্ খারাপ হইয়া যায়; তাহাদের চিকিৎসার বা ময়লা কাপড় কাচাইবার ব্যয়ভার মুনাফাশিকারী মালিকেরা গ্রহণ করেন না।

মুনাফার লোভ ও সামাজিক ক্ষতি

পূর্বে উৎপাদকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল; তাই তাঁহারা জিনিস ভাল করিতে ও দাম কম করিতে চেষ্টা করিতেন। উৎপাদনের খরচা কম হইলে ক্রেতারা কম দামে জিনিস পাইতেন। এখন উৎপাদকেরা ছোট

খাট শিল্পের মালিকদিগকে উৎসন্ন করিয়া নিজেদের মধ্যে সংঘ স্থাপন করিয়া একচেটিয়া অধিকারের সুবিধা ভোগ করেন। ফলে ক্রেতাদিগকে বাধ্য হইয়া এমন দাম দিতে হয়, যাহাতে উৎপাদকদের মুনাফা যথাসম্ভব অধিক হয়। ধনতন্ত্রের সমর্থকেরা বলিতেন যে, শ্রমিকেরা কাজ পাইবার জন্য পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিবে বলিয়া মজুরির হার কম হইবে এবং উৎপাদকদের মধ্যে শ্রমিক নিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতা হইবে বলিয়া বেতন বেশি কম হইতে পারিবে না। সুতরাং অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে উৎপাদক, ক্রেতা ও শ্রমিক সকলেরই সুবিধা হইবে। কিন্তু, কার্যকালে দেখা গেল যে, শ্রমিকেরা এককভাবে মালিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারেন না। তাঁহারা সংঘবদ্ধ হইয়া তাঁহাদের স্বার্থ রক্ষা করিতেছেন; সরকারও তাঁহাদের সমর্থন লাভের আশায় নানারূপ নিয়ম কানুন তৈয়ারি করিয়া মালিকদের অবাধ স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। কিন্তু ক্রেতাদের মধ্যে সংঘ গড়িয়া তোলা খুব কঠিন বলিয়া তাঁহারা সংঘবদ্ধ মিল-মালিকদের দয়ার উপর নির্ভর করিতেছেন।

প্রতিযোগিতা

অসহায় ক্রেতা

আধুনিক যুগে উৎপাদকদের মধ্যে শ্রমবিভাগ হইয়াছে। যাঁহাদের পুঁজি আছে তাঁহারা উহা শিল্পে নিয়োগ করেন; লাভ হইলে তাঁহারা অধিক লভ্যাংশ পান, লোকসান হইলে নিয়োজিত ধন নষ্ট হইতে পারে। কিন্তু পুঁজিপতিরা নিজেরা অল্পক্ষেত্রেই উৎপাদনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। একদল লোক শুধু কারবার স্থাপনে বিশেষজ্ঞ হইয়াছেন: তাঁহারা অন্য শ্রেণীর বিশেষজ্ঞের হাতে উহার পরিচালনার ভার দেন। তাঁহারা আবার বেতনভুক ম্যানেজার প্রভৃতির দ্বারা উৎপাদন করান। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে এখন অনেক ক্ষমতা।

ধন বিনিয়োগের জটিলতা

ধনতান্ত্রিক উৎপাদনে বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রবর্তিত হইবার ফলে উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস পায় বটে, কিন্তু শ্রমিকদের এমন ভাবে কাজ করিতে হয় যে, চল্লিশ বৎসর বয়স হইতে না হইতেই তাঁহাদের স্নায়ু দুর্বল হইয়া পড়ে এবং উচ্চতম হারে বেতনলাভের যোগ্যতা আর তাঁহাদের থাকে না।

বৈজ্ঞানিক প্রণালীর ফলে শ্রমিকের অবস্থা

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলে সমাজের অনেক ক্ষতি হয়। দেশের জলবায়ুর সমতা রক্ষার জন্য অরণ্যসম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজন, কিন্তু অরণ্য যদি ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে থাকে তাহা হইলে মালিক লোভের আশায় বড় বড় গাছগুলি কাটিয়া বিক্রয় করে। খনির মালিকেরা কয়লা প্রভৃতি খনিজ সম্পদের লোভে এমন করিয়া খনন করে যে খাদ ধ্বসিয়া বহু লোকের ধনপ্রাণ বিনষ্ট হয়। ধনতন্ত্রে একই জিনিসের বিভিন্ন উৎপাদনকারীরা প্রতিযোগিতামূলক বিজ্ঞাপন দিয়া অনেক অর্থ নষ্ট করে। শ্রমিকদের মধ্যে এখন আত্ম-চেতনা দেখা দিয়াছে। তাঁহারা বুঝেন যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাঁহারা পরের লাভের জন্য খাটিয়া মরিতেছেন। সেইজন্য তাঁহারা যতটা ভাল ভাবে কাজ করিতে পারিতেন ততটা সুষ্ঠুরূপে কাজ করেন না। তাঁহাদের আর্থিক অবস্থার ক্রমশ: উন্নতি হইলেও তাঁহাদের মনের ক্ষোভ ও অসন্তোষ বিদূরিত হইতেছে না। মালিক শ্রমিকের সংঘর্ষের ফলে জাতীয় আয় অনেক হ্রাস পাইতেছে। ধনতন্ত্রের সবচেয়ে বিষময় ফল হইতেছে এই যে, লোকের সামনে একটা মিথ্যা আদর্শ খাড়া করা হইতেছে। ধনীদের দেখাদেখি সাধারণ লোকেও ভাবে যে খাটিয়া খাওয়াটা অপমানজনক; পায়ের উপর পা দিয়া বিনা পরিশ্রমে বসিয়া খাওয়াই আদর্শ বলিয়া গৃহীত হয়। কিন্তু অলস-জীবনের মতন একঘেয়ে বিরক্তিকর বস্তু আর কিছু নাই। ধনতন্ত্র বেকার সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই।

দোষত্রুটি

ভূয়া আদর্শ

এই সব দোষ আছে বলিয়া একদিকে ধনতন্ত্রের ত্রুটি সংশোধন করিবার চেষ্টা চলিতেছে অন্যদিকে ইহার পরিবর্তে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ আয়োজন হইতেছে। ধনতন্ত্রকে সংশোধন করিয়া কোথাও বা রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র স্থাপন, কোথাও বা জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রবর্তন এবং কোথাও ফ্যাসিস্ট ও নাৎসী নীতিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে বা হইয়াছিল।

বিকল্প ব্যবস্থা

১৪। রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রবাদ (State Capitalism) অধিকাংশ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় রাখিয়া শিল্প-বাণিজ্যের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করাকে কেহ কেহ রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রবাদ আখ্যা দিয়া থাকেন। এই নিয়ন্ত্রণ কোথাও বা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের New

Deal এর মতন অত্যন্ত মৃদু, কোথাও বা ফ্যাসিস্ট নীতির মতন অত্যন্ত প্রখর। কিন্তু মূলত সব ক্ষেত্রেই মুনাফার জন্য উৎপাদন, চুক্তির স্বাধীনতা এবং মালিকের শ্রমিক নিয়োগের ক্ষমতা স্বীকার করা হয়। রাষ্ট্র ব্যাঙ্ক, যানবাহন, সংবাদ আদান-প্রদান প্রভৃতি নিজের কর্তৃত্বে রাখে। অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারি করা এবং মাদকদ্রব্য প্রস্তুত করার একচেটিয়া অধিকার রাষ্ট্রের থাকে। যে সব শিল্প ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, যেমন রেলের ইঞ্জিন তৈয়ারি বা সার উৎপাদন বা জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন, সেগুলি রাষ্ট্রের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রের অধীনে যত শিল্প আসে আমলাতন্ত্রের কাজের গুরুত্ব ততবেশি বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্র মালিক, শ্রমিক ও ক্রেতাদের বিভিন্ন স্বার্থের সামঞ্জস্য বিধান করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু সরকারের পক্ষে মালিকদের সুদূরপ্রসারী প্রভাব অতিক্রম করা কঠিন হয়।

রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রবাদের বৈশিষ্ট্য

এইরূপ ব্যবস্থাকে কেহ কেহ বা State Capitalism বলেন, কেহ বা State Socialism বলেন। কিন্তু যেখানে মৌলিক শিল্পগুলি (যে শিল্পের উপর অন্যান্য শিল্প নির্ভরশীল, যেমন লৌহ ও ইস্পাত শিল্প) রাষ্ট্রের আয়ত্তে আসিয়াছে এবং রাষ্ট্র জনসাধারণের সম্পত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সেইখানে ইহাকে রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ বলা যাইতে পারে। ফেবিয়ান্ সমাজতন্ত্রবাদ ইহার এক প্রধান শাখা। মার্কসীয় সমাজতন্ত্র যেখানে শ্রমিকের অধিনায়কত্বের উপর সংস্থাপিত, রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদে সেখানে মধ্যবিত্তদের প্রাধান্য দেখা যায়।

রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ

১৫। **ফ্যাসিবাদ** (Fascism): রাষ্ট্রকে সর্বশক্তিমান্ ও অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী করিবার উদ্দেশ্যে ও একদিকে গণতন্ত্র, অন্যদিকে সমাজতন্ত্রকে দমন করিবার জন্য বেনিতো মুসোলিনি (১৮৮৩—১৯৪৫). ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ফ্যাসিস্টদল স্থাপন করেন। দুই বৎসর পরে তিনি রোম নগরীতে অভিযান করিয়া আধুনিক যুগের প্রথম একনায়কত্ব (Dictatorship) কায়েম করেন। প্রাচীন রোমের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রতীকরূপে কুঠারের সহিত এক বোঝা লাঠি বাঁধা হইত; ইহাতে ঐক্য হইতে শক্তি জন্মে বুঝাইত। ঐ লাঠির বোঝাকে Fascio বলিত—ঐ শব্দটি হইতে ফ্যাসিজিম্ উদ্ভূত হইয়াছে।

উৎপত্তি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালি দুর্বল, দরিদ্র, দলাদলিতে উন্মত্ত ও বেকার সমস্যায় প্রপীড়িত হইয়াছিল। মুসোলিনির ফ্যাসিস্টদল ইতালিয়ানদিগকে একতাবদ্ধ হইয়া রাষ্ট্রের অনুশাসন সর্বথা পালন করিয়া প্রাচীন রোমের গৌরবময় ঐতিহ্য ফিরাইয়া আনিতে আহ্বান করিল। বিভ্রান্ত ইতালিয়ান যুবকেরা এই ডাকে সাড়া দিলেন। মুসোলিনি তাহাদিগকে প্রথমেই শিখাইলেন যে রাষ্ট্র জনসাধারণের ঐক্য ও কল্যাণের প্রতীক্। সুতরাং কোন কারণেই রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা কর্তব্য নহে। রাষ্ট্র একাধারে বাস্তব সত্তা এবং অধ্যাত্মশক্তি, অতীতের গৌরবের এবং ভবিষ্যতের আশাভরসার একমাত্র ন্যাসী; সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক সংঘ রাষ্ট্রের আদেশ মাথা পাতিয়া লইতে বাধ্য। নীতি, ধর্ম, সত্য সবকিছু রাষ্ট্রের অধীন। মুসোলিনি ঘোষণা করিলেন যে রাষ্ট্রের ভিতরেই সমস্ত, রাষ্ট্রের বাহিরে কিছুই থাকিতে পারে না এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন কিছু বরদাস্ত করা হইবে না। মানুষের জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটি নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার রাষ্ট্রের আছে।

ব্যক্তির অধীনতা

রাষ্ট্র পরিচালনা করিবে কিন্তু বিশেষ এক দল ও ঐ দলের অধিনায়ক। ফ্যাসিস্টবাদে গণতন্ত্রের অধিকার স্বীকার করা হয় না। সাধারণ লোক জানে না তাহারা কি চায়। তাহাদিগকে ধাপ্পা দিয়া কতকগুলি ধূর্তলোক পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি সাজিয়া স্বার্থসাধন করে। সুতরাং সাম্য, স্বাতন্ত্র্য ও সৌভ্রাত্রের ফাঁকা বুলির পরিবর্তে দায়িত্ব, নিয়মানুবর্তিতা ও ধাপে ধাপে উঁচু নেতৃসমূহকে স্বীকার করিতে হইবে। ফ্যাসিস্ট দলে ছোট, মাঝারি, বড়ো এবং সবচেয়ে বড়ো নেতা (মুসোলিনি স্বয়ং) যাহা আদেশ করিবেন তাহাই রাষ্ট্রের আদেশ বলিয়া নির্বিচারে মানিয়া লইতে হইবে। স্বাধীনতাকে অধিকার বলিয়া না ধরিয়া কর্তব্য বলিয়া মানিয়া লওয়া উচিত। রাষ্ট্রের আজ্ঞা পরিপূর্ণরূপে পালন করিলে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশ সম্ভব। সেইজন্য মত প্রকাশের স্বাতন্ত্র্য, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি লোককে শুধু বিভ্রান্ত করে। এক কথায় ফ্যাসিস্ট মতবাদে ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের নিকট বলি দেওয়া হইয়াছে। আমরা যেমন মনকে বুঝাই যে, দুর্গাপূজার সময় পাঁঠাকে বলি দিলে পাঁঠার পরম সদ্গতি হয়, মুসোলিনি তেমনি ইতালিয়ানদিগকে বুঝাইয়াছিলেন যে,

গণতন্ত্রের বিরোধিতা

রাষ্ট্রের গৌরব বৃদ্ধির জন্য নিজেকে বলি দেওয়াই ব্যক্তির জীবনের চরম সার্থকতা।

যুদ্ধের প্রতি আকর্ষণ

আভ্যন্তরীণ শাসনসংক্রান্ত সমস্যার প্রতি যাহাতে লোকের দৃষ্টি না পড়ে সেইজন্য তাহাদের দৃষ্টি রাজ্য জয় করার দিকে আকৃষ্ট করা একাধিনায়কদের চিরন্তন রীতি। এইজন্যই ফ্যাসিস্টরা দেশের লোককে যুদ্ধোন্মত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে শান্তিকামীরা ক্লীব। যুদ্ধের মধ্যেই মানুষের শৌর্য, বীর্য, মহত্ত্ব বিকশিত হয়। মুসোলিনি সদম্ভে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, নারীর যেমন সার্থকতা মাতৃত্ব লাভে, পুরুষের তেমনি চরিতার্থতা লাভ হয় যুদ্ধে।

ধনতন্ত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ

ফ্যাসিবাদ ধনতন্ত্রকে নূতন জীবন দান করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্টরা বলিলেন যে, ব্যক্তিগত মালিকানা ও পরিচালনায় উৎপাদন ভালো হয়, কিন্তু যেখানে রাষ্ট্রের স্বার্থ জড়িত থাকে, সেখানে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করিবে বা কর্তৃত্ব করিবে। যেমন যুদ্ধের উপকরণসমূহ রাষ্ট্রের কারখানায় তৈয়ারি হইবে। ব্যাঙ্ক ও বৈদেশিক বাণিজ্য রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত হইবে।

কৃষি ও শিল্পে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকিবে বটে, কিন্তু রাষ্ট্র প্রয়োজন অনুসারে উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে। রাষ্ট্র বলিয়া দিবে কোন্ জিনিস কতটা উৎপন্ন করা দরকার, বেতনের হার কত হইবে, দাম কত ঠিক করা হইবে এবং কোন্ শিল্প কিরূপ অর্থসাহায্য পাইবে। মুনাফার জন্য উৎপাদন করা হইবে, তবে মুনাফার হার কি হইবে তাহা রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত হইবে। শ্রমিকদের ধর্মঘট করিবার কিংবা মালিকদের কারখানায় তালা ঝুলাইয়া দিবার (Lockout) স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু উৎপাদনের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে শ্রমিকের পরামর্শ লইবার নীতি স্বীকৃত হইয়াছিল। বড় বড় শিল্পগুলি ২২টি কর্পোরেশনে বিভক্ত করিয়া একজন মন্ত্রীর দপ্তরের অধীনে রাখা হইয়াছিল। ফ্যাসিস্ট দল কর্পোরেশনের ব্যাপারে যথেষ্ট হস্তক্ষেপ করিত।

ফ্যাসিবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল পেশা বা বৃত্তিগত প্রতিনিধি

নির্বাচন। সাধারণ গণতন্ত্রের মতন বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রতিনিধি নির্বাচন না করিয়া বিভিন্ন বৃত্তিধারীরা নিজ নিজ প্রতিনিধি বিধানসভায় পাঠাইত। কিন্তু শ্রমিকেরা সংখ্যায় বেশি হইলেও মালিকদের সহিত সমান সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকারী ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, কিঞ্চিদধিক ৭১ হাজার শিল্পপতি ৮০ জন প্রতিনিধি পাঠাইতেন, আবার তাঁহাদের এক লক্ষ ত্রিশ হাজার কর্মচারীরও ৮০ জন প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা ছিল।

বৃত্তিমূলক প্রতিনিধিত্ব

ফ্যাসিবাদ যুক্তিতর্কের প্রাধান্য দিত না; আবেগ ও সংস্কারকে বড় বলিয়া মনে করিত। কিছু সংখ্যক লোককে কিছুকালের জন্য ধোঁকা দেওয়া যায়, কিন্তু সকল লোককে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া ছেঁদো ও মিস্টিক্ ধরনের কথায় ভুলাইয়া রাখা যায় না। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইতালির শোচনীয় পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইতালিয়ানগণ মুসোলিনিকে হত্যা করিল এবং ফ্যাসিবাদ বিসর্জন দিল।

মিষ্টিক ধরন

১৬। **নাৎসীবাদ** (Nazism): ফ্যাসিবাদের সহিত নাৎসীবাদের মতগত সাদৃশ্য প্রচুর দেখা যায়। হিট্‌লারের নেতৃত্বে নাৎসীবাদ বা National Socialist German Workers' party ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে জার্মানিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পূর্ণ বিলোপ হইয়াছিল। নেতার ইচ্ছায় সব কিছু পরিচালিত হইত। তাঁহার উপর কোন প্রকার বাধানিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা হইত না। নাৎসীদল রাষ্ট্রের অঙ্গরূপে পরিগণিত হইত।

উৎপত্তি

হেগেলীয় মতবাদের প্রভাবে নাৎসীরা রাষ্ট্রকে সর্বগ্রাসী ও সর্বশক্তিমান্ করিয়া তুলিয়াছিল। ব্যক্তি রাষ্ট্রের জন্য, রাষ্ট্র ব্যক্তির জন্য নহে, ইহাই ছিল তাহাদের মূল নীতি। সমগ্র জার্মান জাতি হিট্‌লারের আদেশে রাষ্ট্রের জন্য ধনপ্রাণ এমন কি বিচারবুদ্ধি বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। এইভাবে তাঁহারা রাষ্ট্রকে অসীম ক্ষমতাশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন, কিন্তু সে রাষ্ট্র গণতন্ত্রকে কোন স্থান দেয় নাই।

হেগেলীয় প্রভাব

নাৎসীবাদ জাতিবিদ্বেষকে এক নূতন ধর্মের মর্যাদা দিয়াছিল। ইহুদি

জাতিকে উৎসন্ন করিবার জন্য নাৎসীদল অমানুষিক বর্বরতা করিয়াছিল। বিশুদ্ধ আর্যজাতিভুক্ত নর্ডিক জাতি জগতে প্রভুত্ব করিবার জন্য জন্মিয়াছে; সুতরাং অন্যান্য সকল জাতিকে তাহার পদানত হইয়া থাকিতে হইবে, এই ছিল তাঁহাদের ধারণা। সেইজন্য ইঁহারা ব্যাপকভাবে যুদ্ধ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। যুদ্ধের জয়গান করিতে তাঁহারা হইতেন পঞ্চমুখ।

জাতিবিদ্বেষ

নাৎসীদল নিজদিগকে স্তোশালিস্ট বলিলেও তাঁহাদের আর্থিক নীতি ধনতন্ত্রেরই পরিপোষক ছিল। ফ্যাসিস্টদের ন্যায় তাঁহারাও ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করিয়া উহার উপর ব্যাপক সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিতেন। জার্মানিতে শ্রমিকদের ধর্মঘট করিবার অধিকার ছিল না।

ধনতন্ত্রের প্রভাব

নাৎসীবাদ ও ফ্যাসীবাদ মানুষের ঈর্ষা, দ্বেষ, লোভ ও মোহকে প্ররোচিত করিয়াছিল। ন্যায়বুদ্ধি ও মানবিকতাকে কল্পিত জাতীয় স্বার্থের পদতলে বলি দেওয়া হইয়াছিল। মিথ্যা প্রচারের দ্বারা যে অধিনায়ককে অভ্রান্ত সত্যদর্শী ঋষির স্থান দেওয়া হইয়াছিল সেই হিট্‌লার ও মুসোলিনিও যে কামক্রোধের বশে অন্যায় ও অবিচার করিতে পারেন তাহা তাঁহাদের জীবনের শেষ অঙ্কে দেখা গিয়াছিল। যে মতবাদ জাতিবিদ্বেষের উপর প্রতিষ্ঠিত, যাহা বিশ্বশান্তির পরিপন্থী এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের বিরোধী তাহা কখনও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

দোষ-ত্রুটি

১৭। **গান্ধীবাদঃ** মহাত্মা গান্ধী ছিলেন কাজের লোক; বসিয়া বসিয়া কোন দার্শনিক মতবাদ বিস্তার করিবার মতন সময় ও সুযোগ তাঁহার ছিল না। কিন্তু তাঁহার সুদীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি অসংখ্য বক্তৃতা করিয়াছেন, পুস্তকপুস্তিকা, প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র লিখিয়াছেন। সেইগুলির মধ্যে তাঁহার আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা নিবদ্ধ আছে। উহা মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিলে তাঁহার মৌলিক প্রতিভার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইতে হয়। তিনি তাঁহার আত্মজীবনীতে স্বীকার করিয়াছেন যে, টলস্টয়ের "The kingdom of God is within you." "The Gospel in Brief",

গান্ধীজীর উপর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাব

ও "what to do" নামক রচনাত্রয়, রাস্কিনের "Unto This Last" এবং আমেরিকার শান্তিবাদী থোরো (Thoreau) লিখিত "On the duty of Civil Disobedience" নামক পুস্তিকা তাঁহার মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তিনি একে বৈষ্ণব পরিবারের ছেলে ; তারপর আবার অহিংসামূলক বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। সেইজন্য তাঁহার সকল চিন্তা ও কর্মের মূল প্রেরণা ছিল অহিংসা।

সৈন্য ও পুলিশ ছাড়া রাষ্ট্র চলে না। রাষ্ট্রীয় শক্তি লোককে দাবাইয়া রাখে বলিয়া উহা অহিংস নহে। অহিংসার পূজারী বলিয়া গান্ধীজী রাষ্ট্রকে বাদ দিয়া নৈরাজ্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি Young India পত্রিকায় (২।৭।৩১) লিখিয়াছিলেন—"রাজনৈতিক ক্ষমতার অর্থ হইল জাতীয় প্রতিনিধিদের সাহায্যে জাতীয় জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করিবার সামর্থ্য। যদি জাতীয় জীবন স্বয়ংনিয়ন্ত্রিত হয় তাহা হইলে প্রতিনিধি নির্বাচনের কোন প্রয়োজন হয় না। এই অবস্থাকে উন্নতধরনের নৈরাজ্য বলে। ইহাতে প্রত্যেকেই নিজেকে নিজে এমন ভাবে শাসন করে যে সে তাহার প্রতিবেশীর বাধাস্বরূপ হয় না। এরূপ আদর্শ অবস্থায় কোন রাষ্ট্রের প্রয়োজন হয় না, সেইজন্য কোন রাজনৈতিক ক্ষমতাও থাকে না। কিন্তু জীবনে এমন আদর্শ সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। তাই থোরোর (Thoreau) সুপ্রসিদ্ধ উক্তি আছে যে, যে সরকার সবচেয়ে কম শাসন করে, সেই সরকারই সবচেয়ে ভালো।" অন্যান্য নৈরাজ্যবাদীরা হিংসায় আস্থাশীল। তাঁহারা রক্তাক্ত বিপ্লবের সাহায্যে রাষ্ট্রকে বিলোপ করিতে চাহেন। মহাত্মা গান্ধী কখনই কোনক্ষেত্রে হিংসার সমর্থন করেন নাই। তাই তিনি নৈরাজ্যবাদকে রূপায়িত করিবার কোন উপায়ের সন্ধান দিতে পারেন নাই। প্লেটো যেমন "রিপাবলিকে" আদর্শ রাষ্ট্রের বার্তা প্রচার করিয়া শেষে তাহা স্থাপন করা সম্ভবপর নহে বুঝিয়া "Laws" নামক গ্রন্থে একটা কাজ চালানো ব্যবস্থার কথা বলিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধীও সেইরূপ নৈরাজ্য স্থাপন সম্বন্ধে হতাশ হইয়া সরকারের কার্যক্ষেত্র যথাসম্ভব সংকুচিত করিবার কথা বলিয়াছেন।

অহিংসা ও নৈরাজ্যবাদ

মহাত্মা গান্ধী শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ চাহিতেন। তিনি বলিতেন সরকারের হাতে যতটা কম ক্ষমতা থাকে ততই ভাল। তাঁহার মতে

প্রত্যেক গ্রাম শাসন সম্পর্কে আত্মকর্তৃত্ব করিবে। গ্রামের লোক কি আর্থিক ব্যাপারে, কি শাসন ব্যাপারে পরের মুখাপেক্ষী হইবে না। তবে নিকটবর্তী গ্রামসমূহের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা বর্তমান থাকিবে। ব্যক্তি গ্রামের জন্য, গ্রাম জিলার জন্য, জিলা প্রদেশের জন্য, প্রদেশ রাষ্ট্রের জন্য এবং রাষ্ট্র বিশ্বমানবের জন্য আত্মবিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকিবে। মহাত্মাজী বলিয়াছেন যে, পিরামিডের মতন নীচের তলার উপর ক্রমান্বয়ে উপরতলা সাজাইবার মত শাসনব্যবস্থা কায়েম করা হইবে না; ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ গ্রাম এক মহাসামুদ্রিক বৃত্তের মধ্যে বিধৃত হইবে আর তাহার কেন্দ্রস্থলে থাকিবে ব্যক্তিপুরুষ।

গ্রামের আত্মশাসন, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ পরিহার

গান্ধীজী ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা পছন্দ করিতেন না। বস্তুতঃ তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন, নির্বাচনের দ্বন্দ্ব, দলীয় বিরোধ প্রভৃতির গভীর বিরোধিতা করিয়াছেন। তিনি পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকে শক্তি ও হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে করিতেন। হিংসার সাহায্যে কখনও দুর্বলকে রক্ষা ও প্রতিপালন করা যায় না। প্রকৃত গণতন্ত্র বাহির হইতে জোর করিয়া স্থাপন করা যায় না। উহা মানবের আত্মচেতনা হইতে উদ্ভূত হইলে তবে সুফল প্রদান করে।

পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ত্রুটি

গান্ধীজী প্রত্যক্ষ নির্বাচনকে দোষের আকর মনে করিতেন। কেননা ইহাতে জালজুয়াচুরি, মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার সম্ভাবনা খুব বেশি। সেইজন্য তিনি পরোক্ষ নির্বাচন সমর্থন করিয়াছেন। গ্রামের সকল প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী মিলিয়া পাঁচজন ব্যক্তি নির্বাচন করিবে। এক বৎসরের জন্য ঐ পাঁচজনের হাতে গ্রামের শাসন করিবার, বিধান রচনার ও বিচার করিবার ভার থাকিবে। প্রত্যেক গ্রাম একটি মাত্র ভোট দিয়া জেলার শাসনপরিষদ নির্বাচন করিবে। আবার প্রত্যেক জেলা এক একটি ভোট দিয়া প্রাদেশিক শাসন ও বিধানমণ্ডলী নির্বাচিত করিবে। প্রাদেশিক সংস্থাগুলি আবার এক একজন করিয়া সভাপতি স্থির করিবেন। এই সভাপতিরাই সমবেত-ভাবে কেন্দ্রীয় শাসন চালাইবেন। গান্ধীজীর মতে যাঁহারা কায়িক শ্রম করেন তাঁহারাই মাত্র ভোট দিবার অধিকারী হইবেন; অলস ব্যক্তিকে

গান্ধীজীর পরিকল্পিত শাসনব্যবস্থা

নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইবে। তিনি ১৮ হইতে ৫০ বৎসরের নরনারীকে মাত্র ভোটের অধিকার দিবার পক্ষপাতী ছিলেন। বোধ হয় পঞ্চাশের পর লোকে বাহিরের কাজে মন না দিয়া আত্মোন্নতির চেষ্টা করুক এই অভিপ্রায় তাঁহার ছিল।

মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এতদূর পক্ষপাতী ছিলেন যে, তিনি বলিতেন যে সংখ্যাগরিষ্ঠের বিচার বিবেচনা যদি ব্যক্তির মতে নীতি ও বিবেকের অনুমোদিত না হয় তাহা হইলে ব্যক্তি উহার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করিতে পারে। কিন্তু তাঁহার মতবাদে সমাজতন্ত্রের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। তিনি বড় বড় কলকারখানা পছন্দ করিতেন না, কিন্তু যেখানে উহা না হইলে চলিবে না, সেখানে উহার কর্তৃত্ব রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং শ্রমিকেরা সরকারের মাধ্যমে উহার উপসত্ব ভোগ করিবে। তাঁহার পরলোক গমনের কয়েক মাস পূর্বে তিনি হরিজন পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন (১৬।৩।৪৭) যে, "ঝাড়ুদার, ডাক্তার, উকীল, শিক্ষক, বণিক এবং অন্যান্য সকলের একদিনের পারিশ্রমিক সমান হওয়া উচিত। হয়তো পরিপূর্ণ রূপে এই আদর্শ কোন দিন ভারতবর্ষে অনুসৃত হইবে না; তবে ভারতকে সুখী করিতে হইলে এই লক্ষ্য সকলের সামনে রাখা কর্তব্য।" তিনি ধনীদের বারংবার সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে ধন ভগবানের দেওয়া জিনিস; ইহা শুধু তাঁহাদের একা একা ভোগ করিবার জন্য নহে। তাঁহারা ধনের ন্যাসী Trustee মাত্র; সুতরাং সর্বসাধারণের হিতার্থে উহা ব্যয় করা প্রয়োজন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অল্পসময়ের মধ্যে ভারতের সাত লক্ষ গ্রামের অসম্ভব উন্নতি করিতে পারেন। তাঁহারা যদি এই কার্যে অবহেলা করেন তাহা হইলে ক্ষুধার্ত জনতার হাতে তাঁহাদের দুর্গতির শেষ থাকিবে না (Young India ৫।১২।২৯)। তিনি মার্কসের ন্যায় শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা সংস্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু হিংসার দ্বারা ও বিপ্লবের দ্বারা উহা প্রবর্তন করিতে চাহিতেন না। তাঁহার সাম্যধর্ম অহিংসার পথে মানবের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হউক ইহাই তাঁহার কামনা ছিল।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও সমাজতন্ত্র

ন্যাসবাদ

বেন্থামের বহুজনের হিতবাদে গান্ধীজী বিশ্বাস করিতেন না, কেননা তিনি ছোট বড় সকলের কল্যাণ চাহিতেন। তাঁহার আদর্শকে অনুসরণ

করিয়া এখন বিনোবা ভাবে, জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রভৃতি সর্বোদয়বাদ প্রচার করিতেছেন। সর্বোদয় মানে সকলের উদয়। গান্ধীজী "হরিজন" পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন (২৪।৩।৩৯) যে সর্বোদয়-সমাজে প্রত্যেকে সার্বজনিক কল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগ করিবে, কেহ কাহারও শত্রু হইবে না; কেহ নিরন্ন থাকিবে না, কেহ বেকার রহিবে না; ছোট বড়োর ভেদ থাকিবে না। মুষ্টিমেয় বড় লোকেরা মণিমাণিক্য-খচিত প্রাসাদে বাস করিবেন আর লক্ষ লক্ষ লোক আলোহীন, বাতাসহীন অন্ধকূপে জীবন যাপন করিবে, এরূপ হইতে পারিবে না। নেশা, জুয়া, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতির অস্তিত্ব সর্বোদয় সমাজে থাকিবে না। তাঁহার শাসনব্যবস্থার আদর্শ ছিল রামরাজ্য।

সর্বোদয় ও রামরাজ্য

মহাত্মা গান্ধীর মতবাদ ভারতীয় সংবিধানের উপর বেশ কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। পাঞ্চায়েতের প্রবর্তন, শাসনের বিকেন্দ্রীকরণ, মাদকতা ও অস্পৃশ্যতা নিবারণ, কুটিরশিল্পের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সংবিধানের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসনের ক্ষমতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বড় বড় কলকারখানার সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে।

ভারতীয় সংবিধানে গান্ধীর প্রভাব

অনুশীলন

১। "Socialism proposes to complete rather than oppose the liberal democratic creed." Discuss the statement (1962).

"Democracy is not complete without socialism" (1964).

সমাজতন্ত্র ধনতন্ত্রবাদের বৈষম্য ও জীবিকা অর্জনের অনিশ্চয়তাকে দূর করিতে চায়। যদি দশ হাজার শ্রমিক একজন ধনীর অধীনে কাজ করে তাহা হইলে শ্রমিকদের ভোট দিবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাহাদিগকে ধনীর ইঙ্গিতমত চলিতে হয়। যেখানে অধিকাংশ লোক গরীব সেখানে গণতন্ত্র ব্যর্থ হইতে বাধ্য। কেননা গরীবেরা পেটের চিন্তায় আকুল, তাহারা দেশের সমস্যা লইয়া মাথা ঘামাইতে পারে না। আর সেই সুযোগে ধনীরা এমন কৌশল অবলম্বন করে যাহাতে তাহাদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা চলিয়া

আসে। ধনবৈষম্য দূর না করিতে পারিলে গণতন্ত্র সার্থক হইবে না। এই উদ্দেশ্যে খানিকটা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার।

একাদশ প্রকরণের শেষাংশ ও ত্রয়োদশ প্রকরণের "ব্যক্তিগত সম্পত্তি" হইতে শেষ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত দেখ।

২। Describe briefly the leading political ideas of Karl Marx.

চতুর্থ ও পঞ্চম প্রকরণ দেখ।

৩। Explain and discuss the salient ideas of Collectivism.

১২ প্রকরণে সমূহতন্ত্রবাদ ও ১৪ প্রকরণে রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রবাদ দেখ।

৪। Examine critically the theories of Fascism and Communism.

১৫ প্রকরণে ফ্যাসিবাদ ও চতুর্থ প্রকরণে "কমিউনিজিমের মূলকথা" এবং ষষ্ঠ প্রকরণে "রাশিয়ার সাম্যবাদের ত্রুটি ও কৃতকার্যতা" দেখ

৫। "Mahatma Gandhi spiritualised politics and secularised religion," comment on this statement and discuss the contribution he made to the political thought of the present century.

১৭ প্রকরণ দেখ।

অহিংসার উপর ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্র স্থাপনের চেষ্টা পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন। মহাত্মা গান্ধী ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের নীতি প্রচার করিয়া গণতান্ত্রিক স্বাতন্ত্র্যের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সংযোজন করিয়াছেন। মানুষের স্বভাব বদলাইবার উপর জোর দিয়া ও অহিংসার মহিমা প্রচার করিয়া তিনি রাজনীতিকে আধ্যাত্মিক পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও হরিজনদের উন্নয়ন প্রচার করিয়া প্রচলিত ধর্মকে তিনি সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে তুলিয়াছেন। মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার সকলেরই আছে। জাতিভেদ ধর্মকে প্রকাশ করে না, উহাকে আবৃত করে মাত্র।

রাষ্ট্রের সংবিধান

১। **সংজ্ঞা ও স্বরূপঃ** কোন্ রাষ্ট্রের শাসনপদ্ধতি কিরূপ তাহা যাহা হইতে জানা যায় তাহাকে সেই রাষ্ট্রের সংবিধান বলা হয়। অধিকাংশ রাষ্ট্রের সংবিধানই একটি দলিলে লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সেই দলিলটি পাঠ করিলেই ঐ রাষ্ট্রের শাসনপদ্ধতির সবটুকু জানা হইয়া গেল মনে করিলে ভুল হইবে। কেননা যতই বিস্তৃত করিয়া এবং যতই সাবধানতার সঙ্গে সংবিধান নামে পরিচিত দলিলটি রচনা করা হউক না কেন তাহার মধ্যে সেই রাষ্ট্রের শাসন সংক্রান্ত সব কথা কিছুতেই স্থান পাইতে পারে না। বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন সময়ে শাসনপদ্ধতি রচনা করা হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা তৈয়ারি করার জিনিস নহে, তাহা বিবর্তনশীল (Constitutions grow and are not made)। মানুষের সমাজব্যবস্থার ন্যায় মানুষের শাসনপদ্ধতিও মানুষের চিন্তা ও ধারণা, আচার ও আচরণ এবং আর্থিক ও সামাজিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে। মানুষ যদি চিরদিন একই ধরনের কায়িক ও মানসিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হইত, তাহার পরিবেশ যদি অপরিবর্তনীয় থাকিত তাহা হইলে কোন এক সময়ে রচিত সংবিধানের দলিলটিই সেই রাষ্ট্রের শাসনপদ্ধতির সর্বাঙ্গীন পরিচয় দিতে পারিত। কিন্তু মানুষের ধারণা ও প্রয়োজন সব সময়েই কিছু কিছু বদলাইতেছে। সেই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংবিধানেরও পরিবর্তন করা প্রয়োজন হয়। কিন্তু সংবিধানের মধ্যে উহাকে সংশোধন করিবার যে প্রক্রিয়া লিখিত থাকে, কেবলমাত্র তাহার দ্বারাই যে পরিবর্তন সাধিত হয় তাহা নহে। সংবিধানের মধ্যে প্রযুক্ত শব্দ ও বাক্যগুলি সব সময়ে যে একই অর্থ বহন করে তাহা নহে, স্থানকালপাত্র হিসাবে তাহাদের অর্থ শাসনবিভাগের, আইনবিভাগের এবং বিচারবিভাগের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ এবং তাঁহাদের অধীন কর্মচারীরা কিছু অন্য ধরনের অর্থে প্রয়োগ করেন

সংবিধান রচিত হইলেও উহা বিবর্তনশীল

সংবিধান কেন এবং কিভাবে বদলায়

এবং জনসাধারণও তাহাতে নীরব স্বীকৃতি দেয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, ভারতীয় সংবিধানের দলিলে এমন কথা কোথাও নাই যে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালকে অথবা হাইকোর্টের কোন বিচারককে নিযুক্ত করিবার পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার তথাকার মুখ্যমন্ত্রীর সম্মতি লইবেন ; অথচ মুখ্যমন্ত্রীর সহিত পরামর্শ না করিয়া ঐ সব উচ্চপদে কাহাকেও নিযুক্ত করা হয় না। আবার অন্যদিকে সংবিধানে পশ্চিমবঙ্গের সরকারকে শিক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব দেওয়া হইলেও নানা কারণে এই রাজ্যের ও অন্যান্য রাজ্যের সরকার কেন্দ্রের নির্দেশ ও উপদেশ মানিয়া চলিতেছেন। গত বার বৎসরে দশ বার সংবিধানের সংশোধন সাধন করিলেও এই সব ব্যাপারে অদলবদলের চিহ্ন সংবিধানের দলিলটিতে পাওয়া যাইবে না। এমনটি যে শুধু ভারতবর্ষেই ঘটিতেছে তাহা নহে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানেও অলিখিত নানা পরিবর্তন ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। সেখানকার যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ক্রমাগত অধিক ক্ষমতাশালী হইতেছে এবং আর্থিক ব্যাপারে রাজ্য সরকারগুলি দিন দিন অধিকতর অধীনতা পাশে বদ্ধ হইতেছে। ইংলণ্ডের সংবিধান হাজার বছর ধরিয়া ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে। কোন এক সময়ে কোন এক স্থানে একদল্ লোক সভা করিয়া ঐ সংবিধান রচনা করে নাই। যুগোপযোগী প্রয়োজন মিটাইবার জন্য উহাতে অনেক রদবদল করা হইতেছে।

প্রথা, রীতিনীতি ও আদালতের রায়

প্রত্যেক রাষ্ট্রের সংবিধান কতকটা বা লিখিত দলিলের উপর নির্ভর করে, কতকটা বা প্রথা ও রীতিনীতির উপর নির্ভর করে। উচ্চতম বিচারালয় কিভাবে সংবিধানের ধারা-গুলির ব্যাখ্যা করেন তাহার উপরও সংবিধানের স্বরূপ ও প্রকৃতি অনেকটা নির্ভর করে। এইসব সূত্রের ব্যাখ্যা পরে করা হইবে।

সংবিধানের সংজ্ঞা

এখন আমরা সংবিধানের কয়েকটি সংজ্ঞা দিতেছি। ফাইনারের মতে রাষ্ট্রীয় মৌলিক প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ হইতেছে সংবিধান ("The system of fundamental institutions is the Constitution.")। এটি বোধ হয় ডাইসির প্রদত্ত সংজ্ঞার সংক্ষিপ্ত রূপ। (ডাইসি বলেন যে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে নিয়মকানুন রাষ্ট্রের ক্ষমতা ব্যবহারের ও বণ্টনের রীতিকে প্রভাবান্বিত করে তাহাই সংবিধান।) অন্যান্য জিনিসের মধ্যেও ইহাতে সার্বভৌম ক্ষমতার

অধিকারী সমূহকে নিরূপণ করিবার নিয়ম, তাহাদের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার নিয়ম, তাহাদের ক্ষমতা ব্যবহার করিবার নিয়ম অন্তর্ভুক্ত থাকে। কে. সি. হুইয়ার বলেন যে, সংবিধান হইতেছে সেই নিয়মসমূহ যাহার দ্বারা কি উদ্দেশ্যে এবং কোন্ বিভাগের দ্বারা সরকারী ক্ষমতা পরিচালিত হইবে তাহা নিয়ন্ত্রিত হয় ("That body of rules which regulates the ends for which and the organs through which governmental power is exercised.")।

সকল প্রকার সংবিধানই বাধানিষেধের উল্লেখ করিয়া শাসকবর্গের কার্যকে কিছু না কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে। প্রাচীন ভারতে রাজাকে ধর্মের অনুশাসন মানিয়া চলিতে হইত। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যেরও একটা সংবিধান ছিল। হিট্‌লার বা মুসোলিনিও লোকের সামনে একটা সংবিধান খাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন, যদিও তাঁহাদের ক্ষমতার সামনে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য উড়িয়া গিয়াছিল। আধুনিক সংবিধানে শাসকবর্গের স্বেচ্ছাচারের হাত হইতে বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে নাগরিকদের কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অধিকারের উল্লেখ করা হইয়া থাকে। শাসকবর্গ ঐ সব অধিকার লঙ্ঘন করিলে নাগরিকেরা তাঁহাদের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করিতে পারেন।

শাসকবর্গের উপর অল্পাধিক নিয়ন্ত্রণ

সংবিধান এক প্রকারের আইন বটে, কিন্তু সাধারণ আইন অপেক্ষা সাংবিধানিক আইনের গুরুত্ব অনেক বেশি। ইংলণ্ড ছাড়া অন্যান্য রাষ্ট্রে সাংবিধানিক আইন পরিবর্তন করিবার জন্য বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বনের ব্যবস্থা আছে।

সাংবিধানিক আইন

২। **সংবিধানের সংগঠন ও বিবর্তন:** প্রত্যেক সংবিধানই বিবর্তনশীল, কিন্তু কোন সংবিধান জীবদেহের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ নীতির ন্যায় বিবর্তনের ফলে উদ্ভূত, আবার কোন সংবিধান নিউটনের যান্ত্রিক-পদ্ধতিতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে রচিত। ইংলণ্ডের সংবিধান কালক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছে। ডারউইন যেমন পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে জীবদেহের ক্রমবিকাশ দেখাইয়াছেন, তেমনি বিভিন্ন যুগের নানা ধরনের সমস্যা সমাধান করিবার জন্য স্বাভাবিক উপায়ে সংবিধানের রদবদল হইয়াছে। রাজশক্তি পার্লামেণ্টের নিকট অধীনতা স্বীকার করিয়াছে, পার্লামেণ্ট আবার

ক্যাবিনেটের নেতৃত্ব মানিয়া লইয়াছে, জনকল্যাণনীতি অনুসরণ করার ফলে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা বাড়িয়াছে; কিন্তু প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পূর্ণভাবে বিলোপ করা হয় নাই। অব্যবহারে অনেক বিধি ও প্রতিষ্ঠান মৃতপ্রায় ও নিরর্থক হইয়াছে বটে, কিন্তু পুরাতনের আবরণের ভিতর দিয়াই নূতন প্রতিষ্ঠান নিজের কার্যকারিতা দেখাইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, যদিও ক্যাবিনেটই প্রকৃত পক্ষে ক্ষমতা পরিচালনা করে তথাপি রাজা বা রানীর নামে এখনও সব কাজ করা হইয়া থাকে। সংরক্ষণশীল ইংরাজ জাতি বিপ্লবের পরিবর্তে বিবর্তনকে শ্রদ্ধা করে।

ইংলণ্ড ছাড়া আর সকল দেশেই কিন্তু সংবিধান যুক্তি-বিচার করিয়া পরিকল্পনা অনুসারে গঠন করা হইয়াছে। কোথাও বা রাজা স্বেচ্ছায় অথবা জনমতের প্রভাবে একটি নূতন সংবিধান রচনা করিয়া জনসাধারণের সহিত ক্ষমতা ভাগাভাগি করিয়া লইতে রাজী হন। দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লবের পর ফ্রান্সের রাজা লুই ফিলিপি এবং ১৯৬২ খৃস্টাব্দে নেপালের রাজা মহেন্দ্র এইভাবে সংবিধান রচনা করিয়াছেন বা করাইয়াছেন। তৃতীয়তঃ জনসাধারণ বিপ্লবের দ্বারা রাজশক্তি অথবা অভিজাতবর্গকে ক্ষমতা হইতে অপসারিত করিয়া নিজেরা সংবিধান রচনা করিয়াছে। ইংলণ্ডে প্রথম চার্লসের সিংহাসন চ্যুতির পর ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান রচিত হইয়াছিল। রাশিয়ার বিপ্লবের পর বলশেভিকদল শ্রমিকদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এক সংবিধান রচনা করেন।

চতুর্থতঃ কতকগুলি স্বাধীন বা প্রায় স্বাধীন রাষ্ট্র রাজনৈতিক সুরক্ষার জন্য একত্রিত হইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র সংগঠন করিতে পারে। তাহারা নিজেদের সুবিধা অনুসারে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করিয়া দিয়া শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে পারে। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের ক্যাণ্টনগুলি ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে এইভাবে সংবিধান রচনা করিয়াছিল। ইংলণ্ডের উপনিবেশভুক্ত আমেরিকানেরা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচনা করেন।

পঞ্চমতঃ কোন দেশ বিদেশী শক্তির অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হইয়া নিজেদের সংবিধান তৈয়ারি করে। সংবিধান রচনা করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে সংগঠিত প্রতিনিধিমূলক সভা ঐ কার্যে প্রবৃত্ত হয়। ভারতবর্ষে

সংবিধান রচনা করিতে প্রায় আড়াই বৎসর সময় লইয়াছিল। পাকিস্থান পনের বৎসর পরে ঐ কাজে হাত দিয়াছে।

৩। **সংবিধানের ভূমিকা**ঃ আধুনিক সংবিধানের প্রারম্ভে একটি Preamble বা ভূমিকা সন্নিবিষ্ট করিবার রীতি দেখা দিয়াছে। উহাতে সংবিধান রচনাকালে রাষ্ট্রের কার্যকলাপের লক্ষ্য সম্বন্ধে কিরূপ জনমত ছিল জানা যায়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথমেই লিখিত আছে "আমরা, যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণ, উৎকৃষ্টতর সংঘ গঠন করিবার জন্য এবং সুবিচার, আভ্যন্তরাণ শান্তি, বাহিরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা, সাধারণের কল্যাণ বৃদ্ধি এবং বংশানুক্রমে স্বাধীনতার সুফল ভোগ করিবার জন্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের এই সংবিধান প্রণয়ন ও সংস্থাপন করিতেছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্স ও জার্মানিতে যে সংবিধান রচিত হয় তাহার প্রারম্ভে শান্তিরক্ষা ও সামাজিক উন্নতির প্রয়োজনীয়তা ঘোষিত হয়। ফ্রান্সের চতুর্থ রিপাবলিকের (১৯৪৬) সংবিধানে এমনও বলা হইয়াছে যে, বিশ্বশান্তি সংরক্ষণের জন্য জাতীয় সার্বভৌমিকতাকে সংকুচিত করার প্রয়োজন স্বীকৃত হইতেছে। উহাতে নরনারীর সাম্য, রাষ্ট্র কর্তৃক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান ও বৃদ্ধদিগকে প্রতিপালনের কথাও আছে। চীন ও সোভিয়েট ইউনিয়নের সংবিধানের ভূমিকায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ঘোষিত হইয়াছে। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনাতে গান্ধীনীতি অনুসরণ করিয়া বিকেন্দ্রীকরণ, পঞ্চায়েত, অস্পৃশ্যতা নিবারণ প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। সংবিধানের ভূমিকায় যে নীতির উল্লেখ থাকে তাহা যদি সরকার উল্লঙ্ঘন করেন তবে সরকারকে বিচারালয়ের সমক্ষে অভিযুক্ত করা যায় না। সেই জন্য ঐরূপ নীতি ঘোষণার দ্বারা কেবলমাত্র রাষ্ট্রের লক্ষ্য বা আদর্শের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

৪। **লিখিত ও অলিখিত সংবিধান**ঃ সংবিধানকে লিখিত ও অলিখিত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার একটা রীতি চলিয়া আসিতেছে। ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রকে অলিখিত এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সংবিধানকে লিখিত বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কোন সংবিধানই সম্পূর্ণরূপে লিখিত নহে এবং কোন শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণ অলিখিত হইতে পারে না। যাহাকে অলিখিত সংবিধান বলা হয় তাহাতে প্রথমতঃ কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয়,

যাহা অন্যান্য সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহার উল্লেখ থাকে না। যেমন ইংলণ্ডের কোনও আইনে এমন কথা লেখা নাই যে প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রীকে নিযুক্ত করিবেন অথবা তিনি মন্ত্রীদের একক বা যুক্তভাবে বরখাস্ত করিবেন। দ্বিতীয়তঃ অলিখিত সংবিধানে সাধারণ আইন ও সাংবিধানিক আইনের মধ্যে কোন পার্থক্য রক্ষিত হয় না। একই পদ্ধতিতে উভয় প্রকার আইন পার্লামেণ্টের দ্বারা পাশ করানো হয়। তবে হাউস্ অব লর্ডসের সংস্কারসাধনরূপ গুরুতর সাংবিধানিক বিষয়ে বহুকাল ধরিয়া বিচারবিতর্ক চলিতেছে।

ফরাসী লেখক ডি টক্‌ভিল যখন লিখিয়াছিলেন "ইংলণ্ডের সংবিধানের কোন অস্তিত্ব নাই" তখন বোধ হয় তিনি বলিতে চাহিয়াছিলেন যে কোন এক জায়গায় ইংলণ্ডের সংবিধান গুছাইয়া লেখা হয় নাই ; উহা বহু দলিলের মধ্যে ও রীতিনীতি প্রথার মধ্যে ছড়াইয়া আছে। প্রজাদের মৌলিক অধিকারের কথা ম্যাগনা কার্টা, পিটিসন অব রাইট, বিল অব রাইটস্ প্রভৃতির মধ্যে এবং বিচারকের স্বাধীনতা অ্যাক্ট অব সেটেলমেণ্ট, ভোটদানের অধিকার, জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত কয়েকটি আইনে পাওয়া যায়। তবে ইংলণ্ডের শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক কথাই লিপিবদ্ধ নাই। যেখানে লিখিত নির্দেশ আছে, সেখানেও ছাপার হরপের লেখাকে অমান্য করিয়া রীতিনীতিকে অনুসরণ করা হয়। লিখিত বিবরণ অনুসারে রাজা বা রানীর ক্ষমতা অনেক, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তিনি মন্ত্রীদের মত না লইয়া কিছুই করেন না।

পূর্বেই বলিয়াছি যে লিখিত সংবিধানে শাসনসংক্রান্ত সমস্ত নিয়মকানুন লেখা থাকে না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান লিখিত বটে, কিন্তু ইহাতে তথাকার রাজনৈতিক দলের কথা, কংগ্রেস কমিটির ক্ষমতার কথা, কিংবা প্রেসিডেণ্টের প্রভাবের সকল নিদর্শনের উল্লেখ করা হয় নাই। প্রত্যেক সংবিধানেই কতকগুলি প্রথার উদ্ভব হয় এবং সেগুলি আইনের মতনই মান্য করিয়া চলা হয়। লিখিত সংবিধানের স্থায়িত্ব বা সুনির্দিষ্টতা অলিখিত সংবিধানের চেয়ে বেশি এরূপ দাবি করা যায় না। লিখিত ও অলিখিত শব্দের পরিবর্তে এইস্থানে 'বহুলাংশে লিখিত' ও 'বহুস্থানে বিক্ষিপ্ত' শব্দ ব্যবহার করিলে বাস্তবের সঙ্গে অধিকতর সামঞ্জস্য থাকিবে। প্রথমোক্ত

সংবিধানের শব্দগুলির এক এক রকমে ব্যাখ্যা করা হয়। আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যার দ্বারা একই ধারাকে নানা উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিয়াছেন। ফ্রান্সের সংবিধান লিখিত হওয়া সত্ত্বেও ১৭৮৯ হইতে ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ষোলবার বদলাইয়াছে। আমেরিকায় ২২ বার এবং ভারতে ষোলবার সংবিধান সংশোধন করা হইয়াছে।

৫। **নমনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান** (Rigid and Flexible Constitutions) **:** লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের পার্থক্যের ন্যায় নমনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের শ্রেণীবিভাগও অনেকটা অবাস্তব। যে সংবিধানকে বিনা আয়াসে, সাধারণ আইন তৈয়ারির পদ্ধতিতে বিধানমণ্ডলীর দ্বারা পরিবর্তন করা যায় তাহাকে নমনীয় বা সুপরিবর্তনীয় সংবিধান (flexible constitution) বলে। ইংলণ্ডের সংবিধান এই ধরনের। কিন্তু ইংরাজেরা এতই সংরক্ষণশীল যে গুরুত্বপূর্ণ কোন সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধনের জন্য পার্লামেণ্ট গড়ে ত্রিশবৎসর ধরিয়া বিচারবিবেচনা করেন বলিয়া লাস্কী অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং নামে সুপরিবর্তনীয় হইলেও কাজের বেলায় আইন তৈয়ারি করিয়া পরিবর্তন আনা বড় সহজ ব্যাপার নহে। নিউজিল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও আইরিশ ফ্রি স্টেটের সংবিধান লিখিত হইলেও নমনীয়।

ইংলণ্ডে প্রথা (convention) এর পরিবর্তন ঘটাইয়া অনেক সময়ে সাংবিধানিক পরিবর্তন আনা হয়। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে বেজহট লিখিয়াছিলেন যে হাউস অব কমন্স যখন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করে তখন তিনি পদত্যাগ করেন। কিন্তু ঐ প্রথার পরিবর্তে এখন প্রধানমন্ত্রী হাউস অব কমন্স ভাঙ্গিয়া দিয়া সাধারণ নির্বাচন করিবার ব্যবস্থা করেন। ইহার দ্বারা তিনি জানিতে চাহেন যে সাধারণ নির্বাচকেরা তাঁহাকে সমর্থন করেন কি হাউস অব কমন্সের রায় মানিয়া লন। এই প্রথা অবশ্য এক দিনে উদ্ভূত হয় নাই। কোন প্রথাই সহসা কায়েম হয় না।

দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান তাহাকেই বলে যাহাতে পরিবর্তন ঘটাইবার জন্য বিশেষ পদ্ধতির অথবা বিশেষ ধরনের সভার প্রয়োজন হয়। সংবিধানের মধ্যেই এ পদ্ধতির সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির

অধিকার বজায় রাখিবার জন্য সংবিধানকে যেমন সুস্পষ্ট আকারে লেখা দরকার তেমনি উহাকে যথাসম্ভব দুষ্পরিবর্তনীয় করা প্রয়োজন। তাহা না হইলে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার তাহাদের ক্ষমতা ও অধিকার বিলোপ করিতে পারে। কিন্তু এ কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, পৃথিবীর প্রায় সব যুক্তরাষ্ট্রেই আজকাল রাজ্য সরকারের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে। ইহার জন্য সংবিধান পরিবর্তন করিতে হয় না। কেন্দ্রে ও রাজ্যে যদি একই দলের প্রভাব থাকে, তাহা হইলে সেই দলের নির্দেশে রাজ্যের অনেক অধিকার কেবল নামে মাত্র পর্যবসিত হয়। কেন্দ্র হইতে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করার ফলেও রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য হ্রাস পায়।

নাগরিকদের অধিকারের তালিকা যে সংবিধানে দেওয়া হয় তাহাকে দুষ্পরিবর্তনীয় করা কর্তব্য। তাহা না হইলে হিট্‌লার যেমন সহজেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে সংগঠিত ওয়াইমার সংবিধানকে বদলাইয়া নিজের একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিতে পারে। যে রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আছে সেখানেও তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করিবার জন্য সংবিধান পরিবর্তনের পদ্ধতিকে যতদূর সম্ভব অনমনীয় করা উচিত। তাহা না হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় ঝোঁকের মাথায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ সুবিধা ও অধিকার হরণ করিতে পারে। লাস্কী এইসব কথা বিবেচনা করিয়া সংবিধান যাহাতে সহজে পরিবর্তন করা না যায় তাহার উপায় নির্ধারণ করিতে বলিয়াছেন।

কিন্তু সংবিধানে যে উপায়ের কথা লেখা থাকে কেবলমাত্র সেই পদ্ধতিতেই যে উহা পরিবর্তিত হয় তাহা নহে। বিচারকগণের রায়ের দ্বারা এবং নূতন নূতন প্রথা বা Convention-এর উদ্ভবের দ্বারাও সংবিধান পরিবর্তিত হয়। সেইজন্য হ্যারল্ড ম্যাকবেন তাঁহার The Living Constitutions ও মুনরো তাঁহার The Government of the United Statesয়ে দাবি করিয়াছেন যে আমেরিকার সংবিধান ইংলণ্ডের সংবিধানের তুল্যই নমনীয় ও পরিবর্তনশীল। প্রেসিডেন্ট উইলসন্ বলেন যে আমেরিকার লিখিত সংবিধানের সহিত তথাকার বাস্তব শাসনপ্রথার অনেক পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্যের জন্য জনমতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রিম

কোর্টের সংবিধান সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যার পরিবর্তন এবং নূতন নূতন প্রথার উদ্ভব হয়।

নমনীয় সংবিধানের প্রধান গুণ হইতেছে এই যে সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সহজেই সংবিধানকে পরিবর্তিত করা যায়। সংবিধান পরিবর্তন করিবার কোন ব্যবস্থা না থাকিলে লোকে বাধ্য হইয়া বিপ্লবের সাহায্য লয়। কিন্তু পরিবর্তনের পদ্ধতি যদি অত্যন্ত সহজ হয় তাহা হইলে শাসনব্যবস্থার স্থায়িত্ব থাকে না এবং কোন সুপরিকল্পিত কার্য সাধন করা কঠিন হয়।

৬। সংবিধান পরিবর্তনের বিবিধ পদ্ধতিঃ এখানে পদ্ধতি বলিতে কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক ভাবে (Formally) সংবিধানের পরিবর্তন সাধনের কথা বলা হইতেছে। প্রথার উদ্ভবের দ্বারা অথবা বিচারালয়ের ব্যাখ্যার দ্বারা পরিবর্তন করার সম্বন্ধে বিচার করা হইতেছে না। ইংলণ্ডের শাসনবিধির কোন অংশ পরিবর্তন করিতে হইলে সাধারণ আইন যে ভাবে তিনবার এক সদনে পাশ করাইবার পর অন্য সদনে প্রেরণ করা হয় এবং সেখানেও তিনবার উহা গৃহীত হইলে রাজা বা রানীর স্বাক্ষর লাভের পর বলবৎ হয়, সেরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা যাইতে পারে। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ভোট দিবার অধিকার সম্প্রসারণের, ১৯১১ খৃষ্টাব্দে হাউস অব লর্ডসের ক্ষমতা হ্রাসের প্রস্তাবের সময় সাধারণ নির্বাচন করিয়া জনসাধারণের মতামত লওয়া হইয়াছিল। ইহাতে মনে হয় যে, সংবিধানে কোন গুরুতর পরিবর্তন সাধনের পূর্বে সংরক্ষণশীল ইংরাজ জাতি জনসাধারণের মত কি তাহা নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করেন। সাংবিধানিক আইনে কিন্তু এরূপ বাধ্যবাধকতা কিছু নাই।

ইংলণ্ডে কি ভাবে সংবিধান সংশোধন করা হয়?

লিখিত সংবিধানগুলির মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে পরিবর্তিত করা সবচেয়ে কঠিন। একজন পণ্ডিত গবেষণা করিয়া বাহির করিয়াছেন যে সেখানে প্রায় তিন হাজার সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যে এযাবৎকাল মাত্র বাইশটি গৃহীত হইয়াছে।

এরূপ কম সংখ্যক প্রস্তাব পাশ হইবার কারণ হইতেছে তথাকার সংবিধান-সংশোধনী পদ্ধতির দুরূহতা ও জটিলতা। প্রথমে সংশোধনের

প্রস্তাব হওয়া দরকার কংগ্রেসের প্রত্যেক সদনের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের দ্বারা অথবা অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির বিধানমণ্ডলীর অনুরোধে আহূত এক জাতীয় সভার (National Convention) দ্বারা। এই দুইটি পদ্ধতির কোন একটির দ্বারা যদি প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহা হইলে উহা রাজ্যগুলির তিন-চতুর্থাংশের বিধানমণ্ডলীতে অথবা রাজ্যসমূহের বিশেষ সভায় (Convention) তিন-চতুর্থাংশের ভোটের দ্বারা আবার দৃঢ়ীকৃত (Ratified) হওয়া প্রয়োজন হয়। দুই প্রকারে প্রস্তাব ও দুই প্রকারে দৃঢ়ীকরণ করিবার ব্যবস্থার ফলে সংশোধনের চার রকম পদ্ধতি নিয়মবদ্ধ করা হইয়াছে। এরূপ করিবার কারণ এই যে কংগ্রেস অথবা রাজ্যসমূহের বিধানমণ্ডলী নিজেদের খেয়াল মত যেন সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপনের বাধা না দিতে পারে। আবার কংগ্রেস যদি প্রস্তাব পাশ করে এবং আশংকা করে যে রাজ্যসমূহের বিধান-মণ্ডলী হয়তো ইহা সমর্থন করিবে না তাহা হইলে উহা রাজ্যসমূহের এক বিশেষ সভা আহ্বানের দাবি করিতে পারে। অন্যদিকে যদি জনসাধারণের মধ্যে সংশোধনের আগ্রহ খুব বেশি থাকে, অথচ কংগ্রেস উহাতে বাধা দিবে আশংকা হয় তাহা হইলে রাজ্যসমূহের বিধানমণ্ডলী দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের দ্বারা দাবি করিতে পারে যে জাতীয় সভা বা National Convention ডাকা হউক।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সংশোধন পদ্ধতির জটিলতা

বাস্তবপক্ষে এত রকমে সংশোধনের ব্যবস্থা থাকিলেও একটিমাত্র উপায়েই ২২ বার সংবিধান সংশোধন করা হইয়াছে। কংগ্রেস দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে প্রস্তাব করেন ও রাজ্যগুলির আইনসভা তিন-চতুর্থাংশ ভোটে উহা দৃঢ়ীকৃত করেন। এইরূপ সংশোধনী প্রস্তাবের উপর প্রেসিডেন্ট অথবা রাজ্যের গভর্ণরের ভেটো করিবার অর্থাৎ নাকচ করিয়া দিবার কোন অধিকার নাই—ইহা সুপ্রীম কোর্টের রায়ের দ্বারা স্বিরীকৃত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রে ৫০টি রাজ্য আছে, তাহার মধ্যে যে কোন ১৩টি যদি বাধা দেয় তাহা হইলে সংশোধন পাশ করা অসম্ভব হয়।

সোভিয়েট রাশিয়াতে সংবিধান সংশোধন করা অপেক্ষাকৃত সহজ। সুপ্রীম সোভিয়েট বা সোভিয়েট পার্লামেন্টের উভয় সদনে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের দ্বারা পাশ হইলে সংবিধানের কোন ধারা সংশোধিত হইতে

পারে। কিন্তু সম্প্রতি ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের সংবিধান ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত করিবার উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠিত হইয়াছে। কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে বোধ হয় সুপ্রীম সোভিয়েটের কক্ষদ্বয় উহা আলোচনা করিবে এবং যদি প্রত্যেক কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উহা অনুমোদন করেন তবে উহা পাশ হইবে।

রাশিয়া

সুইট্জারল্যাণ্ডে আংশিক ও সামগ্রিকভাবে সংবিধান সংশোধন করিবার বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি আছে। যদি আংশিক সংশোধন করিতে হয় তাহা হইলে আইনসভার উভয় কক্ষে অথবা পঞ্চাশ হাজার ভোটারের আবেদনক্রমে উহার প্রস্তাব করিতে হইবে। প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর উহা জনসাধারণের নিকট পেশ করা হইবে। ভোটারদের অধিকাংশ এবং ক্যান্টনগুলির অধিকাংশ যদি সম্মতি দেন তবে উহা পাশ হইবে। সামগ্রিক সংশোধনের প্রস্তাব আইনসভার এক বা উভয় কক্ষে প্রস্তাবিত হইতে পারে। পঞ্চাশ হাজার ভোটারও আবেদন করিয়া উহা দাবি করিতে পারেন। তারপর ঐ বিষয়ে জনমত গ্রহণ করা হয়। যদি অধিকাংশের দ্বারা উহা পাশ হয় তাহা হইলে আইনসভার উভয় কক্ষের নূতন করিয়া নির্বাচন করা হয় এবং নব নির্বাচিত আইনসভা সামগ্রিক সংশোধন পাশ করে। সুইট্জারল্যাণ্ডে ভোটদাতারা একবার মূল বিষয়ের বিচার করেন আবার সাধারণ নির্বাচনের সময় উহা নীতিগত ভাবে বিচার করেন। দুইবারই যদি উহা অধিকাংশের মতে পাশ হয় তাহা হইলে উহার আইনসঙ্গত রূপ দান করেন আইনসভা।

সুইট্জারল্যাণ্ড

অস্ট্রেলিয়াতেও সংবিধান সংশোধন করিতে হইলে প্রথমে আইনসভার দুই সদনে প্রস্তাব গৃহীত হওয়া দরকার; পরে উহা ভোটারদের সামনে পেশ করা হয়। ভোটারদের অধিকাংশের এবং আঙ্গিক রাজ্যগুলির অধিকাংশের মতে উহা পাশ হইলে সংশোধনকে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়।

অস্ট্রেলিয়া

যুক্তরাষ্ট্রে সংশোধনে প্রণালী একটু জটিল রাখিতে হয়। তাহা না হইলে আঙ্গিক রাজ্যগুলি ভাবিতে পারে যে তাহাদের যে সব ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহা যে কোন সময়ে সংবিধান সংশোধন করিয়া কাড়িয়া লওয়া যাইতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রে সাবধানতার প্রয়োজন

ভারতের আঙ্গিক রাজ্যগুলির এইরূপ আশংকা নিবারণের জন্য সংবিধানে ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে ভারতীয় পার্লামেণ্টের রাজ্যসমূহের প্রতিনিধির সংখ্যা, কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতাসমূহের বণ্টন, কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনক্ষমতার ব্যাপকতা, প্রেসিডেন্টের নির্বাচন ও ক্ষমতা প্রভৃতি বিষয়ে কোন সংশোধন করিতে হইলে প্রথমে লোকসভা ও রাজ্যসভার দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে উহা পাশ হওয়া চাই, তারপর উহাতে বিভিন্ন রাজ্যের আইনসভাগুলির অন্ততঃ অর্ধেকের সম্মতি থাকা প্রয়োজন। সংবিধানের অন্যান্য বিষয়ে পরিবর্তন সাধনের জন্য আঙ্গিক রাজ্যদের আইনসভার সম্মতি লওয়ার দরকার হয় না।

ভারতীয় সংবিধান

কোন কোন সংবিধানে কতকগুলি বিষয়ে কোন প্রকার সংশোধন আনা চলিবে না বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের তৃতীয় রিপাবলিকের জন্য যে সংবিধান রচিত হইয়াছিল তাহাতে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছিল যে সাধারণতন্ত্রকে পরিবর্তন করিবার জন্য কোন সংশোধন প্রস্তাব উঠাইতে দেওয়া হইবে না অর্থাৎ ফ্রান্সে রাজতন্ত্র স্থাপিত হউক এরূপ প্রস্তাব আইন বিরুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

সংবিধানের অপরিবর্তনীয় অংশ

৭। উত্তম সংবিধানের লক্ষণঃ আজকাল নূতন নূতন রাষ্ট্র স্থাপিত হইতেছে। পাশ্চাত্য জাতিদের অধিকারভুক্ত উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করিতেছে; তাহারা কেহ এককেন্দ্রিক, কেহ বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান গ্রহণ করিতেছে। সেই জন্য আদর্শ সংবিধানের কি কি লক্ষণ থাকা উচিত তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন।

সংবিধানের সর্বপ্রধান গুণ হইতেছে সুস্পষ্টতা। উহার কোন ধারার মধ্যে এমন কোন শব্দ প্রয়োগ করা উচিত নহে যাহার দুই বা ততোধিক মানে করা সম্ভব হয়। এটি বলা যত সহজ কাজে পরিণত করা তত নহে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে অনেকে আদর্শস্থানীয় মনে করেন, কিন্তু একই শব্দের এক এক প্রকার ব্যাখ্যা সেখানকার সুপ্রীম-কোর্ট বিভিন্ন সময়ে করিয়াছেন। ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র রচনার সময় শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞদের সাহায্য লওয়া হইয়াছিল, তথাপি মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত ধারাগুলি লইয়া এত

সংবিধান সুস্পষ্ট হওয়া দরকার

মামলা-মোকদ্দমা হইতেছে কেন? যাহা হউক যতটা সম্ভব সাবধানতার সহিত সংবিধান রচনা করা কর্তব্য। দ্ব্যর্থবাচক শব্দ পরিহার করিয়া সংবিধান এমন প্রাঞ্জল ভাষায় রচনা করা উচিত যাহাতে জনসাধারণ উহার অর্থ বুঝিতে পারে। সংবিধান একান্ত নমনীয় হইলে উহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে, আবার অত্যন্ত দুষ্পরিবর্তনীয় হইলে সামাজিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যবিহীন হয়। সংশোধন বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বনীয়।

সংবিধানকে অতিরিক্ত ব্যাপক (Comprehensive) করা উচিত নহে। মানুষ যতই চেষ্টা করুক না কেন ভবিষ্যতে শাসনসংক্রান্ত কতপ্রকার সমস্যার উদ্ভব হইবে তাহা বুঝিতে পারে না। সেই জন্য সংবিধানের মধ্যে মাত্র মৌলিক বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত নির্দেশ থাকা উচিত; কোন বিষয়েরই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেওয়া উচিত নহে। সমাজের ও অর্থনীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শাসন ব্যাপারে রদবদলের প্রয়োজন হয়। সংবিধানের মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের পরিচালনা কিভাবে করা হইবে অথবা হাইকোর্টের বিচারকদিগকে কিরূপে নিযুক্ত করা হইবে এসব ব্যাপারের আনুপূর্বিক বর্ণনা না করিলেই ভাল হয়—যদিও ভারতীয় সংবিধানে তাহা করা হইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে মাত্র সাতটি ধারা আছে, আর ভারতীয় সংবিধানে ৩৯৫টি ধারা ও আটটি পরিশিষ্ট আছে।

অতিব্যাপক হওয়া উচিত নহে

সংবিধানের মধ্যে নাগরিকদের অধিকার সন্নিবিষ্ট করা উচিত কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে। লাস্কীর মতে এরূপ করা কর্তব্য, কেননা জনসাধারণ তাহা হইলে নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হইয়া শাসকশ্রেণীর কার্যকলাপের উপর কড়া নজর রাখিতে পারিবে। কিন্তু কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, অধিকার সাধারণ আইনের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত ও বিচারালয় কর্তৃক সুরক্ষিত হওয়া দরকার। সংবিধানের মধ্যে অধিকার সংক্রান্ত বাধানিষেধের উল্লেখ থাকিলে উকিলদের সুবিধা হয়, কিন্তু নাগরিকদের হয়রানি ভোগ করিতে হয়।

অধিকারের উল্লেখ

অনুশীলন

১। Distinguish between rigid and flexible constitutions. Are the constitutions of (a) the U. S. A., (b) Great Britain and (c) India rigid or flexible ? Give reasons for your answer —(1963).

পঞ্চম প্রকরণ দেখ।

গ্রেটব্রিটেনের সংবিধানকে নমনীয় বলা হয়, কেননা উহার পরিবর্তন করিবার জন্য কোন বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার হয় না; সাধারণ আইন বদলাইবার যে প্রক্রিয়া আছে তাহা অনুসরণ করিয়াই উহা পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু কার্যতঃ বহু বৎসরের আলোচনা ও আন্দোলন ছাড়া সেখানকার সংবিধান বদলানো যায় না।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান বদলানোর জন্য এক জটিল প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে (ষষ্ঠ প্রকরণের তৃতীয় অনুচ্ছেদ দেখ)। কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট রায় দিয়াও সংবিধানের কিছু অংশ বদলাইয়াছে। ভারতের সংবিধান নামে দুষ্পরিবর্তনীয় কিন্তু কার্যতঃ কংগ্রেসীদলের সংখ্যাধিক্য থাকায় অতি সহজেই বহুবার সংবিধানে পরিবর্তন আনা হইয়াছে।

২। Discuss the relative merits of rigid and flexible constitutions with illustrations.

পঞ্চম প্রকরণ দেখ।

৩। Explain the term constitution and describe the requisites of a good constitution.

প্রথম প্রকরণের সংজ্ঞা দেখ। সপ্তম প্রকরণে উত্তম সংবিধানের লক্ষণ পাইবে।

৪। "The distinction between rigid and flexible constitution is one of degree rather than kind." Illustrate.

৫ ও ৬ প্রকরণ দেখ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সরকারের বিভিন্ন রূপ

১। রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ কি সম্ভবপর? রাষ্ট্রের মৌলিক উপাদান হইতেছে ভূখণ্ড, জনসংখ্যা, সরকার ও সার্বভৌমিকতা। এই চারিটি উপাদানের কোন একটির অভাব থাকিলে রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে না। কিন্তু রাষ্ট্রের মধ্যে কোনটির ভূখণ্ড ও জনসংখ্যা কম-বেশি হইতে পারে, মানুষ লম্বা ও চওড়ায় ছোট বড় হইতে পারে। রাষ্ট্রের মূল উপাদান কয়টি যেখানে থাকিবে সেইখানেই সেই সংস্থা রাষ্ট্র নামে অভিহিত হইবে, যেমন মানুষের আকৃতি, প্রকৃতি ও বিচারশীলতা দেখিলে আমরা তাহাকে মানুষ আখ্যা দিই। মানুষ ধনী, নির্ধন, সজ্জন, দুর্জন যাহাই হউক না কেন তবুও সে মানুষ। তেমনি রাষ্ট্র ছোট হউক, বড় হউক, কৃষিপ্রধান হউক বা শিল্পপ্রধান হউক, একজনের দ্বারা শাসিত হউক বা বহুজনের দ্বারা শাসিত হউক তবুও মূলতঃ তাহা রাষ্ট্রই। এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের যে প্রভেদ দেখা যায় তাহা সরকারের বৈশিষ্ট্যজনিত। সেইজন্য সরকারের শ্রেণীবিভাগ সম্ভব, কিন্তু রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ হইতে পারে না। যখন আমরা কথায় বলি যে অমুক রাষ্ট্র ধনতান্ত্রিক, অমুক রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক, তখন প্রকৃতপক্ষে সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত বিশেষ কোন আর্থিক ব্যবস্থার কথাই বলি, রাষ্ট্রের স্বরূপগত বিভেদের কথা চিন্তা করি না।

২। আরিস্টটলকৃত শ্রেণীবিভাগ: আরিস্টটল রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখান নাই। তাই তিনি সরকারের শ্রেণীবিভাগকে রাষ্ট্রের শ্রেণী বিভাগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে শ্রেণী-বিভাগের মূলে দুইটি তত্ত্ব আছে। প্রথম হইতেছে সংখ্যাঘটিত—শাসনক্ষমতা একের হাতে, কয়েকজনের হাতে, কি বহুর হাতে ন্যস্ত আছে তাহা বিচার করা। দ্বিতীয় হইতেছে নীতিঘটিত—রাষ্ট্রের পরিচালনা শাসিতদের স্বার্থে অর্থাৎ জন-কল্যাণের জন্য কি শাসকদের ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার জন্য করা হয়। সকলের

সংখ্যা ও গুণগত বিভাগ

মঙ্গলের জন্য হইলে উহাকে রাষ্ট্রের স্বাভাবিক রূপ এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের উদ্দেশ্যে হইলে বিকৃত রূপ বলিয়া তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। রাষ্ট্রের স্বাভাবিক রূপে একজনের হাতে ক্ষমতা থাকিলে তাহা রাজতন্ত্র, কতিপয় লোকের হাতে থাকিলে অভিজাততন্ত্র এবং বহুলোকের হাতে থাকিলে গণতন্ত্র (Polity) নামে পরিচিত হয়। রাজতন্ত্র বিকৃত হইয়া স্বেচ্ছাচার-তন্ত্র (Tyranny), অভিজাততন্ত্র বিকৃত আকারে কুলীনতন্ত্র (Oligarchy) এবং গণতন্ত্র উচ্ছৃঙ্খল ও স্বার্থান্বেষী হইয়া জনতাতন্ত্রে (Democracy) পরিণত হয়। তাঁহার শ্রেণীবিভাগ নিম্নলিখিত আকারে দেখানো যাইতে পারে।

সংখ্যানুসারে বিভাগ	গুণানুসারে বিভাগ	
	স্বাভাবিক রূপ	বিকৃতরূপ
একজনের শাসন	রাজতন্ত্র	স্বৈরতন্ত্র
কয়েক জনের শাসন	অভিজাততন্ত্র	কুলীনতন্ত্র
বহুজনের শাসন	গণতন্ত্র (Polity)	জনতাতন্ত্র (Democracy)

এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে আরিস্টটল Democracy শব্দ নিন্দার্থে প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু আধুনিক যুগে উহা প্রশংসনীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। স্বৈরতন্ত্র বা Tyranny বলিতে তিনি একের স্বার্থসাধনের জন্য শাসনযন্ত্র ব্যবহার করা বুঝাইয়াছেন। অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র শ্রেণীনির্বিশেষে সকলের মঙ্গলসাধন করে, কিন্তু কুলীনতন্ত্র শুধু ধনীদের এবং জনতাতন্ত্র শুধু দরিদ্রের মঙ্গল চাহে।

গণতন্ত্রের বিশিষ্ট অর্থ

আরিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ এ যুগে অচল বলিয়া অনেকে মনে করেন। প্রথমতঃ দরিদ্রদের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে যে শাসনপ্রণালী পরিচালিত হয় তাহাকে তিনি বিকৃত বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রীদের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে বিত্তহীনদের একনায়কত্ব স্থাপন (Dictatorship of the Proletariat) এবং ধনীদের উচ্ছেদ করা। আরিস্টটল শ্রেণীহীন রাষ্ট্রের কথা ভাবিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়তঃ রাজতন্ত্র বলিতে এখন বিশেষ কিছুই নাই, কেননা কোথাও বংশানুক্রমিক প্রথায় রাজা

আরিস্টটলের মতের বিরুদ্ধে চারিটি সমালোচনা

হইয়া কেহ একচ্ছত্র আধিপত্য ভোগ করেন না। ইংলণ্ডে রানী বা জাপানে রাজা থাকিলেও সেখানকার শাসনপ্রণালীকে রাজতন্ত্র বলা চলে না। তৃতীয়তঃ কিছুকাল পূর্বে চীন, জাপান প্রভৃতি প্রাচ্য দেশের নরপতিরা নিজদিগকে দেবতা বলিয়া ঘোষণা করিতেন। সেইজন্য কোন কোন সমালোচক বলেন যে আরিস্টটল Theocracy বা দৈবতন্ত্রকে বাদ দিয়া অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছেন। কিন্তু ইহার উত্তরে বলা যায় যে যাঁহারা দৈবশক্তি দাবি করিতেন তাঁহারাও রাজা, সুতরাং তাঁহাদিগকে রাজতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা বিশেষ অন্যায় হয় নাই।

চতুর্থতঃ উড্রো উইলসন্ বলেন যে, রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের চাপে পড়িয়া অভিজাততন্ত্র নিষ্পেষিত হইয়াছে, এখন আর উহা দেখা যায় না। নেপোলিয়নের সময় পর্যন্ত ভিনিসে কুলীনতন্ত্র ছিল। ব্রাইসের মতে গণতন্ত্রের মধ্যেও অভিজাততন্ত্র রহিয়াছে। নামে বহুর শাসন হইলেও কাজে কতিপয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিই রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনা করেন। সেই হিসাবে আরিস্টটলের শ্রেণীবিভাগের দোষ দেওয়া যায় না।

আরিস্টটল কথিত শাসনচক্র

আরিস্টটলের মতে বিভিন্ন শাসনপ্রণালী চক্রবৎ ঘুরিতে থাকে (Aristotelian Cycle) রাজতন্ত্রের হাত হইতে অভিজাতেরা ক্ষমতা দখল করেন, তাঁহাদের মধ্যে যখন স্বার্থচিন্তা প্রবল হয় তখন উহা কুলীনতন্ত্রে পরিবর্তিত হয়, উহাদের কুশাসনের বিরুদ্ধে একজন শক্তিশালী ব্যক্তি জনতাকে জাগাইয়া নিজে ক্ষমতা অধিকার করিয়া লন ; তাঁহারই নাম Tyrant বা স্বৈরাচারী নায়ক ; আবার কালক্রমে তাঁহার বিরুদ্ধে জনসাধারণ বিপ্লব করিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে ; গণতন্ত্র জনতাতন্ত্রে পর্যবসিত হইলে আবার রাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা গণতন্ত্রকেই চূড়ান্ত শাসনপ্রথা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু কোন শাসনপ্রণালীই হয়তো চিরস্থায়ী নয়। আরিস্টটলের চক্রবৎ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত আধুনিক ইতিহাসের দ্বারা কতকটা সমর্থিত হইতেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালি ও জার্মানিতে গণতন্ত্র

উহার যাথার্থ্য

স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই উহার ধ্বংসাবশেষের উপর মুসোলিনি ও হিট্‌লারের একনায়কত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। প্রাচ্যের বহু গণতন্ত্রে সামরিক নেতা

একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। রাশিয়াতে নামে বিত্তহীনদের একনায়কত্ব স্থাপিত হইলেও, ক্রুশ্চেভের স্টালিননীতির নিন্দাবাদ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সেখানে Tyranny বা স্বৈরতন্ত্রই চলিয়াছিল। এইবার হয়তো রাশিয়ার নব-সংবিধানের প্রভাবে গণতন্ত্র স্থাপিত হইবে। সেইজন্য বহু সমালোচনা সত্ত্বেও আরিস্টটলের শ্রেণী বিভাগকে একেবারে অযৌক্তিক বলা চলে না।

৩। **মিশ্র শাসনতন্ত্র (Mixed States) ঃ** প্লেটো ও আরিস্টটল রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র—এই তিন ভাগে শাসনপ্রণালীকে বিভক্ত করিয়াছেন বটে, কিন্তু পলিবিয়াস্ যখন রোমের সরকারের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিতে প্রবৃত্ত হন তখন দেখিতে পান যে উহাতে ঐ তিন প্রকারের শাসনপ্রথাই মিশ্রিত রহিয়াছে। রোমের কনসালেরা রাজতন্ত্রের, সেনেট অভিজাততন্ত্রের ও জনসভাগুলি গণতন্ত্রের লক্ষণ বহন করে। সেইজন্য তিনি মিশ্রিত শাসনপ্রথা নামটি প্রবর্তন করেন। উনবিংশ শতাব্দীর কোন কোন ইংরাজ লেখক ইংলণ্ডের শাসনপ্রথাকেও মিশ্র (Mixed State) বলিয়াছেন। তাঁহারা রাজা বা রানীর মধ্যে রাজতন্ত্র, হাউস্ অব লর্ডসের মধ্যে অভিজাততন্ত্র এবং হাউস অব কমন্সের মধ্যে গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের এই মত কঠোরভাবে সমালোচিত হইয়াছে। রাজশাসন মানে যদি একজনের শাসন, অভিজাততন্ত্র মানে অর্ধেকের কম লোকের শাসন এবং গণতন্ত্র মানে অর্ধেকের বেশি লোকের শাসন হইলে একই সময়ে তিন ধরনের শাসন কি করিয়া প্রচলিত থাকিবে? ইংলণ্ডে ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের গৌরবময় বিপ্লবের পরে এবং ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ভোট সংক্রান্ত আইন পাশ হইবার পূর্বে অভিজাততন্ত্র প্রচলিত ছিল। সে সময়ে রাজার হাত হইতে ক্ষমতা লর্ড শ্রেণীর হাতে আসিয়াছিল। তারপর ভোটের অধিকার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত ক্ষমতা হাউস্ অব কমন্সের হাতে আসে। সুতরাং একই কালে তিন ধরনের শাসনপ্রণালীর সংমিশ্রণ কখনও হয় না বা হইতে পারে না। শাসনের চূড়ান্ত ক্ষমতা কোথাও বা একের, কোথাও বা অল্পসংখ্যক ব্যক্তির হাতে, আবার কোথাও সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে ন্যস্ত থাকে।

প্রাচীন রোম ও আধুনিক ইংলণ্ডের শাসনপ্রথা

মিশ্র শাসনতন্ত্র সম্ভব নহে

৪। **আধুনিক শাসনপ্রথার শ্রেণীবিভাগ :** আজকাল যে ধরনের শাসনপ্রথা বিভিন্ন দেশে প্রচলিত আছে তাহার বৈশিষ্ট্য সেকালের শ্রেণীবিভাগে ধরা পড়ে না। শুধু সংখ্যা এবং গুণের নীতিতে বিচার করিলে সরকারের অনেক প্রয়োজনীয় লক্ষণই বাদ পড়ে। জনমতের নিয়ন্ত্রণ কোন্ শাসনতন্ত্রের উপর কত বেশি সেই ভিত্তিতে সরকারকে প্রথমতঃ তিন বর্গে বিভক্ত করা যায়। প্রথমেই বলা ভাল যে, জনমতকে একটুও গ্রাহ্য করে না এমন সরকার পাওয়া কঠিন। কোন সরকার জনমতকে বেশি মানিয়া চলে, কোন সরকার কম মানিয়া চলে। যে সরকার জনমতকে কম মানে তাহাকে আমরা স্বৈরতন্ত্র বলিতে পারি। স্বৈরতন্ত্রের চেয়ে জনমতের সঙ্গে একটু বেশি সম্পর্ক আছে একনায়কতন্ত্রের, এবং জনমতের সঙ্গে পূর্ণ সম্বন্ধ আছে গণতন্ত্রের। স্বৈরতন্ত্রকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়—রাজতন্ত্র, সামরিক অধিনায়কতন্ত্র এবং অভিজাততন্ত্র।

সরকারের উপর জনমতের প্রভাব

স্বৈরতন্ত্র

রাজতন্ত্র সাধারণতঃ বংশানুক্রমিক হয়। পোলাণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজাকে নির্বাচিত করা হইত, কিন্তু নির্বাচকদের প্রভাবপ্রতিপত্তি অসামান্য ছিল, সুতরাং চরম ক্ষমতা রাজার হাতে ছিল না বলিয়া নির্বাচকদের হাতে ছিল বলিলে ঠিক হয়। সে কালের পোলাণ্ডের শাসনপ্রণালী তাই নামে রাজতন্ত্র হইলেও কাজে কুলীনতন্ত্র (Oligarchy) ছিল। রাজার শাসনের পিছনে জনমতের নীরব সমর্থন কিছুটা না থাকিলে ফ্রান্সের চতুর্দশ লুই বা ভারতের চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের ন্যায় রাজার পক্ষেও বেশি দিন রাজ্য চালানো সম্ভব হইত না, কেন না রাজা একা, শাসিত প্রজা সংখ্যায় বহু; গায়ের জোরে সকলকে দীর্ঘদিন দাবাইয়া রাখা সম্ভব নহে।

রাজতন্ত্র

আজকাল প্রাচ্য দেশে ও দক্ষিণ আমেরিকায় গণতন্ত্রের চিতাভস্মের উপর সামরিক অধিনায়কতন্ত্রের উদ্ভব হইতে দেখা যাইতেছে। গণতন্ত্রের নামে নানা প্রকার কদাচার যখন চলিতে থাকে, লোকের জীবনযাত্রার মৌলিক সমস্যাগুলি যখন শাসকবর্গ সমাধান করিয়া উঠিতে পারেন না তখন কোন সামরিক নেতা

সামরিক অধিনায়কতন্ত্র

সৈন্যদলের সাহায্যে সমস্ত শাসনক্ষমতা নিজের হাতে গ্রহণ করেন। বর্মা ও পাকিস্তানে দেখা গিয়াছে যে, সামরিক নেতা রাতারাতি কতকগুলি প্রভাবশালী লোককে গ্রেপ্তার করিয়া বিনা রক্তপাতে ক্ষমতা অধিকার করিয়াছেন। দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন রাষ্ট্রে সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা সামরিক কোন অধিনায়কের পক্ষে ক্ষমতা ছিনাইয়া লওয়া দুর্লভ ঘটনা নহে। ইউরোপেও এরূপ ঘটনা কয়েকবার ঘটিয়াছে। নেপোলিয়ন ডিরেক্টরদিগকে হটাইয়া নিজের হাতে সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্পেনের ফ্রাঙ্কো সামরিক ক্ষমতাবলে গণতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়াছিলেন এবং আজ পর্যন্ত ক্ষমতা পরিচালনা করিতেছেন।

কোন রাষ্ট্রে অল্প সংখ্যক লোক ছলে বলে কৌশলে ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হইতে পারেন। তাঁহারা জনসাধারণকে দাবাইয়া রাখেন।

কুলীনতন্ত্র

নেপোলিয়নের ইতালি বিজয়ের পূর্বে পর্যন্ত প্রায় হাজার বছর ধরিয়া ভিনিসে এইরূপ কুলীনতান্ত্রিক প্রথা প্রচলিত ছিল।

একনায়কতন্ত্র

একনায়কতন্ত্র (Dictatorship) স্বৈরতন্ত্র অপেক্ষা জনমতের সহিত অধিকতর সম্বন্ধযুক্ত। লোকে ডিক্টেটরকে নিজেদের নায়ক বলিয়া মানিয়া লয়। ডিক্টেটর সামরিক বাহিনীর নেতা নাও হইতে পারেন। তাঁহার দক্ষতা, সুবিবেচনা ও শৌর্য-বীর্যের দ্বারা তিনি লোককে মুগ্ধ করিয়া ক্ষমতা অধিকার করেন। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার শাসনকে ব্যক্তিগত একনায়কত্ব (Personal dictatorship) নামে অভিহিত করা হয়। প্রাচীন রোমে সালা (Sulla) ও জুলিয়াস্ সিজার এইরূপ ব্যক্তিগত একনায়কত্ব লাভ করিয়াছিলেন। বর্তমান যুগে মুসোলিনি ও হিট্লার যথাক্রমে ফ্যাসিস্ট ও নাৎসী দলের নেতারূপে একনায়কত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহাদের শাসনকে দলীয় একনায়কত্ব বলে। রাশিয়াতে প্রোলেটারিয়েট বা বিত্তহীন শ্রমজীবীদের যেরূপ একনায়কত্ব স্থাপিত হইয়াছে তাহাকে শ্রেণীগত একনায়কত্ব বলা হয়। শ্রেণীগত বৈষম্য লোপ করিয়া শ্রেণীহীন সমাজ স্থাপন করাই ইহার উদ্দেশ্য। তাহা হইলে একনায়কত্বের তিনপ্রকার ভেদ দেখা যাইতেছে—ব্যক্তিগত, দলগত ও শ্রেণীগত।

গণতন্ত্রকেও তিন প্রকারে বিভক্ত করা যায়। কতকগুলি গণতন্ত্রে রাজপদবী নাই, কতকগুলিতে আছে। ইংলণ্ড, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াতে রাজা বা রানীর পদ বজায় আছে, কিন্তু শাসন ব্যাপারে তাঁহাকে হস্তক্ষেপ করিতে কদাচিৎ দেওয়া হয়। অন্যান্য গণতন্ত্রে যথা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ভারতবর্ষ, ফ্রান্স, সুইট্জারল্যাণ্ড প্রভৃতিতে রাজা নাই, সুতরাং সাধারণতন্ত্র আছে। দ্বিতীয়তঃ গণতন্ত্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হইতে পারে। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে নাগরিকেরা এক জায়গায় মিলিত হইয়া সমবেতভাবে নিয়ম তৈয়ারি করে ও শাসকবর্গকে নির্বাচন করে। সুইট্জারল্যাণ্ডের কোন কোন ক্যাণ্টনে ও ভারতবর্ষের পঞ্চায়েত-গুলিতে এইরূপ বিধি আছে। প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকেরা যেখানে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া আইনসভায় পাঠায়, সেখানে পরোক্ষ গণতন্ত্র আছে বলিয়া ধরা হয়। তৃতীয়তঃ কোন কোন গণতন্ত্রে মন্ত্রিমণ্ডলী আইনসভার নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য; আইনসভা মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যত্র মন্ত্রিমণ্ডলী প্রেসিডেন্টের নিকট দায়ী; প্রেসিডেন্ট যাহাকে খুসি মন্ত্রী নিয়োগ করিতে পারেন ও যে কোন মন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিতে পারেন।

গণতন্ত্র

এই তিনভাবে গণতন্ত্রকে বর্গীকরণ ছাড়া আর একটি নীতিও অনুসরণ করিয়া ইহার শ্রেণী বিভাগ করা হয়। ইহাকে কেহ কেহ আঞ্চলিক নীতি নাম দিয়া থাকেন। কোথাও রাষ্ট্রের শাসনভার কতকটা যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের উপর ও কতকটা আঙ্গিক রাজ্যগুলির সরকারের উপর দেওয়া হয়; আবার কোথাও একটি মাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের উপর সকল শাসনভার ন্যস্ত থাকে। প্রথম প্রকারের গণতন্ত্রকে যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal) ও দ্বিতীয় প্রকারের নাম এককেন্দ্রীয় (Unitary) বলা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র ও এককেন্দ্রিক শাসন

শাসনব্যবস্থা সব রাষ্ট্রের এক রকম হইতে পারে না। প্রত্যেক সমাজের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক চেতনার বিভিন্নতা অনুসারে সরকারের সংগঠন ও প্রকৃতি বিভিন্ন রকমের হয়। নামে এক হইলেও কাজে শাসনপ্রণালী দুই দেশে দুই রকম হইতে পারে। ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে গণতান্ত্রিক

শাসনব্যবস্থা বিভিন্ন ধরনের হয় কেন?

ও পার্লামেণ্টারি শাসনপদ্ধতি প্রচলিত থাকিলেও দুই দেশের সরকার ঠিক একই রকমের নহে।

আধুনিক সরকারের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল তাহা নিম্নে একটি চার্টের সাহায্যে প্রদর্শিত হইতেছে।

ডাঃ স্ট্রং (Dr. Strong) পাঁচটি বিভিন্ন নীতিতে সরকারকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন। প্রথমতঃ রাষ্ট্রের শাসন একটি কেন্দ্র হইতে পরিচালিত হয়, কি অনেকগুলি আঞ্চিক রাজ্যের ও একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের দ্বারা হয় (Unitary or Federal)। দ্বিতীয়তঃ সংবিধান নমনীয় কি দুষ্পরিবর্তনীয়।

পাঁচটি বিভিন্ন নীতিতে বর্গীকরণ

তৃতীয়তঃ আইনসভার প্রকৃতি কিরূপ—ইহাতে দ্বিতীয় কক্ষ নির্বাচিত না বংশানুক্রমিক, উহার ক্ষমতা জনসাধারণের দ্বারা প্রত্যক্ষরূপে নির্বাচিত প্রথম কক্ষের তুল্য কি কম? চতুর্থতঃ শাসনকার্য কাহার নির্দেশ অনুসারে চলে—আইনসভার কি প্রেসিডেণ্টের, মন্ত্রিমণ্ডল আইনসভার নিকট দায়ী কি প্রেসিডেণ্টের নিকট দায়ী। পঞ্চমতঃ বিচারপ্রণালী কিরূপ—সরকারী কর্মচারীদিগকে সাধারণ আইনের দ্বারা সাধারণ বিচারালয়ে বিচার করা হয় কিংবা তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র বিচারালয় ও স্বতন্ত্র আইনের (Administrative Law) ব্যবস্থা আছে।

৫। রাজতন্ত্রের গুণ ও দোষঃ যে রাষ্ট্রে রাজা আছে তাহাকেই রাজতন্ত্র বলা চলে না। যেখানে রাজার হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকে, রাজার মতেই শাসনসংক্রান্ত সকল সমস্যার সমাধান করা হয় তাহাকেই প্রকৃত রাজতন্ত্র বলে। ম্যাক্ আইভার বলেন যে, রাজতন্ত্র বলিয়া স্বতন্ত্র কোন শাসনপ্রণালী থাকিতে পারে না, কেন না রাজাকে কতিপয় পরাক্রান্ত ও প্রভাবশালী ব্যক্তির উপর নির্ভর করিতে হয়। সেই ব্যক্তিদের হাতেই প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতা থাকে, সুতরাং উহাকে একপ্রকার কুলীনতন্ত্র বলা চলে।

রাজতন্ত্র কি অভিজাততন্ত্রের নামান্তর মাত্র

এই মত সর্বাংশে সত্য বলা যায় না। দুর্বল রাজারা অমাত্য ও অভিজাত শ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত হন বটে, কিন্তু এমন সুদক্ষ ও সুচতুর নরপতিও দেখা যায় যিনি কাহারও সম্পূর্ণ বশীভূত নহেন, যিনি এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে ও এক দলকে অন্য দলের বিরুদ্ধে লাগাইয়া দিয়া নিজের হাতে চরম ক্ষমতা রাখেন। প্রাচীন ভারতের নীতিশাস্ত্রে ও অর্থশাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, রাজা বিভিন্ন উপদেষ্টার মতামত গ্রহণ করিবেন, কিন্তু সিদ্ধান্ত স্থির করিবেন স্বয়ং। যেখানে লোকে মনে করে যে রাজা দেব অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন কিংবা তিনি দৈবশক্তির অধিকারী সেখানে তাঁহার অধিকার আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত জাপানের সম্রাট ভগবানের প্রতিনিধিরূপে পূজিত হইতেন। আজকাল ইংলণ্ড, নরওয়ে ও বেলজিয়ামের রাজবংশ প্রচুর সামাজিক মর্যাদা ভোগ করেন, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা তাঁহাদের খুব কম।

রাজতন্ত্রের প্রধান গুণ হইতেছে এই যে রাজা রাষ্ট্রকে নিজের সম্পত্তি বলিয়া মনে করেন, সেইজন্য তাহার উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন;

রাজতন্ত্রে অপব্যয় ও স্ববিরোধী কার্যকর্ম কম

কোন অপচয়, বা অপব্যয় যাহাতে না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। রাজা প্রজাদের মঙ্গলে নিজের কল্যাণ বিবেচনা করিয়া তাহাদের হিতসাধনে আত্মনিয়োগ করেন। হব্স বলেন যে, একটি সভার হাতে চরম ক্ষমতা থাকিলে বিভিন্ন দল বিভিন্ন রকমের নীতি অনুসরণ করে এবং পরস্পরের বিরোধী কাজ করে; রাজা স্ববিরোধী কাজ বড় একটা করেন না। রাজা মন্ত্রগুপ্তি বজায় রাখিয়া দেশরক্ষা করিতে পারেন ও পররাষ্ট্র

আক্রমণ করিতে পারেন। বিপদআপদের সময়ে রাজা যত তৎপরতার সহিত কাজ করিতে পারেন, অন্য কোন সরকার ততটা পারে না। রাজতন্ত্রে লাল ফিতার (Red tapism) উপদ্রব কম। রাজা যাহা ভাল বিবেচনা করেন তাহা আদেশ করেন এবং সকলে তাহা মানিতে বাধ্য হয়। রাজা সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

ভারতে সুশাসক বলিতে রামচন্দ্রের মতন রাজা বুঝায়। প্লেটো দার্শনিক রাজাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। কিন্তু ভাল রাজার সংখ্যা অত্যন্ত কম।

ভাল রাজার ছেলে অপদার্থ হইতে পারে

একজন রাজা বিচক্ষণ, সুবিচারক, কার্যক্ষম ও ন্যায়পরায়ণ হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার পুত্রও যে ঐ সকল গুণের অধিকারী হইবেন তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? গণতন্ত্রে ও অভিজাততন্ত্রে সুদক্ষ ব্যক্তি নির্বাচিত হন, কিন্তু রাজতন্ত্র বংশানুক্রমিক বলিয়া প্রকৃতির খেয়ালের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। রাজতন্ত্রের মধ্যে দরবারে ও হারেমে রেষারেষির অন্ত থাকে না। রাজার ছেলেরা সৌভ্রাত্র ভুলিয়া যাইয়া পরস্পরকে শত্রু মনে করে। রাজক্ষমতা নিরংকুশ বলিয়া রাজারা ক্ষমতার গর্বে ধরাকে সরা মনে করেন। অত্যাচারী রাজাদের কুশাসনে জনসাধারণের জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠে।

ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোন কোন রাজা জনকল্যাণমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও প্রচেষ্টায় দেশের সংহতি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়াছিল সত্য, কিন্তু উপর হইতে চাপ দিয়া কোন

জোর করিয়া প্রজার হিত করিতে গেলে অহিত হয়

সংস্কার সাধন করিতে গেলে তাহা স্থায়ী ফল প্রদান করে না। লোকে জুলুমের ভয়ে কিছুদিন নব সংস্কার মানিয়া চলে, তারপর আবার যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আবৃত হয়। জনকল্যাণকারী রাজার উত্তরাধিকারী যদি অত্যাচারী হন তাহা হইলে প্রজাদের দুর্গতির সীমা থাকে না।

রাজতন্ত্রের সবচেয়ে বড় দোষ হইতেছে এই যে, ইহাতে নাগরিকদের

প্রজার আত্মসম্মান থাকে না

আত্মসম্মান বজায় থাকে না। একজন আদেশ করিবে আর সকলে চিরকাল ধরিয়া তাহা নির্বিচারে পালন করিবে এই ব্যবস্থায় তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশ লাভ করিতে পারে না। সুশাসন কখনও স্বশাসনের চেয়ে ভাল হইতে পারে না।

৬। **অভিজাততন্ত্রের দোষ ও গুণঃ** রুশো অভিজাততন্ত্রকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—স্বাভাবিক, নির্বাচনমূলক ও বংশানুক্রমিক। বিদ্যা, বুদ্ধি, সুদক্ষতা প্রভৃতি গুণের বলে যাঁহারা শাসন করেন তাঁহাদিগকে স্বাভাবিক অভিজাত বলা যাইতে পারে। নির্বাচনের দ্বারা যাঁহারা হাতে শাসনক্ষমতা পান, তাঁহারা ঐ সব গুণের অধিকারী হইতেও পারেন, নাও পারেন। নির্বাচনে জয়লাভ করিতে হইলে লোকের মনোরঞ্জনের ক্ষমতা থাকা দরকার। বংশানুক্রমিক অভিজাতদের মধ্যে সদ্‌গুণ কিছু থাকিতে পারে বটে, কিন্তু তাঁহাদের মনে এমন একটা অহংকার থাকে যাহা তাঁহাদিগকে জনসাধারণের নিকট হইতে দূরে রাখে। কুলগত ও ধনগত ভেদে দুই প্রকার লোক বংশপরম্পরাক্রমে ক্ষমতার আসনে আসীন হইতে পারে। ধনীদের শাসন অপেক্ষা ভাল বংশের লোকের শাসন অনেক গুণে ভাল।

ত্রিবিধ অভিজাততন্ত্র

অভিজাততন্ত্র জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণ করে, ইহার বিরুদ্ধে লোকের মনে অশ্রদ্ধা জাগিলে ঐ শাসনতন্ত্রের পতন ঘটে। রোমের লোকে বিশ্বাস করিত যে শাসনকার্য বড়লোকেরই শোভা পায়। নির্বাচিত হইবার জন্য ও ভোটারদিগকে খুসি রাখিবার জন্য এত টাকা খরচ করার প্রয়োজন হইত যে সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা ব্যয় করা অসম্ভব হইত। রোমের ম্যাজিস্ট্রেটরা কোন বেতন পাইতেন না। ইংলণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীতে অভিজাত বংশের সন্তানেরা বিনা বেতনে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠানসমূহে এবং পার্লামেণ্টে সদস্যগিরি করিতেন।

প্রাচীন রোম ও ইংলণ্ডে অভিজাততন্ত্র

অভিজাতবর্গ পরিবর্তনকে ভয় করেন। তাঁহারা আশংকা করেন যে, বর্তমান ব্যবস্থার কিছু রদবদল করিলে হয়তো তাঁহাদের হাত হইতে ক্ষমতা অন্য শ্রেণীর হাতে চলিয়া যাইবে। সেইজন্য তাঁহারা খুব সংরক্ষণশীল হন। তাঁহারা স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া একই ধরনে পরিচালিত করেন। লোকে সেইজন্য বিশ্বাস করে যে, সহসা কোন পরিবর্তন ঘটিবে না। অভিজাততন্ত্রের সুনিপুণ কর্মক্ষমতা এবং উদ্যমশীলতা প্রশংসনীয়।

ইহার গুণ

অভিজাততন্ত্র (Aristocracy) প্রায়শঃই কুলীনতন্ত্রে (Oligarchy)

পরিণত হয়। শাসকবর্গ নিজেদের শ্রেণীগত স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য অন্যান্য শ্রেণীকে শোষণ করিতে থাকেন। স্বার্থসাধনের জন্য তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে কলহ করেন। তাঁহাদের দ্বন্দ্বের ফলে শাসনব্যবস্থা শিথিল হয়। এই ধরনের শাসনপ্রথার সবচেয়ে বড় দোষ হইতেছে শ্রেণীগত বৈষম্য। এক শ্রেণীর লোকে সকল প্রকার সুখসুবিধা ভোগ করিবে, আর অন্য সকলে বঞ্চিত থাকিবে, এই ব্যবস্থা অসহনীয়। ইঁহারা সংস্কারের বিরোধী হন এবং প্রাচীন প্রথার অচলায়তন গড়িয়া বসেন।

ইহার দোষ

কিন্তু যেখানে অভিজাতেরা একটি জাতি বা শ্রেণীতে পরিণত হন না, তাঁহাদের দলে গুণবান লোককে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকেন, সেখানে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রাইস্ বলেন যে, জগতে চিরকাল মাত্র এক প্রকার শাসনব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে—সেটি হইতেছে অল্পসংখ্যকের শাসন। রাজতন্ত্রে কয়েকজন প্রধান লোকই শাসন চালাইয়া থাকেন। আবার গণতন্ত্রেও প্রকৃত ক্ষমতা অল্প সংখ্যক কৃতী ব্যক্তিদের হাতে থাকে। তাই ব্রাইসের মতে নামে রাজতন্ত্রই বলা হউক আর গণতন্ত্রই বলা হউক অভিজাততন্ত্রই একমাত্র শাসনপ্রথা। কার্লাইল বলেন যে, বিজ্ঞজনের দ্বারা শাসিত হওয়াটা নির্বোধ ব্যক্তিদের চিরন্তন অধিকার ("It is the everlasting privilege of the foolish to be governed by the wise.")।

সকল প্রকার শাসনই মূলত অভিজাততন্ত্র

আধুনিক গণতন্ত্রে ধনী শিল্পপতিদের প্রভাব যথেষ্ট দেখা যায়। তাঁহারা পরোক্ষ উপায়ে সরকারের শাসননীতিকে নিজেদের স্বার্থে নিয়োজিত করেন। কোথাও বা আইনসভার সদস্যদিগকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া বশীভূত করেন; কোথাও বা শাসনবিভাগের কর্তৃপক্ষ আমদানি, রপ্তানি, শুল্ক এবং কর নির্ধারণের বেলায় তাঁহাদের স্বার্থের অনুকূল কাজ করেন, আবার কোন কোন রাষ্ট্রে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি শিল্পপতিদের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ সাহায্য গ্রহণ করে এবং যে পয়সা দেয় তাহারই কথামত বাজনা বাজাইবার নীতি অনুসরণ করিয়া তাহাদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রীয়

ধনিক সম্প্রদায়ের শাসন

ক্ষমতা পরিচালনা করে। ইহাও এক ধরনের অভিজাততন্ত্র। ইংরাজীতে ইহাকে plutocracy বা ধনিক সম্প্রদায়ের শাসন বলে।

৭। **দপ্তরশাহীর (Bureaucracy) দোষগুণ বিচার:** ইংরাজীতে ব্যুরোক্রেসি বলি বা বাংলায় দপ্তরশাহী বলি, শব্দটি নিন্দাসূচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। সরকারী কর্মচারীরা যেখানে জনমতের দ্বারা পরিচালিত হয় না, নিজদিগকে এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ বলিয়া মনে করে এবং নিজেদের মধ্যে উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে লাল ফিতার সাহায্যে গোপনে শাসনকার্য চালায় তাহাকে আমরা আমলাশাহী বলিয়া অবজ্ঞা করিতে অভ্যস্ত। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সরকারের স্থায়ী কর্মচারীদের শিক্ষাদীক্ষা পরীক্ষার দ্বারা কার্যে নিয়োগ, তাহাদের কাজ করিবার ধরন, আচার-আচরণ ও দায়িত্বজ্ঞানের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন। সুদক্ষ স্থায়ী কর্মচারীরা হইতেছেন শাসনযন্ত্রের প্রাণস্বরূপ। তাঁহাদের সততা ও কার্যক্ষমতার উপর সরকারের কার্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভর করে। মন্ত্রীরা জনমতের সঙ্গে পরিচিত, তাঁহারা জানেন কিরূপ নীতি অবলম্বন করিলে পরবর্তী নির্বাচনে বেশি ভোট পাওয়া যাইবে; কিন্তু কোন নীতিকে কার্যে রূপান্তরিত করিবার ভার থাকে স্থায়ী কর্মচারীদের উপর। কর্মচারীদের বিভিন্ন স্তর আছে। উচ্চস্তরের কর্মচারীরা একই দপ্তরে বহুকাল কাজ করিয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তাহার ফলে মন্ত্রীদিগকে মূল্যবান উপদেশ দিতে পারেন। অবশ্য মন্ত্রীরা সেই উপদেশ লইতেও পারেন, অগ্রাহ্যও করিতে পারেন। দুর্বল প্রকৃতির মন্ত্রীরা আমলাদের কথায় উঠেন বসেন। স্বাধিকারপ্রমত্ত হইয়া উচ্চস্তরের কর্মচারীদের উপদেশ যাঁহারা অগ্রাহ্য করেন, তাঁহাদিগকে অনেক দুর্ভোগ ভুগিতে হয়।

স্থায়ী কর্মচারীদের সততা ও দক্ষতার উপর শাসনপদ্ধতি অনেক নির্ভর করে

আজকাল জনকল্যাণ নীতি অবলম্বনের জন্য সরকারের কাজ অনেক বাড়িয়াছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমলাদের হাতে অনেক ক্ষমতাও আসিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা বিচারকের ন্যায় রায় দিবার ক্ষমতাও পাইয়াছেন। তাঁহাদের যোগ্যতার উপর লোকের ভালোমন্দ অনেকখানি নির্ভর করে।

আমলাদের ক্ষমতা-বৃদ্ধির কারণ

সাধারণ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা লইয়া কর্মঠ, সচ্চরিত্র ও বুদ্ধিমান-শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে সরকারী চাকুরিতে নিযুক্ত করা হয়; শিল্প প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা কিংবা ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি পদের জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করা হয়।

সরকারী কর্মচারীদের যোগ্যতা বিচারের জন্য কতকগুলি মাপকাঠি আছে। তাঁহাদের সৎ ও বুদ্ধিমান হওয়া প্রয়োজন। তাঁহাদের নিয়মানুবর্তিতা থাকা দরকার। সরকারী যন্ত্র বিশাল ও জটিল। প্রত্যেক কর্মচারী যদি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ পালন করিয়া কর্তব্য কর্ম না করেন তাহা হইলে বিশৃঙ্খলতা দেখা দেয়। কোন কর্মচারী যদি ভাবেন যে আইনসভার অমুক সদস্য তাঁহার আত্মীয় বা অমুক মন্ত্রী তাঁহার মুরুব্বি, সুতরাং তিনি অফিসের বড়কর্তার আদেশ অমান্য করিলেও তাঁহার কোন শাস্তি হইবে না, তাহা হইলে সুষ্ঠুভাবে ও সময়মত কাজ চালানো অসম্ভব হয়। ছোট বড় প্রত্যেক কর্মচারীর বিচার বস্তুনিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন। কেহ যেন না ভাবেন যে, অমুক আমার বন্ধু বা আত্মীয়, অমুক স্থানে আমার শ্বশুরবাড়ি; সেইজন্য অমুক ব্যক্তিকে বা অমুক স্থানকে যাহাতে বিশেষ সুবিধা দেওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। একজনের সুবিধা করিতে গেলে দশজনকে অসুবিধায় ফেলিতে হয়। সেইজন্য কর্মচারীদের ন্যায়পরায়ণ হওয়া প্রয়োজন।

আমলাদের বস্তুনিষ্ঠ ও নিয়মানুবর্তী হওয়া দরকার

সরকারী কাজে গোপনতা রক্ষা অবশ্য প্রয়োজন। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি সরকারের পরিকল্পিত কোন কাজের খবর পূর্ব হইতে সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা বেশ কিছু মুনাফা করিতে পারেন। মনে করুন কেহ যদি আগে হইতে খবর পান যে, অমুক গ্রামের ভিতর দিয়া একটা জাতীয় সড়ক যাইবে তাহা হইলে তিনি সস্তায় উহার দুইপাশের অনেক জমি কিনিতে পারেন এবং পরে সড়কের দরুণ দর বাড়িলে প্রচুর লাভবান হইতে পারেন। সরকারী কর্মচারীদের কাজের মধ্যে যেন একটা পূর্বাপর সম্বন্ধ থাকে। আজ একরকম নীতি অবলম্বন করা হইল, কাল আবার উহা বদলানো হইলে লোকের বড় অসুবিধা হয়। সরকারী কাগজপত্রে যাহাতে

গোপনতার প্রয়োজনীয়তা

স্পষ্টতা ও সুনির্দিষ্টতা থাকে তাহার প্রতি কর্মচারীদের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

সরকারী কর্মচারীরা সেকালের হিন্দু নারীদের মতন লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজেদের কর্তব্য কর্ম করিয়া যান। খবরের কাগজে নিজেদের নাম জাহির করিবার জন্য যাঁহারা ব্যস্ত হন তাঁহারা আদর্শ কর্মচারী হইতে পারেন না।

দপ্তরশাহীর প্রধান দোষ হইতেছে যে, সরকারী কর্মচারীরা মানুষের সুখ-দুঃখের চেয়ে তাঁহাদের দপ্তরের নিয়মকানুনকে উঁচুতে স্থান দেন। লোকের যত অসুবিধাই হউক না কেন, তাঁহারা নিয়মের একচুল এদিক ওদিক করিতে চাহেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে অ্যাকাউন্টস্ জেনারেলের দপ্তরে হিসাব নিকাশ করিতে এত দেরি হয় যে, কোন কোন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী ৪।৫ বছরের মধ্যেও পেন্সনের টাকা পান না; কেহ কেহ অভাবের তাড়নায় মৃত্যুমুখেও পতিত হন। জনমতের সঙ্গে সরকারী আমলাদের বিশেষ কোন সম্পর্ক থাকেনা, কেননা তাঁহারা নিজ নিজ দপ্তরের ফাইলের মধ্যে ডুবিয়া থাকেন।

গণতান্ত্রিক শাসনে মন্ত্রীরা মূল নীতি নির্ধারণ করিয়া দেন, এবং কর্মচারীরা তাহা কার্যে পরিণত করেন। আজকাল এত বেশি আইন পাশ করিতে হয় যে, আইনসভা খুঁটিনাটির মধ্যে না যাইয়া মোটামুটি নীতিগুলি আইনের মধ্যে বাঁধিয়া দেন এবং সরকারী দপ্তরগুলির উপর উহার অন্তর্গত ছোটখাট বিষয়ের উপর নিয়ম করিবার ভার দেন। ইহার ফলে কর্মচারীদের ক্ষমতা আজকাল অনেক বাড়িয়াছে। আমলাশাহী কথাটা নিন্দনীয় হইতে পারে, কিন্তু আমলাদের পূর্ণ সহযোগিতা ছাড়া সরকারী কাজ চালানো অসম্ভব।

মন্ত্রীর সহিত উচ্চ কর্মচারীদের সম্বন্ধ

অনুশীলন

১। (a) How far is it possible to classify the states?

(b) "Classification of forms of Government seems rather barren." Comment.

(a) প্রথম প্রকরণ দেখ।

(b) চতুর্থ প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

নামে যাহাই হউক না কেন, সকল প্রকার সরকারেরই ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে কতিপয় চতুর ও সুদক্ষ লোকের হাতে। তাই ব্রাইস বলেন—

"There has been only one form of government in the world, government of the few."

কি রাজতন্ত্রে, কি গণতন্ত্রে ক্ষমতা পরিচালনা করেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক। এক অধিনায়কতন্ত্রেও একজনের পক্ষে সব কাজের নির্দেশ দেওয়া অসম্ভব হয়।

২। Is it correct to say that Dictatorship is a necessary stage in the evolution of democracy? Give reasons for your answer.

প্রাচীন গ্রীসে কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে একনায়কতন্ত্রের অধীনে দেশে সংহতি আসিয়াছে এবং শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছে। তাহার উপর ভিত্তি করিয়া গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন করা সহজ। কিন্তু একনায়কত্ব ছাড়াও যে গণতন্ত্র কায়েম করা যায় তাহা ইংলণ্ডের ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস হইতে দেখা যায়।

৩। Give a critical estimate of Bureaucracy.

সপ্তম প্রকরণ দেখ।

চতুর্দশ অধ্যায়

—

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র

১। গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ও স্বরূপ ঃ গণতন্ত্র এক রকমের শাসনতন্ত্র বটে কিন্তু ইহার মূল হইতেছে এক বিশেষ প্রকারের সমাজব্যবস্থা। সেই সমাজব্যবস্থার অভাব যেখানে দেখা দেয়, সেখানে শাসনপ্রথা গণতন্ত্র নামে পরিচিত হইলেও, কাজে অন্য কিছুতে পরিণত হয়। গণতন্ত্রের চারা একদেশ হইতে তুলিয়া আনিয়া অন্য দেশে রোপণ করা চলে না। সমাজব্যবস্থারূপ অনুকূল জমি না পাইলে উহা শুকাইয়া যায়। তাই লাতিন আমেরিকায় এবং প্রাচ্যের অনেক দেশে গণতন্ত্র শিকড় গাড়িতে পারে নাই।

গণতন্ত্রের অনুকূল আবহাওয়া

প্লেটো আরিস্টটলের সময় হইতে গণতন্ত্রকে এক বিশেষ ধরনের শাসনব্যবস্থা বলিয়া ধরা হইতেছে। ইহার মূল উপাদান হইতেছে ব্যক্তি-স্বাধীনতা। জনগণ মতদানের স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া শাসকবর্গকে নির্বাচিত করিবে এবং শাসকগণ জনসাধারণের অভিপ্রায় অনুসারে শাসনকার্য চালাইবে ইহাই হইতেছে গণতন্ত্রের মূল তত্ত্ব। জনসাধারণ বলিতে কাহাকে বুঝাইবে? ব্রাইস্ বলেন যে, যে শাসনপ্রথায় জনসমষ্টির অন্ততঃ তিন চতুর্থাংশ নাগরিক এবং তাঁহাদের অধিকাংশের মতে শাসনকার্য চালান হয় তাহাই গণতন্ত্র। মোটামুটি বলিতে গেলে নাগরিকদের ভোটের শক্তি যেন তাহাদের শারীরিক বলের সমান হয়। বিয়াট্রিস ও সিডনী ওয়েব আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন যে কোন নির্দিষ্ট এলাকায় সমগ্র প্রাপ্তবয়স্ক অধিবাসীদের সংঘ যখন রাজনৈতিক আত্মশাসনের ক্ষমতা ও অধিকার ভোগ করে তখন উহাকে রাজনৈতিক গণতন্ত্র বলা হয়। তাঁহারা শতকরা ৭৫ জনের পরিবর্তে শতকরা ১০০ জনের অধিকার ভোগের কথা বলিয়াছেন।

জনসাধারণ বলিতে কি কি ও কাহাকে বুঝায়?

এই সংজ্ঞা দিয়া বিচার করিতে গেলে গণতন্ত্রশাসিত বলিয়া প্রসিদ্ধ বহু রাষ্ট্রকেই অগণতান্ত্রিক বলিতে হয়। প্রাচীন এথেন্সের অধিবাসীদের মধ্যে

শতকরা পঞ্চাশ জনই ছিলেন ক্রীতদাস ; শতকরা ১৫ জন ছিলেন বিদেশীয় অধিবাসী, তাঁহারা ব্যবসাবাণিজ্য করিতেন ও করভার বহন করিতেন, কিন্তু সকলপ্রকার রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিলেন। বাকী ৩৫ ভাগের মধ্যে মাত্র প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের হাতে শাসন-ক্ষমতা ছিল ; নারীদের কোন অধিকার ছিল না। ফরাসী বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে কেবল করদাতাদিগকে ভোটের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল ; দরিদ্র জনসাধারণ ও নারীরা সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমে এগারটি রাজ্যে কেবলমাত্র সম্পত্তির অধিকারীদিগকে ও দুইটি রাজ্যে করদাতাদিগকে ভোটের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। ইহার ফলে তথাকার অধিকাংশ রাজ্যে শতকরা তিনজনের বেশি ভোটার ছিল না। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম ভোটের আইন পাশ হইবার পরও পুরুষদের মধ্যে মাত্র শতকরা পাঁচজন ভোটের অধিকার পাইয়াছিল। ইংলণ্ডের মতন গণতান্ত্রিক দেশেও মেয়েরা ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ভোট দিতে পারিতেন না। সুতরাং আজ আমরা যে ধরনের শাসনপ্রণালীকে গণতন্ত্র বলিতেছি তাহা বিংশ শতাব্দীর পূর্বে কোথাও ছিল না।

প্রাচীন গণতন্ত্রগুলি কতটা গণতান্ত্রিক ছিল ?

কিন্তু গণতন্ত্রের সঙ্গে যদি অধিকাংশ অধিবাসীর ভোট দিবার অধিকারকে এক করিয়া না দেখি, তাহা হইলে খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর এথেন্স বা ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা যাইতে পারে। ম্যাক্ আইভার বলেন যে, গণতান্ত্রিক শাসনে সরকার জনগণের এজেণ্ট মাত্র এবং সেই হিসাবে তাঁহারা সরকারকে জবাবদিহি করিতে বাধ্য করেন। সি, এফ, স্ট্রং বলেন যে শাসিতগণের সক্রিয় সম্মতির উপর যে সরকার প্রতিষ্ঠিত তাহাকে গণতন্ত্র বলিয়া ধরা যায় ("Democracy implies that Government shall rest on active consent of the governed")।

শাসিতদের সক্রিয় সম্মতি

আব্রাহাম্ লিঙ্কন গণতন্ত্রকে 'Government of the people, by the people, for the people' বলিয়াছেন। For the people বা জনসাধারণের জন্য বা তাহাদের কল্যাণের জন্য শাসনকার্য চালানো হয়, এ কথা রাজা, ডিক্টেটার ও কুলীনতন্ত্রের শাসকেরাও বলিয়া থাকেন। বড় বড় রাষ্ট্রে

জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে শাসনে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না, পরোক্ষভাবে প্রতিনিধি নির্বাচনের সময়ে পাঁচ বছরে এক মিনিটের জন্য ভোট দিতে যাইয়া শাসনকার্যে সক্রিয় অংশ লয়। ইহাকে Government by the people বা জনসাধারণের দ্বারা শাসন বলা চলে না। কিন্তু ভোটারগণ যাঁহাদিগকে নির্বাচিত করেন, তাঁহারা আইনসভায় যাইয়া শাসনবিভাগকে কতটা এবং কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করেন তাহার উপর গণতন্ত্রের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। কোথাও কোথাও দেখা যায় যে, নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের অধিকাংশ যে দলভুক্ত সেই দলের নেতা যাহা বলেন তাহাই সকলে মানিয়া লয়; আইনসভার বিচারবিতর্ক কলেজে ডিবেটিং সোসাইটির আলোচনার মতন কোন বাস্তব ফল প্রসব করে না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভোটারগণ শুধু আইনসভার সদস্যগণকে নহে, তাঁহাদের প্রধান কর্মকর্তা বা প্রেসিডেন্টকেও নির্বাচিত করেন। প্রেসিডেন্টের হাতে বিপুল ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। সাধারণতঃ চার বৎসরের মধ্যে আইনসভার সদস্যেরা তাঁহাকে সরাইতে পারেন না। তিনি যে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন তাহা জনগণের নিকট হইতে নির্বাচনের ফলে তিনি লাভ করিয়াছেন। সুইট্জারল্যাণ্ডের লোকেরা গণনির্দেশ (Referendum), গণভোট (Plebiscite), গণউদ্যোগ (Initiative) এবং পদচ্যুতি (Recall) ব্যবহার করিয়া শাসন ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। সেইজন্য প্রত্যক্ষ ভাবে জনসাধারণের শাসন কেবল মাত্র সুইট্জারল্যাণ্ডে ও যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমী রাজ্য কয়টিতে প্রচলিত আছে। গণতন্ত্রে জনগণ তাঁহাদের স্বাধীন মতামত সংবাদপত্রে ও সভা-সমিতিতে ব্যক্ত করিতে পারেন এবং সেই জনমত অনুসরণ করিয়া শাসনবিভাগ তাঁহাদের কার্যের নীতিগঠন ও পরিচালনা করেন। এই হিসাবে গণতন্ত্রকে Government of the people বা জনগণের শাসন বলা চলে। মূল কথা হইতেছে এই যে, গণতন্ত্রে মতামত প্রকাশের স্বাতন্ত্র্য থাকা চাই, প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর ভোটের অধিকার থাকা চাই এবং নির্বাচিত ব্যক্তিরা জনমতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া চাই। এই তিনটি শর্তের কোন একটির অভাব হইলে গণতন্ত্র প্রহসনে পরিণত হয় এবং তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া বলা চলে Government of the people by the civil servants for the profiteers—মুনাফাশিকারীদের সুবিধার জন্য আমলাদের

দ্বারা পরিচালিত জনগণের শাসন। কিন্তু জনগণ যেখানে নিশ্চেষ্ট ও অসতর্ক থাকে সেইখানেই এরূপ ঘটিতে পারে। গণতন্ত্রের মূল কথা হইতেছে শাসক ও শাসিতের পার্থক্য দূর করা। ব্যাপকভাবে ভোটের অধিকার দেওয়া, মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া, নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন ব্যবস্থা প্রভৃতি গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য।

২। **প্রাচীন ও আধুনিক গণতন্ত্র:** প্রাচীন ভারতে, প্রাচীন গ্রীসের এথেন্স নগরীতে, প্রাচীন রোমে আধুনিক ধরনের গণতন্ত্র না থাকিলেও, একপ্রকার গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। বৈদিক যুগে সভা ও সমিতি রাজাকে নিয়ন্ত্রিত করিত। ঋগ্বেদে প্রার্থনা করা হইয়াছে যে, সমিতির সকলে যেন মিলিয়া মিশিয়া একচিত্ত হইয়া কাজ করিতে পারেন। বুদ্ধদেবের সময়ে শাক্য, বজ্জি ও লিচ্ছবিদের মধ্যে গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। ভগবান্ বুদ্ধ তাঁহার প্রিয় শিষ্য আনন্দকে বলিয়াছিলেন

প্রাচীন ভারতের গণতন্ত্র ও বুদ্ধদেবের মতে উহার সাফল্যের কারণ

"যতদিন বজ্জিগণ ঘন ঘন সভা ডাকিবার ও সভায় উপস্থিত হইবার অভ্যাস বজায় রাখিবেন এবং সকলে শান্তিপূর্ণভাবে কার্য সম্পাদন করিবেন ততদিন তাঁহাদের পতনের ভয় নাই। যতদিন তাঁহারা প্রাচীন প্রথার অনুসরণ করিবেন, যাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা পরিত্যাগ করিবেন না, যাহা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই তাহা বিধিবদ্ধ করিবেন না, যতদিন তাঁহার কুলবৃদ্ধদিগকে সম্মান করিবেন এবং তাঁহাদের কথা মানিয়া চলিবেন ততদিন তাঁহাদের অবনতি হইবে না, বরং উন্নতি হইবে।"

প্রাচীন এথেন্সে দাসগণের এবং বিদেশী বাসিন্দাদের নাগরিক অধিকার ছিল না। সেইরূপ বুদ্ধদেবের সমকালীন লিচ্ছবির সকল অধিবাসীর শাসন ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা ছিল না। সেখানে সাত হাজার সাতশত সাত জন রাজা উপাধিধারী ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহারাই সভাতে উপস্থিত হইয়া শাসনকার্য নিষ্পন্ন করিতেন। আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন যৌধেয় গণে পাঁচ হাজার ব্যক্তির হাতে শাসন ক্ষমতা ছিল। প্রাচীন মালবগণ, বৃষ্ণিগণ প্রভৃতির মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, সুতরাং প্রাচীন ভারতে যে গণতন্ত্র ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে উহা অভিজাততন্ত্র ঘেঁষা ছিল।

লিচ্ছবিগণের শাসন প্রণালী

প্রাচীন রোমে জনসাধারণের ভোটের অধিকার থাকিলেও তাঁহারা অভিজাতবর্গকে নির্বাচন করিতেন; সেইজন্য রোম অত্যন্ত শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু এথেন্স ও রোমের ইতিহাস হইতে প্রমাণিত হয় যে গণতন্ত্র ও সাম্রাজ্য একসঙ্গে টিকিতে পারে না। সাম্রাজ্যের ভোগ-ঐশ্বর্যের চাপে গণতন্ত্র নিষ্পেষিত হয়।

প্রাচীন গণতন্ত্রের সংকীর্ণতা

প্রাচীন গণতন্ত্র ও আধুনিক গণতন্ত্রের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। প্রাচীন গণতন্ত্রে শ্রমজীবীদিগকে ও নারীদের নাগরিক অধিকার দেওয়া হইত না। এই বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকেও দক্ষিণ আফ্রিকার ইউরোপীয় শাসকবর্গ দাবি করেন যে তাঁহারা গণতন্ত্রের অধীনে বাস করেন; কিন্তু তথাকার লোকসংখ্যার মাত্র এক ষষ্ঠাংশ হইতেছে ইউরোপীয়; তাহাদের হাতেই সকল ক্ষমতা রহিয়াছে, বাকি ছয়ভাগের পাঁচভাগ লোক সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া কোনপ্রকারে জীবন ধারণ করিতেছে। কিন্তু এটি নিয়মের একটি ব্যতিক্রম মাত্র। অন্যান্য আধুনিক গণতন্ত্রে ভোটের অধিকার প্রাপ্তবয়স্ক সকল নরনারীকেই দেওয়া হইয়াছে।

এথেন্সের গণতন্ত্র

প্রাচীন এথেন্সে ভোটের দ্বারা নির্বাচন করা হইত না, লটারি (Lot) করিয়া প্রায় সমস্ত কর্মচারীকে নির্বাচিত করা হইত; কেবলমাত্র যুদ্ধের সেনাপতিদের বেলায় এ নিয়ম খাটিত না। তাঁহারা ছাড়া প্রত্যেককেই প্রত্যেক কাজ করিবার যোগ্যতা-সম্পন্ন বলিয়া মনে করা হইত। যাঁহারা নাগরিক অধিকার ভোগ করিতেন, তাঁহাদিগকে অবশ্য কায়িক পরিশ্রম করিয়া বা ব্যবসাবাণিজ্য করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে হইত না। যদিও তাঁহাদের সকলেরই প্রচুর অবসর ছিল তথাপি তাঁহাদের বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি সমান ছিল না। তাই অনেক অযোগ্য ব্যক্তির হাতে শাসনক্ষমতা ন্যস্ত হওয়ার ফলে রাষ্ট্রের মধ্যে বিশৃঙ্খলা আসিয়াছিল।

প্রতিনিধি নির্বাচন আধুনিক প্রথা

প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার প্রথা আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য। সেকালে রাষ্ট্র ছিল নগরের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সুতরাং সকল নাগরিক একস্থানে মিলিত হইয়া আলোচনাদি করিতে পারিতেন। কিন্তু আধুনিক বড় বড় রাষ্ট্রগুলির পক্ষে এরূপভাবে কাজ করা অসম্ভব।

সেকালের গণতন্ত্রে আইনসভার গুরুত্ব এত বেশি ছিল না, কারণ প্রাচীন যুগে লোকে চিরাচরিত প্রথার দ্বারা অনুশাসিত হইত। আজকাল আইনসভা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাধান্য লাভ করে। সেকালে আইনসভা, বিচারবিভাগ ও শাসনবিভাগের মধ্যে কোন বিশেষ পার্থক্য ছিল না।

সেকালের আইন ও আইনসভা

প্রাচীন ও আধুনিক গণতন্ত্রের মধ্যে আর একটি প্রধান পার্থক্য দেখা যায় ব্যক্তির সহিত রাষ্ট্রের সম্বন্ধের মধ্যে। সেকালে ব্যক্তিকে সর্বাংশে রাষ্ট্রের অধীন ও অনুগত করিয়া রাখা হইত। ব্যক্তির জীবনধারা রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। আধুনিক গণতান্ত্রিকেরা বিশ্বাস করেন যে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি ও রক্ষা করিবার জন্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজন। ব্যক্তির জীবনে এমন অনেক জিনিস আছে ও থাকা দরকার যাহা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে।

সেকালের রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ

৩। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গণতন্ত্র (Direct and Indirect Democracy):

যেখানে ভোটারগণ সরাসরিভাবে নীতি নির্ধারণ করেন ও শাসন ব্যাপার ও শাসকদিগকে নিয়ন্ত্রণ করেন তাহাকে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলা যায়। তাঁহারা সোজাসুজি রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। আইন তাঁহাদের দ্বারাই তৈয়ারি হয় বা ঘোষিত হয়, শাসনবিভাগের কর্মচারীরা তাঁহাদের দ্বারা নির্বাচিত হন এবং শাসন-সংক্রান্ত সকল বিষয়ে জনগণ প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশ দেন। প্রাচীন গ্রীসে, বিশেষ করিয়া এথেন্স নগরীতে রোমের সাধারণতন্ত্রে ইহা প্রচলিত ছিল। উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র প্রথমতঃ নগররাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু রোম যখন সাম্রাজ্য বিস্তার করিল, তখন সাম্রাজ্যের লোকেরা ভোটের অধিকারী হইলেও রোম নগরীতে Comitia নামক সভায় সময় ও অর্থ ব্যয় করিয়া উপস্থিত হইতে চাহিত না। তাহারা যদি দলে দলে যোগ দিতে আসিত তাহা হইলে তাহাদিগকে স্থান দেওয়াই অসম্ভব হইত—সকলে মিলিয়া একসঙ্গে কাজ করা তো দূরের কথা। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের প্রধান ত্রুটি হইতেছে এই যে, ইহা নিতান্ত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র কি?

আধুনিক কোন রাষ্ট্রেই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত নাই, তবে স্বায়ত্তশাসন-মূলক প্রতিষ্ঠানে ইহা কোন কোন স্থানে বর্তমান আছে। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের পাঁচটি ক্যাণ্টনে, আমেরিকাস্থিত নিউ ইংলণ্ডের কয়েকটি সহরে ও ভারতের গ্রামপঞ্চায়েতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র রহিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বাণ্টু জাতির মধ্যেও স্থানীয় কার্য নির্বাহ করিবার জন্য জনগণের একস্থানে মিলিত হইবার প্রথা আছে।

এ যুগে উহার প্রভাব

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে নাগরিকেরা অনুভব করিতে পারেন যে, শাসন ব্যাপারে তাঁহারাই মালিক। হয়তো ইহাতে তাঁহাদের দায়িত্বজ্ঞান বৃদ্ধি পায়। শাসনসংক্রান্ত আলোচনা করিতে যাইয়া তাঁহারা রাজনৈতিক শিক্ষাও লাভ করেন। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে এথেন্সের মহান নেতা পেরিক্লিস গণতন্ত্রের গুণ গান করিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন—"আমাদের সহিত অন্যান্য রাষ্ট্রের তফাৎ এই যে, যে ব্যক্তি রাজনৈতিক ব্যাপার হইতে দূরে থাকে তাহাকে আমরা শান্তশিষ্ট বলি না, কিন্তু অকেজো বলিয়া মনে করি। অন্যেরা মনে করেন, যেখানে কাজ করিতে হইবে সেখানে কথা শোভা পায় না, আমাদের মতে ভালভাবে আলোচনা না করিয়া কোন কাজ করিতে গেলে তাহা ব্যর্থ হইবেই; সেইজন্য আমরা সকলে উপস্থিত থাকিয়া রাষ্ট্রের নীতিগত সকল প্রশ্নে বিতর্কের দ্বারা সিদ্ধান্ত করি।"

ইহার গুণ

কিন্তু আধুনিক আইনসভার মতন এথেন্সে রাজনৈতিক আলোচনায় মাত্র পাঁচ সাত শত লোক উপস্থিত থাকিতেন না, হাজার হাজার লোক উপস্থিত থাকিতেন। এত লোকের মধ্যে রাষ্ট্রের অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, শাসকদের বিরুদ্ধে অন্যায়-অবিচারের অভিযোগ প্রভৃতি ব্যাপারে ধীর চিত্তে আলোচনা করা অসম্ভব হইত। মনে রাখা প্রয়োজন যে, সে যুগে লাউড স্পীকার ছিল না; সেইজন্য গলার জোর খুব বেশি না থাকিলে কেহ শ্রোতৃবৃন্দের এক দশমাংশের কাছেও নিজের বক্তব্য পৌঁছাইয়া দিতে পারিতেন না। হাজার হাজার লোকের সামনে চীৎকার করিয়া বক্তৃতা করিতে যাইয়া বক্তারা প্রাজ্ঞজনোচিত ধীরতা দেখাইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। তাই এথেন্সে গণবক্তার (Demagogue) সংখ্যা খুব বাড়িয়াছিল। ম্যাডিসন বিদ্রূপ করিয়া

বহুলোকের হট্টগোল

বলিয়াছেন যে এরূপ ক্ষেত্রে এথেন্সের পক্ষে সক্রেটিসের মতন লোককে বিষ খাওয়াইয়া প্রাণদণ্ড দিয়া কাল আবার তাঁহার প্রতিমূর্তি স্থাপনে আদেশ দেওয়া বিচিত্র নহে।

এথেন্সের জনসভাতে (Ecclesia) আইন অবশ্য বেশি তৈয়ারি করা হইত না, কেননা সেখানে প্রথার প্রভাব ছিল খুব বেশি। কিন্তু যাহা কিছু আইন প্রণয়ন করা হইত তাহা উঁচু রকমের হইত না। হাজার হাজার লোকের হৈ-হল্লার মধ্যে সুষ্ঠুভাবে প্রস্তাবিত আইনের দোষগুণ বিচার করা যায় না। উহার সংশোধনী প্রস্তাব আনিবার কোন ব্যবস্থাও সেখানেও ছিল না। এথেন্সের তুলনায় রোমের কমিসিয়া (Comitia) নামক জনসভায় আইন তৈয়ারির ব্যবস্থা অনেক ভাল ছিল। সেখানে হয় সেনেটের অভিজাতবর্গের দ্বারা নয় তো কমিসিয়ার সভাপতির দ্বারা আইনের খসড়া প্রস্তুত হইত; সুতরাং উহা সুস্পষ্ট, সুবোধ্য ও সংক্ষিপ্ত হইত। কমিসিয়াতে উহার আলোচনা হইত না এবং সংশোধন করাও হইত না, শুধু সম্মতি বা অসম্মতি জানান হইত। রোমের জনসভাতে বেশি লোক উপস্থিত হইত না।

এথেন্স ও রোমে আইন-তৈয়ারি প্রণালীর বিভিন্নতা

প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রকে অপ্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলা হয়, কারণ জনসাধারণ সরাসরি শাসনকার্যে বা আইন প্রণয়নে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না, তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধির সাহায্যে পারে। একটি বিস্তীর্ণ এলাকা হইতে ৫০।৬০ হাজার ভোটার ভোট দিয়া একজনকে পাঁচ বৎসরের জন্য আইনসভায় পাঠাইয়া থাকেন। ৫০ হাজার ভোটারের মধ্যে হয়তো ২০ হাজার ভোটার ঐ প্রতিনিধির পক্ষে ভোট দেন, ১৯ হাজার অন্য লোকের পক্ষে ভোট দেন এবং ১১ হাজার অনুপস্থিত থাকেন। তাহা হইলে ঐ প্রতিনিধি ৫০ হাজারের মধ্যে মাত্র ২০ হাজারের প্রতিনিধি। নির্বাচন সম্বন্ধীয় অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিব। এখানে এইটুকু বলিয়া রাখা দরকার যে অপ্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে একজন ভোটার নিজেকে সমুদ্র উপকূলের বালুকাস্তূপের মধ্যে মাত্র একটি বালুকণা বলিয়া মনে করে।

অপ্রত্যক্ষ গণতন্ত্র

৪। **প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের নীতি :** কোন কোন প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে আইন তৈয়ারি, সংবিধান সংশোধন, সরকারী

কার্যনীতির বিশেষ কোন সমস্যা প্রভৃতি ব্যাপারে জনগণের প্রত্যক্ষভাবে ক্ষমতা ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে। ঐ সব ব্যবস্থাকে গণনির্দেশ (Referendum), গণ-উদ্যোগ (Initiative), গণভোট (Plebiscite) ও পদচ্যুতি (Recall) নামে অভিহিত করা হয়।

Referendum বা গণনির্দেশ বলিতে কোন প্রস্তাবিত আইন অথবা সংবিধানে সংশোধনী সম্বন্ধে ভোটারদের সম্মতি আছে কিনা তাহা জানিবার ব্যবস্থা বুঝায়। সুইট্জারল্যাণ্ডে সাধারণ আইন পাশ করিতে হইলে প্রথমে আইনসভার উভয় সদনের উহাতে সম্মতি প্রয়োজন। তারপর ত্রিশ হাজার প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ অথবা আটটি ক্যাণ্টন যদি দাবি করে যে, উহাতে গণনির্দেশ (Referendum) লওয়া হউক তাহা হইলে ভোটারদের সামনে উহা পেশ করা হয় এবং তাঁহাদের অধিকাংশ যদি উহাতে সম্মতি দেন তবে উহা গৃহীত হয়। কোন বৈদেশিক শক্তির সহিত সন্ধি যদি পনের বছরের বেশি বা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বলবৎ করার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে উহার সম্বন্ধেও গণনির্দেশ লওয়া দরকার হয়।

Referendum বা গণনির্দেশ

সুইট্জারল্যাণ্ডে সংবিধানের পরিবর্তন করিতে হইলে গণনির্দেশ অবশ্য গ্রহণীয়। পঞ্চাশ হাজার নাগরিক কোন পরিবর্তন প্রস্তাব করিতে পারেন, অথবা আইনসভাকে প্রস্তাব আনিতে অনুরোধ জানাইতে পারেন। আইনসভা সম্মত হইলে গণনির্দেশ লওয়া হয়। সংবিধানকে যদি সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিতে হয় তাহা হইলে প্রথমে উহা প্রয়োজন কিনা তাহা গণনির্দেশের দ্বারা ঠিক করা হয়। যদি অধিকাংশের মতে প্রয়োজন বিবেচিত হয় তাহা হইলে আইনসভার উভয় সদনের পুনর্নির্বাচন করা হয়; নব-নির্বাচিত কক্ষদ্বয় পরিবর্তিত সংবিধানের খসড়া তৈয়ারি করে এবং উহা যদি গণনির্দেশে অধিকাংশ ভোটার এবং অধিকাংশ ক্যাণ্টনের দ্বারা স্বীকৃত হয় তবে কার্যকরী হয়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের পরে আর সুইট্জারল্যাণ্ডের সংবিধানের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে নাই।

সংবিধানের পরিবর্তনে উহার প্রভাব

সোভিয়েট রাশিয়াতে প্রিসিডিয়াম যে কোন আঙ্গিক রাজ্য বা Union Republic-এর অনুরোধে যে কোন বিষয়ে গণনির্দেশ লইতে পারে

সুইডেনের আইনসভা কখনও কখনও কোন কার্যনীতি অথবা আইন সম্বন্ধে জনগণের কি ইচ্ছা তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য গণনির্দেশ গ্রহণ করে। কিন্তু কোন বিষয়ে তাহারা উহা লইতে বাধ্য নহে এবং লইলেও গণনির্দেশকে কার্যে পরিণত করিতে তাহারা বাধ্য নহে। ইতালি ও ফ্রান্সে সংবিধান পরিবর্তন করিতে হইলে হয় আইনসভার শতকরা ষাট ভাগ সদস্যের সম্মতি প্রয়োজন অথবা অধিকাংশের সম্মতি এবং গণনির্দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। অস্ট্রেলিয়ার সংবিধান পরিবর্তন করিতে হইলেও গণনির্দেশে অধিকাংশ ভোটারের ও অধিকাংশ আঞ্চিক রাজ্যের সম্মতি গ্রহণ করিতে হয়।

রাশিয়া, সুইডেন ও ফ্রান্সে গণনির্দেশ

Initiativo বা গণ-উদ্যোগের দ্বারা নাগরিকেরা আইনসভাকে কোন বিশেষ আইন তৈয়ার করিতে অনুরোধ করিতে পারেন। সুইট্জারল্যাণ্ডের ক্যান্টন সমূহে সাধারণ আইন প্রণয়ন বিষয়ে ভোটারদের এই স্বাধীনতা আছে; কিন্তু তথাকার যুক্তরাষ্ট্রে কেবলমাত্র সংবিধান পরিবর্তনের জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। সংবিধান পরিবর্তনের জন্য পঞ্চাশ হাজার নাগরিকের অনুরোধ প্রয়োজন হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ১৯টি আঙ্গিক রাজ্যে আইন পরিবর্তনের জন্য ও ১৪টি রাজ্যে সংবিধান পরিবর্তনের জন্য গণ-উদ্যোগ ব্যবহৃত হয়।

Initiative বা গণউদ্যোগ

নির্দিষ্ট সংখ্যক নাগরিক যদি কোন আইনসভার বা শাসকমণ্ডলীর সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, তাহা হইলে পশ্চিম আমেরিকার কয়েকটি রাজ্যে ঐ বিষয়ে নাগরিকদের ভোট লওয়া হয় এবং অধিকাংশ ভোটার মত দিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পদচ্যুত করা হয়। ইহাকে Recall বা পদচ্যুতি বলা হয়। ইহার ফলে দলের ও ব্যক্তিদের মধ্যে রেষারেষি বাড়িয়া যায়, একে অপরকে অপদস্থ করিবার জন্য সব সময়ে চেষ্টা করেন এবং কেহই প্রশান্ত মনে সদস্যগিরি করিতে পারেন না। তবে নির্বাচনের দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ বর্ষের মধ্যে যদি ইহা ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা থাকে তাহা হইলে আইনসভার সদস্যেরা ভুলিতে পারেন না যে তাঁহারা তাঁহাদের নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট হইতেই ক্ষমতালাভ করিয়াছেন।

Recall বা পদচ্যুতি

সাংবিধানিক নিয়মে কোন আইন বা সংবিধান সম্বন্ধে যখন ভোটারদের মত লওয়া হয় তাহাকে গণনির্দেশ বলে আর যখন কোন বিশেষ কার্যনীতি বা সমস্যা বিষয়ে তাঁহাদের মতামত জিজ্ঞাসা করা হয় তখন উহাকে Plebiscite বা গণভোট বলে। নেপোলিয়ান জনগণের মত গ্রহণ করিয়া প্রথমে কন্‌সাল এবং পরে সম্রাট পদবী গ্রহণ করেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র তৃতীয় নেপোলিয়নও ঐভাবে ফ্রান্সের দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্রের স্থলে সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। হিট্‌লার ও মুসোলিনি গণভোট লইয়া অনেক কাজ করিতেন, কিন্তু ভোটারদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা ছিল না, কাজে কাজেই একনায়কগণ গণভোটের সমর্থন পাইতেন। সম্প্রতি ফ্রান্সের দ্য গ্যল কোন কোন বিষয়ে গণভোট লইয়া শক্তিশালী হইয়াছেন।

Plebiscite বা গণভোট

আইন ও শাসন ব্যাপারে জনসাধারণের প্রত্যক্ষরূপে হস্তক্ষেপ অনেকেই সমর্থন করেন না। যদি জনসাধারণের হাতে আইনের প্রস্তাব করিবার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে এক আইনের সঙ্গে অন্য আইনের সামঞ্জস্য থাকিবে কিরূপে? আজকাল প্রায় সকল আইনেরই অর্থনৈতিক ফলাফল বিচারবিবেচনা করিতে হয়, কিন্তু জনগণ তাহা করিবার যোগ্যতা রাখেন কি? সুইট্‌জারল্যাণ্ডের কথা স্বতন্ত্র, সেটি ছোট রাষ্ট্র, সেখানকার লোক শিক্ষিত এবং বৈদেশিক নীতিতে নিরপেক্ষ। সুতরাং সেখানে উহা কিছু পরিমাণে সফল হইলেও, অন্যত্র ইহা সুফল অপেক্ষা অধিক কুফল প্রসব করিবে বলিয়া আশংকা হয়। একজন লেখক উপমা হিসাবে বলিয়াছেন যে, এরোপ্লেনে চড়িয়া যদি আরোহীরা পাইলটকে বলিতে থাকেন কি ভাবে চালাইতে হইবে, কোনদিকে যাইতে হইবে তাহা যেমন বিপজ্জনক হয় তেমনি জনসাধারণের পক্ষে আইন ও সংবিধানের পরিবর্তন সম্বন্ধে মত দেওয়া বিপদসংকুল।

প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের দোষগুণ

গণনির্দেশ, গণভোট প্রভৃতিকে খুব শিক্ষাপ্রদ বলিয়া দাবি করা হয়। ভোটাররা দেশের কথা ভাবিয়া চিন্তিয়া ভোট দিলে রাজনৈতিক শিক্ষা তাঁহারা নিশ্চয়ই পান। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় যে, রাজনৈতিক দলগুলি কোন প্রস্তাবের স্বপক্ষে বা

উহা কি শিক্ষাপ্রদ?

বিপক্ষে ভোট জোগাড় করিবার কাজে উঠিয়া পড়িয়া লাগে এবং তাহারা যাহা বলে অধিকাংশ ভোটারই তাহা মানিয়া চলে। এরূপ হইলে শিক্ষা তাহাদের বিশেষ কিছুই হয় না। ফাইনার সুইট্জারল্যাণ্ডের গণনির্দেশ প্রণালীর বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, নির্বাচনের সময়ে ভোটারদের যেরূপ মত প্রকাশ পায়, গণনির্দেশের সময়ও প্রায় সেইরূপ মত জয়ী হয়।

৫। **গণতন্ত্রের গুণ**ঃ গণতন্ত্র মানুষের মর্যাদার মূল্য যতটা দেয় এমন আর অন্য কোন শাসনপ্রণালী দেয় না। ইহাতে ছোট বড়, গরীব, বড়লোক, স্ত্রী-পুরুষের সমান মর্যাদা। প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুটনের জন্য গণতান্ত্রিক শাসন সমান প্রযত্নশীল। এই শাসনবিধিতে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মতামত লইয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শাসক ও আইন প্রণেতৃবর্গকে নিযুক্ত করা হয়। নির্বাচনের সময় ধনী মানী নির্বাচন-প্রার্থীকেও দীনতম ভোটারের নিকট যাইয়া তাঁহার সমর্থন চাহিতে হয়।

মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ভোটারদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করে যে তাহাদের অবলম্বিত নীতি প্রতিপক্ষদলের নীতি অপেক্ষা ভাল। ভোটের গণনাকালে সকলের ভোটেরই মূল্য সমান। কোন বিদ্বান বা গণ্যমান্য লোক দাবি করিতে পারেন না যে, দরিদ্র ও অশিক্ষিত ভোটারদের ভোটের অপেক্ষা তাঁহার ভোটকে বেশি মূল্য দেওয়া হউক। সকলের সঙ্গে সমান মর্যাদা পাইয়া প্রত্যেকে নিজের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল হয়।

নিজেকে কেহ হীন বা অবজ্ঞার পাত্র বলিয়া মনে করে না। রাজতন্ত্রে, অভিজাততন্ত্রে বা একনায়কতন্ত্রে সাধারণ মানুষ ভাবে যে, সে বুঝি বড়-লোকদের হুকুম তামিল করিবার জন্যই জন্মিয়াছে।

গণতন্ত্রই একমাত্র শাসনপ্রণালী যেখানে শাসক ও শাসিতদের মধ্যে কোন কোন অনতিক্রমণীয় স্তরের ভেদ নাই। শাসিতদের সম্পত্তির উপরই

শাসক ও শাসিত একই

শাসকগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত। যে মুহূর্তে শাসিতেরা অনুভব করিবেন যে, শাসকগণ আর তাঁহাদের মত অনুসারে কাজ করিতেছেন না সেই মুহূর্তে তাঁহাদের দাবি করিবার অধিকার আছে যে সরকারের পরিবর্তন ঘটুক। নূতন

নির্বাচনের সময় তাঁহারা ভোট দিয়া অন্য দলের লোককে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। অনভিপ্রেত সরকারকে এইরূপে বিনা রক্তপাতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সরানো যায়। অন্য কোন শাসনতন্ত্রে এইরূপ সুবিধা নাই। বিপ্লবের পরিবর্তে ক্রমবিকাশের দ্বারা যাঁহারা অভীষ্ট সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে চাহেন, তাঁহারা গণতন্ত্রই পছন্দ করেন।

বিপ্লব প্রয়োজন হয় না

গণতন্ত্রে শাসিতদের ইচ্ছা অনুসারে সরকারী কার্যনীতি নির্ধারিত হয়। পায়ে যে লোক জুতা পরে, সেই জানে জুতার কাঁটা কোথায় ব্যথা দিতেছে, বাইরের লোকের পক্ষে উহা জানা সম্ভব নহে। সেইজন্য জনসাধারণের দুঃখকষ্ট দূর করিবার জন্য গণতন্ত্র যতটা চেষ্টা করে, এমন আর অন্য কোন শাসনতন্ত্র করে না। কোন ভাল ব্যবস্থাও যদি অন্যে ঠিক করিয়া জনসাধারণকে উহা অনুসরণ করিতে বলে, তাহা হইলে লোকে মনে করে এ বোঝা আবার তাহাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইল কেন? তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর ফেড্রিক দি গ্রেট, পিটার দি গ্রেট প্রভৃতি আলোকপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাচারী নৃপতির (Enlightened despots) প্রবর্তিত সমাজসংস্কারগুলি প্রজারা ভাল মনে গ্রহণ করেন নাই। গণতন্ত্রে জনসাধারণ ভুলভ্রান্তি অনেক করে সন্দেহ নাই, কিন্তু শিশু যেমন পড়িতে পড়িতে দাঁড়াইতে শিখে, লোকে তেমনি পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিতর দিয়া উপযোগী ব্যবস্থা আবিষ্কার করে।

লোকে নিজেদের সুখ-সুবিধা বুঝিয়া সরকারকে নির্দেশ দেয়

গণতন্ত্রের মহৎ গুণ এই যে ইহাতে, ধীরে সুস্থে যুক্তিতর্ক দিয়া লোককে বুঝাইয়া কাজ লওয়া হয়। ইহা জনমতের রাজ্য; তাই জনমতকে যাহাতে অনুকূলে আনা যায় তাহার জন্য প্রত্যেক রাজনৈতিক দলপতি সকল প্রকার চেষ্টা করেন। যেখানে গণতন্ত্র নাই, সেখানে লোককে ঠ্যাঙ্গাইয়া ঠাণ্ডা করা হয়। গণতন্ত্রে গুলিগোলার বা বুলেটের পরিবর্তে ব্যালটপত্র ব্যবহার করা হয়। কোন প্রস্তাবের স্বপক্ষে জনমতকে অনুকূল করিবার জন্য তাহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করা হয়। বুঝাইবার জন্য উহার সমর্থনে যত কিছু যুক্তিতর্ক আছে তাহা প্রয়োগ করা হয়। কখনও কখনও শুকনো তর্ক অপেক্ষা

যুক্তিতর্কের ও সহিষ্ণুতার মহত্ব

বিশেষ কোন ভাবের প্রতি উন্মাদনা জাগাইতে পারিলে বেশি কাজ হয়। গণতন্ত্র বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমস্যা বুঝিতে চাহে এবং বুঝিয়া সুঝিয়া উহার সমাধান করিতে চায়। কোন সম্প্রদায়কে—উহা ভাষা, ধর্ম বা আর্থিক অবস্থাগত হউক না কেন—উচ্ছেদ করা গণতন্ত্রের অভিপ্রেত নহে। পরমত-সহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের এক প্রধান গুণ। যেখানে অপরের মত বুঝিবার বা অপরের যুক্তিতর্ক শুনিবার মতন ধৈর্য নাই, সেখানে গণতন্ত্র টিকিতে পারে না। তাই বলা হয় যে পরস্পরের প্রতি সদিচ্ছা, পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা, যুক্তিতর্ক দিয়া লোককে বুঝাইবার চেষ্টা ও পরমতসহিষ্ণুতা—এই চারিটি স্তম্ভের উপর গণতন্ত্রের সৌধ দাঁড়াইয়া আছে।

গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত অনুসারে কাজ করা হয় বটে, কিন্তু সংখ্যালঘুদের মতামতকে যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হয়। সংখ্যালঘুরা

মত প্রকাশের স্বাধীনতা

যাহাতে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা যথার্থ গণতন্ত্রে থাকে। সভাতে, আলাপ-আলোচনায়, সংবাদপত্রে ও পুস্তকপুস্তিকার মাধ্যমে প্রত্যেকে তাহার মতামত অকুণ্ঠচিত্তে প্রকাশ করিতে পারে। অমুককে সমালোচনা করিতে বা অমুক ব্যবস্থাকে খারাপ বলিতে কেহ কোন দ্বিধাসংকোচ বোধ করে না।

গণতন্ত্রে ব্যক্তি অপেক্ষা আইন বড়। আইনের নিরপেক্ষ ও নৈর্ব্যক্তিক শাসনের অধীনে প্রত্যেকে নিজ নিজ ধনপ্রাণ লইয়া কালযাপন করিতে

আইনের ছত্রছায়া

পারে। আইনের চোখে সকলে সমান। কেহ কাহারও চেয়ে বেশি অধিকার ভোগ করিতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে সাম্য ও স্বাধীনতা হইতেছে গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র।

রাজতন্ত্রে বা অভিজাততন্ত্রে লোকে মনে করে, যেই ক্ষমতা পাক না কেন তাহাতে কি আসে যায়? যে রাজা হইবে তাহাকেই খাজনা দিতে

দেশপ্রেম

হইবে। এইরূপ বোধ হইতে দেশপ্রেম জন্মিতে পারে না। গণতন্ত্রে প্রত্যেকে উপলব্ধি করে যে, দেশ তাহার নিজের, সরকার তাহার নিজের পছন্দ করা, সুতরাং দেশের যাহাতে উন্নতি হয় তাহার চেষ্টা করা প্রত্যেকের কর্তব্য।

এইরূপ চেতনা জাগিলে মানুষ উন্নত হয়, তাহার ব্যক্তিত্ব সুপরিস্ফুট হয় এবং সামাজিক জীবন মহত্তর হয়। মানুষ তৈয়ারি করাই যদি সকল প্রকার সমাজব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে এই উদ্দেশ্য সাধনে গণতন্ত্র যতটা সমর্থ হয় এমন আর অন্য কোনপ্রকার শাসনপ্রণালী নহে।

জীবন মহত্তর হয়

৬। **গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ :** প্লেটো তাঁহার 'রিপাবলিকে' গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে দুইটি অভিযোগ আনিয়াছেন। এক হইতেছে যে গণতন্ত্র মূর্খের শাসন। ইহাতে মুড়ি-মিছরির এক দর, ভোট গণনা করা হয় কিন্তু ওজন করিয়া দেখা হয় না যে কাহার ভোটের কতটা গুরুত্ব। যে কোন সমাজে বিদ্বান ও বুদ্ধিমানের চেয়ে মূর্খ ও অবিবেচকের সংখ্যা অধিক। গণতন্ত্র যখন সংখ্যাধিক্যের শাসন, তখন প্রকারান্তরে ইহা মূর্খেরই শাসন। দ্বিতীয় হইতেছে যে ইহাতে উচ্ছৃঙ্খলতা এত বৃদ্ধি পায় যে অবশেষে এক স্বেচ্ছাচারী নায়ক (Tyrant) সকল ক্ষমতা হস্তগত করিয়া লয়। প্লেটো দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, স্বাধীনতার মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া গণতন্ত্র ক্রমাগত আরও বেশি স্বাধীনতা চায় এবং তাহা যখন পায় না তখন শাসকদিগকে আমলাতন্ত্রের (oligarchy) সমর্থক বলিয়া গালি দেয়। ক্রমে ক্রমে অরাজকতা বাড়িতে বাড়িতে পরিবারের মধ্যেও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেয়। পিতা পুত্রকে ভয় করিতে আরম্ভ করেন, পুত্র পিতার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি হারায়; শিক্ষক ছাত্রদিগের চাটুকারে পরিণত হন এবং ছাত্রেরা অধ্যাপককে অবজ্ঞা করিতে থাকে। তরুণেরা নিজদিগকে প্রবীণদের সমকক্ষ বলিয়া মনে করে এবং তাঁহাদের সঙ্গে কার্যে ও বাক্যে প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হন। বৃদ্ধেরা তাঁহাদিগকে তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহাদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করে। এইভাবে স্বাধীনতা যেন সব কিছুর বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চায় এবং লোকে শেষে লিখিত ও অলিখিত আইনের অধীনতাও অস্বীকার করে। মহাভারতের শান্তিপর্বেও ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন যে, যখন অল্পবয়স্কেরা বর্ষীয়ান্ গুরুজনকে অমান্য করে তখন গণতন্ত্রের পতন ঘটে। এই অভিযোগের উত্তরে বলা হয় যে, এথেনীয় গণতন্ত্র প্লেটোর গুরু সক্রেটিসকে মৃত্যুদণ্ড দিয়াছিল বলিয়া প্লেটো ঐ শাসনপ্রণালীর বিরুদ্ধে হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন।

স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলা

ইংলণ্ড অত্যন্ত সংরক্ষণশীল এবং সেখানে বৃদ্ধরা যথেষ্ট সম্মান লাভ করেন; সুতরাং গণতন্ত্রমাত্রেই যে জ্ঞান ও বয়সের অমর্যাদা করে একথা ঠিক নহে।

এ যুগের লেখক এমিল ফাগুয়ে (Emile Faguet) বলেন যে, গণতন্ত্র হইতেছে অক্ষমের শাসনপদ্ধতি (The cult of Incompetence)। বিজ্ঞ, ধীর ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা নির্বাচনের হট্টগোলের মধ্যে যাইতে কিংবা দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া ভোট ভিক্ষা করিতে রাজী হন না। কার্যনিপুণ উদ্যোগী পুরুষেরা শিল্পবাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করেন। কাজেই যাঁহাদের না আছে বিদ্যাবুদ্ধি, না আছে ব্যবসাবুদ্ধি তাঁহারাই রাজনীতিতে যোগ দেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে জুতা তৈয়ারি করিতে গেলেও শিক্ষানবিশীর দরকার হয়, কিন্তু যাঁহারা দেশের আইন তৈয়ারি করিবার জন্য নির্বাচনপ্রার্থী হন তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষা কতটা কি আছে তাহা অনুসন্ধান করা হয় না। লোকমাতানো বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতা আর রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ও সামাজিক সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা এক নহে। যাঁহারা লোককে মাতাইয়া তুলিতে পারেন, তাঁহারা প্রায়ই জনসাধারণের খেয়াল খুসির সমর্থন করিয়া জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। দেশের প্রকৃত নেতৃত্ব করিবার যিনি যোগ্য, তিনি লোককে প্রেয়ের পথ না দেখাইয়া শ্রেয়ের পথ নির্দেশ করেন। কিন্তু 'চোরা নাহি শুনে কভু ধর্মের কাহিনী'; কাজেই জনতা মহৎ লোকের উচ্চ আদর্শের বাণী অপেক্ষা পেশাদার রাজনৈতিকের চাটুবাদ বেশি পছন্দ করেন। জনতার মধ্যে অধিকাংশ লোক অজ্ঞ, সুতরাং তাঁহারা নিজেদের অনুরূপ লোকের কথা বেশি শোনেন। ফলে শাসনভার অজ্ঞদের হাতে যাইয়া পড়ে।

অযোগ্য লোকেরা কেমন করিয়া ক্ষমতা পায়

এই অভিযোগ যদি সত্য হইত তাহা হইলে ইংলণ্ড ও আমেরিকা এতদিনে রসাতল যাইত। ভারতবর্ষের যিনি আজ রাষ্ট্রপতি তাঁহার স্থান বিশ্বের বিদ্বন্মণ্ডলীর পুরোভাগে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে অতি বড় শত্রুও অজ্ঞ, অযোগ্য কিংবা অক্ষম বলিতে সাহস করে না। রাজাদের মধ্যে বা অভিজাততন্ত্রে কেহ অজ্ঞ, মূর্খ অবিবেচক থাকেন না এমন বলা যায় না। আইনসভায় যাঁহারা নির্বাচিত হন তাঁহারা যদি সকলেই বক্তৃতা করিতে বদ্ধপরিকর হন, তাহা হইলে আইনসভার পক্ষে আর কোন কার্য

গণতন্ত্রে যোগ্য শাসকের অভাব নাই

সম্পাদন করা অসম্ভব হইয়া উঠে। দলগত নিয়মানুবর্তিতা (Party discipline) থাকার জন্য কয়েকজন নীতি নির্ধারণ করেন, অন্যে উহা নীরবে সমর্থন করেন। সুতরাং দুই দশ জন অজ্ঞ ব্যক্তি নির্বাচিত হইলেও বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না। প্লেটো প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের কথা চিন্তা করিতে পারেন নাই। ফাগুয়ে. হেন্‌রি মেইন ও লেকী যখন গণতন্ত্রকে অক্ষমের শাসনপদ্ধতি বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন তখন তাঁহাদের মনে কি ধরনের গণতন্ত্রের কথা জাগিয়াছিল বলা যায় না। তবে পাল্‌টা জবাবে বলা যায় যে, অন্য কোন প্রকার শাসনপ্রণালী তাঁহাদিগকে এই-ভাবে তীব্র নিন্দা করিবার স্বাধীনতা দিত কি? রাজা, একনায়ক বা অভিজাত শাসন এরূপ নিন্দা করিলে তাঁহাদিগকে জেলে না বন্ধ করিলেও তাঁহাদের বই বাজেয়াপ্ত করিয়া লইত। গণতন্ত্রে দৈনন্দিন শাসন কার্য চালাইবার ভার থাকে সুশিক্ষিত ও সুনিপুণ স্থায়ী কর্মচারীদের উপর। তাঁহাদের উপরে থাকে মন্ত্রিমণ্ডলী। মন্ত্রীরা কোথাও সভাপতির নিকট কোথাও আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল থাকেন। কোন কোন মন্ত্রী মূর্খ হইতে পারেন, কিন্তু সকল মন্ত্রীই অজ্ঞ একথা কেহ বলিতে পারেন না।

নিন্দা করিবার এত স্বাধীনতা অন্য শাসন প্রণালী দিত না

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ এই যে, ইহাতে ধনীদের প্রভাব খুব বেশি। ভোট দিবার বেলায় ধনীর ভোটে, দরিদ্রের ভোটে ইতর বিশেষ নাই বটে, কিন্তু ধনীরা চাঁদা দিয়া দলের চাঁইদিগকে হাত করিয়া লন এবং তাঁহাদের সাহায্যে শাসনযন্ত্রকে নিজেদের স্বার্থের অনুকূল কার্য করিবার জন্য ব্যবহার করেন। আইনসভার আনাচেকানাচে ধনী, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের দূতেরা ঘোরাফেরা করে। আইন যাহাতে তাঁহাদের স্বার্থের প্রতিকূলে না যায় সে ব্যবস্থা তাঁহারা অবলম্বন করেন। প্রয়োজন হইলে তাঁহারা রাষ্ট্রের বড় বড় কর্তাদের অথবা উচ্চ কর্মচারীদের ভাগ্নে, ভাইপো, জামাইকে চাকুরি দিয়া হাত করিয়া লন। গণতন্ত্রের প্রধান যে সম্বল জনমত, তাহাকেও আয়ত্ত করিবার জন্য ইঁহাদের চেষ্টা কম নহে। সংবাদপত্র জনমত গঠনের এক প্রধান উপায়। অধিকাংশ বড় বড় সংবাদপত্রের মালিকানাসত্ত্ব ধনীদের হাতে। যে দুই চারিখানি সংবাদপত্র মধ্যবিত্তদের দ্বারা পরিচালিত

গণতন্ত্রে ধনীদের প্রভাবের বিবিধ নিদর্শন

হয়; তাহারাও ধনী বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতিকূলে কিছু লিখিতে সাহসী হয় না। ধনীরা অর্থনীতির বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কাহাকেও চাকুরী দিয়া নিজেদের স্বার্থের অনুকূল মত প্রচার করান। সরকার আবার ঐ মত অনুসারে কার্য করিয়া থাকেন।

এই অভিযোগের অনেকখানি সত্য। কিন্তু ধনীদের সহিত দরিদ্রদের আর্থিক বৈষম্য দূর করিবার জন্য গণতন্ত্রে অনেক প্রকার উপায় অবলম্বিত হইতেছে। ধনীরা কোন কোন লোককে কিনিতে পারেন, কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাঁহাদের প্রভাব হইতে মুক্ত এমন লোকের সংখ্যা কম নহে। সেইজন্যই ধনীদের চেষ্টা সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক সংস্কার বহু রাষ্ট্রে গৃহীত হইয়াছে।

কিন্তু ধনীরা ক্রমে নিয়ন্ত্রিত হইতেছেন

গণতন্ত্রে প্রায়ই দেখা যায় যে, সরকারের অনুগ্রহভাজনেরা জোটবন্দী হইয়া নির্বাচনের সময়ে সরকার যে দলভুক্ত, সেই দলকে জয়ী করিবার চেষ্টা করেন। একবার একদলের লোক হাতে শাসন-ক্ষমতা পাইলে তাঁহারা নানা উপায়ে ঐ ক্ষমতা দীর্ঘকাল ভোগ করিবার চেষ্টা করেন। সরকারের হাতে অনেক রকমের কাজ আছে; ঠিকাদারী দেওয়া, লাইসেন্স ও পারমিট বিতরণ করা, বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আর্থিক সাহায্য বণ্টন করা প্রভৃতি অনেক উপায়ে সরকার বহু সংখ্যক লোককে হাত করিয়া লইতে পারেন; সামরিক কাজেও অসংখ্য লোক নিযুক্ত হয়। এই সব অনুগ্রহজীবীরা দেশের সমগ্র ভোটারের তুলনায় সংখ্যায় নগণ্য বটে, কিন্তু ইঁহারা স্থানে স্থানে জোটবন্দী হইয়া কাজ করিয়া সরকারকে জিতাইয়া দিতে পারেন। ইঁহারা অসন্তুষ্ট হইলে সরকারের দল হারিয়াও যাইতে পারে। এই লোকগুলি নিছক স্বার্থের খাতিরে ভোটারদিগকে ভয় দেখাইয়া অথবা খোসামোদ করিয়া ভোট আদায় করে। এইরূপ কুপ্রথা বর্তমান থাকায় গণতন্ত্র তামাসায় পরিণত হয়। ইংলণ্ডে এরূপ রীতি বড় একটা দেখা যায় না। ভারতবর্ষ এই দোষ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত বলিয়া দাবি করা যায় না।

অনুগ্রহজীবিদের জোটবন্দী প্রচেষ্টা

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অস্থায়ী ও ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া মেইন ও লেকী ইহার

প্রতি বিরূপ। কিন্তু তাঁহাদের বিরুদ্ধ সমালোচনার পর তিন পুরুষের জীবন কাটিয়া গিয়াছে তবুও গণতন্ত্র টিকিয়া আছে। মাত্র এই যুক্তি বলেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, গণতন্ত্র ক্ষণস্থায়ী নহে। যেখানে গণতান্ত্রিক আবহাওয়া নাই, সেখানে ইহার সাময়িক পতন ঘটিতে পারে, কিন্তু স্থায়ীভাবে কোথাও গণতন্ত্রের পরিবর্তে একনায়কতন্ত্র বা অভিজাততন্ত্র কায়েম হয় নাই। জার্মানি ও ইতালিতে গণতন্ত্রের স্থানে একনায়কত্ব স্থাপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু আবার উহার অবসানের পর গণতন্ত্রের পুনরভ্যুত্থান ঘটিয়াছে। গণতন্ত্র টিকিয়া থাকিলেও কোন দলের ক্ষমতা বেশি দিন টিকে না বলা যাইতে পারে। গণতন্ত্রবিরোধীরা বলেন যে, ভোটারগণ খেয়ালের বশে চলেন, কখনও এ দলকে কখনও ও দলকে ক্ষমতা প্রদান করেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকার দলীয় ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, এ কথা কতকটা সত্য, কিন্তু এই দুই রাষ্ট্রে সরকারের পতন ঘন ঘন হয় না। ফ্রান্সে এক বৎসরের চেয়ে কম সময় এক এক সরকারের আয়ু ছিল; তাই পঞ্চম রিপাবলিকে এমন ব্যবস্থা করা হইয়াছে যাহাতে মন্ত্রিসভা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে। ভারতবর্ষে একাদিক্রমে বহু বৎসর ধরিয়া একই দল ও তাহার মহান্ নেতা ক্ষমতা পরিচালনা করিতেছে।

গণতন্ত্র ক্ষণভঙ্গুর নহে

মন্ত্রিসভাও ক্ষণস্থায়ী নহে

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ হইতেছে এই যে ইহাতে জনসেবার নাম করিয়া এক শ্রেণীর পেশাদার রাজনৈতিকের উদ্ভব হইয়াছে। ইঁহারা বিশেষ কোন কাজকর্ম করেন না। কি করিয়া ভোট্ আদায় করিতে হয়, দলের মধ্যে কি ভাবে প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে হয়, লোকে মানুক বা না মানুক তবু কিরূপে মোড়লি করিতে হয় এসব বিষয়ে ইঁহারা বিশেষজ্ঞ। এ অভিযোগ অস্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। এখন রাজনীতির কার্য এত জটিল এবং এত সুদূরপ্রসারী হইয়াছে যে, কেহ আর ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতে রাজী নহেন। রাজনৈতিক কর্মীদের যখন কোন বেতন দেওয়া হইত না, তখন বড়লোকের ছেলেরা অথবা পসারওয়ালা ডাক্তার ও উকীল ব্যারিস্টারেরা সখ করিয়া নাম কিনিবার উদ্দেশ্যে রাজনীতি করিতেন। এখন বিত্তহীনেরাও যাহাতে

পেশাদার রাজনৈতিকের উৎপত্তি ও তাহার কারণ

রাজনৈতিক কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন, সেইজন্য তাঁহাদের ভাতা, বেতন প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

গণতন্ত্র নাকি সাহিত্য, বিজ্ঞান, সুকুমার কলা প্রভৃতির আদর করে না। সেকালে রাজা জমিদারেরা যেমন পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন, একালের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সেরূপ করিবার মতন অর্থ ও সামর্থ্য অনেকেরই নাই। বণিক শ্রেণীর হাতে টাকা আছে কিন্তু তাঁহারা সাহিত্য ও চিত্রকলার মর্যাদা বোঝেন না। এ কথা কতকাংশে ঠিক বটে, কিন্তু একজন কৃতী সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক বা চিত্রকর যত টাকা রোজগার করেন, যত সম্মান লাভ করেন, প্রাচীন ও মধ্যযুগে তাহা খুব কম কবি ও শিল্পীর ভাগ্যেই জুটিত। এখন তাঁহারা গণমহারাজের দরবারে আদর পাইতেছেন অথচ কাহারও স্তাবকতা করিতে হইতেছে না।

শিল্প ও সাহিত্যের আদর

গণতন্ত্রে অনেক অপচয় ঘটে। মন্ত্রীরা ও কর্মচারীরা মনে করেন "লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন"। সে গৌরীসেন হইতেছেন সাধারণ করদাতারা। রাজরাজড়ার আমলেও অপচয় কম হইত না। গণতন্ত্রে অপচয় একদিন না একদিন ধরা পড়ে, কিন্তু রাজারা বেপরোয়া হইয়া বিলাসিতার স্রোতে গা ঢালিয়া দিতেন।

অপচয়

গণতন্ত্রে দলাদলিতে অনেক শক্তি ও অর্থের অপব্যয় ঘটে। এক দল অন্য দলকে অপদস্থ করিবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিতে থাকে। সাধু উপায়ে হউক, অসাধু উপায়ে হউক দলের চেষ্টা থাকে কোন-রূপে ক্ষমতা হস্তগত করা। একথা সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও উত্তর দেওয়া যায় যে রাজতন্ত্রে ও অভিজাততন্ত্রে হীন ষড়যন্ত্র কম হইত না। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল অনেক ভাল কাজও করে। বিরোধী দলের বিরুদ্ধ সমালোচনার ভয় না থাকিলে সরকার স্বেচ্ছাচারী হইত।

দলাদলি

এইরূপে দেখা যায় যে, গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ সত্য হইলেও, ইহাকে যতটা খারাপ বলিয়া বিরুদ্ধবাদীরা চিত্রিত করিয়াছিলেন, ইহা ততটা খারাপ নহে। মানুষ যখন আদর্শ চরিত্র লাভ করিতে পারে নাই, তাঁহার শাসনব্যবস্থাও তেমনি ত্রুটিহীন হইতে পারে না।

৭। **গণতন্ত্রের মূল্য নিরূপণ :** গণতন্ত্রে জনসাধারণকে সমস্ত শক্তির উৎস বলা হয়। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই নিজেদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত; দেশের কথা ভাবিবার ও বুঝিবার ইচ্ছা তাঁহাদের নাই, সামর্থ্যেরও অভাব। পেশাদার রাজনৈতিক কর্মীরা তাঁহাদিগকে নিজের নিজের দলে টানিবার চেষ্টা করে। যে দলের কর্মীসংখ্যা বেশি বা অর্থবল অধিক সেই দল নির্বাচনে জয়লাভ করে। কয়জন লোক স্বাধীনভাবে চিন্তা করে? কয়জনই বা নির্ভীকভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করে? যাঁহারা ধীর চিত্তে রাষ্ট্রের ও সমাজের উন্নতির কথা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করেন তাঁহাদের সংখ্যা বেশি না হইলেও, তাঁহাদের প্রভাব কম নহে। তাঁহাদের ভাবধারা সমাজের বিভিন্ন স্তরে পৌঁছায় এবং উদাসীন ব্যক্তিদিগকে উদ্বুদ্ধ করে। তাঁহাদের সাহায্যেই গণতন্ত্রের আদর্শের সহিত কর্মদক্ষতার সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হয়।

গণতান্ত্রিক আদর্শের সহিত কর্মদক্ষতার সামঞ্জস্য কি করিয়া করা যায়?

ব্রাইস্ বিভিন্ন দেশের গণতন্ত্রের কার্যপদ্ধতি অনুসন্ধান করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে গণতন্ত্রের মধ্যে অভিজাততন্ত্র বর্তমান থাকে। সকল মানুষই সমান এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রত্যেকের মত লইয়া চরিত্রবলে ও কর্মদক্ষতায় যাঁহারা শ্রেষ্ঠ তাঁহাদিগকে আবিষ্কার করা হয়। এই স্বল্পসংখ্যক লোকের হাতে শাসনকার্য পরিচালনার ভার থাকে। তাঁহারা ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেছেন কিনা সেদিকে অবশ্য সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। জনসাধারণ নিজেরা শাসন চালাইতে না পারিলেও এটুকু বুঝিতে পারে যে সরকারী কাজের ফলে তাহাদের উপকার হইতেছে কি অপকার হইতেছে। রাজনীতির সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই এমন চিন্তানায়কদের লেখা ও বক্তৃতা হইতেও জনসাধারণ ঐ প্রকার জ্ঞান আহরণ করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নেতৃত্ব করিবার উপযুক্ত লোককে খুঁজিয়া বাহির করা যতটা সহজ অন্য কোন শাসনব্যবস্থায় সেরূপ নহে। কেননা একের অপ্রতিহত ক্ষমতার অধীনে যাঁহারা জীবনযাপন করিতে বাধ্য হন, তাঁহারা স্বাধীনভাবে কোন ব্যাপারেই নেতৃত্ব করিতে অভ্যস্ত হন না। যাঁহারা গণতন্ত্রকে অক্ষমতার পদ্ধতি বলিয়া নিন্দা

গণতন্ত্রের অভ্যন্তরস্থ অভিজাততন্ত্র

করেন তাঁহারা গণতন্ত্রের অভ্যন্তরস্থ অভিজাততন্ত্রকে আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। এই অভিজাতবর্গ কিন্তু বংশানুক্রমে বা ধনৈশ্বর্যের ফলে ক্ষমতালাভ করেন নাই, নিছক গুণের জোরেই তাঁহারা ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রথমে হয়তো কোন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে অথবা স্বায়ত্তশাসনের কেন্দ্রে, পরে প্রাদেশিক আইনসভায়, তারপর কেন্দ্রীয় আইনসভায় এবং তথা হইতে মন্ত্রিসভায় উপমন্ত্রিত্ব করিয়া নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিয়া অবশেষে মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। কিন্তু গণতন্ত্রে শুধু দক্ষতা দেখাইলেই চলে না, জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখাও প্রয়োজন হয়। জনগণের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের অধীনে মন্ত্রীদিগকে কর্মনিপুণতা দেখাইতে হয়।

গণতন্ত্রে অনেক কিছু দোষ-ত্রুটি আছে বটে, কিন্তু মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে এই শাসনপ্রণালী যেরূপ পারে অন্য কোন শাসনপদ্ধতি তাহা পারে না। ইহাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে মতামত প্রকাশ করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। যে কোন লোক অধিকাংশ ব্যক্তিকে স্বমতে আনিতে চেষ্টা করিতে পারে এবং সফল হইলে তাহার অভিপ্রেত সংস্কার প্রবর্তন করাইতে পারে।

ব্যক্তিত্বের মর্যাদা

গণতন্ত্রের বিকল্পে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং একাধিনায়কতন্ত্র অবলম্বন করা যাইতে পারে। কিন্তু গুণানুসারে উত্তরাধিকারী নির্বাচনের কোন ব্যবস্থা এই সব শাসনপদ্ধতিতে নাই। ভাল রাজা বা ভাল ডিক্টেটারের মৃত্যুর পর শাসনকার্য কে চালাইবেন? মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতাও গণতন্ত্র ছাড়া অন্য কোন শাসনব্যবস্থায় দেওয়া হয় না। এইজন্য বলিতে হয় যে শত দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও গণতন্ত্রই আমাদের গতি, গণতন্ত্রই আমাদের ভরসা।

কোন বিকল্প শাসনপ্রথা চলিতে পারে না

৮। গণতন্ত্রকে কি কি উপায়ে সফল করা যায়? গণতন্ত্র ছাড়া যখন অন্য কোন শাসনব্যবস্থা এ যুগে অচল, তখন উহাকে কি ভাবে দোষ-ত্রুটিমুক্ত করা যায় তাহা আলোচনা করা কর্তব্য।

আর্থিক ও সামাজিক সাম্যভাব না থাকিলে গণতন্ত্র সফল হইতে পারে না। অল্পসংখ্যক লোক ধনী হইলে এবং অধিকাংশ ব্যক্তি দরিদ্র হইলে

ধনীরা নানাভাবে সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করেন। দরিদ্রেরা নিজেদের পেটের চিন্তায় অস্থির হন। সার্বজনিক ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করবার মতন সময় ও সামর্থ্য তাঁহাদের থাকে না। যে সমাজে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ আছে সেখানে একজন অপরের সহিত সমান বলিয়া গণ্য হন না। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণেরা যদি চণ্ডালদের ছায়াও স্পর্শ করিতেন তাহা হইলে অবগাহন স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতেন। আজও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণবর্ণের ব্যক্তিরা শ্বেতকায়দের সহিত এক হোটেলে খাইতে বা এক বাসে যাতায়াত করিতে পারেন না। মুখে গণতন্ত্রের বুলি আওড়াইলেও যেখানে মানুষকে মানুষ্যত্বের মর্যাদা দেওয়া হয় না সেখানে প্রকৃত গণতন্ত্রের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। যে দেশে ধনের বৈষম্য প্রবল নহে এবং সামাজিক সংহতি বর্তমান, সেইখানে গণতন্ত্র সবিশেষ কৃতকার্যতা লাভ করে। পৃথিবীর মধ্যে তাই সুইট্‌জারল্যাণ্ডে এবং স্ক্যাণ্ডেনিভিয়াতে সর্বাপেক্ষা সফল গণতন্ত্র দেখা যায়। ইংলণ্ডেও গণতন্ত্রের মূল দৃঢ়রূপে প্রোথিত।

আর্থিক ও সামাজিক সাম্য

শিক্ষার ব্যাপকতাও গণতন্ত্রের কৃতকার্যতার জন্য আবশ্যক। শাসন ব্যাপারে মতামত দিতে গেলে অল্পবিস্তর লিখিতে ও পড়িতে জানা চাই। অশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে শাসন সংক্রান্ত জটিল সমস্যাগুলি অনুধাবন করা কঠিন। গণতন্ত্রে সেই জন্য প্রত্যেক বালক-বালিকাকে তাহার বুদ্ধি ও শক্তি অনুসারে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ দেওয়া দরকার। অর্থের অভাবে কোন বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি যেন উচ্চতম শিক্ষালাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত না হন।

শিক্ষার ব্যাপক প্রসার

পরস্পরের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রথাকে গণতান্ত্রিক শাসনের মূল ভিত্তি বলা হয়। সেই জন্য লোকে যাহাতে বিভিন্ন ধরনের সংঘ গঠন করিতে পারে ও স্বাধীন ভাবে মতামত প্রকাশ করিতে পারে তাহার পূর্ণ সুযোগ দেওয়া উচিত। যে মতের স্বপক্ষে বেশি লোক হইবে সেই মত অনুসারে কার্য করা হইবে। যাঁহাদের মত গৃহীত হইল না তাঁহাদেরও কর্তব্য সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে মানিয়া চলা। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠেরা যেন সংখ্যালঘুদের

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করেন। সংখ্যালঘুরা সব সময়েই যেন বিনা বাধায় সরকারের দোষত্রুটি দেখাইবার সুবিধা ভোগ করেন।

জনসাধারণ সহিষ্ণু হইয়া যদি কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের কথা শুনিতে না চান, তাহা হইলে গণতন্ত্র বিফল হইবার আশংকা থাকে। যাঁহারা মনের কথা খুলিয়া বলিতে পারেন না, তাঁহারা শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতে পারেন। তাই পরমতের প্রতি সহিষ্ণুতা দেখানো গণতন্ত্রের সাফল্যের এক প্রধান উপায়।

সহিষ্ণুতা

গণতন্ত্রে যাঁহারা বিশ্বাসী তাঁহারা বিপ্লবের দ্বারা আমূল পরিবর্তন সাধন করিতে চাহেন না। তাঁহারা লোককে বুঝাইয়া সুঝাইয়া জনমতকে নিজেদের পক্ষে আনেন এবং ধীরে ধীরে পরিবর্তন আনয়ন করেন। তাড়াতাড়ি সব কিছু বদলাইতে গেলেই ভুলভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক।

বিবর্তন চাই, বিপ্লব নহে

লজিকে লাউর যুক্তি নামে এক প্রকার কুযুক্তির কথা দেখিতে পাওয়া যায়। গণতন্ত্র কিন্তু মাথা না ভাঙ্গিয়া, মাথা গণনা করিয়া কার্য নীতি স্থির করে। তাই অহিংসাকে মনেপ্রাণে স্বীকার না করিয়া লইলে প্রকৃত গণতান্ত্রিক হওয়া যায় না। গায়ের জোরে কাহাকেও নত করিলে সে সুযোগ পাইলেই প্রতিশোধ লয়। মহাত্মা গান্ধী বার বার বলিয়াছেন যে, হিংসার ভিত্তিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

অহিংস নীতি

আইন ও আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি অনুসারে কার্য সম্পাদনের রীতিকে মান্য করিয়া চলা গণতন্ত্রের সাফল্যের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক ব্যক্তি যেন উপলব্ধি করেন যে তিনি আইনের ছত্রছায়ায় বসবাস করিতেছেন, কাহারও খেয়াল মর্জির উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হয় না। ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছায় যদি প্রথা ও আইন পরিবর্তিত হয় তাহা হইলে নাগরিকদের মনে নিশ্চিন্ততা আসিতে পারে না।

গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য প্রতিপক্ষ দলের অস্তিত্ব থাকা প্রয়োজন। যেখানে একটি মাত্র দলই সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত হয়, সেখানে গণতন্ত্র বজায় রাখা খুব কঠিন হয়। সেখানে সরকারী দলের বিরুদ্ধে যতই

বিক্ষোভ উপস্থিত হউক না কেন কোন বিকল্প দলের শাসন স্থাপন করা অসম্ভব। প্রতিপক্ষ দলের পক্ষে সরকার গঠনের সম্ভাবনাও সরকারী দলকে ন্যায় ও সততার পথে রাখে। যদি ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদিগকে সমালোচনা করিবার কেহ না থাকেন তাহা হইলে তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী হইতে পারেন।

স্থায়ী সরকারী কর্মচারীদের সততা ও দক্ষতার উপরও গণতন্ত্রের সাফল্য অনেকটা নির্ভর করে। সরকারের দৈনন্দিন কাজ চালানোর ভার এই সব কর্মচারীর উপর। তাঁহারা যদি কার্যক্ষম না হন তাহা হইলে লোককে অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে হয়। তাঁহারা ঘুষ লইয়া বা অন্য কোন প্রলোভনে পক্ষপাতপূর্ণ কার্য করিলে লোকের মনে গণতান্ত্রিক সরকারের উপর অশ্রদ্ধা জন্মায়। অনেক সময় কর্মচারীদের দোষে অনেক অপব্যয় হয়।

সাধু ও সুনিপুণ নেতৃত্ব গণতন্ত্রের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। যে দেশে ঘনঘন নেতৃত্বের পতন ও পরিবর্তন ঘটে সে দেশে সরকারের নীতির কোন স্থায়িত্ব থাকে না। নেতার বহুদর্শিতা ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আদর্শবাদ জাতির জীবনে বলসঞ্চার করে। অসৎ নেতৃত্বের দোষে কোন কোন রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের বদনাম হইয়াছে।

পরিশেষে আমরা জন স্টুয়ার্ট মিলের সতর্কবাণীর কথা উল্লেখ করিব। তিনি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে Considerations on Representative Government নামে সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন—"A people may prefer a free government, but it, from indolence, or carelessness, or cowardice, or want of public spirit, they are unqual to the exertions necessary for preserving it, if they will not fight for it when it is directly attacked, if they can be deluded by the artifices used to cheat them out of it, if momentary discouragement or temporary panic, or by a fit of enthusiasm for an individual, they can be induced to lay their liberties at the feet even of a great man, or trust him with powers which enable him to subvert their institutions; in all these cases they are more or less unfit for liberty." ইহার ভাবার্থ এই যে

কোন দেশের লোক গণতন্ত্র পছন্দ করিতে পারেন, কিন্তু যদি আলস্য, অনবধানতা, ভীরুতা অথবা জনসেবার ভাবের অভাববশতঃ তাঁহারা উহা রক্ষা করিবার জন্য যে প্রচেষ্টার প্রয়োজন তাহা না করিতে পারেন, উহা আক্রান্ত হইলে রক্ষা করিবার জন্য সংগ্রাম করিতে না পারেন, যদি তাঁহারা ধোঁকাবাজিতে ভুলেন, যদি সাময়িক হতাশা, ভীতি, বা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি (তিনি যতই মহৎ হউন না কেন) ভক্তির আতিশয্যে তাঁহার পদতলে স্বাধীনতা বিসর্জন দেন বা তাঁহাকে এমন ক্ষমতা দেন যাহাতে তিনি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে উচ্ছেদ করিতে পারেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তাঁহারা মোটের উপর স্বাধীনতা ভোগ করিবার অনুপযুক্ত।

৯। **ভারতে গণতন্ত্রঃ** এশিয়া ও আফ্রিকার মধ্যে ভারতবর্ষই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও শক্তিশালী গণতন্ত্রশাসিত দেশ। এই দেশে গণতন্ত্রের সাফল্যের উপর সমগ্র প্রাচ্যভূমির শাসনপ্রণালীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ভারতবর্ষে তিনবার সাধারণ নির্বাচন নিরুপদ্রবে ঘটিয়াছে। ইহা বড় সহজ কথা নহে। কেননা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এত অধিক সংখ্যক নরনারী ভোট দিবার ক্ষমতার অধিকারী নহেন। কিন্তু এদেশে কয়েকটি প্রবল অন্তরায়ের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রকে সংগ্রাম করিতে হইতেছে।

প্রথমতঃ এখানে এখনও অধিকাংশ ভোটার অজ্ঞ ও অক্ষরজ্ঞানবর্জিত। তাহাদের পক্ষে বিবেচনার সহিত ভোট দেওয়া সহজ নহে। দ্বিতীয়তঃ ভারতে বহুলোক দরিদ্র এবং কিছুসংখ্যক লোক নিরন্ন অথবা বেকার। এমন অবস্থায় তাঁহাদের পক্ষে দেশের হিত চিন্তা করা খুবই কঠিন। তৃতীয়তঃ এখানে জনসমুদয়ের প্রতি প্রীতির অপেক্ষা জাতিগত, ভাষাগত, ধর্মগত ও আঞ্চলিক আনুগত্য প্রবল। ভোটারগণ যোগ্যতম ব্যক্তিকে ভোট না দিয়া অনেক সময়ে নিজের জাতির প্রার্থীকে ভোট দেন। মন্ত্রিসভা গঠনের সময়েও প্রধান প্রধান জাতিদের প্রতিনিধিকে গ্রহণ করিতে হয়। ভাষার কলহে সময় সময় দাঙ্গাহাঙ্গামা পর্যন্ত হয়। উহার মূলে অবশ্য আছে চাকুরি ও সরকারী কাজের সুবিধালাভের লোভ। ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষিত হইলেও এখনও এখানে ধর্মের নামে গড়াদ্বন্দ্ব কম হয় না। নির্বাচনের সময় ও মন্ত্রিসভা গঠনের সময়ে

অজ্ঞতা, দরিদ্রতা, জাতি, ধর্ম, ভাষা ও অঞ্চলগত নীতি গণতন্ত্রের পরিপন্থী

ধর্মের ভিত্তিতে কিছুসংখ্যক লোকের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত দেখান হইয়া থাকে।

কিন্তু এসব বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ভারতবর্ষে গণতন্ত্র দিন দিন শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এত অল্প সময়ের মধ্যে এবং বিনা রক্তপাতে রাজন্যবর্গ ও জমিদারদের ক্ষমতা বিলুপ্ত হয় নাই। যুগযুগান্তের পুঞ্জীভূত সংস্কারের বিরুদ্ধে অস্পৃশ্যতা বর্জন করা হইয়াছে। সম্পত্তির উত্তরাধিকার, পুরুষের একপত্নীত্ব ও বিবাহবিচ্ছেদ ব্যাপারে মনুশাসিত দেশের নরনারীর চিরকালের বৈষম্য দূর করা হইয়াছে।

এদেশে সাম্যের জয়যাত্রা

এদেশে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্ষমতা ভোগ করিতেছে বলিয়া অনেকে মনে করেন যে, ইহার ফলে গণতন্ত্র বিপন্ন হইবে। কিন্তু এখানে অন্য দল গঠনে কোন বাধা দেওয়া হয় না। বিভিন্ন দল মনের খুসীতে সরকারকে যত ইচ্ছা নিন্দা করিতে পারে, সে জন্য কাহাকেও কোন দণ্ড দেওয়া হয় না। এগুলি সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্য কোন দল যতক্ষণ পর্যন্ত বিকল্প-সরকার গঠনের মতন শক্তিসঞ্চয় করিতে না পারে ততক্ষণ পর্যন্ত এদেশে পূর্ণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে দাবি করা যায় না।

একটি মাত্র দলের প্রভাব ও বিকল্প সরকারের অভাব

১০। **একনায়কতন্ত্র** (Dictatorship): বিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্রের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হইতেছে একনায়কতন্ত্র, কেননা রাজতন্ত্র ও কুলীনতন্ত্রের পুনরাবির্ভাব এখন আর সম্ভব নহে। ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইতালি, জার্মানি ও স্পেনে একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে প্রাচ্যদেশের অনেক রাষ্ট্রে গণতন্ত্র পরাভূত হয় এবং একনায়কতন্ত্র উদ্ভূত হইয়াছে। পূর্বে আমরা দেখাইয়াছি যে একনায়কতন্ত্র ব্যক্তিগত, দলগত ও শ্রেণীগত হইতে পারে। সম্প্রতি আবার নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র (Controlled Democracy), পরিচালিত গণতন্ত্র (Guided Democracy), নবগণতন্ত্র (New Democracy), বেসিক ডেমোক্রাসি প্রভৃতি ছদ্মনামের অন্তরালে একনায়কতন্ত্র আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ফ্রান্সে দ্য গল যে পঞ্চম রিপাবলিক

একনায়কতন্ত্রের শ্রেণীভেদ

স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা এত বেশি যে ফ্রান্সের লোকেরা বিদ্রূপ করিয়া মহারাজা দ্য গল বলিতেছেন। তিনি কোন কারণ না দেখাইয়া এক মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করিয়া অন্য মন্ত্রিসভা আহ্বান করেন। এও এক মৃদুধরনের একনায়কতন্ত্র।

পরিচালিত গণতন্ত্র

লাতিন আমেরিকায়, পাকিস্তানে ও বর্মায় সামরিক একনায়কতন্ত্র দেখা যায়। ইহাতে সৈন্যদলের প্রভাব খুব বেশি থাকে। লোকে ভয়ে এরূপ শাসনতন্ত্রকে মানিয়া লয়। অবশ্য রাজনৈতিক নেতারা যখন অক্ষমতা ও অসাধুতার জন্য সরকারকে হেয় করিয়া তুলেন তখন সামরিক একনায়কতন্ত্র দুর্নীতি দূর করিয়া লোকের প্রিয়পাত্র হয়। একনায়কতন্ত্রে কার্যদক্ষতা হয়তো কিছু বৃদ্ধি পায়, কিন্তু লোকের মতপ্রকাশের স্বাতন্ত্র্য লোপ পায়। কোন দেশেই একনায়কতন্ত্র সুদীর্ঘকাল ধরিয়া স্থায়ী হইতে পারে না।

সামরিক একনায়কতন্ত্র

১। Distinguish Democracy from Dictatorship and point out the conditions essential to the success of Democracy. (1962)

গণতন্ত্রে চরম ক্ষমতা থাকে জনসাধারণের হাতে। তাহারা যাঁহাদিগকে নির্বাচন করে তাঁহারাই সরকার পরিচালনা করেন। জনসাধারণ ইচ্ছা করিলে যে কোন সরকারের পতন ঘটাইতে পারে। একনায়কত্বে জনসাধারণকে একজন মাত্র ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে চলিতে হয়। গণতন্ত্রে তাহাদিগকে সাবালক বলিয়া ধরা হয় কিন্তু একনায়কতন্ত্রে তাঁহারা যেন নাবালক, নিজের ভালমন্দ বুঝেন না ; নায়ক যাহা বলেন তাহাই করিতে বাধ্য হন। গণতন্ত্র সফল হয় সামাজিক সাম্য, শিক্ষার প্রসার, পরমতের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শনে। সুনিপুণ ও স্বার্থত্যাগী নেতৃত্ব ইহার পক্ষে অপরিহার্য। অষ্টম প্রকরণ দেখ।

২। Point out the characteristics of Parliamentary form of Government. In what different ways does the Parliament

exercise control over the Cabinet in this form of Government? (1963)

পার্লামেন্টারি শাসনপদ্ধতিতে সরকার পার্লামেন্টের কাছে দায়িত্বশীল থাকেন। সরকার যতদিন পর্যন্ত সংখ্যাগুরু দলের বা দলসমূহের আস্থাভাজন থাকেন ততদিন পর্যন্ত ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারেন। পার্লামেন্ট (ক) প্রশ্ন করিয়া (খ) জরুরি কোন ব্যাপার আলোচনার জন্য অধিবেশন মুলতুবি রাখার প্রস্তাব করিয়া (গ) অনাস্থা ঘোষণার প্রস্তাব পাশ করাইয়া (ঘ) কোন সরকারী বিল পরাজিত করিয়া (ঙ) অর্থ মঞ্জুরি না করিয়া কেবিনেটকে দাবাইয়া রাখিতে বা হারাইয়া দিতে পারেন। যেখানে বিপুল সংখ্যাধিক দলের প্রতিনিধিরা কেবিনেট গঠন করেন সেখানে কিন্তু আইনসভায় গরম গরম বক্তৃতা দেওয়া ও হল্লা করা ছাড়া বিরোধীদল আর কিছুই করিতে পারেন না। দলীয় নিয়ন্ত্রণ কঠোর হওয়ার ফলে অনেক জায়গায় পার্লামেন্টের ক্ষমতা অনেক হ্রাস পাইয়াছে।

৩। In what respects does democracy differ from totalitarianism? Why is democracy preferred?

(ক) গণতন্ত্রে ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে থাকে; ইহাতে সরকার সংস্কৃতি, ধর্ম, সাহিত্য, নীতি প্রভৃতির উপর হস্তক্ষেপ করেন না। সর্বগ্রাসী সরকারের নিয়ন্ত্রণের কবল হইতে জীবনের কোন কিছুই বাদ পড়ে না। (খ) গণতন্ত্রে ব্যক্তিপুরুষ চলাফেরা, মতপ্রকাশ, জীবিকা নির্বাচন প্রভৃতি বহু বিষয়ে স্বাধীনতা ভোগ করে; কিন্তু সর্বাত্মক শাসনে তাহা পারে না। (গ) গণতন্ত্রে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে, সর্বাত্মক শাসনে একটিমাত্র দল থাকে এবং তাহারই উচ্চতম কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সরকার চলেন। (ঘ) সর্বাত্মক শাসনে সকলে দলের সভ্য হইতে পারেন না; যাঁহারা হন তাঁহারা বিশেষ সুবিধা ভোগ করেন; সুতরাং বহুসংখ্যক নির্দলীয় ব্যক্তি সেই সব সুবিধা হইতে বঞ্চিত হন।

সর্বাত্মক শাসনে ইতালি ও জার্মানিতে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল ও রাশিয়ায় বামপন্থী বিপ্লবের আকার ধারণ করিয়াছিল। ইঁহারা সকলেই বড় বড় ছেঁদো কথায় স্বর্গের চাঁদ হাতে ধরিয়া দিবার ব্যবস্থা করেন; কিন্তু কাজের বেলায় সাধারণ লোকের যে বিশেষ সুবিধা হয় তাহা নহে।

৪। What conditions are required for a successful operation of a democracy? Indicate the merits and defects of such a form of government.

সপ্তম ও অষ্টম প্রকরণ দেখ।

৫। "Democracy ensures neither better government not greater liberty." Examine this statement and discuss in this connection the causes of reacton against democracy in recent times.

ষষ্ঠ ও সপ্তম প্রকরণ দেখ।

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সেই সব দেশে দেখা দিয়াছে যেখানে দীর্ঘকাল ধরিয়া স্বেচ্ছাচারতন্ত্র প্রচলিত ছিল। ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের প্রভাব অব্যাহত আছে অথচ জার্মানি, ইতালি, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে ও দক্ষিণ আমেরিকায় গণতন্ত্র সফল হয় নাই।

পঞ্চদশ অধ্যায়

এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্র

১। **সংহতির মাত্রাভেদ**ঃ এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র (Unitary State), যুক্তরাষ্ট্র (Federal State), রাষ্ট্র সমবায় (Confederation), প্রকৃত বন্ধন (Real Union), ব্যক্তিগত বন্ধন (Personal Union) এবং মৈত্রীবন্ধন (Alliance) আইনের চোখে এবং সংগঠনের বৈশিষ্ট্যে বিভিন্ন বটে, কিন্তু অন্য দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র সংহতির তারতম্য লক্ষ্য করা যায়।[1] রাষ্ট্রের প্রত্যেক অংশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংহতি দেখা যায় এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে। ইহাতে একটি মাত্র প্রাণকেন্দ্র হইতে রাষ্ট্রদেহের সর্বত্র শক্তি সঞ্চারিত হয়। কচ্ছপ যেমন ইচ্ছা মতন তাহার হস্তপদাদি উদরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইতে পারে, এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র তেমনি কোন কোন অংশের কার্যভার অনায়াসে নিজে গ্রহণ করিতে পারে; আবার ইচ্ছামত কোন অংশকে যে কোন কাজের ভার সমর্পণ করিতে পারে। রাষ্ট্র ও সরকার এখানে একটি।। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের আঙ্গিক রাজ্যগুলি একটিমাত্র রাষ্ট্র হইলেও তাহাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন সরকার আছে। সকলের সম্মিলিত একটি সরকার থাকে, আবার প্রত্যেকের পৃথক পৃথক সরকার থাকে। কে কি কি কাজ করিবে, কাহার কতখানি ক্ষমতা তাহা সংবিধানের দ্বারা নিরূপিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের মতন একটিমাত্র রাষ্ট্র, কিন্তু রাষ্ট্র সমবায় (Confederation) কয়েকটি রাষ্ট্রের সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সহযোগিতার মাত্রা কতটা হইবে তাহা তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত সমস্যার উপর নির্ভর করে। প্রকৃত বন্ধন (Real Union) দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে স্থায়ী যোগাযোগ; দুইটি রাষ্ট্রই পৃথক্ পৃথক্ সত্তা রক্ষা করিবে, কিন্তু একই রাজবংশের দ্বারা শাসিত হইবে। ব্যক্তিগত বন্ধন সাময়িক, আকস্মিক কারণে দুইটি রাষ্ট্রে একই রাজা উত্তরাধিকার লাভ করেন। তাঁহার জীবনকাল পর্যন্ত দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে কিছুটা যোগাযোগ থাকে। মৈত্রীবন্ধন (Alliance)

সাময়িক প্রয়োজন হইতে উদ্ভূত এবং প্রয়োজন মিটিয়া গেলে বন্ধন ছুটিয়া যাইতে পারে।

মৈত্রীবন্ধন সাধারণতঃ সামরিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়। এরূপ ব্যবস্থায় উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সদ্ভাব বৃদ্ধি পায় এবং তাহারা যদি আরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবার প্রয়োজন বোধ করে, তাহা হইলে রাষ্ট্র-সমবায় গঠন করে। মৈত্রীবন্ধন ও রাষ্ট্র সমবায় দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে ঘটিতে পারে। রাষ্ট্র সমবায়ের সদস্যরা অন্যান্য সব বিষয়ে নিজেদের হাতে ক্ষমতা রাখিয়া যুদ্ধ ও বৈদেশিক নীতি পরিচালনার জন্য একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সমবায়ের মধ্যে বাস করিতে করিতে উহার সদস্যেরা আরও নিবিড়ভাবে পরস্পরের মধ্যে সংযুক্ত হইতে চাহিতে পারেন। আমেরিকার তেরটি উপনিবেশ ১৭৮১ হইতে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাষ্ট্র সমবায়ের (Confederation) অন্তর্ভুক্ত ছিল, পরে যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হয়। সুইট্‌জারল্যাণ্ডেও প্রথমে রাষ্ট্র সমবায় গঠিত হইয়াছিল, পরে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। রাষ্ট্র সমবায়ে প্রত্যেক রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা কতকটা পরিমাণে বজায় থাকে; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে আঙ্গিক রাজ্যগুলির সার্বভৌমিকতা লোপ পায়। একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেরই সার্বভৌমিকতা থাকে। কয়েকটি রাষ্ট্রের স্থানে একটি রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। কিন্তু পুরাতন স্বাধীনতার চিহ্নস্বরূপ কতকগুলি বিষয়ে আঙ্গিক রাজ্যগুলি ক্ষমতা ব্যবহার করে। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় শাসনের মধ্যে সুন্দর এক ভারসাম্য রক্ষা করাই যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে এরূপ কোন ভারসাম্য থাকে না; একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার সকল ক্ষমতা ব্যবহার করে। যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিক প্রবৃত্তি হইতেছে ক্ষমতাকে কেন্দ্রাভিমুখী করিবার দিকে।

রাষ্ট্র সমবায় নিবিড়তর ঐক্যের সোপান

২। **এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের গুণ ও দোষঃ** যে রাষ্ট্রে শাসন ক্ষমতা একটিমাত্র কেন্দ্রের উপর সংন্যস্ত, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার সহজে ও দ্রুতবেগে যে কোন সংস্কার সাধন করিতে পারে। ঐ সরকারের পক্ষে বিভিন্ন সংস্কার মতামত বিবেচনা করিবার প্রয়োজন হয় না। যে কোন নীতিই অবলম্বিত হউক না কেন, বিচারমণ্ডলীর নিকট মামলামোকদ্দমার আশংকা নাই। কাজেই

গুণ—সহজ ও সরল

অবাধে সর্বত্র একই প্রকার আইন প্রচলিত করা যায়। একই রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন আইন চালু থাকে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে বিবাহবিচ্ছেদের বিভিন্ন আইন প্রচলিত আছে; কাজেই কোন এক বিশেষ নীতি অনুসারে বিবাহবিচ্ছেদ করিবার নিয়মকানুনের সংশোধন করিয়া সর্বত্র উহার প্রচলন করা একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার। ভারতবর্ষের আঙ্গিক রাজ্যগুলির মধ্যে বিক্রয়করের হার ভিন্ন ভিন্ন; কোথাও শতকরা দুই টাকা কোথাও বা তিন টাকা কর দিতে হয়। ইহাতে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার তারতম্য ঘটে। ইংলণ্ডের মতন এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে যদি কতখানি জমি একজনের আয়ত্তে থাকিবে সে বিষয়ে আইন করিতে হয় তাহা হইলে পার্লামেন্টে একটি আইন করিলেই তাহা সব জায়গায় প্রতিপালিত হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষের মতন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন রাজ্যের আইন সভাকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ঐরূপ আইন পাশ করিতে হয়। সব জায়গায় একরকম আইন হইবার সম্ভাবনা কম; কোথাও বা ত্রিশ একর, কোথাও বা পঞ্চাশ একর জমি রাখা আইনসিদ্ধ হয়। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় আইনের সংঘর্ষ বাধে না।

এক প্রকার আইন সর্বত্র চলিত হয়

এককেন্দ্রিক শাসনের আর একটি প্রধান গুণ এই যে ইহাতে খরচ কম হয়। কোন কার্যনীতি নির্ধারণ করা যেমন সহজ, তেমনি উহা সর্বত্র অনুসৃত হইতেছে কিনা তাহা পর্যবেক্ষণ করাও কষ্টসাধ্য নহে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পরিচালনা থাকায় ব্যয়বাহুল্য ঘটিবার আশংকা থাকে।

ব্যয়বাহুল্য হয় না

দেশে বৈদেশিক নীতি কিংবা আভ্যন্তরীণ শাসন বিষয়ে কোন সংকট উপস্থিত হইলে এককেন্দ্রিক সরকার দৃঢ়তার সহিত যে কোন নীতি কার্যকরী করিতে পারে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কোন রাজ্যের সরকার বেশি বা কম পরিমাণে ঐ নীতি অনুসরণ করিতে পারে। ফলে নীতির ঐক্য বজায় রাখা কঠিন হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রের সরকার নির্দেশ দিতে পারেন যে, বিদেশী লোকেরা যেন গোপনে অনুপ্রবিষ্ট না হয়, তাহার দিকে আঙ্গিক সরকারগুলিকে নজর রাখিতে হইবে। কিন্তু কোন এক

দৃঢ়তার সহিত কাজ করা যায়

বিশেষ সীমান্তে হয়তো কোন কারণবশতঃ তেমন সতর্কতা না থাকিতে পারে। ইহার ফলে সমগ্র রাষ্ট্র বিপন্ন হইতে পারে। জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে এককেন্দ্রিক সরকার অতি শীঘ্র তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে পারে।

আর্থিক পরিকল্পনা

আর্থিক পরিকল্পনার রূপায়ণে যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র অধিক সুনিপুণ হয়। যুক্তরাষ্ট্রে আর্থিক পরিকল্পনা সার্থক করিবার জন্য আঞ্চিক রাজ্যগুলির ক্ষমতা কিছু পরিমাণে হ্রাস করিবার প্রয়োজন হয়।

ইহার ত্রুটি—বৈচিত্র্যের অভাব, কুশাসন ও আমলাশাহীর আশংকা

এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের প্রধান দোষ হইল এই যে, ইহাতে বিভিন্ন অঞ্চলের বৈচিত্র্য ফুটিতে পায় না। সকল স্থানে এক জগদ্দল সরকারের চাপ দেওয়া হয়। ঐ সরকারের পক্ষে দূরের লোকদের সকল প্রকার অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করা সহজ হয় না। স্থানীয় ব্যক্তিরা নেতৃত্ব প্রকাশ করিবার সুযোগ বেশি পান না। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে বিপুল কার্যভার ন্যস্ত থাকায় আমলাদের ক্ষমতা ও প্রভাব অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। তাঁহারা যদি সাধু ও কর্মনিপুণ না হন, তাহা হইলে শাসনব্যবস্থা অচল হইবার জোগাড় হয়। ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষে এককেন্দ্রিকতা এক সময়ে এত বাড়িয়া ছিল যে, একটি চাপরাশি নিযুক্ত করিতে হইলে বা একটি সেতু সংস্কার করিতে হইলে সুদূর কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন হইত। উহা যতদিন না পাওয়া যাইত ততদিন কাজকর্ম অচল থাকিত। যেমন এক জায়গায় বেশি গোবর জড় করিয়া রাখিলে দুর্গন্ধে টেঁকা যায় না, তেমনি একটি কেন্দ্রে অত্যধিক ক্ষমতা ন্যস্ত করিলে উহার দাপটে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়। গণতন্ত্রের নীতি অনুসারে আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বন্টিত হইলে সুশাসন এবং স্বশাসন উভয়ই অধিকতর সহজলভ্য হয়।

৩। **মৈত্রীবন্ধন (Alliance)**ঃ দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র আর্থিক ও সামরিক প্রয়োজনের তাগিদে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাহাদের প্রত্যেকের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে। বৈদেশিক নীতি পরিচালনার কোন কোন বিষয়ে তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে একমত হন। কিন্তু সমগ্র পররাষ্ট্র নীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কোন রাষ্ট্রই ছাড়িয়া

দেয় না। এইরূপ মৈত্রীবন্ধন সুদীর্ঘকাল ধরিয়া স্থায়ী হইতে পারে না। অবস্থার ও ক্ষমতার ভারসাম্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন শিথিল এবং অবশেষে ভগ্ন হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে ফ্রান্স ও রাশিয়া মৈত্রীবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছিল; কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে উহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সমানে সমানে মৈত্রীবন্ধন ঘটিলে ইচ্ছামত একে অন্যের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু যখন কতকগুলি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র একটি বড় রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়, তখন তাহারা উপগ্রহের মতন বৃহৎ রাষ্ট্রটিকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইতে থাকে। পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি রাশিয়ার সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আজকাল ঐভাবে উপগ্রহে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু মৈত্রীবন্ধনের সাধারণ নিয়ম হইতেছে যে উহার অংশীদারেরা যে কোন সময় উহা ছিন্ন করিতে পারে।

৪। **ব্যক্তিগত বন্ধন (Personal Union) ও প্রকৃত বন্ধন (Real Union)ঃ** মৈত্রীবন্ধনে বদ্ধ রাষ্ট্রগুলির প্রত্যেকের স্বতন্ত্র রাজা বা শাসকবৃন্দ থাকে, কিন্তু ব্যক্তিগত বন্ধনে যুক্ত দুইটি রাষ্ট্রে একই রাজা থাকেন। উত্তরাধিকার সূত্রে বা বিবাহ বন্ধনের ফলে এইরূপ বন্ধন ঘটিতে পারে। এলিজাবেথের মৃত্যুর পর স্কটল্যাণ্ডের রাজা জেমস্ ইংলণ্ডের অধিপতি হন। ঐ দুই দেশ প্রথম প্রথম ব্যক্তিগত বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। উভয়ের আভ্যন্তরীণ শাসনপ্রণালী, ধর্ম, সংস্কৃতি ও বৈদেশিক নীতি আলাদা আলাদা ছিল। কিন্তু কালক্রমে ঐ দুই দেশ এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু ইংলণ্ড ও হ্যানোভার প্রথম জর্জের সময় হইতে একই রাজার দ্বারা শাসিত হইলেও উভয়ে কখনও একীভূত হয় নাই।

ব্যক্তিগত বন্ধন অপেক্ষা প্রকৃত বন্ধন দুই রাষ্ট্রের মধ্যে অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করে। ব্যক্তিগত বন্ধনে উভয়ের বৈদেশিক নীতি পৃথক্ হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত বন্ধনে তাহা হইতে পারে না। প্রকৃত বন্ধনে আবদ্ধ রাষ্ট্রদ্বয় আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রায় স্বাধীন, কিন্তু বৈদেশিক নীতি উভয়ের এক হওয়া চাই। যদি ঐ দুই দেশের মধ্যে কোন যুদ্ধ বাধে, তবে উহা আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে গৃহযুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নরওয়ে ও সুইডেন এইরূপ এক প্রকৃত বন্ধনে যুক্ত ছিল। হাঙ্গেরির ম্যাগেয়ার

প্রকৃত বন্ধন অস্থায়ী

জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি কিয়ৎ পরিমাণে স্বীকার করিয়া লইয়া অস্ট্রিয়ার জার্মান জাতি ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে উহাদের সহিত প্রকৃত বন্ধন মানিয়া লইয়াছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে হাঙ্গেরি পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, নামে প্রকৃত বন্ধন বলিলেও বস্তুতঃ ইহা স্থায়ী বন্ধন নহে।

৫। **রাষ্ট্র সমবায়** (Confederacy): দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র তাহাদের নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া রাষ্ট্র সমবায়ের সদস্যতা স্বীকার করিয়া লয়। এই চুক্তির ফলে একদিকে যেমন চুক্তিকারী কোন রাষ্ট্র তাহার স্বাধীনতা হারায় না, অন্য দিকে তেমনি নূতন কোন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় না। চুক্তিকারী রাষ্ট্রগুলি প্রতিরক্ষা (Defence) প্রভৃতি কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হইয়া কার্য করিবে ইহা স্থিরীকৃত হয়। প্রাচীন কালের রাষ্ট্র সমবায়সমূহ বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই, কিন্তু আধুনিককালের রাষ্ট্রসমবায় অল্প কিছুকালের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হয়।

প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে উৎপন্ন হয়

আন্তর্জাতিক আইনের অন্যতম বিশেষজ্ঞ ওপ্লেনহাইম্ (Oppenheim) বলেন যে, রাষ্ট্র সমবায় হইতেছে কয়েকটি পূর্ণ সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে আন্তর্জাতিক সন্ধির দ্বারা সংগঠিত এমন এক সংঘ যাহারা শাসনযন্ত্র সদস্য-রাষ্ট্রদের উপর কোন বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে, কিন্তু ঐ রাষ্ট্রগুলির নাগরিকদের উপর কোন অধিকার দাবি করিতে পারে না। প্রত্যেক সদস্য—রাষ্ট্রের বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ স্বাতন্ত্র্য রাখাই রাষ্ট্রসমবায়ের উদ্দেশ্য। ("A Confederacy consists of "a number of full Sovereign States linked together for the maintenance of their external and internal independence by a recognised international treaty into a union with organs of its own, which are vested with a certain power over the member-states, but not over the citizens of these states.")

সংজ্ঞা

আধুনিক যুগের দুইটি রাষ্ট্র সমবায়ের কথা উল্লেখযোগ্য। প্রথম হইতেছে মাত্র আটবর্ষকালস্থায়ী (১৭৮১-১৭৮৯) আমেরিকার রাষ্ট্র সমবায় এবং দ্বিতীয় হইতেছে একান্ন বৎসর স্থায়ী (১৮১৫-১৮৬৬) জার্মান রাষ্ট্র সমবায়।

আমেরিকার সমবায়ের কোন নিজস্ব শাসনযন্ত্র বা বিচারালয় ছিল না, কিন্তু তেরটি সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা একত্র হইয়া প্রতিরক্ষা বিষয়ে মন্ত্রণা করিতেন। শুধু ঐ বিষয়টি তাঁহারা এককভাবে নির্ণয় করিতে পারিতেন না। জার্মান্ সমবায়ে সদস্য রাষ্ট্রেরা প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া যে সভা (Dist) বসাইতেন তাহা বৈদেশিক নীতি নিয়ন্ত্রণ করিত; কিন্তু ছোটখাট ব্যাপারে প্রত্যেক রাষ্ট্র সন্ধি করিবার ক্ষমতা বজায় রাখিয়াছিল। সভায় নির্ধারিত নীতি কার্যে প..রণত করিবার জন্য কোন শাসনযন্ত্র ছিল না, প্রত্যেক রাষ্ট্র উহা নিজেদের কর্মচারীদের সাহায্যে রূপায়িত করিত। তবে কার্যত উহাতে অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য ছিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রুশিয়ার নেতৃত্বে ইহাই জার্মান সাম্রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রাষ্ট্র সমবায় বেশি দিন স্থায়ী হয় না; ইহা পূর্ণতর ঐক্য স্থাপনের সোপানরূপে ব্যবহৃত হয়।

আমেরিকা ও জার্মানির রাষ্ট্র সমবায়

যুক্তরাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্র সমবায়ের কয়েকটি গুরুতর পার্থক্য দেখা যায়। প্রথমতঃ রাষ্ট্রসমবায়ের সদস্যেরা ইচ্ছামত উহা ত্যাগ করিবার স্বাধীনতা বজায় রাখে। এই স্বাধীনতা থাকে বলিয়াই তাহারা প্রত্যেকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া আত্মতৃপ্তি অনুভব করে; যদিও প্রকৃত পক্ষে বৈদেশিক নীতি পরিচালনা ব্যাপারে কাহারও স্বাতন্ত্র্য থাকে না বলিয়া আইনতঃ কোন সদস্যকেই সার্বভৌম বলা চলে না। কতকগুলি রাষ্ট্র মিলিত হইয়া যখন যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে, তখন তাহারা উহা হইতে বাহির হইয়া আসিবার স্বাতন্ত্র্য চিরতরে ত্যাগ করে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, কোন রাজ্যই ইচ্ছামত যুক্তরাষ্ট্রের সংস্রব ত্যাগ করিবার অধীকারী নহে। সাধারণতঃ সকল যুক্তরাষ্ট্রেই এই নীতি প্রতিপালিত হয়, কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার সংবিধানে সদস্য রাজ্যদিগকে সংস্রব ত্যাগ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য এই ক্ষমতার বাস্তব মূল্য বিশেষ কিছুই নাই—কেন না সমগ্র রাশিয়ায় একটি মাত্র রাজনৈতিক দল আছে এবং সেই দলই শাসন পরিচালনা করিয়া থাকে; সুতরাং দলের নির্দেশ অমান্য করিতে কোন আঙ্গিক রাজ্য কোন দিন সফল হইবে ইহা

যুক্তরাষ্ট্রের সহিত প্রভেদ—সম্বন্ধ ছিন্ন করা হয়

কল্পনা করা যায় না। রাষ্ট্র সমবায় বিচ্ছিন্ন হইতে পারে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র পারে না।

দ্বিতীয়তঃ যুক্তরাষ্ট্রের সংগঠনের ফলে এক নূতন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় এবং আঙ্গিক রাজ্যসমূহ তাহাদের সার্বভৌমিকতা হারায়। রাষ্ট্রসমবায় গঠিত হইলেও সদস্য রাজ্যেরা প্রত্যেকে নিজ নিজ অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখে। যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব শাসনযন্ত্র, আইনসভা, বিচারালয় প্রভৃতি থাকে; রাষ্ট্র সমবায়ে এ সব কিছুই থাকে না। সেখানে সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা মিলিত হইয়া আলাপআলোচনা করেন ও নীতি নির্ধারণ করেন বটে, কিন্তু কোন প্রতিনিধি নিজের ইচ্ছামত কোন মত দিতে পারেন না; তাঁহাকে যে রাষ্ট্র পাঠাইয়াছে, সেই রাষ্ট্রের শাসনকর্তাদের অভিপ্রায় কি জিজ্ঞাসা করিয়া সেই অনুসারে তাঁহাকে মত দিতে হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব শাসনব্যবস্থা থাকে

তৃতীয়তঃ রাষ্ট্রসমবায়ের সঙ্গে সদস্যরাষ্ট্রের নাগরিকদের কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকে না। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের নিজ নিজ নাগরিক থাকে এবং এক সদস্য রাষ্ট্রের নাগরিক অন্য সদস্য রাষ্ট্রে বিদেশী বলিয়া গণ্য হয়। যুক্তরাষ্ট্রে এক নাগরিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়। আমেরিকা ও সুইট্‌জারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিনাগরিকতা দেখা যায়; যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক আবার তাঁহাদের নিজ নিজ রাজ্যেরও নাগরিক।

এক নাগরিকতা

রাষ্ট্র সমবায় চুক্তির ফলে মাত্র উদ্ভূত হয়; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র উৎপন্ন হয় সংবিধানের ফলে। সংবিধানের স্থান সকলের উপরে, উহার ধারা কেহ লংঘন করিতে পারে না। চুক্তিতে যাঁহারা আবদ্ধ হন তাঁহারা চুক্তি ভঙ্গও করিতে পারেন। কিন্তু চুক্তির শর্ত যদি বদলাইতে হয় তাহা হইলে প্রত্যেক সদস্যের সম্মতির প্রয়োজন হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান পরিবর্তন করিবার জন্য সদস্য রাজ্যগুলির নির্দিষ্ট সংখ্যার মাত্র সম্মতি লইতে হয়; প্রত্যেকের সম্মতির দরকার নাই। অবশ্য কোন যুক্তরাষ্ট্র সংগঠনের সময় সংবিধানে এরূপ ধারা রাখা যাইতে পারে যে প্রত্যেক রাজ্যের মত না হইলে সংবিধানের পরিবর্তন করা হইবে না।

সংবিধানের গুরুত্ব

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে যদি কোন বিষয়ে আইন করিবার অধিকার কেন্দ্রায়

আইনসভাকে দেয় এবং ঐ আইনসভা সেই বিষয়ে কোন আইন করে তাহা হইলে উহা প্রত্যেক রাজ্য মানিতে বাধ্য হয়। কিন্তু রাষ্ট্র সমবায়ের যে কোন সদস্য Doctrine of Nullification নীতি প্রয়োগ করিয়া বলিতে পারে যে চুক্তির শর্তের মধ্যে ঐরূপ বিষয়ের উল্লেখ ছিল না, সুতরাং উহা মানিতে বাধ্য নহে। এরূপ পার্থক্যের কারণ এই যে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয় জাতীয় ঐক্য সাধনের উদ্দেশ্যে আর রাষ্ট্র সমবায়ের উদ্দেশ্য হইল প্রতিরক্ষা বা অনুরূপ কোন বিশেষ একটি উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া।

রাষ্ট্রসমবায়ে প্রত্যেক রাষ্ট্রের আইন না মানার অধিকার

৬। যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভবের কারণঃ রাষ্ট্র সমবায় এবং এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের মাঝামাঝি স্থানে থাকে যুক্তরাষ্ট্র। রাষ্ট্র সমবায়ের সদস্যেরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ বজায় রাখিতে চায়, আর অন্য দিকে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলির কোন প্রকার স্বাতন্ত্র্য থাকে না। যুক্তরাষ্ট্রে আঙ্গিক রাজ্যগুলির কয়েকটি বা কতকগুলি বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য থাকে, কিন্তু অপর কতকগুলি বিষয়ে কোন কর্তৃত্ব থাকে না। আঙ্গিক রাজ্যগুলি পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে চায় বটে, কিন্তু মিলিয়া মিশিয়া একেবারে একীভূত হইতে চাহে না। যেখানে একীভূত হইবার আশংকা জন্মে সেখানে যুক্তরাষ্ট্র না হইয়া এক কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র উৎপন্ন হয়। তাই বলা হয় যে স্বাধীন হইয়া থাকিবার ভাবের সহিত একজাতিতে পরিগণিত হইবার ইচ্ছার রফা (Compromise) করিতে গিয়া যুক্তরাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়।

স্বাতন্ত্র্যের সহিত রফা হইতে যুক্তরাষ্ট্রের উৎপত্তি।

আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এবং ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক কারণে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। কোন প্রবল শক্তির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য কেবলমাত্র রাষ্ট্রসমবায়ের গঠন যখন যথেষ্ট ফলপ্রসূ নহে বলিয়া বোধ করা যায় তখন যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিবার ইচ্ছা জন্মে। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সুইট্জারল্যাণ্ডের ক্যাণ্টনগুলি এই ইচ্ছার বশে রাষ্ট্র সমবায় হইতে যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। একার পক্ষে প্রবল জার্মান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা কঠিন বলিয়া অস্ট্রেলিয়ার আঙ্গিক রাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়াছিল।

একই ভাষাভাষী একই জাতির লোক একই শাসনের অন্তর্ভুক্ত থাকার

ফলে তাহাদের মধ্যে যে জাতীয়তা বোধ জন্মে তাহার অনুপ্রেরণায় কতকগুলি উপনিবেশ এক যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিতে চাহে। তাহারা একদিকে ঔপনিবেশিক শক্তির শাসনপাশ হইতে মুক্ত হইতে চাহে অন্যদিকে নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিতে রাজী হয় না। এইরূপ ঐতিহাসিক ঘটনার ফলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। তবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ধর্ম, ভাষা ও ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ধারা আঙ্গিক রাজ্যগুলির মধ্যে বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও কানাডা ও সুইট্জারল্যাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্র সৃষ্ট হইয়াছে এবং কৃতকার্যতার সহিত কর্তব্য সম্পাদন করিতেছে।

ভৌগোলিক সংস্থান যুক্তরাষ্ট্রগঠনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। যে অঞ্চলগুলি যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহাদের পরস্পরের নিকটবর্তী হওয়া দরকার। সুদূর বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত হইলেও যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অন্য কোন রাষ্ট্রের অধিকৃত ভূমি না থাকিলে ভাল হয়। অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশের সহিত পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া ও ট্যাসমানিয়ার ব্যবধান অনেক এবং উভয় অংশের মধ্যে বিস্তীর্ণ অনুর্বর অঞ্চল বিরাজমান। পাকিস্তানের পূর্ব অংশ ও পশ্চিম অংশের মধ্যে ভারতবর্ষের কয়েকটি রাজ্য অবস্থিত, সেইজন্য অনেক জটিল সমস্যা দেখা দেয়।

যুক্তরাষ্ট্র উৎপত্তির অন্যতম প্রধান কারণ হইতেছে অর্থনৈতিক সমস্যা। আমেরিকায় যখন রাষ্ট্র সমবায় স্থাপিত হইয়াছিল তখন উহা দেউলিয়া হইবার জোগাড় হইয়াছিল, কেন না সদস্যেরা তাহাদের দেয় চাঁদা দিত না। অন্যদিকে তাহারা পরস্পরের বিরুদ্ধে শুল্ক প্রাচীর উঠাইয়াছিল। আর্থিক সংহতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইল। আধুনিক যুগের আর্থিক পরিকল্পনা সার্থক করিবার তাগিদেও নিকটবর্তী রাষ্ট্রেরা যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারে।

৭। যুক্তরাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য ঃ কয়েকটি জন সম্প্রদায় যখন পরস্পরের সহিত স্বার্থ সম্বন্ধে এমনভাবে ঐক্যবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় যে, তাহারা নিজেদের সার্বভৌমিকতা ছাড়িয়া দেয়, অথচ প্রত্যেকে নিজেদের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে এত সচেতন যে, স্বতন্ত্র সত্তা বিসর্জন দিতে রাজী হয় না তখন তাহারা যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে সংঘবদ্ধ হয়। ফাইনার বলেন

যে, যুক্তরাষ্ট্র তাহাকেই বলে, যাহাতে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার কিছু অংশ আঞ্চলিক ক্ষেত্রে ন্যস্ত হয় এবং অন্যান্য অংশ ঐসব আঞ্চলিক ক্ষেত্রের সংঘের ভিতরকার কেন্দ্রীয় সংস্থায় ন্যস্ত থাকে ("A Federal State is one in which part of the authority and power is vested in the local areas while another part is vested in a central institution deliberately constituted by an association of the local areas"). কে. সি. হুয়্যারের মতে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি অনুসারে একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার ও অন্যদিকে আঞ্চলিক সরকারসমূহ বিশেষ কোন ক্ষেত্রে পরস্পরের পরিপূরক অথচ স্বতন্ত্র ("By the federal principle I mean the method of dividing powers so that the general and regional Governments are each within a sphere, Co-ordinate and independent.)"

যুক্তরাষ্ট্রে লিখিত সংবিধান থাকিলে ভাল হয়, কেননা প্রথা ও পরস্পরের মধ্যে বুঝাপড়ার উপর নির্ভর করিলে আঙ্গিক রাজ্যগুলি ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে বিবাদবিসম্বাদের আশংকা থাকে। উড্রো উইলসন বলেন যে, লিখিত সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অপরিহার্য না হইলেও উহা থাকিলে অনেক সুবিধা হয়। আঙ্গিক রাজ্যের ও কেন্দ্রের মধ্যে কাহার কতখানি ক্ষমতা তাহা সংবিধান কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সময় আঙ্গিক রাজ্যগুলির মধ্যে যথেষ্ট রাজনৈতিক চেতনা থাকে, সেইজন্য তাহারা ঠিকভাবে জানিতে চায় কতটা ক্ষমতা তাহাদের হস্তচ্যুত হইল, কতটাই বা রহিল। ভবিষ্যতে বিবাদ বাধিলে তাহারা সংবিধানের নির্দেশক্রমে উহার মীমাংসা করিতে পারিবে।

দ্বিতীয়তঃ সংবিধানের প্রাধান্য যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। কেন্দ্রীয় আইনসভা বা আঙ্গিক রাজ্যের আইনসভা সাধারণ আইন পাশ করাইবার পদ্ধতিতে সংবিধানের পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না। সেইজন্য বলা হয় যে যুক্তরাষ্ট্রে কোন আইনসভাই সার্বভৌম নহে। সংবিধানের পরিবর্তনের সময় আঙ্গিক রাজ্যদের বেশ একটা বড় অংশের সম্মতি লওয়ার প্রয়োজন হয়।

তৃতীয়তঃ সংবিধানের ধারাগুলি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইতেছে কিনা—তাহা দেখিবার ভার থাকে সুপ্রিম কোর্টের উপর। যদি কোন আঙ্গিক রাজ্য মনে করে যে, তাহার অধিকারের উপর অন্য আঙ্গিক রাজ্য

কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার হস্তক্ষেপ করিয়াছে, তাহা হইলে সে সুপ্রিম কোর্টের শরণাপন্ন হইতে পারে। সুপ্রিম কোর্ট কোন কোন সময়ে সংবিধানের আক্ষরিক নির্দেশ অবহেলা করিয়া তাহার যুগোপযোগী ব্যাখ্যা করে। সেইজন্য সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের ব্যাখ্যার উপর যুক্তরাষ্ট্রের ভালোমন্দ অনেকখানি নির্ভর করে।

চতুর্থতঃ যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভায় দ্বিতীয় সদনের (Upper Chamber) বিশেষ উপযোগিতা আছে বলিয়া মনে করা হয়; আঙ্গিক রাজ্যগুলির স্বার্থ-সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ও সুইট্‌জারল্যাণ্ডে ছোট বড় প্রত্যেক আঙ্গিক রাজ্য সমান সংখ্যক সদস্য প্রেরণ করিতে পারে; কিন্তু ক্যানাডা, জার্মানি ও ভারতবর্ষে সদস্যের সংখ্যা কমবেশি—যদিও ঠিক লোকসংখ্যার অনুপাতে সদস্য নির্বাচনের ক্ষমতা দেওয়া হয় না। আমেরিকা ছাড়া অন্যত্র দ্বিতীয় সদনের ক্ষমতা প্রথম সদনের তুলনায় অত্যল্প। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে আঙ্গিক রাজ্যগুলিকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহার রদবদল করিবার সময় বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় সদনের মতামত গ্রহণ করা হয়।

পঞ্চমতঃ যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে কেন্দ্রীয় শাসনের আঙ্গিক রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। এই বণ্টননীতি বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রকার। কিন্তু সাধারণতঃ কেন্দ্রের হাতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি এবং মুদ্রা, ব্যাঙ্কিং প্রভৃতি আর্থিক বিষয় ন্যস্ত থাকে এবং আঙ্গিক রাজ্যগুলি শিক্ষা, স্বায়ত্তশাসন, পুলিশ প্রভৃতি বিষয়ের ভার পায়। সংবিধানে প্রত্যেকটি বিষয় উল্লেখ করা সম্ভবপর নহে। অনুল্লিখিত বিষয়-সমূহ পরিচালনা করিবার ক্ষমতাকে Residuary power বলে। উহা কোথাও কেন্দ্রে ন্যস্ত, কোথাও বা আঙ্গিকরাজ্যে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অস্ট্রেলিয়ায় ও জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্রে ঐ ক্ষমতা আঙ্গিক রাজ্যদের হাতে আছে; কিন্তু কানাডা ও ভারতবর্ষে উহা কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত।

৮। যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির সাফল্যের শর্তঃ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হইয়াও এক না হইবার, স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াও পরস্পরের সহিত যুক্ত হইবার নীতি স্বীকৃত হয়। বাস্তবক্ষেত্রে পরস্পর-বিরোধী এই দুই নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সহজ নহে। কয়েকটি বিশেষ শর্ত

প্রতিপালিত হইলে অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ অবস্থা বর্তমান থাকিলে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি সফলতা লাভ করিতে পারে।

প্রথমতঃ যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানে ইচ্ছুক রাষ্ট্রগুলি পরস্পর হইতে সমুদ্র কিংবা দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতের দ্বারা বিচ্ছিন্ন না হয়। তাহাদের মধ্যে একটা ভৌগোলিক ঐক্য যেন থাকে, তাহা না হইলে পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান করা কঠিন হয়। পাকিস্তানের পূর্ব অংশ হইতে পশ্চিম অংশ ভারতীয় রাজ্যের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সেখানে বহু অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে।

ভৌগোলিক ঐক্য

যুক্তরাষ্ট্রে সংঘবদ্ধ রাজ্যগুলি যদি জাতীয়তাবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে সংহতি বৃদ্ধি পায়। নাগরিকেরা যদি কেবলমাত্র নিজ নিজ রাজ্যের নাগরিক বলিয়া মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে নিজদিগকে ভাবিতে না শিখেন, তাহা হইলে পরস্পরের মধ্যে হিংসাদ্বেষ বৃদ্ধি পাইবে এবং শাসনসম্বন্ধীয় ঐক্য সত্ত্বেও প্রকৃত একতার ভাব জন্মিবে না। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, একতা বৃদ্ধির জন্য রাজ্যগুলির মধ্যে এক ভাষা ও এক ধর্ম প্রচলিত হইবার আবশ্যকতা নাই। কেন না, কানাডা ও সুইট্‌জারল্যাণ্ডের আঙ্গিক রাজ্যগুলির ভাষা ও ধর্ম বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ঐক্যবোধ জন্মিয়াছে।

সংহতি বোধ

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে একই ধরনের শাসনপ্রণালী বর্তমান থাকিলে ভালো হয়। কোন আঙ্গিক রাজ্যে স্বেচ্ছাচারতন্ত্র, কোথাও বা সাধারণতন্ত্র থাকিলে তাহাদের মধ্যে বিরোধ বাধিবার আশংকা থাকে। তাই ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের পূর্বে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রশাসিত রাজ্যগুলিতে স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের অবসান ঘটানো হইয়াছিল।

শাসনপ্রণালীর সাম্য

আঙ্গিক রাজ্যগুলির মধ্যে কোনটি আয়তনে ও জনসংখ্যায় কিছু ছোট, কোনটি বা কিছু বড় হইতে পারে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোনটি যদি ধনবলে ও জনবলে অপর সকলের সমষ্টিগত শক্তির অপেক্ষাও বেশি ক্ষমতাশালী হয়, তাহা হইলে ছোট ছোট রাজ্যগুলি বড় রাজ্যটির তাঁবেদার অথবা মুখাপেক্ষী হইয়া কোন

অর্থবলের ও জনবলের সাম্য

প্রকারে অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জার্মানির সাম্রাজ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি গৃহীত হইলেও প্রকৃত পক্ষে প্রুশিয়ার প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। সোভিয়েট রাশিয়ার ইউনিয়নের মধ্যে পনেরটি আঙ্গিক রাজ্য বা সাধারণতন্ত্র আছে বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে একটিতেই (R. S. F. S. R.) দুই তৃতীয়াংশ লোকের বাস। কাজেই তাহার প্রাধান্য না মানিয়া উপায় নাই। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আসাম, উড়িষ্যা, গুজরাট প্রভৃতি জনবলে ও আর্থিক সম্পদে ছোট বলিয়া ইহাদিগকে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে আর্থিক সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আঙ্গিক রাজ্যগুলির মধ্যে সামাজিক প্রথা ও আচারব্যবহার মোটামুটি এক রকম হইলে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদের আশংকা কম থাকে।

একই প্রকার সামাজিক ব্যবস্থা

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণস্থিত রাজ্যগুলি দাসত্ব প্রথা মানিত এবং উত্তর দিকস্থ রাজ্যগুলি ঐ প্রথার বিপক্ষে ছিল বলিয়া উভয়ের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাধিয়াছিল। উহার ফলে দাসত্বপ্রথা বিলুপ্ত হয় এবং উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এ কথা মনে করিলে ভুল হইবে যে, যুক্তরাষ্ট্র বুঝি সকল আঙ্গিক রাজ্যগুলিকে রোলার দিয়া পিষিয়া এক করিতে চায়। বৈচিত্র্যে ও বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যভাব ফুটানোও যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য।

ঐ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার জন্য মন্ত্রি-পরিষদ গঠন করিবার সময় উহাতে বিভিন্ন আঙ্গিক রাজ্যগুলির প্রতিনিধি লইবার চেষ্টা করা হয়। কোন কোন রাজ্য হইতে যদি বহু মন্ত্রী ও অনুরূপ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিকে লওয়া হয়, অথচ কোন কোন রাজ্য অবহেলিত হয়, তাহা হইলে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। কিন্তু আঞ্চলিক ভিত্তিতে মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে যাইয়া কোন অযোগ্য ব্যক্তির উপর কর্তৃত্বভার না চাপানো হয়, সেদিকে নজর রাখা দরকার। নেতৃত্বের গুণে যুক্তরাষ্ট্র সফল হয়। নেতারা যদি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও অপক্ষপাত বিচারে অভ্যস্ত হন তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের ভাব বৃদ্ধি পায়।

"That a federal system can flourish only among the communities imbued with a legal spirit and trained to reverence the law is as certain as can be any political speculation. Federalism substitute litigation and none but a law fearing people will be inclined to regard the dicision of a suit as equivalent to the enactment of a law."

মহামতি ডাইসি বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সকলের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া প্রয়োজন। সুপ্রীম কোর্ট কেন্দ্রীয় শাসন ও আঙ্গিক রাজ্যের সরকারগুলির মধ্যে মামলামকদ্দমায় যে রায় দেন, তাহা সকলে মাথা পাতিয়া লইলে তবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন সফল হয়।

৯। যুক্তরাষ্ট্রের গুণঃ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াও এক বৃহত্তর রাষ্ট্রের সকল সুবিধা ভোগ করিতে পারে। দেহের সকল অংশে রক্ত সঞ্চালিত না হইয়া এক জায়গায় যদি স্তূপীকৃত হয়, তাহা হইলে উহা যেমন মারাত্মক হয়, সকল ক্ষমতা একটি মাত্র কেন্দ্রে ন্যস্ত করাও তেমনি আশংকাজনক। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থায় কিছু কিছু ক্ষমতা বিভিন্ন আঙ্গিক রাজ্যের হস্তে ন্যস্ত হয়, তাই এক সর্বশক্তিমান্ কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা ক্ষমতার অপব্যবহার হইতে পারে না।

ক্ষমতার অপব্যবহারের আশংকা কম

আঙ্গিক রাজ্যগুলির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শাসনযন্ত্র ও আইনসভা থাকে। উহাতে বহুসংখ্যক ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ পান। তাঁহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি দশের কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করা হয়। এককেন্দ্রিক শাসনে এত লোককে দায়িত্বসম্পন্ন কার্যে নিযুক্ত রাখা সম্ভব হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক নীতি জয়লাভ করে। বিস্তীর্ণ ভূভাগকে একই রাষ্ট্রের অধীনে রাখিয়া উহার বিভিন্ন অংশকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বায়ত্ত-শাসন প্রভৃতি বিষয়ে আত্মকর্তৃত্ব প্রদান করা হয়। গণতন্ত্রে যেমন ব্যক্তির স্বাধীনতা সংরক্ষিত হয়, যুক্তরাষ্ট্রে তেমনি আঙ্গিক রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্যের উপর হস্তক্ষেপ করা হয় না।

নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ

বড় আকারে কেন্দ্রীয় শাসনের মধ্যে কোন পরীক্ষামূলক কার্য চালানো বিপজ্জনক, কেননা উহাতে বহুসংখ্যক লোকের স্বার্থ জড়িত থাকে। কিন্তু আঙ্গিক রাজ্যের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে এরূপ গবেষণা চালাইতে পারা যায়। এক ক্ষেত্রে কোন কারণে উহা বিফল হইলে অন্য রাজ্যে উহা প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

পরীক্ষামূলক কার্য চালানো যায়

যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রধান গুণ হইতেছে এই যে ইহা যুগোপযোগী। ছোট ছোট রাজ্যগুলির পক্ষে এযুগে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা যেমন কঠিন, তেমনি অর্থনৈতিক বিকাশ সাধন করা কষ্টসাধ্য। কিন্তু তাহারা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যুক্ত হইয়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সকল সুবিধাই পাইতে পারে, অথচ নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা একেবারে বিসর্জন দিতে বাধ্য হয় না।

কিছু স্বাতন্ত্র্য রাখিয়া আর্থিক ও রাজনৈতিক বিকাশের সুবিধা

১০। **যুক্তরাষ্ট্রের দোষঃ** যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা জটিল। কেন্দ্র ও আঙ্গিক রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন। সেইজন্য পরস্পরের মধ্যে মামলামকদ্দমা লাগিয়াই থাকে। বিচারকদের পক্ষে সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন বিচার করাও সহজ হয় না। তাঁহারা সাধারণতঃ কেন্দ্রের প্রতিই অধিকতর সহানুভূতিসম্পন্ন হন।

যুক্তরাষ্ট্রে তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও দুঃসাধ্য। আঙ্গিক রাজ্যগুলির মতামত লইতে অনেক সময় অতীত হইয়া যায়। সেইজন্য যুদ্ধ ও জাতীয় সংকটকালে সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়া থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের বা উহার আঙ্গিক রাজ্যের সরকার যে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের সরকার অপেক্ষা দুর্বল এরূপ মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। আজকাল পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী যে দুইটি রাষ্ট্র আছে তাহারা উভয়েই যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি অনুসরণ করে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় ব্যয়বাহুল্য ঘটে, কেননা একই ধরনের কতকগুলি কাজ করিবার ভার বিভিন্ন আঙ্গিক রাজ্যে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত থাকে। এককেন্দ্রিক শাসনপদ্ধতি বর্তমান থাকিলে উহাদের উপর নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ করিবার ক্ষমতা একটি মাত্র কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হইত। দুষ্কৃতিকারীরা এক অঙ্গরাজ্যে অপরাধ করিয়া অন্য অঙ্গরাজ্যে পলায়ন করিলে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে ও দণ্ড দিতে অনেক সময় ব্যয়িত হয়। কোন রাজ্যের এলাকায় বিচার হইবে ইহা নির্ণয় করিতেই অনেক সময় চলিয়া যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যদি বিবাহবন্ধন ও বিবাহবিচ্ছেদ সম্বন্ধে আইন করিবার

ভার অঙ্গরাজ্যগুলির উপর ন্যস্ত থাকে তাহা হইলে উহারা কখনো কখনো পরস্পরবিরোধী আইন তৈয়ারি করিয়া থাকে। একরাজ্যে যে ধরনের বিবাহ আইনানুমোদিত, অন্য রাজ্যে হয়তো তাহা অবৈধ। প্রথমোক্ত রাজ্যে বিবাহ করিয়া দ্বিতীয়োক্ত রাজ্যে মধুচন্দ্রিমা যাপন করিতে গেলে নবদম্পতী হয়তো বে-আইনী কাজ করার অভিযোগে অভিযুক্ত হইতে পারে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এরূপ ঘটনা কখনো কখনো ঘটে। তাই ভারতীয় সংবিধান রচনার সময় বিবাহ সম্বন্ধে আইন তৈয়ারির ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আইনসভার উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কিছু দোষ-ত্রুটি আছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া উহার পরিবর্তে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র স্থাপনের উপদেশ দিলে অস্ট্রেলিয়া, সুইট্জারল্যাণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আঙ্গিক রাজ্যগুলি কখনই একীভূত হইতে রাজী হইত না। তাহারা কিছুটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার আশায় যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে সম্মত হইয়াছিল। সেইজন্য তাহাদের নিকট একক বিচ্ছিন্ন ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্ররূপে জীবন যাপনের একমাত্র বিকল্প ছিল যুক্তরাষ্ট্র।

যুক্তরাষ্ট্রে এককেন্দ্রিকতার প্রবৃত্তি (Tendencies towards Centralisation in Federal States): বিংশ শতাব্দীর দুইটি বিশ্বযুদ্ধ, যান্ত্রিক উন্নতির ফলে উৎপাদন ও পরিবহনের বিপ্লব, আর্থিক সংকট ও আর্থিক পরিকল্পনা এবং জনকল্যাণমূলক অগ্রগতি যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ধীরে ধীরে এককেন্দ্রিকতার প্রবৃত্তি বাড়াইতেছে। তাহার ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্যের মাত্রা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। সেইজন্য আধুনিক গতির দিকে লক্ষ্য রাখিলে যুক্তরাষ্ট্র ও এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের গুণ ও দোষের মধ্যে তুলনা করা অনেকাংশে নিরর্থক মনে হয়।

এককেন্দ্রিকতার প্রবৃত্তির হেতু

এ যুগের যুদ্ধ হইতেছে সর্বব্যাপক। ইহাতে জয়ী হইতে হইলে ক্ষেতে খামারে, কল-কারখানায় সকল প্রকার উৎপাদনের উপর একটি সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন হয়। যুদ্ধের মাল সরবরাহ করিবার জন্য অসামরিক জনগণের ক্রয় করিবার স্বাধীনতা সংকোচ করিতে হয়। রেশনিং ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ-নীতি সফল

যুদ্ধ

করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে প্রচুর ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের বাজেট অসম্ভব রকম স্ফীত হইয়াছিল, কিন্তু আঙ্গিক রাজ্যগুলির বাজেটের বিশেষ কোন বৃদ্ধি ঘটে নাই। কেন্দ্রীয় সরকার বহু অর্থ আঙ্গিক-রাজ্যগুলিকে সাহায্যরূপে প্রদান করিতেন। আর্থিক সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা যে নির্দেশ দিতেন তাহাও আঙ্গিক রাজ্যের সরকারসমূহকে মানিতে হইত।

যান্ত্রিক উন্নতিতে দেশকালের উন্নতির হ্রাস

বিংশ শতাব্দীতে যানবাহনের, সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থার ও যন্ত্রপাতির এমন বিস্ময়কর উন্নতি হইয়াছে যে, স্থান ও কালের ব্যবধান অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। ইহার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে আঙ্গিক রাজ্যগুলির খুঁটিনাটি সংবাদ সংগ্রহ করা এবং তাঁহাদের কার্যনীতির বৈষম্য দূর করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া সহজ হইয়াছে। কেন্দ্র হইতে বিভিন্ন আঙ্গিক রাজ্যে ঐ নানাপ্রকার বিশেষজ্ঞ প্রেরণ করিয়া উপদেশ দেওয়া হয়। আঙ্গিক রাজ্যের সরকারগুলি ঐ উপদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারে না। তা ছাড়া নানা স্তরের কর্মকর্তারা মাঝে মাঝে কেন্দ্রীয় সরকারের আহ্বানে একত্রে মিলিত হইয়া পরস্পরের কার্যপদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে চেষ্টা করে।

আর্থিক সংকট ও পরিকল্পনা

ধনতান্ত্রিক সভ্যতায় মাঝে মাঝে আর্থিক সংকট দেখা দেয়। জিনিসপত্রের দাম কমিয়া যায়, উৎপন্ন মালের চাহিদা হ্রাস পায়, শিল্পপতিরা উৎপাদন কমাইয়া দিবার জন্য অনেক শ্রমিককে বরখাস্ত করেন ; তাহাদের কিনিবার ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার দরুণ জিনিসপত্রের চাহিদা আরও কমিয়া যায়। এ হেন সংকটকালে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে উৎপাদনের বৃদ্ধি ও বেকার সংখ্যা হ্রাস করিবার জন্য সকল আঙ্গিক রাজ্যের সরকারের কার্যকলাপের উপর হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন হয়। সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের এমনভাবে ব্যাখ্যা করে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের ঐরূপ ক্ষমতা প্রয়োগে আঙ্গিক রাজ্যগুলি আপত্তি করিতে পারে না, অথবা আপত্তি করিলেও তাহা টেঁকে না। আজকাল আর্থিক সংকট নিবারণের জন্য আর্থিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইতেছে। ঐ পরিকল্পনা রূপায়িত করিতে হইলে কেন্দ্রীয় সরকারকে

শুধু যুক্তি-পরামর্শ দিলেই চলে না, আঙ্গিক রাজ্যের শাসনব্যবস্থাকে কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়।

আধুনিক রাষ্ট্রে জনকল্যাণে নীতি সার্থক করিবার জন্য বেকার ও অকর্মণ্যদিগকে সাহায্য দান, দরিদ্র ছাত্রদিগকে পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান, রোগের মূল দূরীকরণ প্রভৃতি কার্যভার গ্রহণ করিতে হয়। এগুলি আঙ্গিক রাজ্যসরকারের কার্য বলিয়া সংবিধানে লেখা থাকিলেও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভূত সাহায্য ছাড়া করা সম্ভবপর হয় না। অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

জনকল্যাণ নীতি

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুসারে আঙ্গিক রাজ্যগুলির অনুল্লিখিত বিষয়সমূহের উপর কর্তৃত্ব করিবার (Residuary power) ক্ষমতা পাইয়াছিল। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের ব্যাখ্যার সাহায্যে কেন্দ্রীয় সরকার আন্তর্দেশীয় বাণিজ্য, যাতায়াত ব্যবস্থা. শ্রমিকদের কার্যের সময় নির্ধারণ, আর্থিক দুর্গতি নিবারণ প্রভৃতি বিষয়ের উপর আইন করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। আর্থিক সংকট হইতে মুক্তি পাইবার জন্য আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট যে New Deal নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকার উৎপাদন, বণ্টন ও পরিকল্পনার কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং অবশিষ্ট ক্ষমতা (Residuary power) শুধু নামেই এখন আঙ্গিক রাজ্য সরকারের হাতে আছে।

আমেরিকায় এককেন্দ্রিকতা

অস্ট্রেলিয়াতেও এই প্রবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ইঞ্জিনিয়ারদের মামলায় অস্ট্রেলিয়ার সালিশী আদালত (Commonwealth Arbitration Court) আঙ্গিক রাজ্যে বেতন ও চাকুরির শর্ত সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার লাভ করে। ১৯২৬ সালে ঘোষিত হয় যে, ঐ আদালতের কোন রায় আঙ্গিক রাজ্যের আইনের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। অস্ট্রেলিয়ার সংবিধানে Inter-State Financial Agreementএর নীতি সন্নিবিষ্ট হওয়ার ফলে কেন্দ্র অধিক শক্তিসম্পন্ন হইয়াছে।

অস্ট্রেলিয়ার

কানাডাতে Residuary Power কেন্দ্রেই ন্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রিভি-

কাউন্সিল কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রায় প্রদান করিয়া আঙ্গিক রাজ্যের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। অধ্যাপক কেনেডি সেই জন্য মন্তব্য করিয়াছেন যে, কানাডায় জাতীয় বিপদ ও সংকট ছাড়া প্রায় সবই অবশিষ্ট ক্ষমতা প্রদেশদিগকে ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছে।* ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রিভি কাউন্সিল আবার কেন্দ্রীয় শাসনের পক্ষে কয়েকটি রায় দিয়া কানাডাতেও এককেন্দ্রিকতার প্রবৃত্তিকে বলবৎ করিয়াছে।

কানাডায়

পশ্চিম জার্মানির সাধারণতন্ত্রে ও ভারতীয় সংবিধানে আঙ্গিক রাজ্যগুলিকে অনেক বিষয়েই কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী করা হইয়াছে। দৈনন্দিন শাসন ব্যাপারেও উভয় ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকার দিন দিন অধিক শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছেন।

ভারতে

যুক্তরাষ্ট্রের এইরূপ এককেন্দ্রাভিমুখী গতি লক্ষ্য করিয়া কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ভবিষ্যৎ বাণী করিতেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে, যুক্তরাষ্ট্র এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হইবে। এই উক্তি সমর্থন যোগ্য মনে হন না। যুক্তরাষ্ট্রের আঙ্গিক রাজ্যগুলি আজও বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কর্তৃত্ব করিতেছে। তাহারা এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় নাই; কেননা যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার তাহাদের ক্ষমতা কিছু সংকোচন করিতে পারিলেও উহার বিলোপসাধন করিতে সমর্থ হয় নাই। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থায় ঐক্যের উপকারিতার সহিত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আঙ্গিক রাজ্যের স্বাতন্ত্র্যের অপূর্ব সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। তাই সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ লইয়া আজ এক যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব শুনা যাইতেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন

১২। পশ্চিম ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের প্রস্তাবঃ প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হইবার দশ বৎসরের মধ্যেই ইউরোপের রাজনৈতিক গগন

* "That dominion can only invade provincial power in the valid exercise of its enumerated powers and the real residuum of powers, except in cases of national peril and calamity, either rests with the provinces under their property and civil rights in the province, or is unprovided for in the Act."

আবার ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া উঠে। যুদ্ধের সর্বনাশকারী ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ফরাসী রাজনৈতিক ব্রিয়াঁ পশ্চিম ইউরোপকে এক যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তখন তাঁহার কথায় কেহ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড ধ্বংসলীলা এবং রাশিয়ার সাম্যবাদী শাসনব্যবস্থার প্রস্তাব বৃদ্ধি দেখিয়া ফ্রান্স ও ইংলণ্ড যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের প্রারম্ভিক আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করে। আমেরিকাও রাশিয়ার প্রভাবকে প্রতিহত করিবার জন্য এই প্রস্তাব সমর্থন করে। একদিকে আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা, অন্যদিকে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার দ্বারা প্রত্যেকের আর্থিক উন্নতি সাধন এই দুইটি উদ্দেশ্যই সকল যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রেরণা জোগাইয়াছে। উভয় উদ্দেশ্যই পশ্চিম ইউরোপের যুক্তরাষ্ট্র সংগঠনের প্রস্তাবের মূলে রহিয়াছে।

রাশিয়ার হাত হইতে আত্মরক্ষা

কিন্তু আজ পর্যন্ত উহাকে কিভাবে কার্যে পরিণত করা হইবে তাহা স্থির হয় নাই। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড প্রভৃতির বিশাল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব তাহাদের মধ্যে কোনপ্রকার ঐক্য বন্ধনকে সম্ভবপর হইতে দিতেছিল না। কিন্তু এখন উহাদের সকলেরই সাম্রাজ্য বিলীন হইতেছে। তাই এখন তাহারা পরস্পরের মধ্যে অবাধ বেচাকেনা চালাইবার জন্য ইউরোপীয় সাধারণ বাজার (European Common Market) স্থাপন করিতে অগ্রসর হইতেছে। O. E. E. C. বা Organization for European Economic Co-operation আজ কয়েক বৎসর হইতে পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সংহতি স্থাপনের জন্য প্রাথমিক কার্য করিতেছে। আপাততঃ রাজনৈতিকক্ষেত্রে পশ্চিম ইউরোপস্থিত রাষ্ট্রগুলির বৈদেশিক মন্ত্রীরা এক স্থায়ী সম্মেলন স্থাপন করুক—ইহাই ইংলণ্ডের অভিপ্রায়।

আর্থিক প্রয়োজন

১৩। কমন্‌ওয়েলথের ঐক্য ও যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শঃ গ্রেট ব্রিটেনের যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, সিংহল, ঘানা, নাইজেরিয়া ও মালয় লইয়া কমন্‌ওয়েলথ সংগঠিত। দক্ষিণ আফ্রিকা সম্প্রতি ইহার সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছে বা করিতে বাধ্য হইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পূর্বে ইহাতে

যুক্তরাষ্ট্রের না হউক কতকটা রাষ্ট্র সমবায়ের লক্ষণ ছিল। প্রত্যেক সদস্য তখন রাজশক্তিকে (Crown) মানিত। সকলেই বিপদে আপদে ইংলণ্ডকে সাহায্য করিত। সকলের বৈদেশিক নীতি অনেকটা এক ছিল। ইংলণ্ডের বিপুল নৌবল সকলেরই প্রতিরক্ষা-কার্যে সহায়তা করিত। মাঝে মাঝে প্রধান মন্ত্রীরা একত্র হইয়া আলাপ-আলোচনা করিতেন এবং সাধারণ নীতি নির্ধারণ করিতেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যীয় সমর পরিষদে (Imperial War Conference) বিভিন্ন ডোমিনিয়নের প্রধানমন্ত্রীরা মিলিত হইতেন।

পূর্বে রাষ্ট্রসমবায়ের চিহ্ন ছিল

আজ কমনওয়েলথের ঐ ঐক্য বজায় নাই। ভারতবর্ষ, সিংহল, পাকিস্তান, ঘানা (Ghana) প্রভৃতি সদস্য রানীর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে না। কমনওয়েলথের কোন সংসদ নাই, শাসন পরিষদ্ নাই, এমন কি বিচারালয়ও নাই। সুতরাং সংগঠনের দিক দিয়া ইহা নিতান্ত শিথিল। বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে মোটামুটি সকলে প্রধানমন্ত্রীদিগের সাময়িক সম্মেলনে একমত হইলেও উঁহাদের মধ্যে পূর্ণ একতা নাই। ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, লাক্সেমবার্গ, নরওয়ে, ডেনমার্ক, পর্তুগাল, আইসল্যাণ্ড, তুরস্ক, গ্রীস এবং জার্মানির যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্রের সহিত মিলিত হইয়া NATO বা North Atlantic Treaty সম্পাদন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কোন দেশ যদি আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ড কমনওয়েলথের অন্যান্য সদস্যদের বিনা পরামর্শে বা বিনা সম্মতিতে সেই দেশকে রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ আরম্ভ করিতে বাধ্য। পূর্বাহ্নে যাহাদের সম্মতি লওয়া হইবে না, তাঁহারা ইংলণ্ডকে যুদ্ধে সাহায্য করিতে রাজী হইবেন কিনা সন্দেহ। আবার কমনওয়েলথের চারজন সদস্য ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও পাকিস্তান অন্যান্য সদস্যদের সম্মতির অপেক্ষা না রাখিয়া ফ্রান্স, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, থাইল্যাণ্ড ও ফিলিপাইনের সঙ্গে South-East Asia Collective Defence Treaty স্থাপন করিয়াছে।

বৈদেশিক নীতি এখন বিভিন্ন

NATO ও SATOর আঞ্চলিক চুক্তি

কমনওয়েলথের সদস্য রাষ্ট্রগুলির প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাগরিকতার

নিয়ম আছে। একের নাগরিক অন্যের নাগরিক তো নহেই, বরং সম্প্রতি ইংলণ্ডে এক আইন করিয়া কৃষ্ণবর্ণের লোকের পক্ষে ইংলণ্ডে প্রবেশ করিবার অবাধ সুবিধার সংকোচন করিয়াছে। যদি কেহ চাকুরি খুঁজিতে বা স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার জন্য ইংলণ্ডে যাইতে চান তবে ১৯৬২ সালের জুলাই মাস হইতে তাঁহাকে অনেক বাধা-নিষেধের সম্মুখীন হইতে হইবে।

নাগরিকতার নিয়ম বিভিন্ন

দুই চার বছর পূর্বেও বলা হইত যে, কমন্‌ওয়েলথের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে ইহার ভিতর সকলেই গণতন্ত্রকে শ্রেষ্ঠ শাসন প্রণালী বলিয়া মানিয়া লয়। আজ Basic Democracy-র নামে মুষ্টিমেয় ব্যক্তিকে ভোটের অধিকার কোন কোন দেশে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া এ দাবি আর টিঁকে না। আইনের শাসন (Rule of Law) এবং বিচারকমণ্ডলীর পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যও সকল কমন্‌ওয়েলথ সদস্য রাষ্ট্রে আছে তাহাও বলা চলে না।

সকলে গণতন্ত্রের উপাসক নহে

কমন্‌ওয়েলথে যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শ বিশেষ কিছুই নাই। তথাপি বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন ভাষাভাষী রাষ্ট্রসমূহ পরস্পরের সহিত যুক্তি পরামর্শ করিয়া আর্থিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে সহযোগিতা করিতে আবদ্ধ বলিয়া এই প্রতিষ্ঠান দ্বন্দ্বসংকুল বর্তমান যুগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী মনে হয়।

উপযোগিতা

অনুশীলন

১। Explain the nature of a Federal Union and distinguish a Federal Union (a) from a Confederation and (b) from a Unitary State (1964).

যুক্তরাষ্ট্রীয় একতা তাহাকেই বলে যাহাতে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার কিছু অংশ আঞ্চলিক ক্ষেত্রে ন্যস্ত হয় এবং অন্যান্য অংশ ঐ সব আঞ্চলিক ক্ষেত্রের সংঘের মধ্যেকার কেন্দ্রীয় সংস্থায় ন্যস্ত থাকে। আঞ্চলিক সরকারসমূহ ও কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ কোন ব্যাপারে পরস্পরের পরিপূরক অথচ স্বতন্ত্র। [সপ্তম প্রকরণ দেখ।]

যুক্তরাষ্ট্রের সহিত Confederation বা রাষ্ট্রসমবায়ের পার্থক্য এই যে

রাষ্ট্রসমবায়ের সদস্যরা উহা ত্যাগ করিতে পারে। রাষ্ট্রসমবায়ে প্রত্যেক রাষ্ট্র তাহার সার্বভৌম ক্ষমতা অন্ততঃ নামে বজায় রাখে; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সদস্যেরা সাধারণতঃ রাশিয়ার ইউনিয়ন ছাড়া অন্য কোথাও সদস্যতা ত্যাগ করিতে পারে না অথবা সার্বভৌম ক্ষমতা দাবি করে না।

[অন্যান্য পার্থক্য পঞ্চম প্রকরণের শেষ চার অনুচ্ছেদে দেখ।

এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের পার্থক্য প্রথম প্রকরণের প্রথমে দেখ।]

২। What are the essential characteristics of a federal government ?

Compare unitary and Federal Government giving examples.

[সপ্তম প্রকরণ ও নবম প্রকরণ দেখ।]

৩। 'A federal State is a Political Contrivance intended to reconcile national unity and power with the maintenance of State rights'. Elucidate.

[প্রথম, ষষ্ঠ ও অষ্টম প্রকরণ দ্রষ্টব্য।]

৪। What are the conditions for the success of a federal state ? How far do they itest in India ?

[অষ্টম প্রকরণ দেখ।]

ভারতবর্ষে ভাষা ও ধর্মের ঐক্য নাই, প্রাদেশিকতার ভাব ও কখনো কখনো সংহতিকে ক্ষুণ্ণ করিতে অগ্রসর হয়। বিভিন্ন প্রদেশের অর্থবল ও জনবলের সাম্য নাই। তাহাতে প্রাদেশিক হিংসাদ্বেষ বাড়িতে পারে। কংগ্রেস দলের প্রভাবে জাতীয় ঐক্য বজায় রহিয়াছে।

৫। What trends do you notice in Federations towards unitarianism ?

[একাদশ প্রকরণে যুক্তরাষ্ট্রে এককেন্দ্রিকতার প্রবৃত্তি দেখ।]

৬। Compare the relations between the States and the Federal Government in (a) the U.S.A., (b) Australia, (c) Canada and (d) India.

[একাদশ প্রকরণের শেষ পাঁচ অনুচ্ছেদ দেখ।]

ষোড়শ অধ্যায়

ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি

পৃথকীকরণ ক্ষমতার নীতি (Seperation of powers) কাহাকে বলে? প্রত্যেক শাসনব্যবস্থায় তিনটি অপরিহার্য অঙ্গ থাকে। প্রথম হইতেছে আইন কি তাহা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিবার ক্ষমতা যাঁহার বা যাঁহাদের আছে। সেই আইন যথাযথভাবে পালন করা হইতেছে কিনা তাহা দেখিবার ভার থাকে শাসনবিভাগের উপর। শাসনবিভাগ রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে ও জনগণের কল্যাণ সাধনের জন্য বিবিধ কর্ম করে। রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার দায়িত্বভার ইহার উপর ন্যস্ত থাকে। তৃতীয় বিভাগটির নাম বিচারবিভাগ। আইনবিভাগের দ্বারা ঘোষিত আইন অনুসারে ব্যক্তিদের মধ্যে এবং ব্যক্তি ও শাসকবর্গের মধ্যে বিবাদবিসম্বাদের বিচার করা ও অপরাধীকে দণ্ড দেওয়া ইহার প্রধান কার্য।

এই তিনটি বিভাগ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া কার্য করিবে। এই নীতি সপ্তদশ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অনেক পণ্ডিতের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। ইহার মূল্য বক্তব্য ছিল যে, আইন তৈয়ারি, শাসন করা ও বিচার—এই তিন ধরনের কাজ তিনটি বিভাগের লোকের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া উচিত; প্রত্যেক বিভাগ নিজের এলাকাভুক্ত কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে, একে অপরের কাজে হস্তক্ষেপ করিবে না এবং প্রত্যেকেই নিজের নিজের কর্মক্ষেত্রে স্বতন্ত্র থাকিবে। এই মতবাদকে এখন অধ্যাপক রবসন বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই নীতির ভাঙ্গা রথে চড়াইয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সাংবিধানিক আইনের লেখকগণ কতকগুলি ভ্রান্ত মত প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু ইংরাজ পণ্ডিতেরা ইহার যতটা দোষ দেখাইয়া থাকেন, আমেরিকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা ততটা দোষ স্বীকার করেন না। যাহা হউক, এই নীতি এককালে ফ্রান্স ও আমেরিকার সংবিধান রচনার উপর প্রভূত পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং আজও রাজনৈতিক তর্কবিতর্কের সময় ইহার দোহাই দেওয়া হইয়া থাকে। শাসনবিভাগ হইতে বিচারবিভাগ পৃথক করিবার

জন্য ভারতবর্ষে আজও যে আন্দোলন চলিতেছে, তাহা ইহারই প্রভাবে। সেইজন্য এই নীতির বিশদ আলোচনা প্রয়োজন।

২। **ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির উৎপত্তি ও ব্যাখ্যা ঃ** রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পৃথক করিবার কথা আরিস্টটলের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। আরিস্টটল বলেন যে, সরকারের কার্য প্রথমতঃ আলোচনাত্মক (Deliberative), দ্বিতীয়তঃ শাসন সম্পর্কীয় (Magisterial) এবং তৃতীয়তঃ বিচারবিষয়ক। আলোচনাত্মক কার্যের মধ্যে আইন প্রণয়ন, রাজস্ব ব্যবস্থা, যুদ্ধ, সন্ধি এবং সাধারণ রাজনৈতিক প্রশ্নের সমাধান অন্তর্নিহিত। শাসন সম্পর্কীয় কার্য বর্তমান শাসন বিভাগ এবং বিচারবিষয়ক কার্য বিচারবিভাগ করিয়া থাকে। আরিস্টটলের মতে একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যদি একাধিক বিভাগের কাজ করিতে যান, তাহা হইলে কোন কাজই ভালভাবে সম্পন্ন হয় না। তিনি ক্ষমতাবিভাগ অপেক্ষা ক্ষমতাবণ্টনের উপর বেশি জোর দিয়াছেন। কিন্তু এথেন্সের Ecclesia নামক জনসভা আইন তৈয়ারি করিত এবং শাসনকার্য ও বিচারকার্য উভয়ই সম্পাদন করিত। রোমের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী পলিবিয়াস্ ও সিসিরো রোমের সংবিধান বর্ণনা করিতে যাইয়া তিনটি বিভাগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু রোমান্ কমিসিয়া (Comitia) ও সেনেটে তিন বিভাগের কাজই অল্পবিস্তর করা হইত।

মধ্যযুগের শেষে (১৩৭৭ খৃষ্টাব্দে) ইতালিস্থ পাদুয়ার মারসিগলিয়ো শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগের পার্থক্য প্রদর্শন করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ফ্রান্সে বোদাঁ ক্ষমতা পৃথক করিবার নীতি সর্বপ্রথমে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে একই ব্যক্তি যদি আইন তৈয়ারি করিবার ও বিচার করিবার ক্ষমতা ব্যবহার করেন তাহা হইলে নিষ্ঠুর আইন তৈয়ারি করিয়া তিনি নির্দয়ভাবে উহা প্রয়োগ করিতে পারেন। সেইজন্য স্বয়ং বিচার না করিয়া অন্যের উপর বিচার করিবার ক্ষমতা ন্যস্ত করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংলণ্ডের প্রথম জেমস্ ও প্রথম চার্লস আইন করিবার, শাসন করিবার ও বিচারকদিগকে ইচ্ছামত বরখাস্ত করিবার ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া প্রজাদের ধনপ্রাণ বিপন্ন করিয়াছিলেন। তাহারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে ক্রমওয়েল শাসনবিভাগকে আইনবিভাগ হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সে সময়ে পার্লামেণ্ট শাসন কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিল এবং

ক্রমওয়েল স্বয়ং বিচারকদিগকে বরখাস্ত করিলেন। তাই পৃথকীকরণ সফল হইল না।

১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের রক্তহীন বিপ্লবের পর জন লক্ ক্ষমতাকে আইন, শাসন এবং কূটনীতি সম্বন্ধীয় এই তিন ভাগে বিভক্ত করেন। তিনি আইন সম্বন্ধীয় ক্ষমতা রাজা ও পার্লামেন্টের হাতে এবং অপর দুইটি ক্ষমতা রাজা ও তাঁহার শাসন পরিষদের হাতে ন্যস্ত করিবার কথা বলিয়াছেন। প্রজাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার জন্য যে আইন ও শাসনবিভাগকে পৃথক রাখা দরকার এ কথা লকই সর্বপ্রথম প্রচার করেন। একই ব্যক্তি যদি আইন করে ও তাহা প্রয়োগ করিয়া শাসন করে তাহা হইলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিপন্ন হয়।

১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে মঁতেস্ক্যু তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "আইনের মর্মার্থ" নামক গ্রন্থে (L' 'esprit des Lois) ইংলণ্ডের সংবিধান বিশ্লেষণ উপলক্ষে লেখেন—নিরাপত্তা সম্বন্ধে প্রত্যেক ব্যক্তির মনে যে প্রশান্তি জাগে তাহাকেই রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য বলা যায়। ঐ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে হইলে সরকারকে এমনভাবে সংগঠন করা দরকার যাহাতে একে অন্যের সম্বন্ধে ভয়ে ভয়ে না থাকে। যখন একই ব্যক্তির বা একই শাসকবর্গের হাতে আইন করিবার ও শাসন করিবার ক্ষমতা যুক্ত করা হয় তখন স্বাতন্ত্র্য থাকিতে পারে না, কেন না একই রাজা বা সেনেট অত্যাচারমূলক আইন প্রণয়ন করিয়া উহা যদৃচ্ছ প্রয়োগ করিতে পারে। আবার আইন ও শাসনবিভাগ হইতে বিচার করিবার ক্ষমতা স্বতন্ত্র না করিলেও স্বাধীনতা রক্ষা পায় না। বিচার ও আইন করিবার ক্ষমতা একই হাতে থাকিলে লোকের জীবন ও স্বাতন্ত্র্য স্বেচ্ছাচারমূলক নিয়ন্ত্রণের কবলে পড়িবার আশংকা আছে, কেন না বিচারক স্বয়ং আইন করিবেন। যদি শাসনক্ষমতার সহিত বিচারক্ষমতা যুক্ত হয় তাহা হইলে বিচারক জোর করিতে ও অত্যাচার করিতে পারেন। আইন করিবার, সিদ্ধান্তকে কার্যে পরিণত করিবার ও ব্যক্তিবর্গের মামলা বিচার করিবার ক্ষমতা যদি একই ব্যক্তি বা সংসদের হাতে থাকে, তাঁহারা সাধারণ মানুষই হউন বা অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্তই হউন, তাহা হইলে সর্বনাশ ঘটিবে।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সংবিধানজ্ঞ ব্ল্যাকস্টোন এই মত সমর্থন করেন। মঁতেস্ক্যু ইংলণ্ডের সংবিধান দুই বৎসর ধরিয়া অধ্যয়ন করিয়া বুঝিয়াছিলেন

যে, ইংলণ্ডে রাজা শাসন করেন, পার্লামেণ্ট আইন করে এবং বিচারকগণ রাজা ও পার্লামেণ্ট উভয়েরই অধীনতা হইতে মুক্ত। যে সময়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেন তখন কিন্তু প্রকৃত পক্ষে রাজা পার্লামেণ্টের অধীন হইয়াছিলেন এবং রাজার মন্ত্রিমণ্ডলী পার্লামেণ্টের নিকট দায়িত্বসম্পন্ন হইয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও ব্ল্যাকস্টোনের মতন পাকা আইনজ্ঞ তাঁহার "Commentaries on the Laws of England" নামক গ্রন্থে লিখিলেন যে, যেখানেই আইন তৈয়ারি করিবার এবং উহা কার্যকরী করিবার ক্ষমতা একই ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমূহের হাতে ন্যস্ত থাকে, সেখানে সাধারণের স্বাতন্ত্র্য থাকিতে পারে না। তিনি বলিলেন যে, বিচার করিবার ক্ষমতার সহিত আইন করিবার ক্ষমতা যুক্ত হইলে স্বেচ্ছাচারী বিচারকদের হাতে প্রজাদের জীবন, স্বাতন্ত্র্য ও সম্পত্তি বিপন্ন হইতে পারে।

ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের এই দুই মনীষীর মতবাদ আমেরিকায় স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ও ফরাসী বিপ্লবের সময়ে অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। ভার্জিনিয়া ও উত্তর করোলিনার সংবিধানে বলা হইল যে আইন, শাসন ও চরম বিচার করিবার ক্ষমতা সব সময়েই পৃথক ও বিভিন্ন থাকা দরকার। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানেও এই নীতি অনেকাংশে মানিয়া লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পূর্ণতম প্রয়োগ দেখা গেল ফ্রান্সের প্রথম বিপ্লবের প্রথম সংবিধানে। সেখানে প্রথমে মানবীয় অধিকার ঘোষণা করিতে যাইয়া বলা হইল যে, যেখানে ক্ষমতার পৃথকীকরণ স্বীকৃত হয় না, সেখানে কোন সংবিধানই নাই। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের ফরাসী সংবিধানে মন্ত্রীদিগকে আইন-সভায় বসিতে দেওয়া হইল না এবং আইনসভাকে ভাঙ্গিয়া দিবার কোন অধিকার শাসনবিভাগের রহিল না। রাজার হাতে আইনের কোন খসড়া তৈয়ারি করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইল না, তিনি কেবল মাত্র কিছুদিনের জন্য কোন আইনকে আটকাইয়া রাখিতে পারিবেন। আমেরিকার সংবিধানেও প্রেসিডেণ্ট বা তাঁহার অমাত্যদিগকে আইনসভার সদস্য করা হইল না এবং তাঁহার হাতে কেবলমাত্র আইনকে সাময়িকভাবে নাকচ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল। ফরাসী সংবিধানে নির্বাচনের দ্বারা বিচারকদের নিযুক্ত করিবার নীতি স্বীকৃত হইয়াছিল; আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই। মোটের উপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে ক্ষমতার

পৃথকীকরণ নীতি ইউরোপে ও আমেরিকায় অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

৩। ক্ষমতার পৃথকীকরণ কি কাম্য ও যুক্তিযুক্ত? আইন করিবার, শাসন করিবার ও বিচার করিবার ক্ষমতা কিছুটা পৃথক্ করিয়া রাখা দরকার বটে, কিন্তু উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র করিয়া রাখা কার্যক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে নিউ হেমস্ফায়ার (New Hemsphere) এর সংবিধান প্রণয়ন করিবার সময় বলা হইয়াছিল যে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগ অচ্ছেদ্য বন্ধন ও মৈত্রীতে আবদ্ধ; সুতরাং ইহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া উহাদিগকে যতটা স্বতন্ত্র রাখা সম্ভব ততটাই পৃথক্ রাখা কর্তব্য। ("The legislative, executive and judiciary powers ought to be kept as separate from and independent of each other as the nature of a free Government will admit; or as is consistent with the chain of connection that binds the whole fabric of the constitution in one indissoluble bond of unity and amity".)

সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ কাম্য নহে

সত্যই সরকার এক অখণ্ড এবং অবিচ্ছেদ্য সত্তা, ইহাকে টুক্রা টুক্রা করিয়া পৃথক্ করিয়া রাখা যায় না। সরকারের প্রত্যেক কার্য অল্প বা অধিক পরিমাণে সকল বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট। যাঁহাদের হাতে কার্য পরিচালনার ভার ন্যস্ত আছে তাঁহাদিগকে জরুরী অবস্থায় সাময়িক আইন ঘোষণা করিতে হয়। প্রায়ই ছোট খাটো বিষয়ে নিয়ম তৈয়ারি করিতে হয় এবং সেই নিয়ম মানিতে সকলকে বাধ্য করা হয়। ঐ সব নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাঁহাদিগকে বিচারবিভাগের কাছে না পাঠাইয়া শাসনবিভাগই সামান্য কিছু দণ্ড দিয়া থাকেন। আবার উচ্চতম বিচারালয় কোন কোন জটিল মামলায় রায় দিতে যাইয়া যখন দেখেন যে, ঐ সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট আইন নাই এবং পূর্বে কোন রায়েতেও কিছু বলা হয় নাই তখন তাঁহারা ন্যায়বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া উহার মীমাংসা করেন। তাঁহাদের ঐ সিদ্ধান্ত অনুরূপ সকল ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে প্রযুক্ত হইবে। ইহাও একরকম আইন। সেইজন্য আইন তৈয়ারির কাজে তিন বিভাগই অংশ গ্রহণ করে। ইংলণ্ডের হাউস অব লর্ডস আইনবিভাগের

সরকার অখণ্ড ও অবিচ্ছেদ্য

তিন বিভাগই আইন তৈয়ারি করে

একটি শাখা হইলেও ঐ দেশের উচ্চতম বিচারালয়রূপে গণ্য হয়। আমেরিকার সংবিধানে তিনটি বিভাগকে যেমন পৃথক্ রাখা হইয়াছে, তেমনি আবার পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট করা হইয়াছে। সংবিধানের প্রয়োগক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের যোগসূত্রে বিভাগত্রয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছে। এই সূত্রটি পরবর্তী নিবন্ধে ব্যাখ্যা করিব।

পৃথকীকরণে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়

জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁহার Representative Government নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, সরকারের প্রত্যেক বিভাগ যদি নিজ নিজ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র হয় তাহা হইলে একে অপরের কার্যে হস্তাধক হইবে এবং ফলে অচল অবস্থার সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী হইবে। কারণ প্রত্যেক বিভাগ নিজের নিজের ক্ষমতা সংরক্ষণ করিতে যাইয়া অপর বিভাগদ্বয়কে কোনরূপ সাহায্য করিবে না। ইহার ফলে সরকারের কর্মদক্ষতা এত হ্রাস পাইবে যে ক্ষমতার পৃথকীকরণে লাভ অপেক্ষা ক্ষতিই বেশি হইবে। ব্লুণ্টস্‌লি চমৎকার একটি উপমা প্রয়োগ

জৈব দেহের ন্যায় সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট

করিয়া বলিয়াছেন যে, দেহ হইতে মস্তককে পৃথক করিয়া তাহাকে দেহের সহিত সমান করিতে গেলে মানুষের যেমন প্রাণহানি না ঘটিয়া পারে না, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা-ত্রয়কে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করিতে গেলে তেমনি রাষ্ট্র ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। ক্ষমতাত্রয় কোন কোন ব্যাপারে পরস্পরের অধীন না হইয়া পারে না।

আইনবিভাগ সকলের উপরে

ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতিকে মানিতে হইলে প্রত্যেক বিভাগকে সমান ক্ষমতাপন্ন করা দরকার। কিন্তু আধুনিক গণতন্ত্রে আইনবিভাগের স্থানই সকলের উপরে। শাসনবিভাগের উপর আইনবিভাগের অল্প বা অধিক পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। ইংলণ্ডে উহা অধিক, আমেরিকায় অল্প। আমেরিকার সেনেটের অনুমোদন ভিন্ন প্রেসিডেণ্ট কোন সন্ধি করিতে বা উচ্চপদে নিয়োগ করিতে পারেন না। আইনবিভাগ যে আইন প্রণয়ন করে বিচারবিভাগ সাধারণতঃ তাহাই প্রয়োগ করে। তবে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের অভিভাবক হিসাবে বলিতে পারে যে, অমুক আইন করিবার এক্তিয়ার আইনসভার নাই, সুতরাং সে আইন গ্রাহ্য নহে।

এইরূপে দেখা যায় যে, এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজের উপর খানিকটা হস্তক্ষেপ করে।

ফাইনার বলেন যে, ক্ষমতাত্রয়কে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করিলে সরকার কখনও মূর্ছিত হইবে কখনও বা ধনুষ্টংকারের রোগীর মত হাত পা ছুঁড়িতে থাকিবে। যাঁহারা শাসনকার্য পরিচালনা করেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে কি রকম আইন হইলে তাঁহাদের পক্ষে দায়িত্ব পালনের সুবিধা হয়। কিন্তু তাঁহাদের যদি আইন তৈয়ারির সময় কোন ইঙ্গিত করিবারও ক্ষমতা না থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে শাসনকার্য চালানো অসম্ভব হইয়া পড়ে।

ফাইনারের মত

মঁতেস্ক্যু বলিয়াছেন যে, ক্ষমতা পৃথক না করিলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষা পাইতে পারে না। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে দুইটি যুক্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ ক্ষমতা পৃথক করিলেই যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষা পাইবে এমন কোন কথা নাই। আইনবিভাগ হয়তো অত্যন্ত অন্যায় ও পীড়নমূলক আইন করিল; শাসনবিভাগ সেই আইন অনুসারে কাজ করিতে ও বিচারবিভাগ বিচার করিতে বাধ্য। এরূপ অবস্থায় তাহাদের ক্ষমতা পৃথক পৃথক হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তি-পুরুষের উপর অত্যাচার চলিতে পারে। আবার পক্ষান্তরে আইনবিভাগ যদি জনসাধারণের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হয়, তাহা হইলে উহার উপর শাসন ও বিচারবিভাগের কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকিলেও নাগরিকদের স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষিত হইতে পারে। বস্তুতঃ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সমাজব্যবস্থার উপর নির্ভর করে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য

লাস্কী বলেন যে শাসন, বিচার ও আইনবিভাগ যদি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে কাজ করে তাহা হইলে প্রত্যেক বিভাগেরই দায়িত্বশীলতা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইবে। স্বাতন্ত্র্য পরস্পরের মধ্যে সংঘাত আনিবে এবং সংঘাত হইতে বিভ্রমের (confusion) সৃষ্টি হইবে।

পৃথকীকরণে দায়িত্ব জ্ঞানহীনতা জন্মে

ক্ষমতার সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ যে সম্ভবপর নহে তাহা ইংলণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ভারতবর্ষের শাসন-পদ্ধতির বিচার করিলে প্রমাণিত হইবে। উহা যদি সম্ভব হইত তাহা হইলে কোন না কোন রাষ্ট্রে বিভাগত্রয়ের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দেখা যাইত।

ইহা বাস্তব জীবনে সম্ভব নহে

৪। **বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসনপদ্ধতিতে পৃথকীকরণ নীতিঃ** আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে পৃথকীকরণ নীতির স্পষ্ট উল্লেখ নাই বটে কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট বহুক্ষেত্রে বলিয়াছেন যে ঐ নীতি শাসনপদ্ধতির এক মৌলিক তত্ত্ব (a fundamental tenet)। মোটামুটি দেখিতে গেলে লক্ষ্য করা যায় যে, সেখানে কার্যকরী ক্ষমতা প্রেসিডেণ্টকে দেওয়া হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট কিংবা তাঁহার কোন অমাত্য আইনসভার সদস্য হইতে পারেন না। আবার আইনসভাও প্রেসিডেণ্ট বা তাঁহার কোন অমাত্যক পদচ্যুত করিতে পারে না। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক প্রেসিডেণ্ট ও কংগ্রেসের অধীন নহেন। কিন্তু বিভাগ তিনটিকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখিতে গেলে কোন কাজই যে চলিবে না তাহা সংবিধানের রচয়িতারা জানিতেন। তাই তাঁহারা প্রেসিডেণ্টকে সাময়িক-ভাবে আইন নাকচ করিবার ও কংগ্রেসে বাণী প্রেরণ করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। আবার সেনেটের হাতে সন্ধি করিবার ও উচ্চকর্মচারীদিগের নিয়োগ সমর্থন করিবার ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে। কংগ্রেস টাকা-পয়সা মঞ্জুর না করিলে প্রেসিডেণ্টের পক্ষে সরকারী কাজ চালানো অসম্ভব হয়। বিচারবিভাগ স্বতন্ত্র বটে, কিন্তু প্রেসিডেণ্ট বিচারকদিগকে নিযুক্ত করেন এবং তাঁহাদের প্রদত্ত দণ্ড হ্রাস করিতে পারেন। সুপ্রিম কোর্ট যে কংগ্রেসের পাশ করানো আইনকে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে ইহা পৃথকীকরণ নীতির একটি প্রচণ্ড ব্যতিক্রম—কেন না এখানে বিচারবিভাগ আইনবিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ করে। আমেরিকার সংবিধানের পিতৃবর্গ আইন ও শাসনবিভাগকে বহুল পরিমাণে পৃথক্ রাখিতে চাহিলেও আজকাল রাজনৈতিক দলের প্রভাবের ফলে উভয় বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট যে দলভুক্ত সেই দল যদি কংগ্রেসের উভয় কক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় তাহা হইলে শাসনবিভাগ আইন তৈয়ারির কাজে নেতৃত্ব করিতে পারে, কেন না প্রেসিডেণ্ট ঐ দলের নেতাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। কিন্তু যখন কংগ্রেসের বিভিন্ন সদনে, বিভিন্ন দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে, কিংবা এক দলের প্রাধান্য কংগ্রেসের উপর থাকে অন্য দলের এবং লোক প্রেসিডেণ্ট হন সেখানে দুই বিভাগের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লাগিয়াই থাকে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র

ইংলণ্ডের শাসন প্রণালীতেও উপর উপর দেখিলে মনে হয় সেখানে পৃথকীকরণ নীতি আছে। রানী ক্যাবিনেটের সদস্যদের সাহায্যে শাসনকার্য চালাইয়া থাকেন, পার্লামেণ্ট আইন তৈয়ারি করে এবং বিচারকগণ শাসকদের দ্বারা বরখাস্ত হইতে পারেন না। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, বিভাগগুলি পরস্পরের প্রতি দায়িত্বশীল। ক্যাবিনেট সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাদের লইয়া গঠিত হয়। তাঁহারা যে সব আইন তৈয়ারি করার দরকার বুঝেন সেই সব আইন পার্লামেণ্টের দ্বারা পাশ করাইয়া লন। তাঁহাদের দলের সদস্যের সংখ্যা হাউস অব কমন্সে বেশি বলিয়া প্রস্তাবিত আইন পাশ করানো কঠিন হয় না। প্রধানমন্ত্রী যদি দেখেন যে তাঁহার প্রস্তাবিত কোন আইনের বিরুদ্ধে বিরোধিতা দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে তাহা হইলে তিনি রানীকে অনুরোধ করিয়া হাউস অব কমন্স ভঙ্গ করিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে পারেন। এই ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে থাকায় হাউস অব কমন্সের সদস্যেরা সদস্যগিরি হইতে বঞ্চিত হইবার ভয়ে তাঁহার কথামত চলেন। সংবিধানের পুঁথিতে লেখা আছে, যে পার্লামেণ্ট অথবা হাউস অব কমন্স ক্যাবিনেটের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করিতে পারে কিংবা নিন্দাসূচক মন্তব্য পাশ করিতে পারে। এবং উহা পাশ হইলে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে কোন প্রধানমন্ত্রী ঐভাবে পদত্যাগ করেন নাই। তিনি সাধারণতঃ জনসাধারণের মত তাঁহার দিকে,—না তাঁহার বিরুদ্ধে জানিবার জন্য নবনির্বাচনের ব্যবস্থা করাইয়া থাকেন। হাউস্ অব লর্ডস আইনসভার অংশ হইলেও কয়েকজন বিচারক ইহার যাবজ্জীবন সদস্য। ইংলণ্ডের লর্ড চ্যান্সেলার ক্যাবিনেটরূপ শাসনবিভাগের সদস্য হইয়াও হাউস অব লর্ডসের সভাপতিত্ব করেন ও বিচারবিভাগের প্রধান বলিয়া পরিগণিত হন। অধুনা শাসনবিভাগের হাতে পার্লামেণ্ট ছোটখাটো অনেক বিষয়ের নিয়মকানুন তৈয়ারি করিবার ভার দিয়াছে। আবার পক্ষান্তরে হাউস অব কমন্সের কমিটির হাতে কিছু কিছু শাসন-সম্পর্কীয় ক্ষমতাও ন্যস্ত আছে।

গ্রেট ব্রিটেনে

ভারতীয় শাসনতন্ত্রেও সাধারণ আকারে শাসনবিভাগ, আইনবিভাগ ও বিচারবিভাগকে পৃথক্ পৃথক্ রাখা হইয়াছে। কিন্তু এখানেও শাসনবিভাগের

নামে মাত্র প্রধান প্রেসিডেন্টের হাতে আইন নাকচ করিবার ক্ষমতা আছে, আবার বিচারবিভাগের বিচারপতিদিগকে নিযুক্ত করিবার ও প্রাণদণ্ড মকুব করিবার শক্তিও আছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে কেবল মাত্র শাসনবিভাগ নহে, আইনবিভাগও পরিচালিত হয়। প্রধানমন্ত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা, সেইজন্য লোকসভার নেতৃত্বও তিনিই করেন। যে কোন জটিল আইনও অল্পকালের মধ্যে পাশ করাইয়া লওয়া তাঁহার পক্ষে কঠিন নহে। ইংলণ্ডের সংবিধান অলিখিত, কিন্তু সেখানে বাস্তবক্ষেত্রে উহার সংশোধন করা বহু সময় সাপেক্ষ। কিন্তু ভারতবর্ষের সংবিধান গত বার বৎসরের মধ্যে সংশোধিত হইয়াছে। কংগ্রেস দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কেন্দ্রীয় ও আঙ্গিক-রাজ্যগুলির আইনসভায় অক্ষুণ্ণ আছে বলিয়াই এত সহজে সংবিধানের পরিবর্তন সম্ভব হইয়াছে। ইংলণ্ডের বিচারপতিরা কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর আর রাজদূত, গভর্ণর কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যপদে নিযুক্ত হন না। কিন্তু ভারতবর্ষে এরূপ ঘটিতেছে। সমালোচকেরা বলেন যে, কোন কোন বিচারক ভবিষ্যতে ঐ সব পদ পাইবার আশায় শাসনবিভাগের অনুগত হইয়া চলিতে পারেন, এবং তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্যের হানি হইতে পারে। পৃথকীকরণ নীতি ভারতবর্ষে স্বীকৃতি লাভ করে নাই। কিন্তু সরকারের নিম্নস্তরে ম্যাজিস্ট্রেটের হাত হইতে বিচার করিবার ক্ষমতা ছিনাইয়া লইবার দাবি উপস্থিত করিবার সময় আমরা ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতির দোহাই দিয়া থাকি।

ভারতবর্ষে

সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রিসিডিয়াম্ আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকে। সেখানে কম্যুনিস্ট দলের হাতে অপ্রতিহত ক্ষমতা আছে। অন্য কোন দলের অস্তিত্বও নাই। সুতরাং তথায় ক্ষমতার পৃথকীকরণ হইতেই পারে না।

রাশিয়া

সুইট্জারল্যাণ্ডে আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সেখানে সকল প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসার ভার রহিয়াছে জনসাধারণের হাতে। বিভাগীয় ক্ষমতার পৃথকীকরণের নীতি সেখানে কোন মতেই মাথা তুলিতে পারে না।

সুইট্জারল্যাণ্ড

বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গেল যে, কার্যক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্রেই সম্পূর্ণভাবে পৃথকীকরণ নীতি অনুসরণ করা হয় না।

৫। পৃথকীকরণ নীতির দোষ-গুণ : ফরাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লিয়োঁ ডুগুই বলেন যে, মঁতেস্কু একবারও Separation of powers শব্দটি ব্যবহার করেন নাই; তিনি এমন কথাও বলেন নাই যে, সরকারের বিভিন্ন কার্য (functions) সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্রভাবে সম্পাদিত হইবে কিংবা একের কোন নিয়ন্ত্রণ অপরের উপর থাকিবে না। লজিকের সূত্র ধরিয়া সরকার চালানো যায় না। রফা—আপোষের ভাব মনে না রাখিলে রাজনৈতিক জগতে কোন কিছুই সফল হইতে পারে না। সেই হিসাবে পৃথকীকরণ নীতি অচল। কিন্তু উহার বিকল্প হিসাবে কেহ যদি বলেন যে, সরকারের যাবতীয় ক্ষমতা একটি মাত্র ব্যক্তি বা একটিমাত্র সংস্থার হাতে অর্পিত হউক, তাহা হইলে তিনি একনায়কত্বের অত্যাচারী শাসনের পক্ষে ওকালতী করিতেছেন বুঝিতে হইবে। শাসন ব্যাপারে মোটামুটিভাবে কিছু পরিমাণ স্বাতন্ত্র্য প্রত্যেক বিভাগেরই থাকা উচিত।

১। Discuss the value and limitations of the theory of separation of Powers (1964).

গুণ : (ক) ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য কিছুটা রক্ষা পায়। একই ব্যক্তি নিষ্ঠুর আইন তৈয়ারি করিয়া উহা নির্দয় ভাবে প্রয়োগ করিতে পারেন না। (খ) বিচারালয়ে স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের রক্ষা কবচ। (গ) প্রত্যেক বিভাগের কিছু স্বাতন্ত্র্য থাকা উচিত। কিন্তু জীবদেহের ন্যায় সরকারও অখণ্ড ও অবিচ্ছেদ্য। সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ অসম্ভব।

তৃতীয় প্রকরণ দেখ।

২। How far is it possible and desirable to carry out the principle of Separation of Powers in the governmental organization of a State.

তৃতীয় প্রকরণ দেখ।

৩। In what different ways is the principle of the Separation of Powers interpreted in the United States and in Switzerland ?

চতুর্থ প্রকরণ দেখ।

৪। Do you agree with the view that the only true guarantee to individual liberty lies in the theory of Separation of Powers.

তৃতীয় প্রকরণের শেষ তিনটি অনুচ্ছেদ দেখ।

সপ্তদশ অধ্যায়

কার্যাঙ্গ বা শাসনবিভাগ (Executive)

১। শাসনবিভাগের যোগ্যতা ও কার্যাবলী : শাসনবিভাগ (Executive) বলিতে শাসনযন্ত্রের সর্বপ্রধান পরিচালককে বা পরিচালকবৃন্দকে বুঝায়, আবার কখনও কখনও ছোট বড় এমন সকল কর্মচারীকেও বুঝায়, যাঁহাদের হাতে কিছু না কিছু ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে। শেষোক্ত অর্থে গ্রামের চৌকিদার পর্যন্ত শাসনবিভাগের অন্তর্গত। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কর্মচারিবৃন্দকে প্রশাসন (Administration) ও সর্বোচ্চ পরিচালককে শাসনবিভাগ বা কার্যাঙ্গ (Executive) বলা হয়।

সংজ্ঞা

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, নামে সর্বপ্রধান হইতেছেন এক ব্যক্তি, কিন্তু কাজে অন্য। যেমন ইংলণ্ডের রানী ও ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি নামে সর্বপ্রধান, কিন্তু উভয় রাষ্ট্রেই কার্যতঃ প্রধান হইতেছেন প্রধানমন্ত্রী। আমরা এখানে নামের চেয়ে কাজের উপর গুরুত্ব প্রদান করিব।

নামে প্রধান ও কাজে প্রধান

শাসনযন্ত্র পরিচালনার ব্যাপারে কয়েকটি প্রধান গুণ থাকা প্রয়োজন। প্রথমতঃ এমন ব্যবস্থা থাকা দরকার যে, অবিলম্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। অনেক সময়েই সরকারী ব্যাপারে অবিলম্বে কাজ করিতে হয়। তবে কয়েকজনের মতামত লইয়া যদি কোন কাজ করিবার নিয়ম থাকে তাহা হইলে জরুরি ব্যাপারে সিদ্ধান্ত করা যায় না এবং গোপনতা রক্ষা করাও কঠিন হয়। সেইজন্য একের উপর দায়িত্ব থাকা ভাল।

দ্রুত সিদ্ধান্ত

কিন্তু সেই এক ব্যক্তি যেন অতিরিক্ত দুর্বল বা অতিরিক্ত ক্ষমতাশালী না হন। যেখানে কর্মকর্তা দুর্বল, সেখানে আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষিত হয় না এবং পররাষ্ট্রের দ্বারা আক্রমণের আশংকা থাকে। যে রাষ্ট্রেই কর্মকর্তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে আইনাঙ্গের বা আইন বিভাগের বাধানিষেধের দ্বারা খণ্ডিত করা হইয়াছে সেই রাষ্ট্রেই বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। কিন্তু অন্যদিকে কর্মকর্তাকে

বেশি দুর্বল ও বেশি শক্তি ভাল নহে

নিরংকুশ ক্ষমতা দিলে নাগরিকের স্বাতন্ত্র্য বিপন্ন হয়। সেইজন্য কর্মকর্তা যেন বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার ক্ষমতার উৎস হইতেছে জনসাধারণ এবং তাঁহাদের অনভিপ্রেত কাজ করিলে তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত হইতে হইবে। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীকে এবং আমেরিকার রাষ্ট্রপতিকে যথাক্রমে পাঁচ ও চার বৎসর পর পর সাধারণের নিকট নির্বাচনপ্রার্থী হইতে হয়।

স্থায়িত্ব

ফ্রান্সে চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের অবসান কালে পাঁচ ছয় মাস পর পর মন্ত্রিসভার পরিবর্তন ঘটিত। ইহার ফলে সেখানকার শাসনবিভাগের শক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। দ্য গল প্রবর্তিত পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে সাড়ে তিন বৎসর ধরিয়া একই মন্ত্রিসভা শাসন করিয়াছিল। ইহা ঐ দেশের পক্ষে অভূতপূর্ব। হিটলারের অভ্যুদয়ের পূর্বে জার্মানিতে সাত বৎসরের জন্য রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করার ব্যবস্থা ছিল। ইহা একটু বেশি সময় বলিয়া মনে হয়। আমেরিকায় রীতি আছে যে, দুইবারের বেশি কেহ একাদিক্রমে রাষ্ট্রপতির পদ অধিকার করিতে পারিবেন না। তাহা যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। সুতরাং ভাল কার্যাঙ্গের বা শাসনবিভাগের গুণ হইল উদ্যমশীলতা, জনগণের সমর্থনের উপর নির্ভরতা, পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্ষমতার অর্পণ, এবং চার পাঁচ বৎসরের জন্য স্থায়িত্ব।

শাসনবিভাগের কার্যাবলীকে মোটামুটি ছয় বিভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা—(১) আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং আইন মানিতে বাধ্য করা, (২) পররাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ রক্ষা, (৩) সামরিক ব্যবস্থা, (৪) আর্থিক ব্যবস্থা, (৫) আইনবিষয়ক ক্ষমতা, (৬) এবং বিচারবিষয়ক ক্ষমতা পরিচালনা।

আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা

সেকালে আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল, কেন না সরকারী কাজের সংখ্যা ছিল কম। চোর ডাকাতের আক্রমণ হইতে জনসমূহকে রক্ষা করা এবং তাঁহাদের পরস্পরের অধিকার নির্ণয় ও উহার সুরক্ষার ব্যবস্থা করা ছিল শাসনবিভাগের মুখ্য কর্তব্য। কিন্তু এখন নানাবিধ জনকল্যাণকর্মে সরকার লিপ্ত হইয়াছেন। কাজের বিভিন্নতা ও গুরুত্ব যেমন বৃদ্ধি পাইতেছে তেমনি সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা বাড়িতেছে। এই বিপুল সংখ্যক কর্মচারী নিযুক্ত করিবার, গুণানুসারে তাঁহাদের উন্নয়ন ব্যবস্থা এবং দোষত্রুটি বিশেষ করিয়া দুর্নীতি আবিষ্কার করিয়া দণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত কঠিন ও

সমস্যা-সংকুল। উচ্চতম কর্তৃপক্ষ যদি শিথিল প্রযত্ন ও অতিরিক্ত দয়ালু হন তাহা হইলে কর্মচারীরা ভালভাবে কাজ করেন না, আবার তিনি যদি বেশি রকম কঠোর হন, তাহা হইলে অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। আজকাল সরকারের অধীনে অনেক শিল্প-প্রচেষ্টা উৎপাদনের কার্যে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। সেগুলি ঠিক মত কাজ করিতেছে, না সরকারী অর্থের অপব্যয় করিতেছে তাহা দেখা প্রয়োজন। বেসরকারী শিল্পবাণিজ্যের উপর নানাবিধ নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্ত হয়। অনিয়ন্ত্রিত উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থা জনসাধারণের কষ্টের কারণ হইতে পারে। আইন মানিতে বাধ্য করা বলিতে শুধু যে চোর-ডাকাতকে সায়েস্তা করা বুঝায় তাহা নহে। এখন জনহিতকর কত রকম আইন তৈয়ারি হইতেছে; তাহার ফলে যাহাতে সকলের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নীত হয়, তাহা দেখাই শাসনবিভাগের প্রধান কর্তব্য।

পররাষ্ট্র সম্পর্কীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা শাসনবিভাগের একটি প্রধান কর্তব্য। প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই প্রতিবেশী আছে। তাহাদের সহিত সদ্ভাব বজায় থাকে অথচ স্বার্থের কোন ক্ষতি না হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখাও প্রয়োজন। ঐ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রে দূত প্রেরণ করিতে হয় এবং ঐ সব রাষ্ট্রের দূত প্রভৃতির সহিত সদ্ব্যবহার করিতে হয়। দৈনন্দিন বৈদেশিক নীতি পরিচালনার কাজে কোন রাষ্ট্রের আইনসভাই হস্তক্ষেপ করে না। কিন্তু আমেরিকার রাষ্ট্রপতি কোন সন্ধি করিতে চাহিলে উহাতে সেনেটের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতি থাকা প্রয়োজন। ব্রিটেন ও ভারতবর্ষে আইনসভার অনুরূপ ক্ষমতা নাই। অনেক ক্ষেত্রে উচ্চতম কর্মকর্তা কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে গোপন চুক্তিও করিতে পারেন। কূটনীতির পরিচালনায় যদি গোপনতা পরিহার করা সম্ভব হইত তাহা হইলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা অনেক হ্রাস পাইত।

পররাষ্ট্র নীতি

শাসনবিভাগ রাষ্ট্রের সামরিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। স্থলসৈন্য, জলসৈন্য, বিমানবাহিনী প্রভৃতির চরম কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা প্রধান কর্মকর্তার হাতে থাকে। তিনি নিজে সমরাভিজ্ঞ নহেন, তাই উহাদের সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণকে তিনি সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করেন। আধুনিক

প্রত্যেক বড় বড় রাষ্ট্রেই খরচের একটা মোটা অংশ বিভিন্ন প্রকার সেনাবাহিনী ও সমরায়োজনে ব্যয়িত হয়। আমেরিকায় কংগ্রেসের মত লইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হয়। কিন্তু রাষ্ট্রপতি এমনভাবে বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করিতে পারেন যে, শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া পারে না। ব্রিটেন, ভারতবর্ষ, সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রভৃতি রাষ্ট্রে প্রধান কর্মকর্তা কাহারও বিনা অনুমতিতে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারেন।

সামরিক বিভাগ

সরকার চালাইতে হইলে টাকার দরকার। কর হিসাবে কত টাকা উঠাইতে হইবে, কত টাকা বা ধার করিতে হইবে তাহার প্রস্তাব সাধারণতঃ শাসনবিভাগ আইনসভার নিকট পেশ করে। আইনসভার নিকট খরচের জন্য মঞ্জুরি চাহিবার ভারও কর্মাঙ্গের উপর থাকে। আইনসভা কর স্থাপন ও খরচা কম করা হউক বলিতে পারে, কিন্তু বেশি করিবার প্রস্তাব করিতে পারে না।

আর্থিক কার্য

শাসনবিভাগ আইন সংক্রান্ত কার্যেও যথেষ্ট ক্ষমতা ভোগ করে। জরুরি আইন সাময়িকভাবে শাসনবিভাগ ঘোষণা করে। এরূপ আইনকে Ordinance বা অধ্যাদেশ বলে। আইনসভা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রত্যেক খুঁটিনাটির উল্লেখ না করিয়া যে আইন তৈয়ারি করে, সেই অনুসারে শাসনবিভাগ যে সব নিয়ম প্রবর্তন করে তাহাকেও অর্ডিনান্স বলা হয়। আইনের ব্যাখ্যা করা বিচারবিভাগের কাজ হইলেও নিয়ম প্রবর্তনের সময় শাসনবিভাগ উহার মর্ম উদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হয়। কোন্ আইন কিভাবে এবং কতটা প্রযুক্ত হইবে তাহাও অনেকখানি শাসনবিভাগের নির্দেশের উপর নির্ভর করে। সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় (Parliamentary Government) শাসনবিভাগ আইনের খসড়া তৈয়ারি করে ও আইনবিভাগ তাহার অল্প-বিস্তর পরিবর্তন করিয়া পাশ করে। যে প্রস্তাবে শাসনবিভাগের সম্মতি থাকে না, তাহা আইনসভায় পাশ হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। আমেরিকাতেও রাষ্ট্রপতি বাণী প্রেরণ করিয়া ও রাজনৈতিক দলের প্রভাব খাটাইয়া আইন প্রণয়নে যথেষ্ট নেতৃত্ব করিয়া থাকেন।

আইন সম্বন্ধায় ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতির আইন নাকচ করিয়া দিবার ক্ষমতাকে Veto বা রোধ-অধিকার বলে। কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে, যেমন সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের

আশায় অথবা কোন স্থানে বা ব্যক্তির সুবিধা করিবার জন্য কিংবা সাময়িক উত্তেজনাবশে কোন আইন যাহাতে তাড়াতাড়ি কার্যকরী না হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতির হাতে এই ক্ষমতা ন্যস্ত হয়। ইহা চার প্রকারের, যথা—চরম (absolute), শর্তমূলক (qualified), সাময়িক (suspensive) এবং নীরবতা-মূলক (Pocket Veto)। দুই শতাব্দিক বর্ষ পূর্বে ইংলণ্ডের রাজার চরম রোধ-অধিকার ছিল; তিনি নাকচ করিয়া দিলে আর সেই আইন কখনই কার্যকরী হইতে পারিত না। এখন এরূপ অধিকার অধিকাংশ রাষ্ট্রেই লোপ পাইয়াছে। শর্তমূলক রোধ-অধিকার প্রযুক্ত হইলে আইনসভা আবার দুই-তৃতীযাংশ সদস্যের মত লইয়া যদি উহা পাশ করে তবে উহা আইন বলিয়া গণ্য হইবে। রাষ্ট্রপতি কোন আইন নাকচ করিয়া দিয়া আইনসভাকেই উহা পুনরায় বিবেচনা করিতে বলিতে পারেন। উহাকে সাময়িক বা Suspensive Veto বলে। কংগ্রেস যদি অধিবেশন মুলতুবি রাখিবার দশদিনের মধ্যে কোন আইন রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করে এবং তিনি উহার সম্বন্ধে হাঁ বা না কিছুই না বলেন, তাহা হইলে উহা নাকচ হইয়া যায়। এরূপ ক্ষমতা প্রয়োগকে পকেট ভেটো বলা হয়। সংসদীয় শাসনতন্ত্রে শাসনবিভাগের হাতে আইনসভা আহ্বান করা, ভঙ্গ করা প্রভৃতি ক্ষমতা থাকে, কিন্তু রাষ্ট্রপতি-শাসিত পদ্ধতিতে ঐরূপ থাকে না।

চার রকমের ভেটো বা রোধ অধিকার

সকল রাষ্ট্রেই শাসনবিভাগের হাতে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীকে ক্ষমা করিবার অথবা তাহার দণ্ড হ্রাস করিবার ক্ষমতা আছে। বিশেষ ক্ষেত্রে দয়া প্রকাশ করিলে বিচারের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না, বরং বৃদ্ধিই পায়।

ক্ষমা করিবার ক্ষমতা

২। **শাসনযন্ত্র পরিচালকের নিযুক্তি ঃ** শাসনযন্ত্রের যিনি প্রকৃত পরিচালক তিনি কি ভাবে নিযুক্ত বা নির্বাচিত হন তাহার উপর সুশাসন অনেকখানি নির্ভর করে। তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হইতে পারেন, আইনসভা তাঁহাকে নির্বাচন করিতে পারে, কিংবা তিনি ছলেবলে ক্ষমতা অধিকার করিতে পারেন। এই চারিটি উপায় ছাড়া বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারসূত্রে কেহ রাজপদ পাইতে পারে না বটে, কিন্তু আধুনিক জগতে অধিকাংশ রাজা

চারটি উপায়

বা রানী শুধু নামে মাত্র প্রধান, কার্যে নহে। সেইজন্য এই উপায়টির বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন নাই।

জনসাধারণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে কেহ নির্বাচিত হইয়া আসিলে তিনি দাবি করিতে পারেন যে জনমত তাঁহাকে ও তাঁহার নীতিকে সমর্থন করে। তিনি হয়তো জনগণের নিকট তাঁহার দায়িত্বের কথা স্মরণ রাখিয়া কাজও করেন। কিন্তু এরূপ পদ্ধতিতে সব সময়ে যে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিরই নির্বাচন হয় তাহা নহে। যিনি রাষ্ট্রের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে ছুটাছুটি করিতে ও লোকমাতানো বক্তৃতা করিতে পারেন, যাঁহার চিন্তাধারায় স্বাধীনতার বালাই নাই, কাজেই যাঁহার বিরোধী লোকের সংখ্যা খুব কম তাঁহারই নির্বাচিত হইবার বেশি সম্ভাবনা থাকে। ধীর, গম্ভীর, বিবেচক ও শান্তিপ্রিয় লোকেরা নির্বাচনপ্রার্থী হন না। জনসাধারণ উত্তেজনা বশে ব্যক্তিত্বহীন অথচ জনপ্রিয় ব্যক্তিকে নির্বাচন করিতে পারে। রাষ্ট্রের প্রধান কর্মকর্তাকে প্রত্যক্ষ ভাবে নির্বাচন করিতে গেলে অনেক টাকা খরচ হইবারও আশংকা আছে। তার চেয়েও বড় কথা দেশের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা ও উন্মাদনার সঞ্চার হইতে পারে এবং তাহার ফলে অশান্তি দেখা দিতে পারে। এই সব কথা বিবেচনা করিয়াই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান-রচয়িতারা অপ্রত্যক্ষভাবে নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা প্রেসিডেন্টের নির্বাচনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক দলের উদ্ভবের ফলে সেখানে অপ্রত্যক্ষ হইলেও কাজে প্রত্যক্ষ নির্বাচনই হইতেছে। এইজন্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুপরিচিত ব্যক্তি অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত অপরিচিত "কালো ঘোড়া"র (Dark Horse) নির্বাচনের সম্ভাবনা বেশি থাকে। বলিভিয়া, ব্রেজিল ও পেরুতে প্রধান কর্মকর্তাকে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচন করা হয়।

প্রত্যক্ষ নির্বাচন

অপ্রত্যক্ষ নির্বাচনের দ্বারা কর্মকর্তা নিয়োগের নীতি যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া, আর্জেন্টিনা, চিলি ও মেক্সিকোতে বর্তমান আছে। যেখানে জনসাধারণের বুদ্ধি ও বিবেচনার উপর আস্থা কম, অথবা ধনী কিংবা সম্ভ্রান্ত বংশের লোককে নির্বাচিত করিবার আগ্রহ অধিক, সেখানে অপ্রত্যক্ষ নির্বাচন প্রথা প্রচলিত থাকে।

অপ্রত্যক্ষ নির্বাচন

সংসদীয় শাসনপ্রথায় প্রধানমন্ত্রী একদিক দিয়া প্রত্যক্ষ ভাবেই নির্বাচিত

হন। নির্বাচনের পূর্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা প্রচুর প্রচার কার্য করেন বা করাইয়া থাকেন। লোকে কোন দল বিশেষকে ভোট দিবার সময় মনে রাখে ঐ দল জয়ী হইলে কে প্রধানমন্ত্রী হইবেন। আইন-সভার নিম্নসদনের অধিকাংশ সদস্য যে দলভুক্ত হন, সেই দলের নেতাকে রাজা বা রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। ইহাকে নিযুক্তি না বলিয়া নির্বাচন বলাই অধিকতর সঙ্গত, কেন না ব্রিটেনের রানী উইলসনকে বা ভারতের রাষ্ট্রপতি শাস্ত্রীকে নিযুক্ত না করিয়া পারেন না। যদি কেহ দুষ্টবুদ্ধিবশতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নায়ক ছাড়া অন্য কাহাকেও নিযুক্ত করেন, তবে শেষোক্ত ব্যক্তির পক্ষে সংসদের আস্থাভাজন হওয়া অসম্ভব হয়, কাজেই তাঁহার মন্ত্রিসভা অচিরে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন

আইনসভার দ্বারা নির্বাচন করিয়া ফ্রান্সের তৃতীয় সাধারণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করা হইত। কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে সাক্ষীগোপাল হইয়া থাকিতেন। প্রধানমন্ত্রীই সমস্ত ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের আইনসভায় উভয়কক্ষ মিলিত হইয়া তিন বৎসরের জন্য কার্যকরী সমিতিকে নির্বাচিত করে।

আইনসভার দ্বারা নির্বাচন

নেপোলিয়ন, মুসোলিনি, হিট্‌লার প্রভৃতি ছলে বলে কৌশলে ক্ষমতা হস্তগত করিয়াছিলেন। একবার ক্ষমতার আসনে বসিয়া রাষ্ট্রের জনবল ও ধনবলের সাহায্যে লোকের সম্মতি আদায় করা তেমন কঠিন হয় না। তবে সকল লোককে চিরকাল ধাপ্পা দেওয়া যায় না বা দমন করিয়া রাখা যায় না।

ছলে বলে ক্ষমতা লাভ

৩। **এক পরিচালক ও বহু পরিচালক:** আইনসভায় বিভিন্ন মতের ও বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি থাকা প্রয়োজন, কিন্তু শাসন ব্যাপারে একজনের বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে হয়। শাসনভার যদি সমক্ষমতাসম্পন্ন বিভিন্ন ব্যক্তির উপর অর্পিত হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে মতবিরোধ ও হিংসাদ্বেষ উপস্থিত হইতে পারে এবং কোন বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন হয়। এইজন্য সুইট্‌জারল্যাণ্ড ছাড়া আর সব রাষ্ট্রেই একজনের

একক শাসনের গুণ

উপর শাসনভার ন্যস্ত থাকে। নেপোলিয়ন বলিতেন যে, দুইজন ভাল সেনাপতির চেয়ে একজন খারাপ সেনাপতির যুদ্ধ পরিচালনা অনেক ভালো।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়নের সময় বহু পরিচালকের হাতে শাসনভার সমর্পণের নীতি পরিত্যক্ত হইয়াছিল। সেখানে

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি একা সমস্ত শাসনকার্যের পরিচালক; তাঁহার সেক্রেটারীরা তাঁহার অনুগত সেবকমাত্র। তাঁহাদের কোন স্বতন্ত্র মত থাকিলেও রাষ্ট্রপতির আদেশে তাঁহাকে উহা পরিবর্তন বা পরিবর্জন করিতে হয়। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কংগ্রেস ও বিচারালয়ের দ্বারা কিছু পরিমাণে সীমিত হইলেও, তিনিই কার্যনীতি নির্ধারণ ও অনুসরণ করেন।

ইংলণ্ডে বহু পরিচালক নীতি স্থাপিত হইতে হইতে এক পরিচালকনীতি

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথমে ক্যাবিনেটের সকল সদস্য সমান—এই ভাব ছিল। কিন্তু ওয়ালপোলের সময় হইতে মন্ত্রীদের মধ্যে একজনের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রীকে শুধু যে নিযুক্ত করেন তাহা নহে তাঁহাদিগকে বরখাস্তও করিতে পারেন। এই ক্ষমতা তাঁহার হাতে আছে বলিয়া অন্যান্য মন্ত্রীরা তাঁহার অনুগত হইয়া চলেন। গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেক বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ লইয়া নীতিনির্ধারণ করা হয়।

সুইট্জারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে সাত ব্যক্তির হাতে শাসনভার ন্যস্ত হইয়াছে। ইহাকে Collegiate system বলে। আইনসভার উভয় সদনের নির্বাচনের পর উভয়ের একটি সম্মিলিত অধিবেশনে এই সাত ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হয়। তাঁহাদিগকে সমবেত-

সুইট্জারল্যাণ্ডে কলেজিয়েট বা যুক্তশাসন প্রথা

ভাবে ফেডারল্ কাউন্সিল্ বলে; ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই ক্রমাগত পঁচিশ, ত্রিশ বৎসর ধরিয়া নির্বাচিত হইয়া আসিতেছেন। তাঁহারা সকলে একদলভুক্ত নহেন। পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন দলের সভ্যেরাও একসঙ্গে ঐ কাউন্সিলে নির্বাচিত হন। তাঁহারা এক একজন এক একটি দপ্তরের ভার লন। তাঁহাদের মধ্যে একজন এক বৎসরের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হন বটে, কিন্তু তাঁহার কোন বিশেষ ক্ষমতা থাকে না। তিনি সাতজনের একজনই

থাকেন, ছয়জনের উপর প্রাধান্য করেন না। তাঁহাদের কোন কাজ যদি নিন্দনীয় বলিয়া আইনসভার আলোচনায় স্থির হয়, তাহা হইলে তাঁহারা পদত্যাগ করেন না, ঐ কার্যনীতি প্রত্যাহার করেন। বস্তুতঃ সুইট্জারল্যাণ্ডের সংবিধান অনুসারে কার্যপরিচালকগণ আইনসভার নির্দেশ অনুসারে সকল কার্য সম্পাদন করেন। কিন্তু যেহেতু তাঁহারা অভিজ্ঞ এবং নিজ নিজ দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সেই হেতু তাঁহাদের প্রভাব আইনসভার উপর যথেষ্ট দেখা যায়। সুইট্জারল্যাণ্ডে গণ-উদ্যোগ, গণভোট প্রভৃতি প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের বিধি বলবৎ আছে বলিয়া বহু পরিচালক-নীতি থাকা সত্ত্বেও কোন অঘটন ঘটে নাই। সেখানকার লোকেরা শিক্ষিত ও সতর্ক বলিয়া এই নীতি সফল হইয়াছে।

সাধারণতঃ শাসনভার একজনের উপর সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে চার পাঁচ বছর অন্তর জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচন করিলে একদিকে সুদক্ষতা, অন্যদিকে নিয়মতান্ত্রিকতা বজায় থাকে। একেবারে অযোগ্য ব্যক্তি নির্বাচিত হইবার আশংকা কম। একবার নির্বাচন করিয়া জনসাধারণ যদি তাঁহার কার্যকলাপের উপর সতর্ক দৃষ্টি না রাখেন, তাহা হইলে তিনি স্বেচ্ছাচারী হইতে পারেন।

৪। **রাষ্ট্রপতির শাসন এবং মন্ত্রিপরিষদের শাসন ঃ** (Presidential and Parliamentary Powers of Governments): আধুনিক গণতন্ত্রের সরকারী কার্য পরিচালনার দুইটি পদ্ধতি দেখা যায়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির হাতে শাসনভার থাকে, কিন্তু তাঁহার সহিত আইনসভার কোন প্রত্যক্ষ যোগ থাকে না। তিনি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হন। তাঁহার কার্যকাল চার বছরের জন্য সুনির্দিষ্ট থাকে। ঐ সময়ের মধ্যে তাঁহাকে ক্ষমতা হইতে অপসারণ করা দুঃসাধ্য। আইনসভা কোনপ্রকার অনাস্থামূলক প্রস্তাব পাশ করিতে পারে না, পারিলেও তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য নহেন। রাষ্ট্রপতি নিজে কিংবা তাঁহার কোন অমাত্য আইনসভার কোন সদনের সদস্য হইতে পারেন না। এই ব্যবস্থায় শাসকের সহিত আইনসভার কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকে না। ইংলণ্ডের শাসনপদ্ধতি ইহার বিপরীত। কেন না সেখানে শাসকমণ্ডলীর সহিত বিধানমণ্ডলীর অর্থাৎ কার্যাঙ্গের সহিত

শাসনের বৈশিষ্ট্য

বিধানাঙ্গের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কেবিনেট বা মন্ত্রিপরিষদের হাতে শাসনক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। কিন্তু কেবিনেট কেবলমাত্র শাসনকার্য পরিচালনা করে না, আইন প্রণয়নেও নেতৃত্ব করিয়া থাকে। রাজা বা রানী নামে মাত্র প্রধান, তিনি হাউস্ অব কমন্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে ডাকিয়া মন্ত্রিপরিষদ গঠনের ভার অর্পণ করেন। নেতা প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁহার দলের অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দকে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরূপে নিযুক্ত করিবার জন্য সুপারিশ করেন। সেই সুপারিশ রাজা বা রানী কখনই অমান্য করেন না। এইরূপে কেবলমাত্র আইনসভার সদস্যদের লইয়াই মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হইয়া থাকে। কেবিনেটের প্রত্যেক সদস্য ব্যক্তিগত ভাবে এবং সংযুক্ত ভাবে পার্লামেণ্টের নিম্ন কক্ষ, হাউস্ অব কমন্সের নিকট দায়ী থাকেন। প্রত্যেক মন্ত্রী নিজ নিজ দপ্তরের কার্যের জন্য হাউস্ অব কমন্সের নিকট জবাবদিহী করিতে বাধ্য, কিন্তু প্রত্যেক দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি কেবিনেটে আলোচিত হয় বা হওয়া উচিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। নিম্নকক্ষের সদস্যেরা যে কোন দপ্তর সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন; গুরুতর কোন ব্যাপার লইয়া সভা মুলতুবি রাখিবার প্রস্তাব উঠাইতে পারেন এবং অনাস্থা প্রকাশের উদ্যম করিতে পারেন। মন্ত্রিপরিষদের তরফ হইতে প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর না পাইলে মন্ত্রীরা অপদস্থ হন। কিন্তু আজকাল দলীয় শাসন এত কঠোর হইয়াছে যে, মন্ত্রিসভা যে দলের লোক লইয়া গঠিত হইয়াছে সেই দলের কোন সদস্য প্রকাশ্যরূপে হাউস অব কমন্সে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন না, কিংবা কেহ মন্ত্রীদের নিন্দা করিলে তাহার সমর্থন করেন না। ইহার ফলে যতক্ষণ পর্যন্ত হাউস অব কমন্সে মন্ত্রিসভার দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে, ততক্ষণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে নিন্দা বা অনাস্থাসূচক কোন প্রস্তাব পাশ হয় না। আগে এরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইলে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিতেন, এখন তৎপরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করিয়া জানিতে চাহেন যে, জনসাধারণ তাঁহার পক্ষে আছেন কিনা।

মন্ত্রিপরিষদের বৈশিষ্ট্য

জন স্টুয়ার্ট মিল লিখিয়াছেন যে, প্রতিনিধিত্বমূলক কোন বিধানসভার পক্ষে শাসন ব্যাপারে প্রত্যক্ষ অংশ লওয়া সম্ভব নহে, সম্ভব হইলেও উহাতে

বিশৃঙ্খলা জন্মে। হাউস্ অব কমন্স আজকাল অপ্রত্যক্ষরূপে বিতর্ক ও আলোচনার সাহায্যে শাসন ব্যাপারে যে অংশ গ্রহণ করে, তাহাকে পার্লামেণ্টারি বা সংসদ-শাসিত প্রথা বলা চলে কিনা সন্দেহ। সেইজন্য ঐ শব্দটির পরিবর্তে আমরা 'মন্ত্রিপরিষদের শাসন' শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। অবশ্য মন্ত্রিপরিষদ হাউস অব কমন্সের মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকেন। তাঁহারা যদি ক্রমাগত জনগণের অপ্রিয় কাজ করিতে থাকেন, তাহা হইলে পরবর্তী নির্বাচনে তাঁহাদের সাফল্যলাভের আশা থাকে না। এই প্রথার মূল নীতি হইতেছে এই যে, জনসাধারণ রাষ্ট্রের কার্যের নীতি কিরূপ হইবে তাহার নির্দেশ প্রদান করে।

সংসদকর্তৃক শাসন কি সম্ভব?

৫। উভয় প্রথার তুলনামূলক বিচার (Comparison between Presidential and Parliamentary forms of government) : আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রথা অনুসারে যে ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হন, তিনি শাসনকার্যে অভিজ্ঞ নাও হইতে পারেন। বেশি সুপরিচিত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতির পদের জন্য প্রার্থীরূপে মনোনীত করা হয় না, কেন না তাঁহার দোষ-গুণের কথা অনেক লোকে জানেন, কাজেই অনেকে তাঁহার বিপক্ষে বিরুদ্ধভাব পোষণ করিতে পারেন এবং তাহার ফলে তাঁহার পক্ষে ভোটের সংখ্যা কম হইতে পারে। এইজন্য অপেক্ষাকৃত অজানা লোকের পক্ষে নির্বাচনে জয় লাভ করা সহজ হয়। একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তির হাতে চার বৎসরের জন্য জাতির ধনপ্রাণ, মানমর্যাদা রক্ষার ভার সমর্পণ করা বিশেষ যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। তবে এ কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একেবারে অযোগ্য লোক বড় একটা নির্বাচিত হন না।

অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিত্ব

ইংলণ্ডের যিনি প্রধানমন্ত্রী হন তিনি তাঁহার দলের মধ্যে সবচেয়ে সুদক্ষ, সুবিজ্ঞ এবং সুচতুর ব্যক্তি। বিপক্ষদলের নেতার তুলনায় তাঁহার চরিত্র ও কর্মনিপুণতা বেশি আকর্ষণীয় বলিয়াই তাঁহার দলের প্রার্থীরা অধিক সংখ্যায় হাউস অব কমন্সে নির্বাচিত হন। বহুকাল ধরিয়া বিভিন্ন পদে কাজ করিয়া তাঁহার প্রচুর অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। তিনি নিপুণতা ও বিচক্ষণতার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ

দলের ও জনসাধারণের মনোরঞ্জন ক্ষমতা

হইয়াছেন বলিয়াই দলের নেতৃত্ব লাভ করিয়াছেন। অন্যান্য গুণের মধ্যে তাঁহার ভালো বক্তৃতা করার, বিতর্কে চোখা চোখা জবাব দিবার এবং খারাপ অবস্থাকে ভাল প্রতিপন্ন করার ক্ষমতা থাকা দরকার। পার্লামেণ্টে বিরোধী দল তাঁহার নীতির ও কার্যের তীব্র প্রতিবাদ করিলে তিনি এমনভাবে জবাব দেন যাহাতে দেশের লোকে বুঝিতে পারে যে বিপক্ষদলের সমালোচনা নিতান্তই অসার। প্রধানমন্ত্রীকে সব সময়ে দলের লোককে অনুগত ও জনসাধারণকে সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করিতে হয়। আমেরিকার রাষ্ট্রপতিকে কংগ্রেসের কোন সদনেই দাঁড়াইয়া উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতে হয় না। বিরোধী দলের নিন্দাবাদকে সর্বদা খণ্ডন করিবারও তাঁহার দরকার নাই। তবে রাষ্ট্রপতিও প্রথমবার নির্বাচিত হইয়া এমন ভাবে কাজকর্ম পরিচালনা করেন, যাহাতে তিনি দ্বিতীয়বার নির্বাচনে সাফল্য লাভ করিতে পারেন।

রাষ্ট্রপতি দ্বিতীয়বার অর্থাৎ আট বৎসরের বেশি কিছুতেই ক্ষমতা হাতে রাখিতে পারেন না, কিন্তু ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে উহার চেয়ে অধিক-কাল ক্ষমতা ভোগ করা অসম্ভব নহে। আমেরিকার সংবিধান তৈয়ারির সময় চার বৎসরের জন্য এই ভাবিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল যে, উহাতে কার্যনীতির সহসা পরিবর্তন ঘটিবে না এবং পুনর্নির্বাচনের আশায় রাষ্ট্রপতি দক্ষতা ও সততার সহিত কাজ করিবেন। এই আশা ব্যর্থ হয় নাই। ইংলণ্ডের লেবার দল ক্ষমতা হাতে পাইয়া যে সব নীতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন, সংরক্ষণশীল দল তাহার কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়াছেন; কিন্তু অধিকাংশ নীতিই তাঁহারা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

কার্যকাল

ইংলণ্ডের শাসনপ্রথায় আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের মধ্যে সম্বন্ধ অত্যন্ত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ। কেবিনেটের প্রত্যেক সদস্য আইনসভার সদস্য। প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছা করিলে আইন-সভার নিম্নকক্ষের অধিবেশন ডাকিতে পারেন, মুলতুবি রাখিতে পারেন ও ভঙ্গ করিয়া দিতে পারেন। আমেরিকার রাষ্ট্রপতির এ সব ক্ষমতা নাই, তবে তিনি ইচ্ছা করিলে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন। ব্রিটিশ কেবিনেটের সদস্যেরা যে আইন পাশ করানো প্রয়োজন মনে করেন সেই আইন পার্লামেণ্টে পেশ করেন এবং

আইনবিভাগের সহিত সম্বন্ধ

তাহা আইনরূপে গৃহীত হওয়ার পক্ষে বিশেষ বাধা থাকে না। সরকারী সমর্থন না পাইলে কোন বিলই কেহ পাশ করাইতে পারেন না। পূর্বে আমেরিকার রাষ্ট্রপতির আইন করার উপর বিশেষ কোন হাত ছিল না। তিনিই তাঁহার বার্ষিক বাণীতে কংগ্রেসকে যে আইন পাশ করিতে অনুরোধ করিতেন তাহা কখনো পাশ হইত, কখনো হইত না। কিন্তু ইদানিং তাঁহার আইন পাশ করাইবার ক্ষমতা অথবা প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাঁহার নিজেদের দলভুক্ত কংগ্রেসীয় সদস্যেরা তাঁহার প্রস্তাবিত আইন পাশ করাইবার জন্য চেষ্টা করেন। তা ছাড়া রাষ্ট্রপতির হাতে যে সকল সুবিধা আছে তাহার লোভ দেখাইয়া বা বিতরণ করিয়া তিনি তাঁহার প্রস্তাবিত আইনের জন্য সমর্থন সংগ্রহ করেন। আজকাল এই ধরনের প্রস্তাবিত আইনকে Administration measures বলে। ইহার সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। তবে এখনও ব্রিটেনের আইনের সঙ্গে আমেরিকার আইনের পার্থক্য আছে। কেবিনেটের নেতৃত্বে ব্রিটেনের আইনসমূহ তৈয়ারি হয় বলিয়া সেখানে উহাদের মধ্যে একটা ঐক্য ও সামঞ্জস্য থাকে। কিন্তু আমেরিকার কংগ্রেসে বিভিন্ন বিষয়ের আইনের খসড়া তৈয়ারির জন্য বিভিন্ন কমিটি আছে। তাঁহারা যে সব আইন পাশ করাইয়া থাকেন তাহাদের পরস্পরের মধ্যে নীতিগত ঐক্য ও সামঞ্জস্য বজায় রাখা কঠিন। আমেরিকায় যে সময়ে একই দলের লোক কংগ্রেসের উভয় কক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন ও রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে সফল হন তখন শাসনবিভাগের সঙ্গে আইনবিভাগের সদ্ভাবও থাকে। কিন্তু যখন রাষ্ট্রপতি একদলের লোক এবং কংগ্রেসের. বিশেষতঃ সেনেটের অধিকাংশ সভ্য অন্য দলের লোক হন, তখন শাসন-বিভাগের সহিত আইনবিভাগের বিরোধ লাগিয়াই থাকে। তাহার ফলে শাসন ব্যাপারে শিথিলতা ও বিশৃঙ্খলা আসে।

মন্ত্রিপরিষদ-শাসিত প্রথায় মন্ত্রীদিগকে সকল রকম কাজের জন্য দায়ী করা যায়। মন্ত্রীদের কোন কাজের ফলে যদি দেশের কোন অনিষ্ট হয়, তাহা হইলে জনসাধারণ আর সেই দলের লোককে পরবর্তী নির্বাচনে ভোট দেয় না। বিরোধী দল তখন ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি-শাসিত প্রথায় দায়িত্ব কাহারও উপর সুনির্দিষ্ট করিয়া স্থাপন করা কঠিন হয়। সেখানে কোন ক্ষমতা

দায়িত্বশীলতা

বিচারবিভাগের, কোন ক্ষমতা আইনবিভাগের এবং কোন ক্ষমতা শাসন-বিভাগের হাতে থাকে। সেইজন্য কে খারাপ কাজের জন্য দায়ী তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। তিন বিভাগের মধ্যে বিবাদের ফলে কখনও কখনও নৈপুণ্যের হানি হয় এবং দেশের আর্থিক ও সামাজিক জীবনে বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট কাহাকেও উচ্চতম কয়েকটি পদে নিযুক্ত করিবার পূর্বে সেনেটের সম্মতি লইতে হয়। ইহার ফলে কখনো কখনো অবাঞ্ছিত ব্যক্তিও নিযুক্ত হন। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ঐ সব বিষয়ে অবাধ ক্ষমতা ভোগ করেন।

মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতা ইংলণ্ডে যতটা আছে ফ্রান্সে ততটা নাই। ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের পূর্বে মন্ত্রীরা অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছিলেন। তাঁহাদের হাতে আইনসভা ভঙ্গ করিয়া নির্বাচন করাইবার ক্ষমতা ছিল না। এখনও ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট দ্য গলের এমন ক্ষমতা আছে যে, তিনি ইচ্ছামত মন্ত্রিসভার পরিবর্তন ঘটাইতে পারেন। যে মন্ত্রিপরিষদ আইনসভার দ্বারা যে কোন প্রস্তাব পাশ করাইবার ক্ষমতা না রাখে, সে মন্ত্রিপরিষদ আমেরিকার রাষ্ট্রপতির চেয়ে অনেক দুর্বল। কেহ কেহ বলেন যে, শান্তির সময়ে মন্ত্রিপরিষদের শাসন ভাল আর যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রপতির শাসন অধিকতর কাম্য। মন্ত্রীপরিষদ ধীরে সুস্থে দশজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া ও আইনসভার মত বিবেচনা করিয়া কার্যপদ্ধতি স্থির করে। যুদ্ধের সময় এমনভাবে কাজ করিলে জয় লাভ করা অসম্ভব হয়। সে সময়ে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয় এবং গোপনতা বজায় রাখিতে হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় চার্চিল সাহেব ছোট একটি যুদ্ধপরিষদ গঠন করিয়া তাহার সাহায্যে কার্য পরিচালনা করিতেন। তাহার ফলে অযথা বিলম্ব ঘটিতে পারিত না অথচ গোপনতা বজায় থাকিত। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, বিপদ উপস্থিত হইলে মন্ত্রিপরিষদের শাসন এমনভাবে পরিচালিত হয় যে, তাহাতে দেশের স্বার্থের কোন হানি ঘটে না। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি যুদ্ধের সময়ে প্রায় ডিক্টেটারের তুল্য ক্ষমতা ভোগ করেন। কিন্তু শান্তির সময় তিনিও তাঁহার সেক্রেটারীদের ও বিশেষজ্ঞদের মত লইয়া কাজ করেন। ইঁহারা তাঁহার

ফ্রান্সের মন্ত্রিপরিষদ দুর্বল

শান্তিকালে মন্ত্রিপরিষদের ও যুদ্ধকালে রাষ্ট্রপতির শাসন ভাল কি ?

অনুগত কর্মচারী বটে, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমন প্রভাবশালী যে, রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে উপেক্ষা করেন না—যদিও আইনতঃ তিনি কাহাকেও নিযুক্ত করিতে বা কাহারও মত গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন।

৬। **ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি ও ভারতের রাষ্ট্রপতিঃ** যখন আমরা রাষ্ট্রপতি-শাসিত প্রথার কথা বলি তখন আমাদের মনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির কথাই জাগে। অন্য কোন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে আইনবিভাগ ও বিচারবিভাগের ক্ষমতা হইতে এরূপভাবে স্বতন্ত্র করা হয় নাই। অন্যান্য রাষ্ট্রের সংবিধানে প্রেসিডেণ্ট শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু সেখানকার শাসনপ্রণালীকে রাষ্ট্রপতি শাসিত আখ্যা প্রদান করা যায় না।

ফ্রান্সের তৃতীয় সাধারণতন্ত্রের (১৮৭৫—১৯৪৬) প্রেসিডেণ্ট তথাকার আইনসভার দুই সদনের সম্মিলিত অধিবেশনে সাত বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইতেন। তাঁহার ক্ষমতা ব্রিটেনের রাজা ও রানীর তুল্য ছিল, কিন্তু তাঁহাদের মতন সামাজিক মর্যাদা তাঁহার ছিল না। তিনি মন্ত্রিসভার হাতে সমস্ত শাসনভার তুলিয়া দিতেন। নামে প্রেসিডেণ্ট হইলেও আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের একশতাংশ ক্ষমতাও তাঁহার ছিল না। দ্য' গল ইহার পরিবর্তন সাধন করিয়া ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে পঞ্চম সাধারণতন্ত্র স্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে প্রেসিডেণ্ট (স্বয়ং দ্য' গল) আইনসভার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্য ও ফরাসী উপনিবেশের কয়েকজন প্রতিনিধির দ্বারা নির্বাচিত হন। সেইজন্য তিনি দাবি করিতে পারেন যে, তিনি অপ্রত্যক্ষ ভাবে জনতার দ্বারা নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি মন্ত্রীদিগকে নিযুক্ত করেন ও বরখাস্ত করিতে পারেন। মন্ত্রিসভার সভাপতিত্বও তিনি করেন, যদিও কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে উহাতে প্রধানমন্ত্রী সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে পারেন। মন্ত্রীরা আইনসভার সদস্য হইতে পারেন না, তবে আইনসভায় উপস্থিত থাকিতে ও বক্তৃতা করিতে পারেন। প্রেসিডেণ্ট নিজেও আইনসভার নিকট বাণী প্রেরণ করিতে পারেন। এই ব্যাপারে আমেরিকার সংবিধানের সহিত পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানের মিল আছে। কিন্তু কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ

ফ্রান্সের তৃতীয় সাধারণ তন্ত্রের রাষ্ট্রপতি

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতি

বিষয়ে গরমিলও দেখা যায়। প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রীর ও আইনসভার দুই সদনের সভাপতির সহিত পরামর্শ করিয়া আইনসভা ভঙ্গ করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু এই ক্ষমতা বছরে একবারের বেশি তিনি প্রয়োগ করিতে পারেন না। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের মতন তিনি দুই চারিটি বিষয়ে তাঁহার মন্ত্রীদের পরামর্শ না লইতে পারেন; কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ আদেশই কোন মন্ত্রীর স্বাক্ষরের দ্বারা সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন। এইরূপে ফ্রান্সের শাসনতন্ত্র এখন কিছুটা রাষ্ট্রপতি শাসিত, কিন্তু বহুলাংশে মন্ত্রি-পরিষদ-শাসিত প্রথার অনুরূপ।

জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতি

পশ্চিম জার্মানির জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্রে (German Federal Republic) প্রেসিডেন্টের অপ্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা আছে। তিনি যুক্ত-রাষ্ট্রের আইনসভার নিম্নসদনের সভ্যদের এবং অঙ্গীয় রাষ্ট্রের বিধানসভার সম সংখ্যক সভ্যদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচন প্রথায় (Proportional Representation) নির্বাচিত হন। তাঁহার নামে শাসন চালানো হইলেও তাঁহাকে মন্ত্রীদের পরামর্শে কাজ করিতে হয়। কেবল তিনটি ব্যাপারে তাঁহার স্বাধীন কর্তৃত্ব আছে—যথা প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগে, (কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাই নিযুক্ত হইয়া থাকেন), আইনসভার নিম্ন সদনে যখন কোন প্রধানমন্ত্রীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে না তখন উহা ভঙ্গ করা এবং যতদিন না অন্য মন্ত্রী পাওয়া যায় ততদিন বর্তমান মন্ত্রীকে কাজ চালাইতে অনুরোধ করা। সুতরাং এখানে নামে প্রেসিডেন্ট থাকিলেও কাজে উহার শাসনব্যবস্থা মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হয়।

ভারতের রাষ্ট্রপতি

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতির নির্বাচনপদ্ধতি অনেকটা পশ্চিম জার্মানির অনুরূপ। এখানেও রাষ্ট্রপতি শান্তিপূর্ণ সাধারণ অবস্থায় ব্রিটিশ রাজশক্তির ন্যায় ভারতের ঐক্যের প্রতীক্ মাত্র। শাসনকার্য মন্ত্রি-পরিষদই প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীনে চালাইয়া থাকেন। জরুরি অবস্থার উৎপত্তি হইলে রাষ্ট্রপতির হাতে বিশেষ ক্ষমতা ন্যস্ত করিবার ব্যবস্থা ভারতীয় সংবিধানে আছে, কিন্তু তিনি মন্ত্রিমণ্ডলীর পরামর্শ অনুসারে কার্য করেন।

অনুশীলন

১। What are the essential features of Cabinet Government? What are its chief drawbacks.

ক্যাবিনেট সরকার ও পার্লামেণ্টারি প্রথা একই।

চতুর্থ ও পঞ্চম প্রকরণ দেখ।

২। Compare the Parliamentary with the Presidential system of Government.

পঞ্চম প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

৩। Discuss the merits and defects of the collegiate type of executive.

তৃতীয় প্রকরণের শেষ দুই অনুচ্ছেদ দেখ।

৪। Examine, with example, the relation between the legislature and the executive in a state where the executive has a responsible character.

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে সরকার আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল।

পঞ্চম প্রকরণে "আইনসভার সহিত সম্বন্ধ" ও "দায়িত্বশীলতা" দেখ।

অষ্টাদশ অধ্যায়

আইনসভা বা বিধানাঙ্গ (Legislature)

১। বিধানাঙ্গের প্রকৃতি (Nature of Legislature) : আইনসভা বা বিধানাঙ্গ (Legislature) কোথাও বা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আবার কোথাও বা ক্ষমতাবিহীন। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট যে কোন প্রকার আইন করিতে পারে এবং ঐ আইনকে কোন বিচারালয় অসিদ্ধ বলিতে পারে না। উহার সার্বভৌম-ক্ষমতার উদাহরণ দিতে যাইয়া একজন লেখক বলিয়াছেন যে, উহা ইচ্ছা করিলে নাবালককে সাবালক বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে। প্রত্যেক নাগরিককে লর্ড উপাধি দিতে পারে, দেশের ধনসম্পত্তি সকলের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করিয়া দিতে পারে ; পারে না শুধু নারীকে পুরুষ করিতে ও পুরুষকে নারী করিতে। হাউস্ অব কমন্স জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত বটে, কিন্তু একবার নির্বাচিত হইয়া বসিলে উহার সদস্যেরা ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের কার্যকাল বৃদ্ধি করিয়া লইতে পারেন। যে প্রতিনিধিরা তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা নূতন আইন করিলেন যে, সদস্যরা সাত বৎসর কাল পর্যন্ত হাউস অব কমন্সে প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবেন। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, সদস্যেরা জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করিলেও তাঁহাদের এজেণ্টমাত্র নহেন। পার্লামেণ্ট যে কোন আইন বদলাইতে পারে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার নাম কংগ্রেস। উহার ক্ষমতা একদিকে সংবিধানের দ্বারা, অন্যদিকে আঙ্গিক রাজ্যগুলির ক্ষমতার দ্বারা সীমাবদ্ধ। সংবিধান যে ক্ষমতা কংগ্রেসকে দেয় নাই তাহা সে প্রয়োগ করিতে পারে না। যেমন কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের কার্যে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাশ করিতে পারে না। রাজ্যগুলিকে যে যে বিষয়ে আইন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে সেই সেই বিষয়ে কোন আইন তৈয়ারি করিবার ক্ষমতা কংগ্রেসের নাই। ইংলণ্ডের বিচারালয় ঘোষণা করিতে পারে না যে, পার্লামেণ্টের দ্বারা রচিত কোন আইন অবৈধ, কিন্তু আমেরিকার সুপ্রিম

কোর্ট কংগ্রেস প্রণীত আইনকে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে. ইংলণ্ডে সাধারণ আইন ও সাংবিধানিক আইনের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই; পার্লামেণ্ট সংবিধান সংক্রান্ত যে কোন ব্যবস্থা সাধারণ আইন তৈয়ারির রীতিতে সংশোধন করিতে পারে। আমেরিকার কংগ্রেস তাহা পারে না। সেখানে সাংবিধানিক আইন সংশোধনের স্বতন্ত্র এবং অত্যন্ত জটিল রীতি প্রচলিত আছে।

সেকালের স্বেচ্ছাচারতন্ত্রে আইনসভার স্থান ছিল গৌণ—শাসনকর্তারা ইচ্ছামত ইহার পরামর্শ লইতেন বা অগ্রাহ্য করিতেন। একালে আমেরিকা ছাড়া অধিকাংশ রাষ্ট্রে আইনসভা, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগের তুলনায় অধিক ক্ষমতা ভোগ করে। আইনসভা যে আইন তৈয়ারি করে শাসনবিভাগ তাহার বলেই শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখে ও জনসাধারণের বিবিধপ্রকার কল্যাণসাধন করে। বিচারবিভাগও আইনসভার তৈয়ারি আইন প্রয়োগ করে। আইনসভা জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত। সেইজন্য ইহা দাবি করিতে পারে যে জনমতের সমর্থন ইহার পিছনে আছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আইনসভার ক্ষমতা শাসনবিভাগ, বিচারবিভাগ ও সংবিধানের নিয়মাবলী দ্বারা খণ্ডিত ও সাম্যভারপ্রাপ্ত (Checks and balances)।

২। **আইনসভার বিবিধ কার্য (Functions of Legislature)**: আইনসভার প্রধান কার্য হইতেছে আইন তৈয়ারি করা। কিন্তু কয়েক শত লোক একত্রে মিলিত হইয়া আইন তৈয়ারি করিতে পারে না। আজকাল রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজজীবন এত জটিল হইয়াছে যে উহার উপযোগী আইন প্রণয়ন করিতে হইলে বিশেষ রকম শিক্ষাদীক্ষা ও অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। যাঁহারা জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত হইয়া আইনসভায় আসেন তাঁহাদের মধ্যে খুব অল্প লোকেরই এরূপ যোগ্যতা আছে। তাই মন্ত্রিপরিষদ-শাসিত রাষ্ট্রসমূহে মন্ত্রীরা যে কোন আইন সম্বন্ধে তাঁহাদের মূল বক্তব্য আইন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ও আইনের খসড়া তৈয়ারি করিতে সিদ্ধহস্ত বিশেষজ্ঞদের নিকট বলেন ও তাঁহারা Bill বা বিধেয়কের খসড়া প্রণয়ন করেন। যে বিষয়ের আইন সেই বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী উহা আইনসভায়

আইনসভা আইন অনুমোদন করে, তৈয়ারি করে না

পেশ করেন। সেখানে স্বপক্ষ ও বিপক্ষ দলের মধ্যে বিতর্ক ও আলোচনার ফলে উহার কিছু রদবদল করিয়া উহা পাশ করানো হয়। তাই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কার্ল জে. ফ্রাইড্‌রক্‌ বলেন যে, প্রতিনিধিমূলক সভার কাজ আজকাল আইন তৈয়ারির উদ্যোগে করা অপেক্ষা জনমতকে শিক্ষিত করা, প্রচার করা এবং পরস্পরবিরোধী মত ও স্বার্থের সমন্বয় বিধান করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ("The political function of representative assemblies today is not so much the initiation of legislation as the carrying on of popular education and propaganda and the integration and co-ordination of conflicting interests and viewpoints")। আইনসভায় বিভিন্ন দলের ও বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিরা থাকেন। কোন প্রস্তাবিত আইন সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত তাঁহারা আইনসভায় প্রকাশ করেন, উহা সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হয় এবং দেশের জনসাধারণ বিষয়টির দোষগুণ সম্বন্ধে অবহিত হন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের উভয় সদনের আইন সম্বন্ধীয় বিবিধ কমিটি প্রস্তাবিত আইনের আলোচনা করিয়া যেমন ভাবে খসড়া করে তাহাই মোটামুটি সামান্য পরিবর্তনসহ কংগ্রেসে গৃহীত হয়।

বিতর্কের সুবিধা

আইনসভাতে শুধু আইন সংক্রান্ত নহে, কিন্তু রাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় নানা বিতর্ক ও আলোচনা হয়। ঐ সব আলোচনা হইতে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। ঘটনার গতি কোনদিকে যাইতেছে তাহাও বুঝা যায়। সেইজন্য আইনসভাকে একটি Forum of debate বলা চলে।

আর্থিক ক্ষমতা

সরকার চালাইতে হইলে অর্থের প্রয়োজন হয়। কোন্ বিষয়ে কত খরচ হইবে তাহার একটি আনুমানিক ধারণা বা এস্টিমেট আইনসভায় পেশ করা হয়। আবার কি উপায়ে ঐ অর্থ সংগ্রহ করা হইবে তাহার প্রস্তাবও উপস্থিত করা হয়। আয়ব্যয়ের এই হিসাব জনসাধারণের অধিকাংশ প্রতিনিধিরা অনুমোদন করিলে তবে উহা কার্যকরী হয়। এই অনুমোদন উপলক্ষে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কার্যকলাপের সম্বন্ধে অনেক তর্ক ও আলোচনা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকারী প্রস্তাবই গৃহীত হয়। কচিৎ কখনও সরকার আইনসভার

সদস্যদের মত অনুসারে সামান্য কিছু পরিবর্তন করিতে স্বীকৃত হন। আইনসভা যে বিষয়ে খরচের জন্য যত টাকা মঞ্জুরী করেন তাহা সত্যসত্যই সেই বিষয়ের জন্য ব্যয় করা হইল কিনা তাহা দেখাও আইনসভার কাজ। কর নির্ধারণে সম্মতি দিতে যাইয়াই ইংলণ্ডে পার্লামেণ্ট ক্রমে শাসন ব্যাপারে কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিল।

সংসদীয় শাসনে (Parliamentary Government) আইনসভার একটি প্রধান কার্য হইতেছে শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রিত রাখা। দৈনন্দিন শাসনকার্য সরকারী কর্মচারীরা চালাইয়া থাকেন। মন্ত্রীরা তাঁহাদিগকে কার্যনীতি সম্বন্ধে নির্দেশ দেন। কোথাও কোন কিছু অন্যায় কার্য বা অত্যাচার ঘটিলে আইনসভা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন। গুরুতর কোন ঘটনা ঘটিলে যে কোন সদস্য অধিবেশন মুলতুবি রাখিবার প্রস্তাব করিতে পারেন। ঐ প্রস্তাব পাশ হইলে মন্ত্রিগণ আইনসভার আস্থা হারাইয়াছেন বুঝিতে হয়। কাজেই মন্ত্রীরা তাঁহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে উহা পাশ হইতে দেন না। তথাপি আইনসভায় শাসনবিভাগের বিরুদ্ধে কোন গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিলে কিংবা কোন কলঙ্ক প্রকাশ করিলে জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হইতে পারে এবং পরের বারে নির্বাচনে ভোট হারাইবার ভয় আছে—এই আশংকায় মন্ত্রিপরিষদ সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকে। কোন মন্ত্রীর অপকার্য প্রমাণিত হইলে তিনি তো পদত্যাগ করিতে বাধ্য হনই, সমগ্র মন্ত্রিপরিষদও পদত্যাগ করে। আমেরিকার কংগ্রেসের উভয় সদনেরই ব্যবসা সম্পর্কীয় ও অনুসন্ধানমূলক কয়েকটি কমিটি আছে। শাসনবিভাগের কর্মচারীদিগকে ঐ সব কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিবার জন্য ডাকা হয়। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের প্রশ্নের মতন তাঁহারা এইরূপ সাক্ষী দেওয়াকে ভয় করিয়া চলেন। রাষ্ট্রপতি সেনেটের সম্মতি লইয়া উচ্চতম কর্মচারীদিগকে নিযুক্ত করেন। অনেক-ক্ষেত্রে সেনেট উচ্চতম কর্মচারীদের নিযুক্তি বিষয়ে যে রাজ্যে কর্মচারীকে নিযুক্ত করিতে হইবে, সেই রাজ্যের প্রতিনিধিদ্বয় সেনেটের পক্ষ হইতে রাষ্ট্রপতিকে যে পরামর্শ দেন তাহা সাধারণতঃ গৃহীত হয়। ইহাকে **Senatorial Courtesy** বলে।

শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ

নিযুক্তির ক্ষমতা

আইনসভা কিছু কিছু বিচারঘটিত কার্যও করিয়া থাকে। ইংলণ্ডের

হাউস অব লর্ডস্‌ সেখানকার আপিল সম্পর্কীয় মামলার উচ্চতম আদালত। পার্লামেণ্ট প্রথম প্রথম অর্থাৎ দ্বাদশ, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ব্যক্তিগত অবিচারের প্রতিকার করিত ; উহা বিচার কার্য হইতেই আইন করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। অন্যান্য রাষ্ট্রের উচ্চতর সদন রাষ্ট্রপতি বা অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তির Impeachment বা মহা অভিযোগের বিচার করিবার অধিকারী। কিন্তু এ যুগে অর্থাৎ গত দেড়শত বৎসরের মধ্যে কেহ কোথাও Impeached হয় নাই।

বিচারের ক্ষমতা

কোন কোন আইনসভা সংবিধান পরিবর্তনে অংশ গ্রহণ করে। সংবিধান পরিবর্তন করিতে হইলে যে বিশেষ নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয় তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট কিন্তু সাধারণ নিয়মেই সংবিধানের পরিবর্তন করিতে পারে।

সংবিধান পরিবর্তন

জাতীয় জীবনের কোন কোন বিশেষ সমস্যা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ ও অনুসন্ধান করিবার জন্য আইনসভা কখনও কখনও কমিশন নিযুক্ত করিয়া থাকে। শিক্ষার মাধ্যম কি হওয়া উচিত, কিভাবে কৃষিকর্ম চালাইলে বেশি উৎপাদন হয়, বিশেষ কোন শিল্পের সম্মুখে কি কি সমস্যা আছে—এই ধরনের নানা বিষয় সম্পর্কে তথ্যমূলক আলোচনা করিয়া শাসনবিভাগকে কার্যনীতি সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া আইনসভার অন্যতম কর্তব্য।

তথ্য সংগ্রহ ও অনুসন্ধান

অধিকাংশ আইনসভার কিছু কিছু নির্বাচনমূলক কার্যও আছে। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের আইনসভার উভয় কক্ষ সম্মিলিতভাবে শাসনপরিষদ নির্বাচিত করে। ভারতের উপরাষ্ট্রপতিও ঐভাবে নির্বাচিত হন। সোভিয়েট ইউনিয়নের আইনসভা বা সুপ্রিম সোভিয়েটের উভয়কক্ষ ৩৩ জন সদস্য লইয়া একটি প্রিসিডিয়াম (Presidium) বা কার্যকরী সমিতি নিযুক্ত করে।

নির্বাচনমূলক কার্য

এইরূপে দেখা যায় যে, আইন তৈয়ারিতে সাহায্য করা, আয়-ব্যয় সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা, শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করা, তথ্য সংগ্রহ করা, বিতর্ক-দ্বারা জনমত গঠন করা, বিচার, নিয়োগ, নির্বাচন ও সংবিধান পরিবর্তনে অংশগ্রহণ করা প্রভৃতি নানাবিধ কার্য আইনসভা করিয়া থাকে।

৩। **আইনসভার সংগঠন ঃ** অধিকাংশ আধুনিক রাষ্ট্রে আইন-সভার দুইটি কক্ষ বা সদন আছে। ইহার মধ্যে একটি জনসাধারণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হয়। ইহাকে প্রথম কক্ষও বলে, নিম্নসদনও বলে। কেবল মাত্র সুইডেনে অপ্রত্যক্ষ ভাবে নির্বাচিত অল্পসংখ্যক সদস্যযুক্ত সদনকে প্রথম কক্ষ বলে, যদিও অন্যান্য দেশে উহার অনুরূপ প্রতিষ্ঠান দ্বিতীয় কক্ষ বা উচ্চ সদন নামে পরিচিত। ইংলণ্ডে এককালে লর্ডদের খুব প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল, তাঁহাদের খাস আইনকক্ষ হাউস অব্ লর্ডসকে তাই উচ্চ সদন বলা হইত। এখন অবশ্য উহার আর উচ্চতার কোন দাবি নাই। তাই উহাকে দ্বিতীয় সদন বলা হয়। দেখাদেখি অন্যান্য দেশের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে নির্বাচিত ও মনোনীত সদনকে উচ্চসদন বা দ্বিতীয় সদন নামে অভিহিত করা হয়।

সংজ্ঞা

আইনসভার প্রথম কক্ষ ভৌগোলিক অঞ্চল হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত। লাস্কীর মতে ইহার সদস্য-সংখ্যা পাঁচ শতের বেশি হওয়া উচিত নহে, কেন না বেশি লোকের মধ্যে ধীরতার সহিত বিচারবিবেচনা করা কঠিন হয়। খুব অল্প সংখ্যক সদস্য হইলে তাঁহারা বিভিন্ন অঞ্চলের ও বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারেন না। রাশিয়াতে প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়নে তিন লক্ষ ব্যক্তি একজন করিয়া প্রতিনিধি প্রথম কক্ষে প্রেরণ করেন। এক ব্যক্তিকে যদি এত অধিক সংখ্যক লোকের প্রতিনিধিত্ব করিতে হয় তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে তাঁহার নির্বাচকদের সহিত কোন ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখা খুব কঠিন হয়। রাশিয়ার প্রথম কক্ষে ৭৫০ জন, ব্রিটেনের ৬২৫ জন, ইতালির ৫৬০ জন, ভারতবর্ষে ৫০৫ জন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ৪৩৬ জন, পশ্চিম জার্মানিতে ৪৫০ জন, সুইট্জারল্যাণ্ডে ২০০ জন ও সুইডেনে ২৩০ জন সদস্য আছেন।

প্রথম সদনের নির্বাচন প্রথা ও সংখ্যা

দ্বিতীয় সদনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বৃহৎ হইতেছে ব্রিটেনের হাউস্ অব্ লর্ডস্। ইহার সদস্যসংখ্যা প্রায় আটশত, কিন্তু একশ দেড়শ'র বেশি সদস্য ইহাতে উপস্থিত থাকেন না। রাশিয়ার দ্বিতীয় সদনে ৬৩০ জন সদস্য আছেন। তাঁহারা রাশিয়ার আঙ্গিক রাজ্য প্রভৃতি হইতে নির্বাচিত হন। আমেরিকার

দ্বিতীয় সদনের সদস্য সংখ্যা

৫০টি আঙ্গিক রাজ্য হইতে দুইজন করিয়া সদস্য সেনেটে প্রেরিত হন। সুইট্জারল্যাণ্ডে দ্বিতীয় সদনে ৪৪ জন মাত্র সদস্য আছেন। প্রত্যেক পূর্ণ ক্যাণ্টন দুইজন করিয়া ও অর্ধ ক্যাণ্টন একজন করিয়া সদস্য প্রেরণ করে। পশ্চিম জার্মানির যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্রে যে দ্বিতীয় সদন আছে তাহাতে আঙ্গিক রাজ্যগুলি তাহাদের জনসংখ্যার অনুপাতে সভ্য প্রেরণ করে; যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন, কোন রাজ্য তিন জনের কম সভ্য পাঠায় না; কুড়ি লক্ষের বেশি যাহাদের জনসংখ্যা তাহাদের চার জন, যাট লক্ষের বেশি জনসংখ্যা থাকিলে ৫ জন সভ্য পাঠান। সেখানকার সবচেয়ে বড় রাজ্যে দেড় কোটি লোক এবং সবচেয়ে ছোট রাজ্যে ১৫ লক্ষ লোক আছে। সেই জন্য এই ব্যবস্থায় বড় রাজ্যের তুলনায় ছোট রাজ্য বেশি সুবিধা ভোগ করে। এখানকার দ্বিতীয় সদনের সভ্যেরা আঙ্গিক রাজ্যের সরকারের প্রতিনিধি এবং সেই সরকার যখন খুসি যাহাকে প্রেরণ করিতে পারে ও প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিতে পারে।

পশ্চিম জার্মানির সাধারণতন্ত্রে দ্বিতীয় সদনের বৈশিষ্ট্য

ভারতবর্ষের দ্বিতীয় সদনেও জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। আসামের মতন ছোট রাজ্য মাত্র ৭ জন প্রতিনিধি প্রেরণ করে, আর উত্তরপ্রদেশের ন্যায় বড় রাজ্য ৩৪ জন পাঠাইবার অধিকারী। ইহার সদস্য সংখ্যা আড়াই শতের বেশি হইতে পারে না; তন্মধ্যে ১২ জন রাষ্ট্রপতির দ্বারা মনোনীত এবং বাকী সকলে রাজ্যগুলির বিধানসভার সদস্যদের দ্বারা অপ্রত্যক্ষরূপে নির্বাচিত হন।

ভারতে দ্বিতীয় সদন

সুইডেনে দ্বিতীয় সদন থাকিলেও উহা প্রথম সদনের সহিত মিলিত হইয়া সম্মিলিত কমিটির সাহায্যে অধিকাংশ কার্য সম্পাদন করে। সুতরাং সেখানে উহা নিতান্ত গতানুগতিকতা অনুসরণ করিয়া অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। বস্তুতঃ সুইডেনে ধনজনিত বৈষম্য বিশেষ নাই বলিয়া সেখানে দ্বিতীয় সদনের বিশেষ প্রয়োজন নাই।

সুইডেনে দ্বিতীয় সদন

নিউজিল্যাণ্ড সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। সেখানে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় সদন বিলোপ করা হইয়াছে এবং তাঁহার ফলে আজ পর্যন্ত কোন অঘটন ঘটে নাই। গ্রীস্, সালভাডোর,

এক সদন যুক্তরাষ্ট্র

পানামা, যুগোস্লাভিয়া, ফিনল্যাণ্ড, রুমানিয়া ও বুলগেরিয়াতে একটি মাত্র সদন আছে।

অনেকে মনে করেন যে, ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ক্ষমতা ও প্রভাব অব্যাহত রাখিবার বিশেষ উদ্দেশ্যে আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষের অস্তিত্ব বজায় রাখা হইয়াছে। এই কথা কতটা সত্য বিচার করিয়া দেখা যাউক।

৪। দ্বিসদনীয় আইনসভার দোষগুণ বিচার ঃ বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনার ফলে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে দুইটি মাত্র সদনের উদ্ভব হইয়াছিল। একদিকে নগরের প্রতিনিধিরা গ্রামাঞ্চলের প্রতিনিধিদের সহিত একত্রে বসা সুবিধাজনক মনে করায় হাউস্ অব কমন্সের উদ্ভব হইয়াছিল। অন্যদিকে নিম্নস্তরের পাদরিরা পার্লামেণ্টে না আসিয়া তাহাদের স্বতন্ত্র সম্মেলনের মাধ্যমে কর দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল এবং উচ্চস্তরের পাদরিরা ও বিশপেরা বংশানুক্রমিক অভিজাতবর্গের সহিত মিলিত হইয়া হাউস্ অব লর্ডস গঠন করিয়াছিল। এরূপ না হইলে সেখানে পাঁচটি কক্ষের উৎপত্তি হইত। স্পেন, পর্তুগাল ও ফ্রান্সে তিন চারটি করিয়া আইনসভার কক্ষ ছিল। সুতরাং দ্বিসদনযুক্ত আইনসভা আকস্মিক ঘটনার ফল। যুক্তি বিচার করিয়া কেহ পরিকল্পনাসহ দুই সদন স্থাপন করে নাই। কিন্তু একবার স্থাপিত হইবার পর অন্যান্য দেশে ইহাকেই স্বাভাবিক ব্যবস্থা বলিয়া ধরা হইয়াছিল।

দ্বিসদনের উৎপত্তি সুপরিকল্পিত নহে আকস্মিক

দুইচারবার ইহার ব্যতিক্রম করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু ফল ভাল হয় নাই। ক্রমওয়েলের সময়ে দ্বিতীয় সদন বিলোপ করা হইয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় চার্লসের সিংহাসনে পুনরাগমনের সঙ্গে সঙ্গে হাউস্ অব লর্ডসকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। আমেরিকায় রাষ্ট্রগুলি যখন সমবায়-রাষ্ট্র (Confederation) গঠন করিয়াছিল তখন একটি মাত্র সদন স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে কংগ্রেসের দুইটি সদন স্থাপন করার ব্যবস্থা করা হয়। ফরাসী বিপ্লবের সময় ১৭৮৯, ১৭৯১ ও ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের সংবিধানে একটিমাত্র সদন ও নেপোলিয়ন বোনাপার্টির কন্‌সালেট্ শাসনব্যবস্থায় চারটি সদন সৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু কোনটিতেই ভালমতো

ইতিহাসের অভিজ্ঞতা কি একসদনকে সমর্থন করে?

কাজ না চলায় ফ্রান্সে দ্বিসদনযুক্ত আইনসভা স্থাপিত হয়। কাজেই দ্বিসদনের সমর্থকেরা বলেন যে, ইতিহাসের অভিজ্ঞতা তাঁহাদের স্বপক্ষে। তাঁহারা আরও বলিতে পারেন যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর ল্যাটভিয়া ও এস্তোনিয়াতে এক সদন স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু দুইটি দেশ স্বাধীনতা বজায় রাখিতে পারে নাই। উহারা এখন সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত। কিন্তু এক সদনের পক্ষপাতীরা জবাবে বলিতে পারেন যে, নিউজিল্যাণ্ড, যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশে একটিমাত্র সদন থাকায় কোন ক্ষতি হয় নাই। তাহার উত্তরে দ্বিসদনবাদীরা বলিবেন এগুলি ছোট ছোট রাষ্ট্র, ইহারা বড় বড় রাষ্ট্রের তাঁবেদার মাত্র ; সুতরাং এরকম রাষ্ট্রে এক সদনের সাফল্য হইতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

উনবিংশ শতাব্দীতে লেকি প্রভৃতি ঐতিহাসিক যখন দ্বিসদনের সমর্থনের জন্য বদ্ধপরিকর হন, তখন হাউস্ অব লর্ডসের ক্ষমতা হাউস্ অব কমন্স অপেক্ষা বিশেষ কম ছিল না। আইন তৈয়ারির ব্যাপারে উভয় সদন সমকক্ষ তো ছিলই, বরং শাসন ও বিচার ব্যাপারে হাউস্ অব লর্ডসের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বেশি ছিল। কিন্তু ১৯১১ খৃষ্টাব্দে হাউস্ অব লর্ডসের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া তাহাকে মাত্র দুই বৎসরের জন্য হাউস্ অব কমন্সের অভিপ্রেত কোন আইন ঠেকাইয়া রাখিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে উহাও কাটিয়া এক বৎসর মাত্র করা হইয়াছে। ভারতীয় সংবিধানে দ্বিতীয় সদনকে আর্থিক কোন বিধেয়ক (Bill) প্রথম বিচার করিবার কিংবা উহাতে কোন পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দ্বিতীয় সদন। উহার ক্ষমতা ও প্রভাব প্রথম সদন অপেক্ষাও বেশি। অন্য সকল রাষ্ট্রেই দ্বিতীয় সদন অপেক্ষাকৃত হীনবল। সুতরাং এক সদন অপর সদনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ভারসাম্য (balance) রক্ষা করিবে দ্বিসদনের সমর্থকদের এই যুক্তি মানিয়া লওয়া যায় না।

হীনবল দ্বিতীয় সদন কি ভারসাম্য রাখিতে পারে ?

বলা হয় যে, একটিমাত্র সদন থাকিলে উহা স্বৈরাচারী হইবে এবং উহাতে যাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইবেন, তাঁহারা সাময়িক উত্তেজনার বশে যদৃচ্ছাচার আইন পাশ করিবেন। এই মত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

আজ কাল সর্বত্র প্রথম সদন জনসাধারণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় সদন সরকার কর্তৃক মনোনীত হয় অথবা অপ্রত্যক্ষরূপে নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা পূর্ণ হয়। সরকার যে দলভুক্ত হন সেই দল হইতে বাছিয়া বাছিয়া লোককে মনোনয়ন দেওয়া হয়। মনোনীত ব্যক্তিরা সেই দলের নির্দেশ অনুসারেই ভোট দিয়া থাকেন। যদি প্রথম দ্বিতীয় সদনের সদস্যেরা একই ভাবে দলের প্ররোচনায় ভোট দেন তাহা হইলে আর দ্বিতীয় সদন রাখার সার্থকতা কোথায়? তা ছাড়া ইহাও বিবেচনা করা প্রয়োজন যে দ্বিতীয় সদন অপ্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইলে, উহার সদস্যেরা যদি প্রথম সদনের বিরোধিতা করেন তাহা হইলে তাঁহাদের আচরণ গণতন্ত্রবিরোধী হইবে।

একসঙ্গে কি স্বৈরাচারী হয়?

দ্বিসদনের সমর্থকেরা বলেন যে দ্বিতীয় সদনের হাতে প্রথম সদনের প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যানের ক্ষমতা না থাকিলেও তাঁহাদের বিরোধিতার দরুণ বেশ কিছুকাল অতিবাহিত হয়। এই সময়ের মধ্যে সাময়িক উত্তেজনা স্তিমিত হইয়া যায়। দ্বিতীয় সদনের সদস্যেরা প্রস্তাবের বিপক্ষে যে সব যুক্তিতর্ক উঠাইয়া থাকেন লোকে সংবাদপত্রের মারফৎ তাহা পড়িয়া নিজেদের মতামত ঠিক করিতে পারে। মোটের উপর দ্বিতীয় সদন থাকার দরুণ ধীরে সুস্থে সংযতভাবে বিচার করা সম্ভব হয়। ইহার উত্তরে লাস্কী বলেন যে, দ্বিতীয় সদন না থাকিলেও আইন তৈয়ারির যে সব ধাপ আছে তাহা অতিক্রম করিতে যথেষ্ট সময় লাগে। তা ছাড়া আইনসভার বাহিরেও চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা প্রবন্ধাদি লিখিয়া প্রস্তাবিত আইনের দোষত্রুটি দেখাইয়া থাকেন। সুতরাং একটি দ্বিতীয় সদন খাড়া করিয়া কি লাভ? বরং উহার সদস্যদের ভাতা, কর্মচারীদের বেতন প্রভৃতি বাবদ প্রচুর খরচ হয়।

ধীরেসুস্থে বিশেষ বিবেচনার সুবিধা

দ্বিসদনের পক্ষে বলা হয় যে, দুইটি কক্ষ যদি বিভিন্ন সময়ে অর্থাৎ দুই তিন বৎসরের তফাতে নির্বাচিত হয়, তাহা হইলে ৪।৫ বৎসরের পর একবার মাত্র নির্বাচনের ফলে নির্বাচিত ব্যক্তিদের অপেক্ষা ঐব্যবস্থায় জনমত বেশি বাস্তবরূপে প্রতিফলিত হইবে।

জনমতের প্রতিফলন

জনমত নিরন্তর পরিবর্তিত হইতেছে। সুতরাং বিভিন্ন কক্ষ বিভিন্ন সময়ে নির্বাচিত হইলে জনমতের যথার্থ স্বরূপ বুঝিবার সুবিধা হইবে। এই যুক্তি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নহে। প্রথম সদনেও মাঝে মাঝে সভ্যপদ শূন্য হইলে দরুণ মধ্যকালীন নির্বাচন (bye-election) হয় এবং তাহাতে জনমতের হাওয়া কোনদিকে যাইতেছে তাহা বুঝা যায়।

এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে দ্বিসদনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করিলেও যুক্তরাষ্ট্রে ইহা থাকা অবশ্য প্রয়োজন বলিয়া অনেকে মনে করেন। কেন না যুক্তরাষ্ট্র কতকগুলি ভূতপূর্ব রাষ্ট্র লইয়া গঠিত হয় এবং তাহারা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করিবার পূর্বে শর্ত করিয়া লয় যে, তাহাদের জনবল ও ধনবলের অপেক্ষা না রাখিয়া দ্বিতীয় সদনে প্রত্যেকের সমান সখ্যক সদস্য প্রেরণের ক্ষমতা থাকিবে। ঐ দ্বিতীয়সদন তাহাদের প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষণ করিবে।

যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিসদনের প্রয়োজনীয়তা

এই যুক্তি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, সুইট্জারল্যাণ্ড প্রভৃতির ক্ষেত্রে একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। সোভিয়েট ইউনিয়নে ষোলটি Union Republic-এর প্রত্যেকটির ২৫ জন করিয়া প্রতিনিধি দ্বিতীয় সদনে প্রেরণের ক্ষমতা আছে। কিন্তু পশ্চিম জার্মানির যুক্ত-রাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্রে ও ভারতবর্ষে দ্বিতীয় সদনের সদস্য-প্রেরণ ক্ষমতা কিছু জনবলের উপর খানিকটা নির্ভর করে। শুধু তাই নহে; দ্বিতীয় সদনেও প্রতিনিধিরা দলের নির্দেশমত ভোট দিয়া থাকেন। তাঁহারা নিজের স্বার্থ অপেক্ষা দলের স্বার্থ বজায় রাখিতে অধিক মনোযোগী হন। অঞ্চলের স্বার্থ সংবিধানে লিখিত ক্ষমতা বণ্টনের দ্বারা যতটা সম্ভব সংরক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় সদন থাকুক বা না থাকুক অধুনা আর্থিক পরিকল্পনার ও জনকল্যাণমূলক নীতি অবলম্বনের ফলে আঙ্গিক রাজ্যের ক্ষমতা সর্বত্র সংকুচিত হইতেছে। যাহা হউক সংবিধানে লিখিত ক্ষমতা বণ্টন ও বিচারালয়ের নিরপেক্ষ বিচারই আঙ্গিক রাজ্যগুলির স্বার্থ সংরক্ষণের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া লাস্কী মনে করেন।

দলের প্রভাবে দ্বিসদনের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস

উপরে দ্বিসদনের স্বপক্ষে যে সকল যুক্তির কথা বলা হইল তাহার প্রত্যেকটিই খণ্ডন করা যায়। বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের আঙ্গিক

রাজ্যসমূহের মধ্যে কয়েকটিতে দ্বিসদন রাখিবার বিশেষ সার্থকতা দেখা যায় না। অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পরিচালনার ভার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। তথাপি দ্বিতীয় সদন লোপ করিয়া দিবার প্রস্তাব কোথাও পাশ হয় নাই। তাহার কারণ মন্ত্রিসভা গঠনের সময় কোন কোন শান্তিপ্রিয় অথচ সুবিজ্ঞ ব্যক্তিকে দ্বিতীয় সদনের সদস্যরূপে মনোনীত করিয়া বা বিধানসভার দ্বারা নির্বাচিত করাইয়া মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করা সম্ভব হয়। এইরূপ ব্যক্তিরা প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ঝামেলা পোহাইতে রাজী হন না অথচ তাঁহাদের সংযোগিতা মন্ত্রিসভার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। এই যুক্তি এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার দ্বিতীয় সদন সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

মন্ত্রিসভা গঠনে দ্বিতীয় সদনের প্রয়োজনীয়তা

দ্বিতীয় সদনের পক্ষে আর একটি প্রবল যুক্তি হইতেছে এই যে আজকাল আইনসভার কার্য অসম্ভব রকম বাড়িয়া গিয়াছে। প্রথম সদনের পক্ষে ধীরে সুস্থে কোন বিষয়ে বিচার করা কঠিন। যে সকল বিষয়ে এখনও আইন তৈয়ারি করিবার প্রয়োজন হয় নাই, অথচ ভবিষ্যতে হইতে পারে সে সকল বিষয়ে আলোচনা চালাইবার উপযুক্ত ক্ষেত্র হইতেছে দ্বিতীয় সদন। উহাতে প্রবীণ ব্যক্তিদের নির্বাচন ও মনোনয়নের ব্যবস্থা থাকে। তাঁহাদের মতামত গ্রহণ করা হউক বা না হউক উহা শুনিবার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

আইনসভার কার্যবৃদ্ধি

যাঁহারা বলেন যে দ্বিতীয় সদন ধনীদের ও পুঁজিপতিদের কায়েমি স্বার্থ সংরক্ষণের উপায় মাত্র তাঁহাদের কথা নির্বিচারে মানিয়া লওয়া যায় না। হাউস্ অব লর্ডস্ সম্বন্ধে এ উক্তি কিছুটা সঙ্গত হইলেও, আমেরিকার সেনেট, এমন কি ভারতের রাজ্যসভা সম্বন্ধে উহা প্রযোজ্য নহে। ভারতে ধনীদের একাধিক ভোট দেওয়া হয় নাই এবং দ্বিতীয় সদনের নির্বাচনের সময় ভোট দিবার বা ভোটপ্রার্থী হইবার জন্য কোন আর্থিক যোগ্যতার (Monetary qualification) উল্লেখ করা হয় নাই। বাস্তবপক্ষে বেশির ভাগ রাজ্যহারা রাজারা ও জমিদারি-বিহীন জমিদার নন্দনেরা যোগাড়যন্ত্র করিয়া লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই দ্বিতীয় সদনে নির্বাচিত হইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় সদন ইংলণ্ড ছাড়া অন্য কোথাও কায়েমী স্বার্থের ধারক নহে

দ্বিতীয় সদনের কার্যকারিতা যতই থাকুক বা না থাকুক দলগত কারণে উহার অস্তিত্ব বজায় রাখা প্রয়োজন। ইংলণ্ডে অবশ্য হাউস্ অব লর্ডস্ সংরক্ষণশীল দলের এক বিরাট ঘাঁটি। কিন্তু অন্য সব দেশে দলপতিরা দলের ভাল ভাল কর্মীদের বা সমর্থকদের পুরস্কার হিসাবে দ্বিতীয় সদনের সদস্যপদ প্রদান করেন। তাঁহারা ইহার বিলোপ সাধন করিতে রাজী নহেন। ফরাসী বিপ্লবের সমকালে আবি সিয়ে (Abbe Seiyes) বলিয়াছিলেন যে দ্বিতীয় সদন যদি প্রথম সদনের বিরোধিতা করে তবে উহা অনিষ্টকর এবং যদি উহার সহিত একমত হয় তাহা হইলে নিরর্থক। মহামতি বেন্থাম হিতবাদের দৃষ্টিকোণ হইতে বলিয়াছেন যে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের ভোট লইয়া আইনসভার সদস্য নির্বাচন করা উচিত। উহাতে একটি সদনই যথেষ্ট। প্রথম সদন জনসাধারণের সাধারণ স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে, সুতরাং দ্বিতীয় সদনও যদি তাহাই করিতে যায় তবে উহা নিরর্থক হয়, আর যদি বিশেষ কোন স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে তবে উহা অন্যায়। সুতরাং তাঁহার মতে দ্বিতীয় সদন অপ্রয়োজনীয়, নিরর্থক এবং অকেজোর চেয়েও খারাপ (needless, useless and worse than useless)। এই সব যুক্তি কিন্তু এ পর্যন্ত সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত হয় নাই। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক বড় রাষ্ট্রে দ্বিতীয় সদন বর্তমান আছে।

আবি সিয়ে ও বেন্থামের 'ডাইলেমা' স্বীকৃত হয় নাই।

৫। দ্বিতীয় সদনের ক্ষমতা ঃ সকল দ্বিতীয় সদনের ক্ষমতা একরকম নহে। একদিকে ইংলণ্ডের হাউস্ অব লর্ডস্ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল দ্বিতীয় কক্ষ ; অন্যদিকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট সবচেয়ে ক্ষমতাশালী দ্বিতীয় সদন। এই দুই প্রান্তের চরম অবস্থার মাঝামাঝি আছে জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্রের ও ভারতের দ্বিতীয় কক্ষ। কানাডার দ্বিতীয় সদনের সদস্যেরা যাবজ্জীবনের জন্য নির্বাচিত হন বলিয়া তাঁহাদের রাজনৈতিক গুরুত্বও নাই, সামাজিক মর্যাদাও নাই। উহাকে বৃদ্ধ ও ক্লান্ত রাজনৈতিক কর্মীদের পিঁজরাপোল বলা হয়।

কানাডার সেনেট

১৮৩২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত ইংলণ্ডে হাউস্ অব লর্ডসের যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু যখন হইতে জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধিরা হাউস্

অব কমন্সে আসিতে আরম্ভ করিলেন তখন হইতে দাবি উঠিল যে লর্ডস সভাকে সংহার কর বা সংস্কার কর। কেননা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যাহা স্থির করিবেন বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার বলে অধিষ্ঠিত লর্ডেরা তাহা নাকচ করিয়া দিবেন ইহা সহ্য করা যায় না। অনেক আলোচনার ও বিবাদ-বিসম্বাদের পর ১৯১১ খৃষ্টাব্দের পার্লামেণ্ট অ্যাক্‌টের দ্বারা স্থির হয় যে টাকা-পয়সার কথা যে সব বিধেয়কে (Money Bill) আছে অর্থাৎ কিভাবে কোন্ খাতে কত খরচ হইবে এবং কি ভাবে কর নির্ধারণ করা হইবে সে সম্বন্ধে হাউস্ অব লর্ডসের কোন ক্ষমতাই থাকিবে না। এ বিষয়ে কমন্সসভা যাহা ঠিক করিয়া দিবেন তাহাই লর্ডসভাকে মানিতে হইবে; যদি তাঁহারা কোন আপত্তি বা পরিবর্তন করেন তাহা গ্রাহ্য হইবে না। লর্ডসভায় Money Bill আসিবার পর লর্ডগণ বড়জোর একমাস কাল দেরি করাইয়া দিতে পারেন। কোন্ বিষয়টি Money Billর অন্তর্গত কোন্ বিষয়টি নহে সে সম্বন্ধে কমন্স-সভার সভাপতি বা Speaker-এর অভিমত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। ইহার অর্থ এই যে লর্ডসভা বলিতে পারিবেন যে কোন বিশেষ বিষয় Money Bill-য়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল না। সাধারণ আইন সম্বন্ধে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের বিধি অনুসারে স্থির হয় যে লর্ডস্‌সভা উহার সংশোধন ও পরিবর্তন করিতে পারিবে; কিন্তু ঐ সব পরিবর্তনের প্রস্তাব যদি কমন্স-সভার পছন্দ না হয় অথচ তাহারা নিজেদের প্রস্তাবমত আইন পাশ করিতে বদ্ধপরিকর হয় তাহা হইলে তাহাদিগকে দুই বৎসরের কম সময়ের মধ্যে তিনটি ক্রমিক অধিবেশনে তিনবার সম্পূর্ণভাবে উহা পাশ করিতে হইবে। এরূপ করিলে লর্ডসভার আপত্তি সত্ত্বেও ঐ বিধেয়ক (Bill) রাজাজ্ঞা লাভ করিয়া আইনরূপে পরিণত হইবে। ইহাতে লর্ডসভা কেবল যে দুই বৎসরের জন্য যে কোন আইনের প্রস্তাবকে প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা পাইয়াছিল তাহা নহে, কমন্সসভার জীবনের শেষ দুই বৎসরে বিতর্কমূলক কোন বিধেয়ক আনিতে পারিত না। লর্ডসভার এরূপ ক্ষমতার ফলে 'লেবার' দল ক্ষমতায় আসীন হইয়া প্রগতিমূলক কোন সংস্কার সাধন করিতে পারিত না, কেননা ঐরূপ সংস্কার প্রায়শই লর্ডদের কায়েমী স্বার্থের বিরোধী হইত। তাই ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে 'লেবার'দল যখন সর্বপ্রথম নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ

ইংলণ্ডের লর্ডসভার ক্ষমতা হ্রাসের ইতিহাস

করিল তখন হইতে লর্ডসভার ক্ষমতা আরও সংকোচন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার ফলে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে যে আইন পাশ হইল তাহাতে লর্ডসভার মুলতবি রাখার ক্ষমতাকে দুই বৎসর হইতে কমাইয়া এক বৎসরে পরিণত করা হইল। কমন্সসভা তিনটি অধিবেশনের পরিবর্তে দুইটি অধিবেশনে কোন প্রস্তাব তিনবার এক বৎসরের মধ্যে পাশ করিলেই উহা লর্ডসভার বিরোধিতা সত্ত্বেও আইন বলিয়া রাজসম্মতি লাভ করিবে স্থির হইল। এইভাবে এখন লর্ডসভা কমন্সসভার চেয়ে অনেক বেশি হীনবল হইয়া পড়িয়াছে।

আমেরিকার সেনেটসভার মতন শক্তিশালী দ্বিতীয় সদন পৃথিবীতে আর নাই। ইহা আকারে ক্ষুদ্র, ইহার সভ্যসংখ্যা মাত্র একশত। সভ্যদের মধ্যে অধিকাংশই প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি। অনেকেই প্রথম সদনে কিছুকাল প্রতিনিধিত্ব করিবার পর সেনেটে উন্নীত হইয়াছেন। প্রথম সদনের সভ্যেরা মাত্র দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। সেনেটের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য প্রতি দুই বৎসর পর পর নির্বাচিত হন, সেই জন্য ইহা কোন সময়েই নূতন ও অনভিজ্ঞ সদস্যের দ্বারা পূর্ণ থাকে না। সেনেটের কার্যবিধিও এরূপ যে ইহাতে পরিপূর্ণ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রথম সদনে পূর্বনির্ধারিত সময়সরণি অনুসারে বিতর্ক বন্ধ (Closure) করিয়া দেওয়া হয়। এইসব কারণে এবং সংবিধানে প্রদত্ত শক্তিবলে সেনেটের ক্ষমতা ও প্রভাব এত বেশি হইয়াছে।

আমেরিকার সেনেটের প্রভাবের কারণ

সংবিধানে বলা হইয়াছে যে রাজস্ব সম্পর্কীয় বিল প্রথম সদনে আগে উপস্থিত করিতে হইবে, তাহার পর উহা সেনেটে আসিবে এবং সেনেট উহা ইচ্ছামত পরিবর্তন ও সংশোধন করিতে পারিবে। অনেক সময় সেনেট ঐ ধরনের বিলের এমন আমূল পরিবর্তন করে যে উহার শীর্ষকটি ছাড়া আর কিছুই অপরিবর্তিত থাকে না। সেইজন্য সংবিধানের নিষেধ সত্ত্বেও এইভাবে কার্যকালে সেনেট প্রায়শই রাজস্ব সম্পর্কিত বিলও প্রথমে আলোচনা করে। ব্যয় বিষয়ে বিল উভয় সদনের যে কোন কক্ষে প্রথমে উপস্থিত করা যায়। অন্যান্য সকল প্রকার বিলের উপর উভয় সদনের সমান ক্ষমতা।

অর্থ সম্বন্ধীয় ক্ষমতা

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটের এমন তিনটি ক্ষমতা আছে যাহা প্রথম সদনের নাই। প্রথমতঃ রাষ্ট্রপতি যখন উচ্চতম পদগুলিতে লোক নিযুক্ত করেন তখন সেনেটের সম্মতি গ্রহণ করেন ; সেনেটের সম্মতি বলিতে বস্তুতঃ যে রাজ্যে লোক নিযুক্ত করা হইবে সেই রাজ্যের প্রতিনিধিদ্বয়ের সম্মতি বুঝায়। ইহার ফলে সেনেটের প্রভাবপ্রতিপত্তি খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বিদেশের সহিত কোন সন্ধি করিতে হইলে উহাতে সেনেটের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। বৈদেশিক নীতি বিষয়ক সেনেটের যে কমিটি আছে তাহার প্রভাব বৈদেশিক সেক্রেটারীর সদৃশ। কিন্তু রাষ্ট্রপতিরা সন্ধি সম্বন্ধে কাথাবার্তা আরম্ভ করিয়াই ঐ কমিটির পরামর্শ গ্রহণ করেন। উহার সম্মতি থাকিলে সন্ধিতে সেনেটের অনুমোদন লাভ করা সহজ হয়। রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন আগে সেনেটের সঙ্গে পরামর্শ করেন নাই বলিয়া সেনেট তাঁহার পরিকল্পিত League of Nationsয়ের সভ্য হইতে রাজী হয় নাই। তৃতীয়তঃ সেনেটে মহা অভিযোগ বা Impeachment-য়ের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার করে। এ পর্যন্ত কিন্তু সেনেটের এই শক্তি ব্যবহার করিবার সুযোগ হয় নাই। তবুও এই শক্তি তাহার তূণে থাকায় সেনেটের প্রতি লোকের সম্ভ্রম বৃদ্ধি পায়।

তিনটি বিশেষ ক্ষমতা

পশ্চিম জার্মানির সাধারণতন্ত্রের দ্বিতীয় সদন প্রথম সদনের সহিত আর্থিক বিষয়ের ও সাধারণ সম্বন্ধীয় আইন পাশ করিবার সমান ক্ষমতা ভোগ করে। কিন্তু শাসনবিভাগ কেবল মাত্র প্রথম সদনের নিকট দায়ী। তথাকার যুক্তরাষ্ট্রের কতকগুলি প্রশাসন বিষয়ক (administrative) প্রশ্নে দ্বিতায় সদনের সম্মতি লওয়া প্রয়োজন হয়।

জার্মানির দ্বিতীয় সদন

ভারতবর্ষের দ্বিতীয় সদন বা রাজ্যসভার অর্থ-সংক্রান্ত বিধেয়ক (Bill) প্রথমে আলোচনা করিবার বা উহাতে কোন পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা নাই। হাউস্ অব্ লর্ডস্ যেখানে এক মাস ধরিয়া উহা বিবেচনা করিতে পারে, রাজ্যসভা মাত্র চৌদ্দ দিন উহা দেরি করাইয়া দিতে পারে। কেবিনেট রাজ্যসভার নিকট দায়ী নহে। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে উহা লোকসভার সহিত সমান অধিকার ভোগ করে। সেই হিসাবে লর্ডসভার চেয়ে ইহার ক্ষমতা বেশি।

ভারতবর্ষের

ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে সেনেটকে পূর্বাপেক্ষা বেশি শক্তিশালী করা হইয়াছে। কিন্তু অর্থ সংক্রান্ত বিধেয়ক প্রথম সদনে প্রস্তাব করা হয়।

ফ্রান্সের

কেবিনেট প্রথম সদনের আস্থা যতদিন ভোগ করে, ততদিন ক্ষমতায় আসীন থাকিতে পারে বটে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সেনেটের নিকট আস্থাসূচক প্রস্তাব পেশ করিতে পারেন। সেনেট যদি উহা অগ্রাহ্য করে তাহা হইলে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিবে কিনা তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই।

রাশিয়ার দ্বিতীয় সদন

সোভিয়েট ইউনিয়নে দ্বিতীয় সদনের ক্ষমতা সকল বিষয়েই প্রথম সদনের তুল্য। আকারেও উভয় সদন প্রায় সমান। সুইট্জারল্যাণ্ডের দ্বিতীয় সদন প্রথম সদনের সঙ্গে সমান ক্ষমতার অধিকারী।

৬। উভয় সদনের মধ্যে মতবিরোধের সামঞ্জস্য করা হয় কিরূপে? (How are Deadlocks avoided ?) যেখানে দ্বিতীয় সদনের ক্ষমতা সকল বিষয়েই প্রথম সদন অপেক্ষা কম, সেখানে মতবিরোধের সমস্যা গুরুতর নহে। ইংলণ্ডে লর্ডসভা যদি কমন্স সভার অভীষ্ট বিধেয়ক অগ্রাহ্য করিতে বদ্ধপরিকর হয়, তাহা হইলেও কমন্স সভা এক বৎসর পরে উহার আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় প্রস্তাবকে আইনে পরিণত করিতে পারে।

ইংলণ্ডে

আমেরিকায়

আমেরিকার প্রথম সদন যদি দ্বিতীয় সদনের সহিত কোন আইন সম্পর্কে একমত না হইতে পারে, তাহা হইলে প্রত্যেক সদন হইতে তিন জন করিয়া সদস্য এক সম্মেলনে মিলিত হইয়া আপোষের চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত একটা মিটমাট হইয়াই যায়। তবে অনেক ক্ষেত্রে সেনেটেরই মত বজায় থাকে।

ফ্রান্সে

ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে উভয় সদনের মধ্যে মতের অনৈক্য হইলে প্রধানমন্ত্রী প্রত্যেক সদন হইতে সমসংখ্যক সদস্য লইয়া এক কমিটি গঠন করেন ও তাহার উপর মিটমাট করিবার ভার দেন। যদি আপোষ সম্ভব হয়, তাহা হইলে উহার শর্তানুযায়ী বিধেয়কটি পরিবর্তন করিয়া উভয় সদনের সামনে পেশ করা হয়। কিন্তু মিটমাট না হইলে কিংবা কোন এক সদন উহা না মানিলে প্রধানমন্ত্রী

প্রথম সদনকে (National Assembly) উহা পাশ করিতে বলেন এবং পাশ হইলে উহা আইনে পরিণত হয়।

সোভিয়েট রাশিয়াতে দুই সদনের মতের অমিল হইলে প্রথমে উভয় সদন হইতে সমান সংখ্যক সদস্য লইয়া একটি কমিশন নিযুক্ত করা হয়। উহাতে যদি বিরোধের মীমাংসা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক সদন পুনরায় ঐ বিষয় বিবেচনা করে। তাহাতেও মতের মিল না হইলে প্রেসিডিয়াম আইনসভাকে ভঙ্গ করিয়া নবনির্বাচনের ব্যবস্থা করেন।

রাশিয়ায়

সুইট্‌জারল্যাণ্ডে উভয় সদনের বিরোধ তাঁহাদের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে মিটমাট করিয়া লওয়া হয়। এখানে কিন্তু দ্বিতীয় সদন প্রায়ই প্রথম সদনের মতে শেষ পর্যন্ত মত দেয়।

সুইট্‌জারল্যাণ্ডে

ভারতবর্ষে রাজ্যসভা ও লোকসভার মধ্যে কোন সাধারণ বিষয়ের বিধেয়ক (Bill) লইয়া মতভেদ দেখা দিলে উভয় সদনের এক সম্মিলিত অধিবেশন আহ্বান করা হয়। উহাতে লোকসভার সদস্য সংখ্যা রাজ্যসভা অপেক্ষা দ্বিগুণেরও বেশি হওয়ায় লোকসভার মতই জয়ী হইবার সম্ভাবনা। উভয় সদনেই কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত কোন সম্মিলিত অধিবেশন আহ্বান করিবার প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু যৌতুক নিবারণ বিধেয়কের সম্বন্ধে উভয় সদনের মধ্যে মতের অনৈক্য দূর করিবার জন্য সর্বপ্রথম ঐরূপ অধিবেশন ডাকা হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে সম্মিলিত অধিবেশন

অনুশীলন

১। Discuss the case for and against a second chamber in the organisation of a federal legislature (1963).

যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা দ্বিসদনযুক্ত হইলে ভাল হয়। দ্বিতীয় সদন ধনবল ও জনবলের অপেক্ষা না রাখিয়া প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রকে সমানসংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণের ক্ষমতা দেয়; কিন্তু কানাডা ও ভারতবর্ষের সংবিধান

তাহা দেয় নাই। দ্বিতীয় সদন সদস্যরাষ্ট্রদের বিশেষ বিশেষ স্বার্থ রক্ষা করে বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু গত দেড় শত বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যাইতেছে যে দ্বিতীয় সদন সদস্য রাষ্ট্রদের স্বার্থরক্ষায় মনোযোগী হয় নাই। দলের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় সংখ্যাগুরু দলের নায়কেরা যে সিদ্ধান্ত করেন তাহা উভয় সদনই মানিয়া লয়। দ্বিতায় সদনে সদস্যসংখ্যা কম থাকায় ধীরভাবে বিবেচনা করার সুবিধা হয়।

কিন্তু দ্বিতীয় সদন বজায় রাখিতে প্রচুর খরচ হয়। কখনও কখনও দ্বিতীয় সদন অনর্থক কাজে বাধা দেয়। তাড়াতাড়ি কোন কিছু পাশ করাইয়া লওয়া যায় না। ইহাতে সুবিধা অসুবিধা দুইই আছে।

2. What are the arguments for and against the bicameral system of legislature? What functions and powers should a second chamber have?

চতুর্থ ও পঞ্চম প্রকরণ দেখ।

3. If all the means that have been use to secure in the work of legislation, a due amount of caution and reflection, the most improtant is the division of the legislature into two chambers. Explain and discuss.

চতুর্থ প্রকরণের পঞ্চম অনুচ্ছেদ হইতে শেষ পর্যন্ত দেখ।

নির্বাচন ও প্রতিনিধিত্ব

১। প্রতিনিধিত্বের স্বরূপ ও নির্বাচকের কার্যঃ প্রাচীন গ্রীস ও রোমে প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রথা ছিল না। গ্রীসের রাষ্ট্রগুলি নগর-রাষ্ট্র নামে পরিচিত ছিল এবং উহার নাগরিকেরা একস্থানে সম্মিলিত হইয়া শাসন ও বিচার সংক্রান্ত সমস্ত কার্য নির্বাহ করিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রুশো প্রতিনিধিত্বের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বলেন যে, নাগরিকেরা নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে না যাইয়া যেমন ভাড়াটে সৈন্য দিয়া যুদ্ধ করাইলে তাহাদের নিকট স্বাতন্ত্র্য হারান, তেমনি তাঁহারা নিজেরা সভায় না যাইয়া প্রতিনিধি পাঠাইলে প্রতিনিধিরা লাভের লোভে দেশকে বেচিয়া দিতে পারে। তিনি আরও বলেন, যে আইন লোকেরা ব্যক্তিগতভাবে স্বীকার করে না তাহা অবৈধ, তাহা আইন বলিয়াই গণ্য হইতে পারে না "Every law which the people in person have not ratified is invalid ; it is not a law." রুশো সুইট্জারল্যাণ্ডে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন যে তিনি অপ্রত্যক্ষ গণতন্ত্রকে মোটেই আমল দেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন—""The moment a people allows itself to be represented ; it is no longer free. It no longer exists."

প্রতিনিধিত্বের বিরুদ্ধে রুশোর মত

জনবহুল বৃহৎ রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে প্রতিনিধিত্বের সাহায্য লওয়া ছাড়া উপায় নাই। সকলে মিলিয়া প্রত্যক্ষ-ভাবে সরকারী কাজে অংশ গ্রহণ করা অসম্ভব। তাই প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিক অথবা অধিকাংশ নাগরিক সরকারী ব্যাপারে যে ক্ষমতার অধিকারী তাহা তাঁহাদের সুপ্রকাশিত সম্মতি লইয়া তাঁহাদের পক্ষ হইতে যাঁহারা ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগকে প্রতিনিধি বলে। প্রতিনিধিরা যে কাজে মত দিবেন, তাহা সকলের মত বলিয়া ধরিতে হইবে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে একজন জার্মান পণ্ডিত প্রতিনিধিত্বের সংজ্ঞা নির্ণয় করিতে যাইয়া ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন—

কিন্তু প্রতিনিধি না হইলে আধুনিক গণতন্ত্র চলে না

Representation is the process through which the influence which the entire citizenry or a part of them have upon governmental action is, with their expressed approval exercised on their behalf by a smaller number among them, with binding effect upon those represented.—Robert Von Mohl.

ধরা যাক্, একটি নির্বাচন ক্ষেত্রে একলক্ষ ভোটার আছে এবং তাঁহাদের ষাট হাজার ভোটার ভোট দিতে গিয়াছিলেন। ৫ জন প্রতিনিধির মধ্যে একজন কুড়ি হাজার, একজন ষোল হাজার, একজন চৌদ্দ হাজার, একজন ছয় হাজার ও একজন চার হাজার ভোট পাইলেন। যে ব্যক্তি কুড়ি হাজার ভোট পাইয়াছেন তিনিই নির্বাচিত হইলেন। ঐ নির্বাচনক্ষেত্রের এক লক্ষ ভোটারের তিনি প্রতিনিধি হইলেন, যদিও মাত্র একপঞ্চমাংশ ভোটার তাঁহাকে সমর্থন করিয়াছেন। আইন-কানুন প্রভৃতি সকল বিষয়ে তাঁহার সম্মতিকে ঐ নির্বাচন ক্ষেত্রের এক লক্ষ ভোটারের সম্মতি বলিয়া ধরা হয়। এটিকে নিতান্ত কাল্পনিক উদাহরণ বলা চলে না। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনের সময় পাঞ্জাবের বিধানসভার একটি নির্বাচন কেন্দ্রে ১২ জন প্রার্থী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ভোট এমনভাবে বিভক্ত হইয়াছিল যে সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট যিনি পাইয়াছিলেন তিনি প্রদত্ত ভোটের এক-নবমাংশ মাত্র পাইয়া নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

প্রতিনিধির স্বরূপ

নির্বাচকেরা প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে বা আইন তৈয়ারির ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন না বটে, কিন্তু গণতান্ত্রিক বিধানে তাঁহাদিগকেই সমস্ত ক্ষমতার আদিম উৎস বলিয়া ধরা হয়। সেইজন্য প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁহাদিগকে বিশেষ ধীরতা ও বিবেচনার সহিত ভোট দেওয়া কর্তব্য। কয়েক বৎসর বাদে একবার ভোটের সময় ভোট দিয়া আসিলেই তাঁহাদের সকল কর্তব্য শেষ হইল তাহা নহে। যে রাষ্ট্রের নাগরিকেরা ভোট দেওয়া ছাড়া রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অন্য কোন কিছু করেন না, তাঁহাদের পক্ষে বেশি দিন গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা উপভোগ করা সম্ভব হয় না। কেননা তাঁহাদের ঔদাসীন্যের সুযোগ লইয়া রাজনৈতিক মতলববাজেরা নিজেদের স্বার্থ হাসিল

নির্বাচকের কাজ শুধু ভোট দেওয়া নহে

করে। সুতরাং নির্বাচকের কর্তব্য হইতেছে তাঁহাদের প্রতিনিধিদের কার্যকলাপের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা, আইনসভার ও শাসকমণ্ডলীর কার্য সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া উহার উপযোগিতা কতদূর তাহা সংবাদপত্রের মাধ্যমে ও সামাজিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে প্রকাশ করা।

দল সংগঠনের প্রয়োজন

নির্বাচকেরা একক বা বিচ্ছিন্নভাবে এই কার্য করিলে তাহা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় না। তাঁহারা যদি কোন সংস্কার সাধন করিতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে দলবদ্ধ হইতে হইবে। বহুলোকের সম্মিলিত দাবি সহজে উপেক্ষা করা যায় না।

২। সার্বজনীন ভোটের অধিকার (Right of universal franchise): ভোট দিবার অধিকার কাহার হস্তে ন্যস্ত রাখা উচিত তাহা লইয়া প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হইবার আগে পর্যন্ত তুমুল তর্কবিতর্ক চলিত। কেন না ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় সকল রাষ্ট্রেই ভোটের অধিকার খুব কম সংখ্যক লোককে দেওয়া হইয়াছিল। গণতন্ত্রে সর্বাপেক্ষা অগ্রণী ইংলণ্ডে ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ঐ তারিখ পর্যন্ত কোন নারী ভোটের অধিকার পান নাই। ইংলণ্ডে প্রাপ্তবয়স্ক অবিবাহিত পুত্র পিতামাতার সহিত এক সংসারে বাস করিলে ভোট দিতে পারিতেন না। যাঁহারা কোন পরিবারে ভৃত্যরূপে কাজ করিতেন তাঁহাদিগকেও ভোট হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছিল।

সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রথম মহাযুদ্ধের পরে স্বীকৃত হইয়াছে

প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের ভোট দিবার অধিকার থাকিলেও দেখা যায় যে, দেশের মধ্যে যত লোক বাস করে তাহার মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশের কিছু কম বা কিছু বেশি লোক ভোটার তালিকায় স্থান পায়। ইংলণ্ডে এখন শতকরা ৬৯ জন ভোট দিতে পারে। ভারতবর্ষে ১৯৬২ সালের নির্বাচনে ২১ কোটি লোক অর্থাৎ গ্রেট ব্রিটেনের জনসংখ্যার প্রায় চারগুণ লোকের নাম ভোটার তালিকায় স্থান পাইয়াছিল। কিন্তু এখানকার জনসংখ্যা ৪৩ কোটি ৬০ লক্ষ। ভারতবর্ষে প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীমাত্রেই ভোটের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অর্ধেকের বেশি লোক ভোটের তালিকায় স্থান পাইল না কেন? তাহার

জনসংখ্যার অনুপাতে ভোটারের সংখ্যা

কারণ প্রথমতঃ অনেকের বয়স ২১ বছরের কম, সুতরাং তাহারা ভোটার হইতে পারে না; দ্বিতীয়তঃ ইংরাজ, আমেরিকান, চীনাম্যান প্রভৃতি বিদেশীয় লোক কিছু এখানে বাস করেন, তাঁহারা ভোটার নহেন; তৃতীয়ত রাজদণ্ডে দণ্ডিত দুষ্কৃতকারীরা, দেউলিয়ারা, পাগলেরা ভোটের অধিকার হইতে বঞ্চিত; চতুর্থতঃ অনেকে ভোটার তালিকায় নিজেদের নাম আছে কিনা খোঁজ লন না এবং না থাকিলে দরখাস্ত করিয়া ভোটার হইবার ঝামেলা সহ্য করিতে রাজী হন না, কাজেই কর্মচারীদের ঔদাসীন্যে ও নিজেদের আলস্যের ফলে তাঁহারা নাগরিকের এক প্রধান অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন।

কেন কম হয়?

ইংলণ্ডে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে শতকরা দুইজনেরও কম লোক ভোট দিবার অধিকারী ছিলেন। ঐ বৎসর ভোটদানের অধিকার সম্প্রসারণের ফলে মধ্যবিত্ত কিছু লোক ভোট পাইলেন বটে কিন্তু তখন জনসংখ্যার শতকরা সাড়ে চার জনেরও কম লোক ভোটার হইলেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কলকারখানার শ্রমিকদিগকে ভোট দিবার অধিকার দেওয়ায় ভোটারের অনুপাত বাড়িয়া শতকরা সাড়ে আটের কাছাকাছি দাঁড়াইল। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ক্ষেতমজুরেরা ভোট পাইলে উহা প্রায় দ্বিগুণ হইল। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে কিছুসংখ্যক নারী ভোট পাইলেন, তাই জনসংখ্যার অনুপাতে ভোটার সংখ্যা হইল শতকরা ৪৬-এর কিছু কম। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে সকল প্রাপ্তবয়স্ক নারীকেই ভোট দিবার অধিকার দিবার ফলে ঐ অনুপাত বাড়িয়া প্রায় চৌষট্টি হইল।

ইংলণ্ডে ভোটাধিকার বিস্তার

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে যখন মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংবিধানের ফলে কিছুটা প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য প্রদান করা হয় তখন জনসংখ্যার অনুপাতে ভোটের সংখ্যা ছিল শতকরা তিনজনেরও কম। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের সংবিধানের ফলে ভারতের শতকরা ১৪ জন নরনারী ভোটের অধিকার পাইয়াছিলেন। সম্পত্তির অধিকার, শিক্ষা, প্রত্যক্ষ করদানের ক্ষমতা প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া তখন ভোটের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। এখন স্বাধীন ভারতে ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত ও নিরক্ষর প্রায় প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী ভোটের অধিকার পাইয়াছে। এই হিসাবে ভারতবর্ষকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষাও বেশি গণতান্ত্রিক

ভারতে ভোটাধিকার বিস্তার

বলিতে হয়। কেননা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভোটের অধিকার নির্ণয় করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে আঙ্গিক রাজ্যগুলিকে এবং এখনও তথাকার দক্ষিণ অঞ্চলের রাজ্যসমূহে পোল ট্যাক্স প্রদান, সম্পত্তির অধিকার, শিক্ষা কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান বুঝিবার ক্ষমতা নাই প্রভৃতি নানা মিথ্যা অজুহাতে নিগ্রোদিগকে অনেক পরিমাণে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ভোটাধিকার

ভোটের অধিকারকে সংকুচিত রাখা উচিত কি না, সে প্রশ্নকে এখনও অবাস্তব ও ঐতিহাসিক কৌতূহল মাত্র বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কেন না ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে পাকিস্তানে যে নির্বাচন হইল তাহাতে সাড়ে সাত কোটি লোকের মধ্যে মাত্র সত্তর হাজার ব্যক্তিকে ভোট দিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। তথাকায় রাষ্ট্রপতি আয়ুব খান জনসাধারণের ভোটের অধিকারকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন যে, ছাগল ভেড়াকে যেমন বাঁধিয়া হননশালায় লইয়া যাওয়া হয় তেমনি অশিক্ষিত ভোটারদিগকে নির্বাচন কেন্দ্রে খেদাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। তিনি Basic Democracy-র পক্ষপাতী। গণতন্ত্র জনসাধারণের তন্ত্র বা শাসনও হইবে অথচ হাজার করা একজন লোকেরও ভোটের অধিকার থাকিবে না ইহা সোনার পাথরবাটির মতন অবাস্তব ও অদ্ভুত।

পাকিস্তানে ভোটাধিকার

জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁহার Representative Government নামক গ্রন্থে বলেন যে, যাহারা লিখিতে পারে না, পড়িতে জানে না ও সামান্য অঙ্ক করিতে পারে না, তাহাদিগকে কোনক্রমেই ভোটের অধিকার দেওয়া যাইতে পারে না। যে ছেলে কথা বলিতে শেখে নাই তাহার মত চাওয়াও যেমন নিরর্থক তেমন যাহারা লিখিতে পড়িতে জানে না তাহাদিগকে ভোট দিতে বলাও তেমন অসঙ্গত। যাহারা নিজের অবস্থার উন্নতির জন্য যাহা একান্ত আবশ্যক তাহা করিতে পারে নাই, তাহাদের উপর সর্বসাধারণের উন্নতি বিধানের ভার দেওয়া যাইতে পারে না। ফাইনার বলেন যে, শুধু লিখিতে পড়িতে জানিলেই যথার্থরূপে বিচারবিবেচনাপূর্বক ভোট দিবার ক্ষমতা জন্মে না। যতখানি বিদ্যা থাকিলে প্রকৃতপক্ষে ভোট দিবার শক্তি হয় ততখানি ক্ষমতা

শিক্ষার যোগ্যতা

যে কোন দেশের শতকরা ৯৫ জন লোকেরই নাই। এই যদি অবস্থা হয় তাহা হইলে আর লেখাপড়ার যোগ্যতার উপর এত জোর দিয়া লাভ কি ?

মিল বলেন, লোকে আগে লেখাপড়া শিখুক, তারপর তাহাদিগকে ভোট দিবার অধিকার দেওয়া হউক। এই নীতি যদি অনুসরণ করা হইত তাহা হইলে কোন দেশেই শিক্ষার বিস্তার ঘটিত না। ইংলণ্ডে অশিক্ষিত শ্রমিকদিগকে যখন ভোটের অধিকার দেওয়া হইল, তখন উদারনৈতিক ও সংরক্ষণশীল দল পাল্লা দিয়া তাহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিতেন যে ভোটদাতারা আমাদের প্রভু, সুতরাং সেই মনিবদের শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলেই নয়। ভারতবর্ষেও সর্বসাধারণকে ভোটের অধিকার দিবার পর হইতে প্রাথমিক শিক্ষা খুব প্রসার লাভ করিয়াছে।

ভোটাধিকার আগে না শিক্ষা আগে হওয়া উচিত ?

কিছুদিন পূর্বেও পণ্ডিতদের ধারণা ছিল যে, যাহাদের বিষয় সম্পত্তি কিছুই নাই এবং যাহারা প্রত্যক্ষ কর প্রদান করে না, তাহাদিগের ভোটের অধিকার থাকা উচিত নহে। মিল বলেন যে, এই শ্রেণীর বিত্তহীন লোকদিগকে যদি ভোট দিবার ক্ষমতা দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহারা শাসনভার হাতে লইয়া পরের পয়সায় খুব নবাবী করিবে। মিতব্যয়িতার প্রতি তাহাদের মোটেই লক্ষ্য থাকিবে না। এই যুক্তি খুব জোরালো মনে হয় না। কেননা ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে ভোটের অধিকার সকলকে দেওয়া হইলে শাসনভার গরীবদের হাতে এখনও ন্যস্ত হয় নাই। বড়লোকেরাই তাঁহাদের প্রভাবপ্রতিপত্তির বলে আইনসভায় ও শাসনপরিষদে বেশির ভাগ আসন দখল করিয়া আছেন। তা ছাড়া ধনের চেয়ে প্রাণ বড়। সরকারের উপর প্রাণ রক্ষারও ভার আছে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় গরীবদের প্রাণের মূল্য বড়লোকদের প্রাণের চেয়ে কিছু কম নহে। সেইজন্য সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণের চরম ক্ষমতা ধনী ও নির্ধন সকল শ্রেণীর লোকের হাতেই থাকা উচিত।

সম্পত্তির যোগ্যতা

প্রতিনিধিত্বপ্রার্থী স্থানীয় লোক হইবেন কিনা ইহা লইয়া মতভেদ আছে। স্থানীয় লোককে সকলে চেনেন এবং তিনি নির্বাচিত হইলে সেখানকার অভাব-অভিযোগের কথা আইনসভার গোচরে আনিতে পারেন।

কিন্তু কোন কোন স্থানে হয়তো উপযুক্ত প্রতিনিধি পাওয়া যায় না, অন্যদিকে বড় বড় সহরে অনেক যোগ্য ব্যক্তি থাকেন। যোগ্য ব্যক্তির পরিবর্তে অযোগ্য লোক নির্বাচিত হইলে আইনসভার কার্য সুচারুরূপে নির্বাহ করা কঠিন হয়। তাই এখন ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে স্থানীয় বাসিন্দাকেই নির্বাচিত করিতে হইবে এমন কোন নিয়ম নাই।

বাসস্থানের যোগ্যতা

৩। স্ত্রীজাতির ভোটের অধিকার থাকা কি উচিত?ঃ ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সকল রাষ্ট্রের স্ত্রীজাতিকে ভোটের অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছিল। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে স্ত্রী-পুরুষের সকল বিষয়ে সমান অধিকার দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং এই প্রশ্ন অবান্তর মনে হইতে পারে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে ১৯২০ সালের সংশোধন অনুসারে স্ত্রীজাতিকে ভোটের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইতালি প্রভৃতি লাতিন সভ্যতাযুক্ত দেশেও অনেক যুক্তিতর্কের পরে মেয়েরা ভোটের অধিকার পাইয়াছেন। কিন্তু সুইট্জারল্যাণ্ডের মতন প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এখনও স্ত্রীজাতি ঐ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া আছেন। সেইজন্য মেয়েদের ভোটের অধিকার প্রদানের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে কি কি যুক্তি উত্থাপন করা হয় তাহা সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন।

নারীর অধিকার

একদল লোক বলিয়া থাকেন যে, মেয়েরা যখন দেশের রক্ষার্থে অস্ত্র ধারণ করিতে পারেন না তখন তাঁহাদের ভোটাধিকার থাকিবে কেন? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, অনেক রাষ্ট্রেই সামরিক শিক্ষা ও সেবা (Conscription) সকল পুরুষের পক্ষে বাধ্যতামূলক নহে, তথাপি সেখানে কোন পুরুষকে ভোট হইতে বঞ্চিত করা হয় না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রাশিয়ার অনেক নারীও যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

সামরিক যুক্তি

কেহ কেহ বলেন যে, মেয়েদের ভোট দিবার অধিকার দিলে তাঁহাদের মেয়েলি গুণ নষ্ট হইয়া যাইবে; তাঁহারা গৃহকর্ম ও শিশুপালন অবহেলা করিয়া রাজনীতি লইয়া ব্যস্ত থাকিবেন। এ যুক্তিও অসার। কয়েক বৎসর পরে একদিন এক আধ

গার্হস্থ্য ধর্মের যুক্তি

ঘণ্টার জন্য ভোট দিতে গেলে গৃহকর্ম রসাতলে যায় না। কিছু সংখ্যক নারী অবশ্য আইনসভায় ও মন্ত্রিমণ্ডলে স্থান পাইতে পারেন। কিন্তু মেয়ে হইয়া জন্মিলেই যে প্রত্যেককে রান্নাঘর ও শিশুশালা আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। যাঁহাদের যোগ্যতা আছে তাঁহাদিগকে সুযোগ দেওয়া হইবে না কেন?

মেয়েদের ভোট কি পুরুষদের নির্দেশে দেওয়া হয়?

অন্য একটি আপত্তি উঠাইয়া কেহ কেহ বলেন যে, মেয়েদের ভোটের ক্ষমতা দেওয়া নিরর্থক অথবা বিপজ্জনক। অধিকাংশ নারী তাঁহাদের স্বামী, পিতা বা অন্য অভিভাবকের নির্দেশ মতন ভোট দিবেন। ক্যাথলিক মেয়েরা তাঁহাদের ধর্মযাজকদের কথামত ভোট দিতে অগ্রসর হইবেন। এ সব ক্ষেত্রে পুরুষের ভোটই অনর্থক দ্বিগুণিত হইবে। আবার মেয়েরা যদি স্বাধীনভাবে ভোট দিতে যাইয়া তাঁহাদের অভিভাবককে অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে গৃহের সুখশান্তি নষ্ট হইবে। ইহার উত্তরে মিল বলিয়াছেন যে, যদি মেয়েরা পুরুষদের নির্দেশ মতন ভোট দেন তাহা হইলে কোন ক্ষতি হইবে না। আর যদি কিছু সংখ্যক নারীও স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে অভ্যস্ত হন এবং স্বতন্ত্রভাবে ভোট দেন তাহা হইলে সমাজের মহৎ উপকার হইবে।

রাজনীতির সংশোধন ও নারীদের অধিকার সংরক্ষণ

বস্তুতঃ পুরুষদের রাজনীতির মধ্যে এত গলদ ও আবর্জনা আছে যে উহাতে মেয়েদের অংশ গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা থাকিলে পুরুষেরা লজ্জাবশেও অনেকটা সংযত ও সাধুসম্মত উপায়ে কাজ করিতে বাধ্য হইবেন। তা ছাড়া নারীদের কতকগুলি বিশেষ সমস্যা আছে। তাঁহাদের ভোটের অধিকার না থাকিলে পুরুষেরা ঐ সব সমস্যা সমাধানের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইবেন না। শিশুমঙ্গল, বিবাহবিধি, যৌতুক, উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে মেয়েদের মতামত নির্ধারণ করা প্রয়োজন। তাহা না হইলে মেয়েদের অধিকার সংরক্ষিত হইবে না। গণতান্ত্রিক নীতিতে নর ও নারীর সমান অধিকার। সুতরাং নারীকে ভোটদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলে গণতন্ত্রের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়।

৪। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচনঃ আমেরিকার সংবিধানের রচয়িতাগণ রাষ্ট্রপতির নির্বাচনভার প্রত্যক্ষ ভাবে ভোটারদের হাতে না দিয়া পরোক্ষ ভাবে তাঁহাদের দ্বারা নির্বাচিত এক নির্বাচকমণ্ডলীর হাতে দিয়াছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক দলের উৎপত্তির ফলে তাঁহাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। নির্বাচকদিগকে স্বাধীনভাবে নির্বাচন করিতে দেওয়া হয় না; যাঁহারা যে দলের দ্বারা নির্বাচিত হন, তাঁহারা সেই দলের প্রার্থীকে ভোট দেন। মহাত্মা গান্ধীও পরোক্ষ নির্বাচনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি গ্রামের প্রতিনিধি অঞ্চলে, অঞ্চলের প্রতিনিধি জেলায়, জেলার প্রতিনিধি প্রদেশে ও প্রদেশের প্রতিনিধি কেন্দ্রে পাঠাইবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ভারতীয় সংবিধান এখন যেভাবে প্রযুক্ত হইতেছে, তাহাতে বিকেন্দ্রীকরণ অপেক্ষা অতিরিক্ত কেন্দ্রীকরণের প্রবৃত্তিই বলবত্তর হইতেছে।

পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যর্থতা

পরোক্ষ নির্বাচনের স্বপক্ষে বলা হয় যে, ইহাতে অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণ অপেক্ষা সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান নির্বাচকমণ্ডলীর হাতে নির্বাচন ক্ষমতা দেওয়া হয়। জনতা উত্তেজনাবশে বা দলের প্রভাবে অযোগ্য লোককে নির্বাচন করিতে পারে, কিন্তু নির্বাচকমণ্ডলী ধীর স্থির ভাবে বিবেচনা করিয়া যোগ্যতম ব্যক্তিদিগকে নির্বাচন করিবে। এই যুক্তির সমর্থন ইতিহাস হইতে পাওয়া যায় না। দলের প্রভাব এখন সর্বব্যাপী; নির্বাচকমণ্ডলীও যে তাহার নির্দেশ মত কাজ করে তাহা আমেরিকার রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে দেখা গিয়াছে। তা ছাড়া জনসাধারণ যদি ভাল নির্বাচককে নিযুক্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ক্ষমতা দিতে আপত্তি করা হয় কেন? আর তাঁহারা যদি নিজে অযোগ্য বলিয়া অযোগ্য ব্যক্তিদিগকেই নির্বাচকরূপে প্রেরণ করেন তাহা হইলে অপ্রত্যক্ষ নির্বাচনেই বা লাভ কোথায়?

পরোক্ষ নির্বাচনে কি যোগ্যতমের জয় হয় ?

পরোক্ষ নির্বাচনের স্বপক্ষে বলা হয় যে ইহাতে খরচ কম হয় ও সময় কম লাগে, কিন্তু একবারের জায়গায় দুইবার নির্বাচন করিতে তো বেশি খরচ হইবার ও বেশি সময় লাগিবারই কথা। একবার জনসাধারণ নির্বাচকদিগকে

নির্বাচন করিবেন, আবার নির্বাচকেরা প্রতিনিধি নির্বাচন করিবেন, দুইবার হাঙ্গামা পোহাইবার সার্থকতা কোথায়? বরং অল্প-সংখ্যক লোকের হাতে প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা থাকিলে ঘুষ দিয়া ভোট কিনিবার আশংকা থাকে। কিন্তু যেখানে বহু সহস্র লোক ভোটার, সেখানে কতজনকে ঘুষ দেওয়া যাইবে? সেইজন্য পরোক্ষ নির্বাচন অপেক্ষা প্রত্যক্ষ নির্বাচনই অধিক বাঞ্ছনীয়।

অর্থ ও সময়ের অপব্যয়

প্রত্যক্ষ নির্বাচনে প্রতিনিধির সঙ্গে জনসাধারণের একটা সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়। প্রতিনিধি বুঝিতে পারেন যে তিনি জনসাধারণের নিকট দায়িত্বশীল। পরোক্ষ নির্বাচনে এরূপ অনুভূতি জন্মিতে পারে না। প্রত্যক্ষ নির্বাচনের সময় প্রার্থীরা ও তাঁহাদের সমর্থকেরা নানারূপ সভাসমিতি করেন, প্রবন্ধ ও পুস্তিকা প্রকাশ করেন, ভোটারদের বাড়ি বাড়ি যাইয়াও তাঁহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন। তাহার ফলে ভোটাররা রাজনৈতিক শিক্ষা প্রাপ্ত হন। পরোক্ষ নির্বাচনে এরূপ ঘটে না। সুতরাং আধুনিক গণতন্ত্রে প্রত্যক্ষ নির্বাচন নীতিই গৃহীত হইয়াছে।

গণ-সংযোগ

৫। এক সদস্যযুক্ত ও বহু সদস্যযুক্ত নির্বাচন কেন্দ্র: প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে কতকগুলি নির্বাচন কেন্দ্রে বিভক্ত করা হয়। কোথাও এক একটি নির্বাচন কেন্দ্র হইতে একজন মাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়; কোথাও বা একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সালের নির্বাচনের পূর্বে ভারতে অনেকগুলি একাধিক প্রতিনিধিযুক্ত কেন্দ্র ছিল। কিন্তু এখন অধিকাংশ কেন্দ্রই একজন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করে। ব্রিটেনে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ও ভারতবর্ষে এক সদস্যযুক্ত কেন্দ্র আছে। কিন্তু ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশে বহু সদস্যযুক্ত কেন্দ্র (Scrutin de Liste বা List voting) বর্তমান।

একসদস্যযুক্ত কেন্দ্র

যেখানে সমানানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব প্রথা (Proportional Representation) প্রচলিত আছে সেখানে প্রত্যেকটি নির্বাচন কেন্দ্র হইতে কয়েকজন প্রতিনিধির নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। কেননা ঐ প্রথা অনুসারে প্রত্যেক ভোটার বলিতে পারেন কোন্ প্রার্থী তাঁহার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ মনোনয়নের উপযুক্ত। বিভিন্ন দলের প্রার্থী ঐ

তালিকায় থাকেন। ভোটারগণ এক বা একাধিক দলের প্রার্থীকে প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি মনোনয়ন দিতে পারেন। এই ব্যবস্থার ফলে ছোট ছোট দলও তাহাদের সভ্যসংখ্যা অনুসারে কিছুসংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচিত করিতে পারেন। কিন্তু এক সদস্যযুক্ত নির্বাচন কেন্দ্র হইতে একজন মাত্র প্রতিনিধিই নির্বাচিত হন ; সুতরাং সংখ্যালঘু দলগুলির পক্ষে কোন আসন লাভ করা খুব কঠিন হয়।

বহু সদস্যের কেন্দ্রে সংখ্যালঘুর সুবিধা

বহু সদস্যযুক্ত কেন্দ্রের স্বপক্ষে এই একটি মাত্র যুক্তি ছাড়া আর বিশেষ কিছু বলিবার নাই। এক সদস্যযুক্ত নির্বাচন কেন্দ্রে ভোটারদের সহিত প্রার্থীদের ব্যক্তিগত সংস্রব ঘটে। ভোটারেরা বুঝিতে পারেন যে প্রতিনিধির প্রতি তাঁহাদের দাবি আছে এবং প্রতিনিধিও মনে করেন যে তিনি তাঁহার নির্বাচন কেন্দ্রের নিকট দায়িত্বশীল। আইনসভায় যখন ঐ অঞ্চলের কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তখন উহার প্রতিনিধি তথ্যাদি সরবরাহ করিতে পারেন। তাঁহার দ্বারা স্থানীয় অভাব-অভিযোগের প্রতিকার সম্ভব হয়। বহু সদস্যযুক্ত কেন্দ্র আকারে বৃহৎ এবং তাহা হইতে অনেক প্রতিনিধি নির্বাচিত হন বলিয়া কেহই উহার উন্নতির জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন না। এক সদস্যযুক্ত নির্বাচন কেন্দ্রের ব্যবস্থা সরল এবং উহাতে ভোটগণনার নিয়মও সহজবোধ্য।

দায়িত্ব বোধ

৬। গোপন ও প্রকাশ্য ভোটদান : ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ইংলণ্ডে প্রকাশ্যে ভোট দিবার প্রথা ছিল। ইহাতে অনেক দুর্নীতি দেখা দিয়াছিল। দরিদ্রেরা সাহস করিয়া তাঁহাদের অঞ্চলের ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারিতেন না। ভোটের পর ব্যক্তিগত সম্পর্কেও ভাঙ্গন ধরিত। তাই এখন প্রায় সকল গণতান্ত্রিক দেশেই গোপন ব্যালটপত্রের সাহায্যে ভোট দিবার প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে। প্রত্যেক ভোটারকে এমন সুযোগ দেওয়া হয় যাহাতে তিনি সকলের অলক্ষ্যে নিজেদের পছন্দমত প্রার্থীর নাম চিহ্নিত করিতে পারেন। ভারতবর্ষে তিনি ব্যালটপত্র ভাঁজ করিয়া নির্বাচন কেন্দ্রের সভাপতির হাতে দেন। এরূপ ব্যবস্থা করিবার

গোপনে ভোট কেন দেওয়া হয় ?

কারণ এই যে কোথাও কোথাও দেখা গিয়াছিল যে ভোটার ব্যালটপত্র হাতে লইয়া নির্দিষ্ট আচ্ছাদিত স্থানে যাইয়া উহা পকেটে বা ব্লাউজের ভিতর লইয়া বাহিরে যাইয়া প্রার্থীদের নিকট বিক্রয় করিতেন। সেইজন্য এখন তাঁহার হাত হইতে ভাঁজ করা ব্যালটপত্র লইয়া তাঁহারই সামনে বাক্সের ভিতর ফেলার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

৭। **প্রতিনিধির বেতন**ঃ আজকাল প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত হওয়া খুব গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু মধ্যযুগে ইংলণ্ডে কেহ প্রতিনিধি নির্বাচিত হইলে মাথায় হাত দিয়া বসিতেন। একে তো দূরের রাস্তা, তাহাতে যানবাহনের অসুবিধা। তার চেয়ে বড় ভাবনা পার্লামেণ্টে যাতায়াতে যে সময় লাগিবে সে সময়ে নিজের কাজকর্ম কিছুই দেখাশুনা করিতে পারিবেন না, কাজেই অনেক লোকসান হইবে। বিংশ শতাব্দীতে যখন শ্রমিক দলের সাধারণ শ্রমিক সদস্যেরা পার্লামেণ্টে প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত হইতে লাগিলেন তখন কমন্সসভার সদস্যদের বেতন দিবার ব্যবস্থা করা হইল। তাই দেখিয়া এখন অন্যান্য দেশেও আইনসভার সদস্যদিগকে বেতন দিবার প্রথা চালু করা হইয়াছে। ইহার ফলে দরিদ্র অথচ উপযুক্ত লোকের পক্ষেও প্রতিনিধির কাজ করা সম্ভব হইয়াছে। আইনসভার কাজ এত বাড়িয়া গিয়াছে যে উহার প্রতি মনোযোগ দিতে গেলে আর নিজের কাজে মন দিবার সময় পাওয়া যায় না। ভারতীয় পার্লামেণ্টের সদস্যেরা নির্দিষ্ট মাসিক বেতন ছাড়া পার্লামেণ্টের সভায় উপস্থিত থাকিবার জন্য দৈনন্দিন একটা ভাতা পান এবং ভারতের সর্বত্র বিনাভাড়ায় রেলপথে প্রথম শ্রেণীতে যাতায়াত করিতে পারেন। এত সুবিধা দিবার ফলে একশ্রেণীর পেশাদার রাজনৈতিক ব্যক্তির উদ্ভব হইয়াছে; রাজনীতি করাই তাঁহাদের জীবিকা অর্জনের একমাত্র উপায়।

বেতন দিবার কারণ

৮। **প্রতিনিধির কার্য ও দায়িত্ব (Functions and responsibilities of the Representative)**ঃ প্রতিনিধির সহিত তাঁহার নির্বাচন কেন্দ্রের (Constituency) সম্বন্ধ কিরূপ তাহা লইয়া গুরুতর মতভেদ আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডের ব্রিস্টল কেন্দ্রের ভোটারগণ মনে করিতেন যে, প্রতিনিধি তাঁহাদের মুখপাত্র (delegate) মাত্র।

ভোটারগণ তাঁহাকে যেরূপ নির্দেশ দিবেন তিনি সেইভাবে কাজ করিবেন; আইনসভায় স্বাধীনভাবে নিজে বিবেচনা করিয়া কিছু করিবার অধিকার তাঁহার নাই। মহামতি বার্ক এই মতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া ব্রিস্টলের নির্বাচকদিগকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়া আছে। উহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, প্রতিনিধিকে কেবলমাত্র ডেলিগেট ভাবা অযৌক্তিক। ভোটারেরা পার্লামেণ্ট হইতে তিনশত মাইল দূরে বসিয়া কোন প্রস্তাব উত্থাপিত ও আলোচিত হইবার পূর্বেই কি তাঁহাদের সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া তাঁহাদের দ্বারা নির্বাচিত ব্যক্তির নিকট পাঠাইয়া দিবেন? সেই সিদ্ধান্তের দ্বারা চালিত হইলে নির্বাচিত ব্যক্তি তাঁহার কর্তব্যকর্মে অবহেলা করিতে বাধ্য হইবেন কিনা? তিনি তাঁহার ভোটারদিগকে তুষ্ট করিতে চাহেন, না, তাঁহার মন, বুদ্ধি ও বিবেচনার দ্বারা তাঁহাদিগকে সেবা করিবার জন্য ব্যগ্র। তাঁহাকে যদি নির্বাচকদের নির্দেশ অনুসারে সব সময়ে মত প্রকাশ করিতে হয়, তাহা হইলে তিনি উঁহাদের প্রতিনিধি না হইয়া তাঁহাদের যন্ত্ররূপে পরিণত হইবেন।

বার্কের অভিমত

এই মত উনবিংশ শতাব্দীতে গৃহীত হইয়াছিল। সে যুগে প্রতিনিধিরা একবার নির্বাচিত হইবার পর আইনসভায় নিজের স্বাধীন বিবেচনা মত ভোট দিতে পারিতেন। শুধু তাহাই নহে, অনেক ক্ষেত্রে কোন কোন প্রতিনিধি একদলের পক্ষ হইতে নির্বাচিত হইয়া অন্যদলে যোগ দিতেন; কখনও বা দলের নেতার নেতৃত্ব স্বীকার না করিয়া কোন উপদলের সহিত মিলিত হইতেন। বিংশ শতাব্দীতে দলের নিয়ম কঠোর হওয়ার ফলে এখন আর উহা সম্ভব হয় না। যিনি যে দলের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন তাঁহাকে প্রত্যেক প্রশ্নে সেই দলের নির্দেশ মতন ভোট দিতে হয়। এই হিসাবে এখন প্রতিনিধি ডেলিগেটে পরিণত হইয়াছেন। নির্বাচনের সময় ভোটারগণ ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে ততটা মত দেন না, যতটা দেন দলবিশেষের পক্ষে। সুতরাং নির্বাচিত হইবার পর কেহ যদি দলত্যাগ করিয়া অন্য দলে যোগ দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ভোটারদের বিশ্বাসভঙ্গের জন্য দায়ী করা যাইতে পারে।

রাজনৈতিক দলের প্রভাবে প্রতিনিধি কতকটা ডেলিগেটে পরিণত হইয়াছেন

সুইট্জারল্যাণ্ডে নির্বাচিত প্রতিনিধিকে প্রত্যাহার (Recall) করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। ইহার মূলেও প্রতিনিধিকে ডেলিগেট বলিয়া ধারণা বর্তমান আছে। নির্বাচন কেন্দ্রের ভোটারদের অভিপ্রায় অনুসারে কাজ না করিলে তাঁহাকে সদস্যপদ ত্যাগ করিতে হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রিম সোভিয়েটের প্রতিনিধিরাও তাঁহাদের নির্বাচকদের নিকট কৈফিয়ত দিতে বাধ্য ও তাঁহারা ইচ্ছা করিলে তাঁহার প্রতিনিধিত্ব প্রত্যাহার করিতে পারেন। এই ব্যবস্থা ভাসা ভাসা ভাবে দেখিলে মনে হয় ইহা খুব গণতন্ত্রসম্মত। কিন্তু রাশিয়ায় তিন লক্ষ ভোটার লইয়া একটি নির্বাচন কেন্দ্র। এই তিন লক্ষ লোক কি কোথাও সম্মিলিত হইয়া ধীরভাবে বিচার বিবেচনা করিতে পারেন যে, প্রতিনিধি ঠিকমত কাজ করিতেছেন কি না? তিন লক্ষ লোকের মধ্যে দুই এক শত লোক যদি কোন প্রতিনিধির প্রতি বিরূপ হন তাহা হইলে তাঁহারা অন্য সকলকে প্ররোচিত করিয়া প্রতিনিধিকে পদচ্যুত করিতে পারেন। কিন্তু এরূপ অবস্থায় কোন প্রতিনিধিই নিশ্চিন্ত মনে কর্তব্যপালন করিতে পারেন না। কোন না কোন উপদল (Group) তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য সর্বদা ষড়যন্ত্র করিতে পারে। কিন্তু কম্যুনিস্ট দলের অখণ্ড প্রতাপের ভয়ে এরূপ করা সম্ভব হয় না। প্রতিনিধিকে নির্বিচারে দলের নির্দেশ মাথা পাতিয়া লইতে হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দলপতিরা স্বেচ্ছাচারী নায়ক নহেন। তাঁহারা বিভিন্ন নির্বাচনকেন্দ্রের প্রতিনিধিদের মতামত সরাসরি উপেক্ষা করিয়া নিজেদের খেয়ালখুসিমত কাজ করেন না। তাঁহারা প্রতিনিধিদের মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণের মতামত কি তাহা নির্ধারণ করেন ও সেই অনুসারে দলের নীতি স্থির করেন। সুতরাং প্রতিনিধি কখনই একেবারে বিচার-বিবেচনাহীন ভোট দিবার সময় হাত তুলিবার যন্ত্রে পরিণত হন না।

প্রত্যাহার বা পদচ্যুতি কি গণতন্ত্রসম্মত?

প্রতিনিধি হাত তুলিয়া ভোট দিবার যন্ত্রমাত্র নহেন

৯। আঞ্চলিক ও বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্বঃ আধুনিক গণতন্ত্রের বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল হইতে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। এই প্রথা এক শ্রেণীর পণ্ডিতদের মনোমত নহে। তাঁহারা বলেন যে, একটি অঞ্চলে বা নির্বাচনকেন্দ্রে বিভিন্ন পেশার লোক বাস করেন। শ্রমিকের স্বার্থ শিল্পপতির স্বার্থের সঙ্গে অভিন্ন নহে। শিক্ষকের স্বার্থ ও রাজমিস্ত্রীর স্বার্থ এক

নহে। তেমনি ডাক্তার, উকীল, কেরাণী, ইঞ্জিনিয়ার, কামার, কুমোর, ছুতোরের স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন। একজন তাঁহার সমব্যবসায়ীর প্রতিনিধিত্ব করিতে পারেন, কিন্তু বিভিন্ন ব্যবসায়ীর স্বার্থ সংরক্ষণ তাঁহার দ্বারা সম্ভব হয় না। সুতরাং আইনসভায় বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রতিনিধি না লইয়া সমাজের মধ্যে যতগুলি প্রধান প্রধান বৃত্তি বা পেশা আছে তাহাদের প্রতিনিধির স্থান থাকা কর্তব্য। এই মত ফরাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী দুগুই (Duguit), অস্ট্রিয়ার আলবার্ট শাফ্‌লে (Albert Shaffle), এবং গিল্ড সোশ্যালিজমের ও সিণ্ডিক্যালিজমের পৃষ্ঠপোষকগণ সমর্থন করেন।

পেশাগত প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনীয়তা

বৃত্তিগত প্রতিনিধি লইয়া আইনসভা গঠন করিতে গেলে প্রথমেই প্রশ্ন উঠে সমাজের অসংখ্য বৃত্তির মধ্যে কোন্ কোন্‌টি হইতে প্রতিনিধি লওয়া হইবে এবং কোন্ বৃত্তিকে কতজন প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে দেওয়া হইবে। ইতালিতে ফ্যাসিস্ট শাসনকালে অগণিত শ্রমিকেরা যতজন প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকারী ছিলেন, মুষ্টিমেয় শিল্পপতিরাও ততজন প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারিতেন। এরূপ ব্যবস্থা যে অত্যন্ত অন্যায় তাহা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু উহাতে অনুপাত স্থির করা কঠিন

বৃত্তি হিসাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করিলে প্রত্যেক প্রতিনিধি তাঁহার নিজের পেশার কি করিয়া উন্নতি হয় শুধু তাহাই চিন্তা করিবেন, সমগ্র রাষ্ট্রের ও সমাজের হিত চিন্তা করিবেন না। আঞ্চলিক ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচন করিলে নির্বাচিত ব্যক্তিরা নিজদিগকে কোন বিশেষ স্বার্থের প্রতিনিধি বলিয়া ভাবিতে পারেন না। সকলের মঙ্গলে প্রত্যেকের কল্যাণ এই মূল তত্ত্বটি পেশাগত নির্বাচনে ভুলিবার আশংকা থাকে। তা ছাড়া বিভিন্ন বৃত্তির প্রতিনিধি লইয়া আইনসভা গঠিত হইলে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের উদ্ভব হইতে পারে। কোন কোন বৃত্তির প্রতিনিধিরা অপর দুই চারিটি বৃত্তির প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলিত হইয়া মন্ত্রিপরিষদ গঠন করিতে পারে, কিন্তু অন্যান্য বৃত্তির প্রতিনিধিরা আবার নিজেদের মধ্যে সাময়িক ঐক্য স্থাপন করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতে চেষ্টা করেন। এরূপ ক্ষেত্রে কোন মন্ত্রিসভাই স্থায়ী হইতে পারে না।

সার্বজনীন হিতচিন্তার অভাব

১০। **সংখ্যালঘুদের নির্বাচন সমস্যা** (Problems of representation of Minorities) : গণতন্ত্র হইল সংখ্যাগরিষ্ঠের (Majority) মত লইয়া শাসন চালানো। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠেরা যদি সংখ্যালঘু দল ও সম্প্রদায়ের কোন কথা না শুনেন তাহা হইলে তাঁহাদের শাসন অত্যাচারে পরিণত হয়। সংখ্যালঘুদের সংখ্যার অনুপাতে কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইলে তাঁহাদের বক্তব্য আইনসভায় প্রকাশ করিবার সুব্যবস্থা হয়। কিন্তু যেভাবে সাধারণ নির্বাচনে ভোট দেওয়ার প্রথা আছে তাহাতে সংখ্যালঘুদলের নির্বাচিত হইবার সম্ভাবনা কম। যদি প্রত্যেক কেন্দ্রের শতকরা ৫১ জন ভোটার একদলের স্বপক্ষে ভোট দেন এবং ৪৯ জন তাহার বিপক্ষ দলের সমর্থন করে, তাহা হইলে রাষ্ট্রের প্রায় অর্ধেক ভোটারের দ্বারা একজন প্রতিনিধিও নির্বাচিত হইতে পারে না। জন স্টুয়ার্ট মিল বলেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে সাম্যের পরিবর্তে অসাম্য দেখা দেয়; জনসাধারণের একাংশ অবশিষ্টাংশকে শাসন করে এবং নির্বাচনের ন্যায্য অংশ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করে। সেইজন্য সংখ্যালঘুদিগকে তাহাদের নিজ নিজ প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন।

সংখ্যালঘুদিগকে নির্বাচনের সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন

সংখ্যালঘু (Minority) কাহাকে বলে? ভারতবর্ষে ধর্ম ও ভাষার ভিত্তিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় গণনা করা হয়। কিন্তু অন্যান্য দেশে রাজনৈতিক চেতনাবিশিষ্ট এমন কোন জনসম্প্রদায় ন্যাশনালিটি বা দলকে বুঝায় যাহারা সংখ্যায় অন্যান্য অপেক্ষা কম। এইরূপ সংখ্যালঘুরা যাহাতে অন্ততঃ কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারেন তাহার জন্য নানারূপ উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। উহার মধ্যে (১) সমানুপতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া (২) সীমাবদ্ধ ভোটদান পদ্ধতি (Limited vote system), (৩) পুঞ্জীভূত ভোটপদ্ধতি (Cumulative vote), (৪) হস্তান্তরের অযোগ্য একমাত্র ভোটপদ্ধতি (The single nontransferable vote), (৫) আসন সংরক্ষণ (Reservation of Seats), (৬) সাম্প্রদায়িক নির্বাচনমণ্ডলী (Communal electorate) ও (৭) দ্বিতীয় ব্যালট (Second Ballot) কোন কোন দেশে প্রচলিত আছে।

বিভিন্ন পদ্ধতি

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব প্রথা (Proportional Representation) এই প্রথা সর্বপ্রথমে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে টমাস্ হেয়ার (Thomas Hare) নামক এক ব্যক্তি কর্তৃক উদ্ভাবিত হয় ও চার বৎসর পরে ডেনমার্কে অ্যাণ্ড্রি (Andrae) নামক এক ব্যক্তির দ্বারা প্রবর্তিত হয়। পরে ইহাতে কয়েকপ্রকার পরিবর্তন সাধন করা হয়। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল সংখ্যালঘুদের সংখ্যার অনুপাত হিসাবে প্রতিনিধি নির্বাচনের সুবিধা দেওয়া। যে ধরনের নির্বাচন প্রথা এখন অধিকাংশ রাষ্ট্রে প্রচলিত আছে তাহাতে সমগ্র ভোটের অল্পাংশ লাভ করিয়াও কোন দল অধিকাংশ আসন দখল করিতে পারে।

বর্তমান প্রথার দোষ

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব প্রথায় এক কেন্দ্র হইতে কয়েকজন সদস্য নির্বাচন করা হয়। একজন ভোটার একটি মাত্র ভোট দিতে পারেন, কিন্তু তিনি প্রার্থীদিগকে ১, ২, ৩, ৪ প্রভৃতি দ্বারা চিহ্নিত করিয়া তাঁহার প্রথম পছন্দ, দ্বিতীয় পছন্দ প্রভৃতি নির্দেশ দিতে পারেন। হেয়ার প্রথায় যতগুলি লোক ভোট দেন তাঁহাদের সংখ্যাকে যতগুলি আসন আছে তাহা দিয়া ভাগ করিলে যে ভাগফল পাওয়া যায় তাহার সহিত এক যোগ দিলে quota হয়। অ্যাণ্ড্রি পদ্ধতিতে ভোটের সংখ্যাকে প্রার্থীর সংখ্যার সহিত এক যোগ করিয়া ভাগ দিতে হয় ও ভাগফলের সঙ্গেও এক যোগ করিয়া quota বাহির করিতে হয়। যথা—

সমানুপতিক প্রতিনিধি নির্বাচনের পদ্ধতি

$$\frac{\text{ভোটের সংখ্যা} + ১}{\text{আসন সংখ্যা} + ১}$$

মনে করা যাক্ যে কোন কেন্দ্রে ৮০ হাজার ভোটার ভোট দিয়াছে এবং পাঁচটি আসন আছে, তাহা হইলে সহজতম পদ্ধতি অনুসারে ষোল হাজার ভোট হইবে কোটা। অন্য পদ্ধতি অনুসারে

$\frac{৮০০০০}{৫ + ১} + ১ = ১৩৩৩৪$ হইবে কোটা। প্রথম বারের গণনায় কেবল প্রথম পছন্দকে ধরা হইবে। তাহাতেই যদি এক বা একাধিক প্রার্থী quota-র অনুরূপ ভোট পান তাহা হইলে তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে

নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা হইবে। ধরুন কেহ কোটার চেয়ে বেশি ভোট পাইলেন, তাহা হইলে তাঁহার উদ্বৃত্ত ভোট-গুলিতে যে দ্বিতীয় পছন্দ আছে তাঁহাকে ঐ ভোটগুলি হস্তান্তর (Transfer) করিয়া দেওয়া হইবে। যিনি সর্বনিম্ন ভোট পাইবেন তাঁহাকে পরের বারের গণনা হইতে বাদ দেওয়া হইবে, কিন্তু তাঁহার ব্যালটপত্রে যাঁহাদিগকে দ্বিতীয় পছন্দ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহাদিগকে উহা হস্তান্তরিত করা হইবে। এইভাবে কয়েকবার গণনা করিয়া যখন নির্দিষ্টসংখ্যক প্রার্থী উল্লিখিত কোটার সংখ্যা অনুসারে ভোট পাইবেন তখন গণনা শেষ হইবে। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, এই পদ্ধতিতে ভোটারগণ একবারই ভোট দেন, কিন্তু যাঁহারা ভোট গণনা করেন তাঁহাদিগকে কয়েকবার ইঁহাদের দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ পছন্দ অনুসারে ভোটপ্রার্থীদের মধ্যে ভোট হস্তান্তরিত (transfer) করিয়া গণনা করিতে হয়।

ভোট কি করিয়া হস্তান্তর করা হয় ?

সমানুপাতিক নির্বাচনপদ্ধতির অন্য এক প্রকারের নাম List system বা তালিকাপ্রথা। ইহাতে ভোটার একটি মাত্র ভোট দেন না, কিন্তু যতগুলি আসনের জন্য একটি কেন্দ্রে নির্বাচন হইতেছে ততগুলি ভোট দিতে পারেন। বিভিন্ন দল বিভিন্ন প্রার্থীর তালিকা উপস্থিত করেন। ভোটারগণ নিজেদের পছন্দমত যে কোন তালিকাভুক্ত প্রার্থীকে ভোট দেন। ধরা যাক, একটি পাঁচ আসনযুক্ত কেন্দ্রে ৭০,০০০ ভোটার ভোট দিয়াছেন; তাহা হইলে কোটা হইবে ১৪০০১। মনে করুন, 'ক' দল ২৯,০০০, 'খ' দল ১৫,০০০, 'গ' দল ১৪,৫০০, 'ঘ' দল ১০,০০০ ও 'ঙ' দল ১,৫০০ ভোট পাইল। তাহা হইলে ক দল ২টি আসন, খ ও গ প্রত্যেকে একটি আসন পাইবেন এবং বাকী আসনটিও ক দল পাইবেন, কেন না উহাই সর্বাপেক্ষা বেশি ভোট পাইয়াছে। এই পদ্ধতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠদল তাঁহাদের সংখ্যার অনুপাতে কিছু বেশি আসন লাভ করেন। এই প্রথা ফ্রান্স, সুইট্জারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে প্রভৃতি দেশে প্রচলিত আছে।

তালিকা প্রথা

১১। সমানুপাতিক প্রতিনিধি নির্বাচন প্রথার গুণ ও দোষ : এই পদ্ধতির প্রধান গুণ হইতেছে যে ইহাতে সংখ্যালঘু দলগুলি নিজেদের

সভ্যসংখ্যার অনুপাতে কিছু সংখ্যক আসন দখল করিতে পারে। তাহাদের বক্তব্য আইনসভায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা জন্মে।

কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক ব্যক্তিও আইনসভায় প্রতিনিধি পাঠাইবার লোভে একটি দল গঠন করিতে চেষ্টা করে। দলের সংখ্যা যত বেশি হইবে মন্ত্রিপরিষদের স্থায়িত্ব তত বেশি সংকটাকুল হইতে পারে। কেননা বিভিন্ন দলের মধ্যে সাময়িক মৈত্রীর দ্বারা আইনসভার সদস্যদের মধ্যে সম্মিলিত দল গঠন করা হয় এবং উহার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য উহার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি দলকে খুসি রাখা দরকার হয়। সংসদীয় শাসন (Parliamentary Government) বজায় রাখিয়া এই পদ্ধতি অনুসরণ করিতে গেলে অনেক প্রকার উপদ্রব ভোগ করিতে হয়। সাধারণ ভোটারেরা ইহার গণনাপদ্ধতি বুঝিতে পারেন না; কিন্তু সুচতুর ভোটের দালালেরা সুনিপুণ গণনা করিয়া তাঁহাদিগকে পূর্ব হইতেই নির্দেশ দেন কাহাকে প্রথম পছন্দ, দ্বিতীয় পছন্দ ইত্যাদি দিতে হইবে। এই পদ্ধতিতে নির্বাচন কেন্দ্র এতটা বৃহৎ হয় যে, নির্বাচকদের সহিত নির্বাচিতের কোন নিবিড় সম্বন্ধ থাকে না। এই পদ্ধতিতে লোককে সংখ্যালঘু বলিয়া চিন্তা করিতে শিক্ষা দেয়। সংগঠনের শক্তি ও অর্থবল থাকিলে বিপত্নীকেরা অথবা টাকাওয়ালা লোকেরাও নিজেদের দল গঠন করিয়া এক একজন প্রতিনিধি পাঠাইতে পারেন।

বহু দলের উদ্ভব

কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার অস্থায়িত্ব

১২। সীমাবদ্ধ ভোটদান পদ্ধতি (Limited Vote System): একটি কেন্দ্রে যতগুলি প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে হইবে তাহার চেয়ে একটি বা দুইটি কম সংখ্যক ভোট ভোটারকে দিতে দেওয়া হয়। যেখানে ৫ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন, সেখানে কোন ভোটারকেই তিনটির বেশি ভোট দিতে দেওয়া হয় না; তিনটি ভোট তিনজন পৃথক ব্যক্তিকে দিতে হইবে। এই ব্যবস্থায় সংখ্যালঘুরা সম্মিলিত হইলে দুইটি আসন পাইতে পারেন। যদি চারটি ভোট দিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহারা একজন প্রতিনিধি পাঠাইতে পারেন। কোন দলই সব কয়টি আসন দখল করিতে পারেন না। এই প্রথা পর্তুগালে, ব্রেজিলে ও যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন রাজ্যে প্রচলিত আছে।

১৩। পুঞ্জীভূত ভোট পদ্ধতি (Cumulative Vote) : এই পদ্ধতি অনুসারে একটি কেন্দ্র হইতে যতগুলি প্রতিনিধি নির্বাচিত করিতে হইবে, ততগুলি ভোট প্রত্যেক ভোটারকে দিতে দেওয়া হইবে। তিনি সব কয়টি ভোট একজনকে দিতে পারেন। সব কয়টি ভোট একজনকে দিতে পারার অধিকার থাকায় সংখ্যালঘুরা সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করিলে কয়েকটি আসন দখল করিতে পারেন। ইহাতে সংখ্যালঘুদের সমর্থক ভোটের কিছু অপচয় ঘটে, কেন না নির্বাচিত হইবার জন্য যতগুলি ভোটের প্রয়োজন, তাহার অপেক্ষা বেশি ভোটই তাঁহাদের প্রার্থীর জয় সুনিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হয়। এই প্রথা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন রাজ্যে এবং ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের সংবিধান অনুসারে ভারতের কোন কোন প্রদেশে প্রচলিত ছিল।

১৪। দ্বিতীয় ব্যালট (Second Ballot) : যদি দুইটির বেশি দল হইতে একই কেন্দ্রে একজন মাত্র সদস্য নির্বাচনের জন্য প্রার্থী দাঁড় করানো হয়, তাহা হইলে কোন প্রার্থী যতক্ষণ পর্যন্ত না সমগ্র ভোটের অধিকাংশ লাভ করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয়, তৃতীয়বার ইত্যাদি ভোট লওয়া হয়। প্রথম বার ভোট লইয়া দেখা গেল একজন পনের হাজার, একজন চৌদ্দ হাজার ও একজন বার হাজার ভোট পাইয়াছেন। প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে যদি নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা হয়, তাহা হইলে ছাব্বিশ হাজার ভোটারের মতকে অগ্রাহ্য করিয়া মাত্র পনের হাজারের মত গ্রহণ করা হইল ; ঐ ব্যক্তি ৪১ হাজার ভোটের অর্ধেকের বেশি পান নাই। সুতরাং দ্বিতীয় বারে ভোট লইবার সময় তৃতীয় ব্যক্তিকে বাদ দিয়া দুইজনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে এবং যাঁহারা তৃতীয়কে ভোট দিয়াছিলেন তাঁহারা প্রথম বা দ্বিতীয়কে ভোট দিবেন। এইরূপে এবারে একজন অধিকাংশ ভোট পাইবেন। এই ব্যবস্থায় সংখ্যালঘুদের বিশেষ সুবিধা হয় না, তবে ভোট প্রথার ত্রুটির কিছুটা দূর হয়।

১৫। হস্তান্তরের অযোগ্য একমাত্র ভোট (The Single non-transferable Vote) : জাপানে নিয়ম ছিল যে, যতগুলি প্রতিনিধিই একটি কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত হউন না কেন, প্রত্যেক ভোটার একটি মাত্র ভোট দিতে পারিবেন। মনে করুন, কোন কেন্দ্রে এক লক্ষ ভোটার

আছেন, এবং পাঁচজন প্রার্থী সেখান হইতে নির্বাচিত হইবেন, ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কুড়ি হাজার ভোট পাইবেন তাঁহারাই নির্বাচিত হইবেন। এই ব্যবস্থায় সংখ্যালঘুরা চেষ্টা করিয়া তাঁহাদের একটি বা দুইটি প্রার্থীকে নির্বাচিত করাইতে পারেন।

১৬। **সংখ্যালঘুর জন্য আসন সংরক্ষণ**ঃ ভারতবর্ষে সংখ্যালঘু তপশিলী জাতিদের জন্য (Scheduled tribes) কয়েকটি আসন সংরক্ষিত আছে। এই ব্যবস্থায় তাঁহারা ঐ কয়টি আসন নিশ্চয়ই লাভ করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা ন্যূনতম যোগ্যতারও অধিকারী না হইতে পারেন।

১৭। **সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলী**ঃ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের সবচেয়ে নিকৃষ্ট পদ্ধতি হইতেছে সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলী। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ভারতবর্ষে এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। হিন্দুরা হিন্দুদের দ্বারা ও মুসলমানেরা মুসলমানদের দ্বারা নির্বাচিত হইতেন। ইহাতে প্রার্থীরা নিজেদিগকে যতটা গোঁড়া বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিতেন, তত বেশি ভোট পাইতেন। একদল টিকির ও অপর দল দাড়ির দৈর্ঘ্যের জোরে ভোট আদায় করিতেন। এইরূপ ব্যবস্থায় দুই সম্প্রদায় চিরকাল পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকেন।

অনুশীলন

১। What are the different methods by which the electorate can exercise control over their representative in modern Democracies. (1962)

(ক) Recall বা নির্বাচন নাকচ করিয়া অন্য প্রতিনিধি পাঠানো (খ) গণভোট (গ) জনমতের চাপ।

২। State the case for and against universal suffrage.

দ্বিতীয় প্রকরণ দেখ।

৩। Write an essay on Functional or Occupational Representation.

নবম প্রকরণ দেখ।

৪। Discuss the various methods of giving representation to the minorities. Discuss the case for minority representation and write an analytical note on the different methods of minority representation. (1963)

দশম প্রকরণ দেখ এবং সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব প্রথা, সীমাবদ্ধ ভোটদান, পুঞ্জীভূত ভোটদান, আসন সংরক্ষণ, দ্বিতীয় ব্যালট ও সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলী ব্যাখ্যা কর (১১—১৬ প্রকরণ)।

৫। State the case for and against Proportional Representation.

একাদশ প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

৬। What are the functions of a Legislator ? Should he be a Delegate or Representation ?

বিধানসভার সদস্যের কাজ হইতেছে (ক) আইন তৈয়ারি করা (খ) আয়ব্যয় মঞ্জুরি করা (গ) দেশের শাসন কি ভাবে চলিতেছে তাহা প্রশ্ন করিয়া খবর লওয়া (ঘ) শাসকবর্গের ত্রুটিবিচ্যুতির সমালোচনা করা এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের বিরুদ্ধে অনাস্থাপ্রস্তাব পাশ করানো। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহাকে বিচার কার্যেও অংশ গ্রহণ করিতে হয়।

যিনি বিধানসভায় নির্বাচিত হন তিনি কেবলমাত্র নির্বাচকদের Delegate নহেন। তিনি যদি শুধু নির্বাচকগণের মতামত প্রতিধ্বনিত করেন তাহা হইলে তাঁহার কর্তব্যহানি হইবে। তাঁহাকে যথার্থ প্রতিনিধি হইতে হইবে, অর্থাৎ সমস্ত তথ্য ও তত্ত্ব বিচার করিয়া নিজস্ব মত দিতে হইবে। তবে এযুগে কোন প্রতিনিধিই তাঁহার নির্বাচকদের সুস্পষ্ট নির্দেশ অমান্য করিতে সাহসী হন না।

বিংশ অধ্যায়

বিচারবিভাগ (Judiciary)

১। **বিচারবিভাগের গুরুত্ব (Importance of Judiciary) ঃ** ব্রাইস্ বলেন যে, কোন্ জাতি (nation) রাজনৈতিক সভ্যতার কোন্ স্তরে আছে, তাহা নির্ণয় করিবার সব চেয়ে ভাল উপায় হইতেছে পরীক্ষা করিয়া দেখা যে, নাগরিকদের পরস্পরের মধ্যে ও সরকারী কর্মচারী ও নাগরিকগণের মধ্যে বিচারব্যবস্থা কতটা ন্যায়ানুমোদিত ও আইনসঙ্গত। যে রাষ্ট্রে এক শ্রেণীর নাগরিক অন্য শ্রেণীর নাগরিকদের উপর অত্যাচার করিলেও বিচারালয়ে দণ্ডিত হয় না সে রাষ্ট্র অতি অল্পসময়ের মধ্যে বিপ্লবের সম্মুখীন হয়। সরকারী কর্মচারীরা পদগর্বে মদান্ধ হইয়া নাগরিকদের অধিকার পদদলিত করিতে অগ্রসর হন এবং বিচারালয় হইতে তাঁহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থা যদি না থাকে তাহা হইলে সেখানে গণতন্ত্র ব্যর্থ হইবে। বিচারকগণের আইনজ্ঞ, বিচক্ষণ ও নিরপেক্ষ হওয়া প্রয়োজন। তাঁহারা যদি শাসকগণের ভয়ে অস্থির হন তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে সুবিচার করা সম্ভব হয় না।

২। **বিচারবিভাগের কার্য ঃ** বিচারবিভাগের প্রধান কার্য হইল সুবিচার করা। একজন নাগরিকের অধিকার অন্য নাগরিকের দ্বারা বা সরকারের দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইলে, বিচারালয় হইতে প্রতিকার করা হয়। কখনো কখনো অধিকার ক্ষুণ্ণ না হইলেও, ক্ষুণ্ণ হইবে আশংকা করিয়া আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যায় এবং আদালত এমন আদেশ (Injunction) দিতে পারেন যাহাতে অন্যায় করিতে উদ্যত ব্যক্তির কুচেষ্টা নিয়ন্ত্রিত হয় ও শান্তি রক্ষা পায়। উচ্চতম আদালতে বিচার করিতে যাইয়া অনেক ক্ষেত্রে নূতন আইন সৃষ্টি করেন। প্রচলিত আইনকানুনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করাই তাঁহাদের কাজ বটে, কিন্তু এমন জটিল মকদ্দমাও তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হয় যাহার সম্বন্ধে আইনের কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় না। সে ক্ষেত্রে তাঁহারা নিজেদের

বিচার, অধিকার রক্ষা ও অবিচারের নিরোধ

ও আইন তৈয়ারি

বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া ইহার মীমাংসা করিয়া দেন। ঐ মীমাংসা পরে ঐরকম ক্ষেত্রে বিচারকের সিদ্ধান্ত আইনরূপে গৃহীত হয়।

অঙ্গীয় রাজ্যের স্বার্থ সংরক্ষণ

কেন্দ্রীয়শাসন ও আইনবিভাগের হাত হইতে আঙ্গিক রাজ্যগুলির অধিকারকে সুরক্ষা করা যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় উচ্চতম বিচারালয়ের একটি প্রধান কর্তব্য। সংবিধানে উল্লেখ করিয়া দেওয়া হয় কোন্ কোন্ বিষয় কেন্দ্রীয় সংস্থা সমূহের অধিকারভুক্ত আর কোন্ কোন্ বিষয়ই বা আঙ্গিক রাজ্যগুলির এক্তিয়ারে পড়ে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার আঙ্গিক রাজ্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিলে বিচারালয় হইতে তাহার প্রতিকার করা হয়।

সংবিধানের অভিভাবকত্ব

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের অভিভাবকরূপে গণ্য হয়। সংবিধানের কোন বিধি ভঙ্গ করিয়া যদি কংগ্রেস কোন আইন প্রণয়ন করে এবং তাহাদের যদি কেহ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা হইলে তাহার অভিযোগের বিচারকালে সুপ্রিম কোর্ট ঐ আইনকে বা উহার অংশ বিশেষকে নাকচ করিয়া দিতে পারে। ইংলণ্ডের বিচারালয়ের এরূপ ক্ষমতা নাই। পার্লামেণ্ট যে আইনই পাশ করে, তাহা ইংলণ্ডের প্রত্যেক আদালত প্রয়োগ করিতে বাধ্য।

শাসন-বিষয়ক কাজ

বিচারবিভাগ শাসনসংক্রান্ত কিছু কাজও করিয়া থাকে। নাবালকের সম্পত্তির অছি নিযুক্ত করা, দেউলিয়ার বা ফেলপড়া ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে পাওনা আদায় করা প্রভৃতি কাজ বিচারালয়কে করিতে হয়।

পরামর্শ দান

উচ্চতম বিচারালয়ের নিকট কখনো কখনো কোন কোন রাষ্ট্রের শাসনবিভাগ কোন আইন-ঘটিত ব্যাপারে পরামর্শ চাহিতে পারে। বিচারকগণ তখন নিজেদের মত দিতে বাধ্য, কিন্তু শাসনবিভাগ উহা মানিয়া লইতে বাধ্য নহে।

৩। বিচারবিভাগের স্বাধীনতা: বিচারবিভাগের স্বাধীনতার উপর গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে। বিচারকগণ যদি শাসনবিভাগ অথবা আইনবিভাগের মুখাপেক্ষী হন, তাহা হইলে তাঁহারা নিরপেক্ষ বিচার করিতে পারেন না। ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজা

বিচারকদের নিযুক্ত করিতেন এবং রাজা ইচ্ছা করিলেই তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারিতেন। তাই বেকনের ন্যায় মণীষীও বলিয়াছিলেন যে, বিচারক সিংহের মতন বিক্রমশালা ও ন্যায়পরায়ণ বটে, কিন্তু তিনি রাজার সিংহাসন-বহনকারী সিংহ। স্টুয়ার্ট রাজারা তাঁহাদের রাজনৈতিক শত্রুদিগকে বিচারকদের সাহায্যে নির্যাতিত করিতেন।

বিচারকের চাকুরির স্থায়িত্ব

১৭০১ খৃষ্টাব্দে Act of Settlement-এ স্থির হয় যে, বিচারকেরা যতদিন ভালভাবে কাজ করিবেন ততদিন তাঁহাদিগকে অপসারণ করা হইবে না। যদি কোন বিচারকের বিচার নিরপেক্ষ হইতেছে না বলিয়া সন্দেহ হয় তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ আনিয়া লর্ড সভায় ও কমন্স সভায় পেশ করিতে হয়। যদি উভয় সভার অধিকাংশ সদস্য উহা সমর্থন করেন তাহা হইলে রাজা বা রানী অভিযুক্ত বিচারককে পদচ্যুত করিবেন। এই নীতি উচ্চতম আদালতের বিচারকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নিম্নতন আদালতের বিচারকদিগকে লর্ড চ্যান্সেলর পদচ্যুত করিতে পারেন বটে, কিন্তু তিনি কদাচিৎ এই ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। বিচারকদিগের চাকুরির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা থাকিলে তাঁহারা নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে পারেন না। আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারককে পদচ্যুত করিতে হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের প্রথম সদন দ্বিতীয় সদনের নিকট অভিযোগ করিবে এবং দ্বিতীয় সদন বা সেনেট উহার বিচার করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারে। এই পদ্ধতিতে বিচারক তাঁহার স্বপক্ষে প্রমাণাদি উপস্থিত করিতে পারেন, কিন্তু ইংলণ্ডে তাহা হয় না; অনেক আঙ্গিক রাজ্যে বিচারকেরা স্বল্পকালের জন্য নির্বাচিত হন। যাঁহাদের সমর্থনের উপর তাঁহার পদপ্রাপ্তি নির্ভর করে তাঁহাদিগকে তিনি অসন্তুষ্ট করিতে পারেন না। পুনরায় নির্বাচিত হইবার আশায় তিনি বিচারকালে পক্ষপাতিত্ব করিতে পারেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় উচ্চতম আদালতের বিচারকেরা সত্তর বৎসর বয়সে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের সুপ্রীম কোর্টের বিচারকেরা ৬৫ বছর বয়সে ও হাইকোর্টের বিচারকেরা ৬০ বছর বয়সে অবসর গ্রহণ করেন।

অপসারণ করিবার পদ্ধতি

বিচারকদের নিয়োগের পদ্ধতির উপরও তাঁহাদের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা নির্ভর করে। বিচারককে সাধারণতঃ তিনটি পদ্ধতিতে নিযুক্ত করা হয়—জনসাধারণের নির্বাচন, আইনসভার দ্বারা নির্বাচন এবং শাসনবিভাগের দ্বারা নিয়োগ। জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচন করাইলে যাঁহাদের উপর লোকের আস্থা আছে তাঁহারা নির্বাচিত হইতে পারেন বটে, কিন্তু বিচারকের আইন জ্ঞান ও চরিত্রবল কতদূর তাহা বুঝিবার ক্ষমতা সাধারণ লোকের নাই। ভোট সংগ্রহ করিবার শক্তি ও নিরপেক্ষ বিচার করিবার সামর্থ্য এক জিনিস নহে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ৩৬টি আঙ্গিক রাজ্যে বিচারকেরা জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হন। জনসাধারণের নির্বাচন অপেক্ষা আইনসভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচন অনেক ভাল। কেন না ঐ সদস্যেরা বিচার করিতে পারেন যে, কোন প্রার্থী বিচারক হইবার উপযুক্ত কিনা। কিন্তু আইনসভায় রাজনৈতিক দলের প্রভাব থাকে। কেবলমাত্র যোগ্যতার মাপকাঠিতে কেহ নির্বাচিত হইতে পারেন না। সোভিয়েট ইউনিয়নে সুপ্রিম সোভিয়েট নামক আইনসভার উভয় কক্ষ সম্মিলিত ভাবে পাঁচ বৎসরের জন্য উচ্চতম আদালতের বিচারকদিগকে নির্বাচিত করে। অভিজ্ঞতা লাভের পক্ষে পাঁচ বৎসর কাল খুব অল্প সময়; তবে রাশিয়ায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি নাই বলিয়া সেখানে জটিল দেওয়ানী মকদ্দমার সংখ্যা খুব অল্প। সুইট্‌জারল্যাণ্ডেও আইনসভার দ্বিসদনের সম্মিলিত অধিবেশনে ২৪ জন বিচারককে ছয় বৎসরের জন্য নির্বাচিত করা হয়; তবে সেখানে অধিকাংশ বিচারকই পুনরায় নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় শাসনবিভাগ কর্তৃক আইনজীবীদের মধ্য হইতে বিচক্ষণ ব্যক্তিকে বিচারক-রূপে নিযুক্ত করা হয়। ইংলণ্ডে উচ্চতম বিচারকদিগকে প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য বিচারককে লর্ড চান্সেলর নিযুক্ত করেন। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি সেনেটের অনুমোদন লইয়া সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদিগকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। ফ্রান্সে বিচারকেরা পূর্বে বিচারবিভাগের মন্ত্রীর দ্বারা নিযুক্ত হইতেন, কিন্তু পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে নয়জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি High council of the Judiciary নামক পরিষদের সুপারিশে রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত হন।

জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচন

আইনসভার দ্বারা নির্বাচন

উচ্চতম আদালতের বিচারকদের বেতন যথাযোগ্য হওয়া দরকার। বেতন কম হইলে যোগ্য লোকে বিচারক হওয়া অপেক্ষা ওকালতী করা পছন্দ করেন। যে বেতনে বিচারককে নিযুক্ত করা হইবে তাহা যেন তাঁহার কার্যকালের মধ্যে কমানো না হয়।

উপযুক্ত বেতন

উচ্চতম বিচারালয়ের বিচারকদিগকে অবসর গ্রহণের পর আর কোন কাজে নিযুক্ত করা উচিত নহে। যদি তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, মন্ত্রীদের মন জোগাইয়া বিচার করিলে অবসর গ্রহণের পর তাঁহাদিগকে লাটসাহেব রাজদূত বা অনুরূপ কোন উচ্চপদে নিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা আছে তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে নিরপেক্ষ বিচার করা কঠিন হয়।

অবসর প্রাপ্ত বিচারককে পুনরায় নিয়োগ করা

লাস্কি বলেন যে, বিচারকেরা সমাজের উচ্চশ্রেণী হইতে নিযুক্ত হন। সেইজন্য যখন শ্রমিকের সঙ্গে ধনীদের সংঘর্ষ বাঁধে তখন তাঁহাদের সহানুভূতি নিজেদের শ্রেণীর উপর থাকা বিচিত্র নহে। কিন্তু সাধারণতঃ বিচারকেরা শ্রেণীগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে থাকেন।

শ্রেণীগত স্বার্থবোধ

৪। **প্রশাসনীয় বিচারালয় (Administrative Courts):** ফ্রান্সে সরকারী কর্মচারিগণকে বিচারবিভাগের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রশাসনীয় বিচারালয় (Administrative Court) স্থাপিত হইয়াছিল। কালক্রমে উহাতে জনসাধারণ সরকার ও তাহার কর্মচারীদের অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিতে আরম্ভ করে। এই প্রকার বিচারালয়ে অল্প সময়ের মধ্যে কম খরচায় সুবিচার পাওয়া যায়। ফ্রান্সে জনসাধারণের সহিত সরকারের সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র আইনপদ্ধতির উদ্ভব হয়। উহাকে প্রশাসনীয় আইন বা Administrative Law বলা হয়। ডাইসি ফ্রান্সের প্রথার নিন্দা করিয়া বলেন যে ইংলণ্ডে রাজা, প্রজা, সরকারী কর্মচারী ও সাধারণ নাগরিক সকলেই একই আইনের অধীন, একই প্রকার আদালতে সকলের বিচার হয়; সুতরাং ইংলণ্ডে আইনের শাসন (Rule of Law) আছে; কিন্তু ফ্রান্সে উহা নাই।

ফ্রান্সের প্রথা

এ কথা এখন আর সত্য নহে। সরকারের কার্যক্ষেত্র প্রসার লাভ

করায় একদিকে যেমন পার্লামেন্টের পক্ষে সকল বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ নিয়ম করা সম্ভব হয় না, তেমনি সাধারণ আদালতের বিচারকদের শিল্প, বাণিজ্য, অর্থনীতি সংক্রান্ত বিষয়ের খুঁটিনাটি জ্ঞান থাকে না। কাজেই ইংলণ্ডে এখন আইন করিবার সময় পার্লামেণ্ট সাধারণ নীতিমাত্র (General Policy) লিপিবদ্ধ করিয়া সংশ্লিষ্ট শাসনবিভাগকে উহার অন্তর্গত নিয়মকানুন বসাইবার ক্ষমতা প্রদান করেন। ঐ সব বিভাগের কর্মচারীরা আবার উহা প্রযোগ করিয়া সাধারণের অভিযোগের বিচার করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বস্তি-অঞ্চল ও শ্রমিকদের বাসস্থান লইয়া মামলার আপিলের শুনানি হয় স্বাস্থ্য-বিভাগের মন্ত্রীর দপ্তরে। দেউলিয়া, পেটেণ্ট অধিকার, যৌথ ধন কোম্পানী প্রভৃতি বিষয়ের মামলার বিচারের ভার আছে বাণিজ্য দপ্তরের (Board of trade) উপর। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও ঐ ধরনের বিচারালয়ের (Administrative tribunals) উদ্ভব হইয়াছে।

প্রশাসনীয় বিচারালয়ের প্রয়োজনীয়তা

প্রশাসনীয় বিচারালয়ে এমন ব্যক্তিদের উপর বিচারকার্যের ভার দেওয়া উচিত যাঁহারা আইন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। তাঁহারা যেন শুধু লিখিত অভিযোগ নহে, মৌখিক নালিশেরও বিচার করেন। বাদী প্রতি-বাদীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তথ্য নির্ণয় করা কর্তব্য। তাঁহারা যদি আইনঘটিত কোন তর্ক উপস্থিত করেন তাহা মীমাংসা করিবার চেষ্টা করা উচিত। তথ্য ও আইন উভয়েরই প্রতি লক্ষ্য করিয়া সুবিচার করা প্রয়োজন। সরকারী কর্মচারীরা যদি ঐ সব নিয়ম মানিয়া বিচার করেন তাহা হইলে উহার ফলে কাহারও অসন্তুষ্ট হইবার কথা নহে।

উহার বিচার পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত

অনুশীলন

১। Discuss the principles of organisation of Judiciary in modern States. (1962)

এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে বিচারালয়ের সংগঠন ব্যাপারে দেখা প্রয়োজন যে বিচারকগণ যেন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হন। তাঁহাদিগকে রাজকর্মচারীদের

উপরও বিচার করিতে হয়। সেজন্য ফ্রান্সে Administrative Courts আছে। চতুর্থ প্রকরণ দেখ।

যুক্তরাষ্ট্রের আদালত সদস্য রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের মধ্যেও তাহাদের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের বিবাদ বিসম্বাদের মীমাংসা করেন। সেইজন্য বিচারালয়ের গুরুত্ব সেখানে বেশি। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত আছে আবার সদস্যরাষ্ট্রের আদালতও আছে। প্রথমোক্ত আদালত যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনকাম্বন সম্পর্কিত মামলার বিচার করেন আর সদস্য রাষ্ট্রগুলির আইন বিষয়ে মকর্দ্দমার নিষ্পত্তি করা হয় তাঁহাদের নিজস্ব আদালতে। কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াতে কিন্তু নিম্ন আদালতসমূহ রাষ্ট্রীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় উভয় প্রকার মামলারই বিচার করেন। ভারতবর্ষেও সমগ্র বিচারালয় একই প্রকারের—তাহাতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় ধরনের আইনঘটিত মকর্দ্দমার শুনানি হয়।

নিম্ন আদালতের বিচারকগণ রাশিয়াতে ও আমেরিকায় জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হন। তাহাতে তাঁহাদের নিরপেক্ষতা রাখা কঠিন হয়। সুইট্জারল্যাণ্ড আইনসভার উভয় কক্ষ মিলিত হইয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারককে নির্বাচন করেন। আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট প্রথমে সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের নাম স্থির করেন পরে তিনি সেনেটের নিকট উহা পেশ করেন। অর্থাৎ সেখানে শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগের এক কক্ষ সম্মিলিত ভাবে বিচারককে নিযুক্ত করেন। ইংলণ্ডে প্রধানমন্ত্রী লর্ড চান্সেলরের সুপারিশ অনুসারে বিচারক নিযুক্ত করেন।

২। Point out the importance and functions of the Judiciary in a modern state. (1964)

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকরণ দেখ।

৩। How can the independence of Judiciary be guaranteed ?

তৃতীয় প্রকরণ দেখ।

রাজনৈতিক দল ও জনমত

১। সংজ্ঞা ও স্বরূপঃ রাজতন্ত্রে বা এক ব্যক্তির শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয় না; যদি বা হয় তাহা হইলে উহার উদ্দেশ্য হয় শাসকের বিরুদ্ধে জনমত গড়িয়া তোলা। একচ্ছত্র শাসক তাহা করিতে দেন না। তিনি কঠোর হস্তে উহাকে দমন করেন। যদি দমন করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে ঐ দল বলপূর্বক তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করে। অভিজাততন্ত্রে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হস্তে ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। তাঁহারা নিজেদের মধ্যে আপোষে আলাপ-আলোচনা করিয়া কার্যনীতি স্থির করেন। সেইজন্য তাঁহারা রাজনৈতিক দল স্থাপন করিবার প্রয়োজন অনুভব করেন না।

কেবলমাত্র গণতন্ত্রেই রাজনৈতিক দল সম্ভব

তাঁহাদের বিরুদ্ধে যদি কোন গোষ্ঠী দাঁড়াইতে চাহে তবে উহাকে চক্রান্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, কেননা শাসক প্রকাশ্যে প্রচার করিবার অনুমতি দেন না। কি রাজতন্ত্রের বেলায় কি অভিজাততন্ত্রের ক্ষেত্রে যে বিরুদ্ধবাদীরা দাঁড়ান তাঁহাদিগকে রাজনৈতিক দল বলা চলে না। কেননা সাধারণতঃ রাজনৈতিকদল প্রচলিত শাসনতন্ত্রকে জোর করিয়া অথবা ষড়যন্ত্র করিয়া উৎখাত করিতে চাহে না। রাজনৈতিকদল বৈধ উপায়ে জনমতকে নিজেদের অনুকূল করিয়া সরকারী ক্ষমতা দখল করিতে চাহে। ক্ষমতা দখল করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য, তবে ঐ উদ্দেশ্য সাধনের সুবিধা হইবে বলিয়া দেশের আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে কতকগুলি কার্যনীতি ঘোষণা করে এবং জনসাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করে যে ঐ কার্যনীতিই সর্বোত্তম, সুতরাং ঐ দলকে ভোট দেওয়া সকলের কর্তব্য। প্রত্যেক দল অবশ্য পৃথক্ পৃথক্ কার্যনীতি অবলম্বন করে।

কিন্তু কোন দলেরই কার্যনীতি দীর্ঘকাল ধরিয়া অপরিবর্তিত থাকে না। আমেরিকার রিপাবলিকান দল জেফারসনের সময় আমূল সংস্কার চাহিতেন এবং গরীবদের সমর্থন প্রার্থনা করিতেন। এখন তাঁহারা সংরক্ষণশীল হইয়াছেন।

দলের নীতি অপরিবর্তনীয় নহে

ডেমোক্রেটিক দল পূর্বে অনেক সময় সংরক্ষণের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু

এখন তাঁহারা উদারনীতির সমর্থন করেন। ইংলণ্ডে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার ভোট সম্প্রসারণের পর সংরক্ষণশীল ও উদারনৈতিক দল পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়া শ্রমজীবীদের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কেননা শ্রমিকেরা ভোটের অধিকারী হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সংরক্ষণশীল দলও জনকল্যাণনীতি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ভারতবর্ষের দক্ষিণপন্থী, মধ্যপন্থী ও বামপন্থী দলগুলির কার্যনীতি সম্বন্ধীয় ঘোষণাপত্র পাঠ করিলে উহাদের মধ্যে যেমন পার্থক্য তেমনি সৌসাদৃশ্যও দেখা যায়।

রাজনীতির ক্ষেত্রে দল তো আছেই, তা ছাড়া সরকারের উপর চাপ দিয়া কাজ করাইয়া লইবার জন্য নানারূপ Pressure Groups বা চাপ-গোষ্ঠীও আছে। রাজনৈতিক দলের বড় প্রশ্ন হইতেছে ক্ষমতা কে পরিচালনা করিবে 'ক' দলের নেতারা, কি 'গ' দলের নেতারা? আর চাপ দেওয়ার জন্য যে সংগঠনগুলি আছে তাহারা যে কোন ভাবে, বা উপায়ে তাহাদের অভীষ্ট কার্য সিদ্ধ করিতে চায়। রাজনৈতিক দল নিজেদের প্রার্থিগণের নির্বাচনে কামনা করে, কিন্তু চাপ দিবার জন্য যে সব গোষ্ঠী আছে (Pressure Groups) তাহারা নির্বাচিত ব্যক্তিদের দিয়া অথবা শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা নিজেদের স্বার্থ সাধন করাইয়া লইতে চাহে। এই সব সংগঠন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে মোটা টাকা চাঁদা দেয়, বড় বড় নেতাদিগকে সম্বর্ধনা করে, ক্ষমতাশালী রাজকর্মচারীদিগকে পরোক্ষভাবে নানারূপ উপহার দেয়, আবার সভাসমিতি করিয়া নিজেদের দাবি জানায়। সময় সময় ভাড়াটে লোকদের দিয়া তাহাদের দাবি সমর্থন করাইয়া পুস্তক, পুস্তিকা ও প্রবন্ধাদি লেখায়। নানারূপ বণিক সভা, শিল্পপতি গোষ্ঠী প্রভৃতি এইরূপে নিজেদের অনুকূলে আইন পাশ করাইয়া লন এবং এমন প্রশাসনীয় আদেশ সংগ্রহ করেন, যাহাতে তাঁহাদের মুনাফা বৃদ্ধি পায়।

দলের সহিত চাপ-গোষ্ঠীর পার্থক্য

চাপগোষ্ঠীর কাজ লবিয়িংয়ের কাজের চেয়ে বেশি ব্যাপক। লবিয়িং বলিতে কেবলমাত্র আইনসভার আশেপাশে ঘুরিয়া প্রভাবশালী সদস্যদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিয়া অভিষ্ট আইন পাশ করাইয়া লওয়া বুঝায়। কিন্তু চাপগোষ্ঠী শুধু আইন পাশ করাইয়া

লবিয়িং ও চাপগোষ্ঠী

সন্তুষ্ট থাকে না, তাহারা মন্ত্রী ও উচ্চকর্মচারীদের নিকট হইতে লাইসেন্স, পারমিট, হুকুমনামা প্রভৃতিও আদায় করিয়া লয়। Pressure groups-য়ের স্বার্থ অপেক্ষা রাজনৈতিক দলের স্বার্থ বৃহত্তর।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বার্ক রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা নিরূপণ করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন, কতকগুলি লোক যখন তাহাদের সমবেত চেষ্টার দ্বারা সার্বজনীন স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে কতকগুলি নীতি সম্বন্ধে একমত হইয়া সংঘবদ্ধ হয়, তখন রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। এখানে বার্ক জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করাকেই রাজনৈতিক দলের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়াছেন। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই বলে যে, তাহারা সকলের হিতসাধন করিতে চায়; কিন্তু কিসে সকলের মঙ্গল হয়, এবং কেমন করিয়া উহা লাভ করা যায় সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকে। এক এক দলের এক এক রকম মত। একটি দল এমন কার্যনীতি গ্রহণ করে, যাহাতে দলের সদস্যেরা ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে এবং অন্য দল হইতে তাহাদের পার্থক্য বুঝা যায়। তাহারা ঐ কার্যনীতিকে সফল করিবার জন্য বৈধ উপায়ে শাসন ক্ষমতা দখল করিতে চাহে। সেইজন্য ম্যাক্ আইভার বলিয়াছেন—"We may define a political party as an association organised in support of some principle or policy which by constitutional means it endeavours to make the determinant of Government." বার্কার বলেন যে, প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের বিশেষ কতকগুলি মত থাকে বলিয়াই উহা রাজনৈতিক দলরূপে পরিচিত হয়। ঐ মতবাদ দেশের সার্বজনীন স্বার্থ লইয়াই গঠিত। নির্বাচকগণকে উহা মানিয়া লইবার জন্য আহ্বান করা হয়। তাঁহাদের অধিকাংশের সমর্থন লাভ করিতে পরিলে ঐ দল শাসনযন্ত্র দখল করিতে পারে।

সংজ্ঞা

এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, রাজনৈতিক দলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে আইনসঙ্গত উপায়ে কাজ করিয়া ক্ষমতা লাভ করা। তাহারা লোককে বুঝাইয়া সুঝাইয়া নিজেদের মতে আনিতে চাহে। সেইজন্য প্রত্যেক দলের সার্বজনীন কল্যাণ সাধন সম্বন্ধে কিছু বিশিষ্ট মত থাকা দরকার। যাহারা মারামারি কাটাকাটি করিয়া সরকারকে উৎসন্ন করিয়া ক্ষমতা দখল করিবার

রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য

পক্ষপাতী, তাহাদিকে প্রচলিত অর্থে রাজনৈতিক দল বলা চলে কিনা সন্দেহ। ১৯১৭ সালের রাষ্ট্র-বিপ্লবের পূর্বে বলশেভিক দল এবং ক্ষমতা অধিকারের পূর্বে ফাসিস্ট ও নাৎসী দল বলপূর্বক ক্ষমতা দখল করা সমর্থন করিত। তাহারা ক্ষমতা লাভ করিবার পর অন্য কোন দলকে জনমত সংগঠনের স্বাধীনতা দেয় নাই।

দলের প্রতি অবিচল আনুগত্য

যে কোন রাজনৈতিক দলের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতার অত্যন্ত প্রয়োজন। দলের লোকেরা তর্কবিতর্ক করিয়া মত স্থির করিবেন, কিন্তু সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে তাহা সকলকেই মাথা পাতিয়া মানিয়া লইতে হইবে। যদি দলের সভ্যেরা নিজেদের ইচ্ছা বা সুবিধা মত ঐ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন তাহা হইলে দল টিকিতে পারে না। দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রতি অচল আনুগত্য রক্ষা করাও দরকার।

২। **রাজনৈতিক দলের উদ্ভবের কারণঃ** সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে হুইগ ও টোরি দলের উদ্ভবের কারণ নির্ণয় করিতে যাইয়া মেকলে বলেন যে সকল স্থানেই এমন একদল লোক দেখা যায়, যাঁহারা যাহা কিছু সেকালের তাহাই অত্যন্ত প্রীতির সহিত আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহেন; যতই কেন যুক্তিতর্কের দ্বারা নূতন কিছু করিবার প্রয়োজনীয়তা বুঝানো যাক না তাঁহাদের মনের সন্দেহ ও আশংকা কিছুতেই দূর হয় না। আবার অন্য এক শ্রেণীর লোকও দেখা যায় যাঁহারা জোরের সঙ্গে আশা করেন, সাহসের সঙ্গে বিচার করেন, বর্তমানের দোষত্রুটি অবিলম্বে লক্ষ্য করেন এবং যে কোন পরিবর্তনকে উন্নতি বলিয়া মনে করেন। তাঁহার মতে প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকেরা হয় সংরক্ষণশীল এবং অন্যেরা হয় উদারনৈতিক।

মনোভাব অনুসারে লোককে চার ভাগে বিভক্ত করা যায়

আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদেরা দুই শ্রেণীর পরিবর্তে লোকের মনোবৃত্তিকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। যাঁহারা অতীতের দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকেন, যাহা কিছু সেকালে ছিল তাহাই ভাল ছিল এবং উহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য যত্ন করেন তাঁহাদিগকে প্রতিক্রিয়াশীল বলা হয়। যাঁহারা বর্তমানকেই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করেন, সুতরাং কোনরূপ পরিবর্তন চাহেন না, তাঁহাদিগকে সংরক্ষশীল বলা চলে। যাঁহারা অতীত ও বর্তমানকে

অস্বীকার না করিলেও ভবিষ্যতের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকেন ও সমাজের ক্রমবিকাশ চাহেন, তাঁহাদিগকে উদারনৈতিক বলা যায়। আর যাঁহারা অতীতকে অগ্রাহ্য করিয়া এবং বর্তমানকে সমূলে উৎখাত করিয়া ভবিষ্যৎ সমাজের ভিত্তি স্থাপন করিতে উৎসাহী, তাঁহাদিগকে অতিরিক্ত প্রগতিবাদী বা Radical বলা হয়। স্যার হেনরি মেইন্ আর এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মানুষের মনে সংগ্রাম করিবার যে আদিম ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে তাহারই বশে লোকে রাজনৈতিক দলে ঐক্যবদ্ধ হয়। নীতিগত, বিচারগত ও ঐতিহাসিক ঘটনা হইতে উদ্ভূত মতবাদ এক দল হইতে অন্য দলকে পৃথক করে বটে, কিন্তু সাধারণ লোকে এ সব সূক্ষ্ম পার্থক্য কমই বুঝে এবং শীঘ্রই উহা বিস্মৃত হয়। তাহারা নির্বাচনক্ষেত্রে জয়-পরাজয় বুঝে এবং লড়াইয়ের উন্মাদনা লইয়া ভোট সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়।

লড়াইয়ের প্রবৃত্তি হইতে দলের উদ্ভব

মনস্তাত্ত্বিক কারণের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু অর্থনৈতিক বৈষম্যই রাজনৈতিক দলের প্রধান কারণ। যাঁহাদের বিষয়সম্পত্তি আছে তাঁহারা নিরুপদ্রবে উহা ভোগ করিতে চাহেন। সুতরাং তাঁহারা কোন পরিবর্তন চাহেন না। পরিবর্তনকে তাঁহারা ভীতি ও সন্দেহের চোখে দেখেন, কেন না, পরিবর্তনের ফলে তাঁহাদের সুবিধা নষ্ট হইতে পারে। যাঁহাদের বিষয় সম্পত্তি কিছুই নাই, খাটিয়া দিন মজুরি যোগাড় করিতে হয়, তাঁহাদের আশাভরসা নির্ভর করে ভবিষ্যতের উন্নততর সমাজব্যবস্থার উপর। সুতরাং তাঁহারা পরিবর্তন, এমন কি আমূল পরিবর্তন কামনা করেন। লাস্কী বলেন যে, সম্পত্তি সম্বন্ধে জনমতকে নিজেদের চিন্তাধারা অনুসারে নিয়ন্ত্রণ করিবার যন্ত্র হইতেছে রাজনৈতিক দল। ("The party is a mechanism to control public opinion about property in the particular way its members deem desirable").

আর্থিক কারণ

কোন কোন অনুন্নত রাষ্ট্রে ধর্মের ভিত্তিতে, ভাষার ভিত্তিতে বা আঞ্চলিক স্বার্থের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্ম হইতেছে নিভৃত সাধনা ও উপলব্ধির বস্তু। দল পাকাইয়া মাতামাতি করা যায়, জোরজবরদস্তি করা

যায়, কিন্তু ধর্মলাভ করা যায় না। ইউরোপে সপ্তদশ শতাব্দীতে ধর্মের নামে ত্রিশ বর্ষব্যাপী যুদ্ধ হইয়াছিল। ভারতবর্ষেও ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথা প্রচলিত থাকায় ধর্মের নামে দলাদলি ও মারামারি কাটাকাটি চলিয়াছিল।

সাম্প্রদায়িক দল

৩। **রাজনৈতিক দল ও প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রঃ** রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের অপরিহার্য অঙ্গ। তাই ফাইনার বলিয়াছেন—"Representative Government is the party Government." প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে যখন ভোটের অধিকার দেওয়া হয়, তখন রাজনৈতিক দল না থাকিলে ভোটারদিগকে তালিকাভুক্ত করা, ভোট গণনার কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়া এবং বিশেষ প্রার্থীর পক্ষে ভোট দেওয়া অসম্ভব হয়। রাজনৈতিক দল না থাকিলে নির্বাচন প্রার্থীকে মনোনয়ন (nomination) করানো, তাঁহার নির্বাচনের জন্য চেষ্টা করানো এবং নির্বাচিত ব্যক্তিদিগকে দিয়া মিলিত ভাবে কাজ করানো খুবই কঠিন হয়। মনে করা যাক্, একটি নির্বাচনকেন্দ্রে তিন লক্ষ ভোটার আছে। দলের অস্তিত্ব না থাকিলে হয়তো একশত বা দেড়শত লোক নির্বাচন প্রার্থী হইলেন। তাঁহাদের নামের এক সুদীর্ঘ তালিকা ছাপাইয়া ভোট গ্রহণের স্থানে ভোটারের হাতে দিলে, তিনি উহা হইতে একজনকে নির্বাচন করিয়া লইবেন কিরূপে? প্রার্থীদের পক্ষে তিন লক্ষ ভোটারের বাড়ি বাড়ি যাইয়া ভোট প্রার্থনা করা কঠিন, আর ভোটারের পক্ষেও অত প্রার্থীর গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া একজনকে ঠিক করা আরও কঠিন। যদি বা কোন রকমে নির্বাচন হইল তখন পাঁচসাতশত সদস্য আইন-সভায় মিলিত হইয়া কাজ করিবেন কিরূপে? আজ তাঁহারা যে মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করিলেন কাল উহাকে নাও করিতে পারেন। ফলে মন্ত্রিসভার ঘন ঘন পরিবর্তন হইবে এবং দেশের শাসন ব্যাপারে বিন্দুমাত্র পৌর্বাপর্য রক্ষিত হইবে না। আজ এক নীতি কাল অন্য নীতি অনুসৃত হইবে। এই ভাবে দেখা যায় যে রাজনৈতিক দল না থাকিলে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র শাসন চালানো অত্যন্ত কঠিন, এমন কি অসম্ভব হয়। ছোটখাটো নগররাষ্ট্রে সকল ভোটার এক

প্রার্থী ঠিক করা ও ভোটভিক্ষা

আইনসভায় দলের নিয়মানুবর্তিতা

জায়গায় মিলিত হইয়া প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণপূর্বক শাসন চালাইতে পারে। সেখানে রাজনৈতিক দল না হইলেও চলে। ভারতের গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে যাহাতে রাজনৈতিক দলের প্রভাব না থাকে সে বিষয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে নির্দেশ দিয়াছেন। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের মত রাষ্ট্রে গণ-উদ্যোগ, গণভোট প্রভৃতি আছে বলিয়া সেখানেও রাজনৈতিকদল তত অপরিহার্য নহে, কিন্তু অন্যান্য সকল গণতান্ত্রিক দেশেই রাজনৈতিকদলের প্রয়োজন হয়।

৪। রাজনৈতিক দলের কার্য (Functions of political party): রাজনৈতিক দলের প্রথম কার্য হইল উপযুক্ত প্রার্থীকে দাঁড় করানো। সাধারণতঃ নির্বাচনকেন্দ্রের এলাকাভুক্ত স্থানের বাসিন্দাকে প্রার্থীরূপে দাঁড করানো হয়। কিন্তু বিশেষ কোন প্রখ্যাত ব্যক্তিকে বাসিন্দা না হইলেও মনোনয়ন দেওয়া হয়। যদিও ভোটারেরা দলের জন্যই ভোট দেন, তথাপি প্রার্থী কর্মঠ, সচ্চরিত্র ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হইলে ভোট জোগাড করা সহজ হয়।

প্রার্থী মনোনয়ন

রাজনৈতিক দলের দ্বিতীয় কার্য হইতেছে মনোনীত প্রার্থীকে নির্বাচন-রূপ বৈতরণী পার করিয়া দেওয়া। প্রতিকেন্দ্রে ভোটারের সংখ্যা এত বেশি যে, দলের সাহায্য না পাইলে কাহারো পক্ষে সকল ভোটারকে ভোট দিতে অনুরোধ জানানোও কঠিন হয়। সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক দলগুলির অনেকগুলি করিয়া স্থানীয় কর্মী থাকেন। তাঁহারা নির্বাচনের অনেক পূর্ব হইতেই কাজ আরম্ভ করেন। যাঁহাদের ভোট দিবার উপযুক্ত যোগ্যতা আছে, অথচ যাঁহাদের নাম ভোটারের তালিকায় স্থান পায় নাই, এমন সকল ব্যক্তিকে দিয়া দরখাস্ত করাইয়া তাঁহারা তাঁহাদিগকে ভোটার করেন। নির্বাচনের দুই চারিদিন পূর্বে প্রত্যেক ভোটারকে তাঁহারা বলিয়া দেন যে, কোন্ স্থানে যাইয়া ভোট দিতে হইবে এবং ভোটার তালিকায় তাঁহাদের ক্রমিক সংখ্যা কত। এরূপ সংবাদ না পাইলে ভোটারের পক্ষে ঠিক স্থানে যাওয়া কঠিন এবং যাইলেও ব্যালটপত্র পাওয়া সহজসাধ্য হয় না। নির্দলীয় প্রার্থী আজকাল ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় নাই বলিলেই চলে, ভারতবর্ষে অনেক নির্দলীয় প্রার্থী দেখা যায়, কিন্তু তাঁহাদের

ভোটার তালিকায় নাম তোলানো

ভোটকেন্দ্রের খবর

মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিরই জামানত বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়। তাহার প্রধান কারণ ব্যক্তিগতভাবে বা মাহিনা করা লোক দিয়া অত বেশি ভোটারের সমর্থন সংগ্রহ করা সহজ নহে।

রাজনৈতিক দলের তৃতীয় কার্য হইতেছে জনসাধারণের ঔদাসীন্য দূর করিয়া তাঁহাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার করা। সাধারণ লোকে নিজ নিজ সমস্যা লইয়া ব্যস্ত থাকে। জীবিকা অর্জনের জন্য সারাদিন প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া অবসর কালে তাঁহারা খেলাধূলা করিয়া বা গল্পগুজব করিয়া কাল কাটান। রাজনৈতিক দলগুলি তাঁহাদিগকে সভাসমিতিতে আহ্বান করেন। সেখানে দেশের নানাবিধ সমস্যা লইয়া বক্তৃতা দেওয়া হয়। যাঁহারা সভায় উপস্থিত হন না তাঁহাদের জন্য লেখা প্রবন্ধ, পুস্তকাদি ছাপানো হয়। আবার পথে চলিতে চলিতেও যাহাতে লোকে প্রার্থীদের ও বিভিন্ন দলের দোষগুণ জানিতে পারে সেজন্য নানা ধরনের প্রাচীরপত্র ও ব্যঙ্গচিত্র টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়। পথ দিয়া গীতবাদ্য সহকারে বিরাট বিরাট মিছিল বাহির করিয়াও ভোটারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। মোটের উপর নির্বাচনের কিছুদিন পূর্ব হইতে রাজনৈতিক দলগুলি ভোটারদের কর্তব্য সম্বন্ধে এত বেশি সচেতন করিতে চেষ্টা পায় যে, কোন কোন শান্তিপ্রিয় লোক ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়েন।

রাজনৈতিক চেতনা-সঞ্চার করা

জনমতকে সংগঠন করা রাজনৈতিক দলের চতুর্থ কার্য। এক দলের একতরফা উক্তি শুনিলে জনসাধারণ বুঝিতে পারে না যে, উহা কতটা যুক্তিসঙ্গত। প্রত্যেক দলের নিজ নিজ সংবাদপত্র থাকে। বিভিন্ন দলের সংবাদপত্র পাঠ করিলে জনসাধারণ দেশের সমস্যা সম্বন্ধে নিজেদের মত স্থির করিতে পারেন। এখন জনমত সংগঠনের অনেকখানি দায়িত্ব রাজনৈতিক দলের উপর।

জনমত সংগঠনের সহায়তা

রাজনৈতিক দলের পঞ্চম কার্য হইতেছে সরকারকে সমালোচনা করা। যে দলের বেশি সদস্য নির্বাচিত হন, সেই সরকার গঠন করে। আর অন্য বা অন্যান্য দল সরকারের দোষত্রুটি দেখাইবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকে। বিপক্ষ দলের সমালোচনার ভয়ে সরকার ন্যায়ানুমোদিত পথে

সরকারের কাজের আলোচনা

চলিতে চেষ্টা করেন। যেখানে সমালোচনার ভয় নাই সেখানে সরকার যথেচ্ছাচারী হয়।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যদি অল্লাধিক পরিমাণে সমশক্তিসম্পন্ন হয় তাহা হইলে লোকে এক দলের কাজে অসন্তুষ্ট হইলে পরবর্তী নির্বাচনে অন্য দলকে ভোট দিতে পারে এবং তাহার ফলে অন্য দলকে সরকারী ক্ষমতা পরিচালনের সুযোগ দেওয়া হয়।

বিকল্প শাসন

যেখানে দুইটি মাত্র দল আছে সেখানে বিকল্প শাসনের (alternative government) এর ব্যবস্থা করা খুবই সহজ। যেখানে অনেকগুলি দল থাকে সেখানেও কয়েকটি দল সম্মিলিত হইয়া মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করিতে পারে। কিন্তু যেখানে একটি মাত্র দলে শতকরা ৭৫ জন সদস্য থাকে এবং অন্যান্য ৮।১০টি দলের সম্মিলিত সদস্য সংখ্যা শতকরা ২০।২৫ জন মাত্র সেখানে বিকল্প শাসন স্থাপন করা অসম্ভব। এরূপ ক্ষেত্রে বিপক্ষ দল দায়িত্বহীন সমালোচনা করিতে পারে, কেন না তাহারা জানে যে অদূর ভবিষ্যতে তাহাদের হাতে শাসনভার আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই ; তাই যে কাজ করা সম্ভবপর নহে তাহা না করিবার জন্যও তাহারা সরকারকে তীব্রভাবে নিন্দা করে।

উপসংহারে বলা যায় যে, রাজনৈতিক দলের আসল কাজ হইতেছে জনমতকে একমুখী করিয়া জনসাধারণের রায় লওয়া। লোয়েল বলেন—"Their essential function and the true reason for their existence, is bringing public opinion to a focus and framing issues for the popular verdict." অন্য একজন লেখক বলিয়াছেন যে, রাজনৈতিক দলের একটা প্রধান কাজ হইল বিজ্ঞাপন দেওয়া ও ভোটের দালালি করা।

৫। রাজনৈতিক দলের গুণ ও দোষের বিচার : রাজনৈতিক দলের কার্য (Functions) হইতে উহার গুণ ও উপকারিতা উপলব্ধি করা যায়। রাশিয়া ছাড়া অন্য কোন রাষ্ট্রের সংবিধানে রাজনৈতিক দলের কোন উল্লেখ নাই। তথাপি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান প্রণয়নের সাত বৎসর পরেই রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হইয়াছিল। ইংলণ্ডে যেদিন হইতে সার্বভৌম ক্ষমতা রাজার হাত হইতে পার্লামেণ্টের হাতে আসিয়াছে সেই সময় হইতে রাজনৈতিকদলের উদ্ভব হইয়াছে। জেনিংস বলেন যে, এখন কেহ যদি

দলের কাজ হইতে গুণের ধারণা

ইংলণ্ডে কিভাবে শাসন চলে তাহা বর্ণনা করিতে চাহেন তবে তাঁহাকে আদিতে ও অন্তে রাজনৈতিক দলের কথা বলিতে হইবে এবং মধ্যভাগেও উহার বিশদ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রাজনৈতিক দল জনগণের ঔদাসীন্য দূরীভূত করিয়া তাহাদের ঔৎসুক্য বৃদ্ধি করে এবং তাহাদিগকে রাষ্ট্রীয় কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে উৎসাহিত করে।

ব্যক্তিগত মতামত বিচ্ছিন্ন বলিয়া উহা দানা বাঁধিতে পারে না। কেহ যদি কোন সংস্কার কামনা করেন তবে তাঁহাকে শুধু উহার স্বপক্ষে যুক্তি দেখাইলেই হইবে না, তাঁহাকে চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে বহুসংখ্যক লোক সম্মিলিতভাবে উহা দাবি করে। এইরূপ সম্মিলিত দাবি রাজনৈতিক দলের পক্ষেই করা সম্ভব হয়। একক দাবি ও বিশ্লিষ্ট মতের কার্যকারিতা অত্যন্ত অল্প। জনমতকে বিশেষ কোন দাবির ভিত্তিতে গড়িয়া তোলা রাজনৈতিক দলের এক প্রধান গুণ।

ঐক্যবদ্ধ দাবির জোর

সংসদীয় শাসনপ্রথায় (Parliamentary Government) রাজনৈতিক দল মন্ত্রিপরিষদকে স্থায়িত্ব দান করে। দলের অস্তিত্ব না থাকিলে আইনবিষয়ক অথবা করবিষয়ক যে কোন প্রস্তাব পাকা করাইবার জন্য মন্ত্রীদিগকে যথেষ্ট হয়রানি হইতে হইত। প্রতি মুহূর্তে তাঁহাদের আশংকা হইত এই বুঝি তাঁহাদের প্রস্তাব ভোটে নাকচ হইয়া যায়। আইনসভার ক্ষমতালোলুপ সদস্যেরা প্রতিনিয়ত পরস্পরের মধ্যে ষড়যন্ত্র করিয়া মন্ত্রিসভার পতন ঘটাইতে চেষ্টা করেন। দলের শাসন থাকায় সদস্যেরা মন্ত্রীদের অনুগত হইয়া চলেন।

মন্ত্রিপরিষদের স্থায়িত্ব

রাজনৈতিক দল-ভেদ যেখানে নাই সেখানে সরকার যদি জনপ্রিয়তা হারায় তবে উহাকে বলপ্রয়োগ করিয়া অপসারিত করিতে হয়। এরূপ করিতে গেলে আইনসঙ্গত ভাবে কাজ করা চলে না। দুইটি বা ততোধিক দল থাকিলে এক দলের শাসন পছন্দ না হইলে অন্য দলকে নির্বাচনে জয়ী করিয়া বিকল্প মন্ত্রিসভা স্থাপন করা যায়। কাজেই দলভেদ থাকায় সরকার জনমত অনুসরণ করিয়া চলিতে বাধ্য হয়। ইহাতে সুশাসন লাভ করা সম্ভব হয়। যে সরকারের কোন সুগঠিত প্রতিপক্ষ নাই, সে

বলপ্রয়োগ করিয়া সরকারকে সরাইতে হয় না

সরকার স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে। ক্ষমতা লোককে মদগ্রস্ত করে, আর নিরংকুশ ক্ষমতা মদোন্মত্ত করিয়া তুলে।

রাজনৈতিক দলভেদ থাকায় শাসন ও আইন লইয়া আইনসভায় দলগুলির মধ্যে প্রবল তর্কবিতর্ক হয়। উহার বিবরণী সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত হয়। লোকে উহা পড়িয়া একটি সমস্যাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে ভাবিতে ও দেখিতে শেখে। লোকেরা যেরূপ মত প্রকাশ করে, তাহা শেষ পর্যন্ত শাসকবর্গ মানিয়া লইতে বাধ্য হন। যে কোন দেশের সমক্ষে, অসংখ্য সমস্যা বর্তমান। তাহার মধ্যে কয়েকটিকে বাছিয়া লইয়া উহাদের সমাধান করিবার দায়িত্ব রাজনৈতিক দলের উপর থাকে। কোন্ দল কতগুলি সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করিতে পারিয়াছে তাহা দেখিয়া জনমত তাহার অনুকূল বা প্রতিকূল হয়।

জনমত সংগঠন

পরিশেষে রাজনৈতিক দলের গুণগুলি সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করিয়া ফাইনারের ভাষায় বলা যায় যে প্রতিনিধিবর্গকে নির্বাচন, শিক্ষা দেওয়া, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করা, সমর্থকরা এবং নির্বাচনের পর তাহাদের সংসদীয় কার্যাবলীকে নির্বাচকগণের ঘনিষ্ঠ ও ক্রমাগত সংসর্গে নিয়ন্ত্রিত করা দলের দ্বারাই সম্ভব হয় ("Representatives are selected, catechized, pledged, supported and afterwards controlled in their parliamentary activities by the parties in close and continuous touch with the electorate.")

বিভিন্ন গুণ

একদিকে রাজনৈতিক দল না থাকিলে যেমন প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র চালানো কঠিন হয়, অন্যদিকে আবার দলের শাসন ও পীড়নের ফলে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা (Parliamentary Government) ভাঙ্গিয়া পড়িবার মতন হইয়াছে। ঐ ব্যবস্থার মূল নীতি হইতেছে আলাপ-আলোচনা ও তর্কযুক্তির সাহায্যে সত্য নির্ধারণ করিয়া শাসনব্যাপারে উহার অনুসরণ করা। আমরা ভোটারেরা ভোট দিয়া যাঁহাকে আইনসভায় পাঠাইলাম, তিনি প্রত্যেকটি সমস্যার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি শুনিয়া যাহা সমুচিত বিবেচনা করিবেন তাহার পক্ষে ভোট দিবেন ইহাই আমাদের কাম্য। কিন্তু আমাদের প্রতিনিধি মহাশয় দলের সাহায্যে নির্বাচিত হইয়াছেন।

দলের শাসনে প্রতিনিধিত্ব মূলক শাসন অকেজো হইবার আশংকা

তিনি দলের শাসন মানিয়া চলিতে বাধ্য। বিপক্ষদলের সর্বোত্তম একটি প্রস্তাবের পক্ষে একশতটি যুক্তি প্রদর্শন করা হইলেও আমাদের প্রতিনিধি মহাশয় বধিরের ন্যায় উদাসীন থাকিয়া তাঁহার নিজের দলের ইঙ্গিতে উহার বিরুদ্ধে ভোট দিবেন। আবার স্বদলের কোন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে হাজার দোষত্রুটি কেহ দেখাইলেই তিনি অবিচলিতচিত্তে ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিবেন। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে আইনসভার বক্তৃতা, যুক্তিতর্ক প্রভৃতি যেন অনেকটা লোকদেখানো ব্যাপার হইয়াছে। পার্লামেণ্টের ভিতরে যাঁহারা থাকেন তাঁহাদের উপর উহার প্রভাব নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়াছে; কিন্তু পার্লামেণ্টের বাহিরে যে বিপুল জনসাধারণ আছেন, তাঁহারা বা তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা চিন্তাশীল তাঁহারা উহা পড়িয়া স্থির করেন কাজটা ভাল হইতেছে কি মন্দ হইতেছে। তাঁহাদের মতামত যদি শক্তিশালী হয় তাহা হইলে শাসক-গোষ্ঠী উহা উপেক্ষা করিতে পারেন না। কাজেই পার্লামেণ্ট এখন যেন একটি বিতর্কসভায় পরিণত হইয়াছে এবং বাহিরের মতামত অনুসারে মন্ত্রিপরিষদ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তাহাকে আইনসঙ্গত রূপ দিবার (Registration) একটা যন্ত্রমাত্র হইয়াছে। ইহাতে প্রতিনিধিদের ব্যক্তিত্বও সংকুচিত হইতেছে। তাঁহারা দলের নেতাদের হাতে খেলার পুতুলের মতন হইয়াছেন। কিন্তু একথাও সত্য যে, পার্লামেণ্টের পাঁচসাতশত সদস্যের মধ্যে প্রত্যেকেই যদি নিজ নিজ স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে চাহেন তাহা হইলে আর কোন কাজকর্ম সম্পাদন করা অসম্ভব হইয়া উঠে। কয়জন লোকই বা স্বাধীন চিন্তা করে অথবা উহা ব্যক্ত করিবার জন্য উৎসুক হয়!

আইনসভার গুরুত্ব হ্রাস

রাজনৈতিক দলভেদ আইনসভাকে একটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করে; বিরোধী দলের কাজ হইতেছে বিরোধ করা, তা যত ভালো প্রস্তাবই সরকার পক্ষ হইতে উত্থাপন করা হউক না কেন। সব সময়ে সদস্যেরা নিজেদের দলগত ভেদের কথা মনে রাখিয়া কাজ করেন। অথচ এ বিভেদ স্বাভাবিক নহে, কৃত্রিম। বিরোধী দল সরকারী দলকে ছলেবলে কৌশলে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহাদের মনে হয় যে, সরকারী দলকে যত বেশি নাস্তানাবুদ করা যাইবে পরবর্তী নির্বাচনে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ তত বেশি উজ্জ্বল হইবে।

কৃত্রিম বিরোধ

অনেক সময়ে রাজনৈতিক দলের নেতারা দেশের স্বার্থ অপেক্ষা দলের স্বার্থকে বড় করিয়া দেখেন। কোন বিশেষ কার্যপদ্ধতি অবলম্বন করিলে শাসনবিভাগের খরচা হয়তো অনেক বাড়িয়া যাইবে কিন্তু ভোট পাইবার সুবিধা হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে দলপতিরা দেশের ভালমন্দ না ভাবিয়া দলের জয়-পরাজয়ের কথাই চিন্তা করেন।

দলের স্বার্থের নিকট দেশের স্বার্থ বলি দেওয়া

নির্বাচনের সময়ে সকল দলই বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু কার্যকালে তাহা পালন করিতে অগ্রসর হন না। এইজন্যই বলা হয় যে, রাজকুলকে কখনও বিশ্বাস করা কর্তব্য নহে, এ যুগের রাজকুল বলিতে অবশ্য রাজনৈতিক নেতারা।

রাজনৈতিক দলগুলি ক্ষমতা অধিকারের জন্য ব্যগ্র ও লোলুপ হয়। ক্ষমতা হাতে পাইলে উহা যতদিন পারা যায় আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকেন। আমেরিকায় spoils system আগে খুব বেশি ছিল; এখনও কিছু কিছু আছে। বিজয়ী দল কতকগুলি বড় বড় সরকারী চাকুরি ও অসংখ্য ছোট ছোট চাকুরি নিজেদের সমর্থনকারীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। যোগ্যতর প্রার্থী স্বদলভুক্ত নহেন বলিয়াই উপেক্ষিত হন। অন্য দেশে Spoils system প্রচলিত না থাকিলেও দলের কর্মীদিগকে পুরস্কৃত করিবার অনেক রকম ফন্দিফিকির আছে। কখনো কখনো উহা জঘন্যতম রূপও পরিগ্রহ করে। দুর্ভিক্ষ, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক উৎপাতের সময় সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়; বন্যার্ত দিগকে ঘরবাড়ি তৈয়ারি করিবার জন্য টাকা ধার দেওয়া হয়। সাহায্যাদি বণ্টনের সময় কখনো কখনো বাছিয়া বাছিয়া দলের সমর্থকদিগের দাবি সর্বাগ্রে বিবেচনা করা হয়। ধার দিয়া আর ধারের টাকা ফেরত দিবার তাগিদ দেওয়া হয় না। নির্বাচনের সময়ে এই সব উপকৃত লোকেরা বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া ভোট সংগ্রহ করেন।

ক্ষমতা হাতে রাখার কৌশল ও দুর্নীতি

দলীয় শাসনপ্রথা প্রচলিত থাকায় বিজয়ী দলের লোক লইয়াই সরকার গঠিত হয়; বিপক্ষ দলের যোগ্যতম ব্যক্তিও মন্ত্রীর পদ হইতে অপসারিত হন। ইহাতে জাতীয় শক্তির অপচয় ঘটে। যাঁহারা সংগঠনমূলক কাজ করিতে পারিতেন,

অনেক যোগ্য ব্যক্তিকে বাদ দিতে হয়

তাঁহারা বাধ্য হইয়া শুধু বিরুদ্ধাচারণ করিবার জন্য সকল শক্তি নিয়োগ করেন।

দল প্রথার অন্যতম প্রধান দোষ হইতেছে ধনীদের প্রাধান্য। দলের অসংখ্য কর্মীকে খাইতে পরিতে দিবার ব্যবস্থা করিতে হয়, প্রচারপত্র, ব্যঙ্গচিত্র প্রভৃতি লেখাইতে ও ছাপাইতে হয়; সভা-সমিতির আয়োজন করিতে হয়। এ সব কাজে খরচ অনেক। এ টাকা আসিবে কোথা হইতে? বড বড় শিল্পপতি ও মহাজনেরা দলকে টাকা দিয়া সাহায্য করেন। কিন্তু এ সাহায্য নিঃস্বার্থ নহে; এ একরকম দাদন দেওয়া। দল জয়লাভ করিলে এমন আইন-কানুন পাশ করিবে, যাহাতে দলের ধনভাণ্ডারে সাহায্যকারীরা বেশ দু'পয়সা মুনাফা লাভ করিতে পারেন। ধনীরা এইভাবে অপ্রত্যক্ষরূপে গণতন্ত্রকে পঙ্গু করেন। কিন্তু এত দোষ সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলপ্রথা পরিহার করা যায় না। 'নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভালো,' দলের প্রভাবে গণতন্ত্রের মহিমা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয় বটে, কিন্তু দল না থাকিলে গণতন্ত্র একেবারে অচল হইয়া পড়ে। এ যুগে উত্তরাধিকার সূত্রে কেহ ক্ষমতা লাভ করে না। দলের ভিতর দিয়াই দলপতির উদ্ভব হয়। দলের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের দ্বারা প্রখর ও চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দলের নেতা নির্বাচিত হন। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত নেতাই শাসনদণ্ড পরিচালনার উপযুক্ত ব্যক্তি।

ধনীদের প্রভাব

নেতার উদ্বর্তন

৬। **রাজনৈতিক দলের কৃতকার্যতার শর্ত (Conditions of successful working of Party System)**: এক দলের সহিত অন্য দলের মতভেদ তো থাকেই, কিন্তু সে মতভেদ যেন এত গুরুতর না হয় যে, একে অন্যের উচ্ছেদ সাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হয়। যদি কোথাও সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং একদল লোক সেখানে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চায়, তাহা হইলে সাধারণতন্ত্রীরা রাজতন্ত্রীদিগকে সমূলে বিনাশ করিবার চেষ্টা করে। রাজশাসিত দেশে সাধারণতন্ত্রীদিগকে সহ্য করা হয় না। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণু হওয়া প্রয়োজন। এক দলের লোক এক জায়গায় একটি সভার আয়োজন করিয়াছে, অন্য দলের লোক যাইয়া

গণতান্ত্রিক সহিষ্ণুতা

সে সভা ভাঙ্গিয়া দিবে—এরূপ অবস্থায় সুস্থ রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। গণতন্ত্র সহিষ্ণুতার উপর প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং রাজনৈতিক দলাদলির বেলাতেও সহিষ্ণুতাকে সযত্নে পরিবর্ধন করিতে হইবে।

সামরিক শক্তি যেন কোন দলের না থাকে

কোন রাজনৈতিক দলের অধীনে কুচকাওয়াজ করিয়া বেসরকারী সৈন্যদলকে শিক্ষিত করিবার অনুমতি দেওয়া যায় না। এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি না রাখিলে কোন একটি দল সামরিক রীতিতে শিক্ষিত হইয়া অন্য সব দলকে উৎসন্ন করিবে এবং নাগরিকদের স্বাধীনতাও বিনষ্ট করিবে। ইতালির ফ্যাসিস্ট দল ও জার্মানির নাৎসী দলের ইতিহাসে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের একটি প্রতিক্রিয়াশীল দল বহু স্থানে যুবকদিগকে কুচকাওয়াজ শিখাইত। তাহার ফল ভাল হয় নাই।

আমলাদিগের নিরপেক্ষতা

কোন রাজনৈতিক দল যখন ক্ষমতা লাভ করেন, তখন যেন উচ্চতন স্থায়ী কর্মচারীদিগকে দলে টানিতে চেষ্টা না করেন। কর্মচারীরা নিরপেক্ষ না থাকিলে কোন দলই তাঁহাদের নিকট হইতে ভালো সেবা পাইবেন না। আজ যদি উঁহারা ঐ দলের পক্ষপাতী হন, কাল যখন অন্য দল শাসনভার পাইবেন তখন কি করিয়া কাজ চলিবে? কর্মচারীরা বিশেষজ্ঞ হিসাবে মন্ত্রীদিগকে পরামর্শ দান করেন; ঐ পরামর্শ নৈর্ব্যক্তিক ও পক্ষপাতশূন্য হওয়া প্রয়োজন।

সংকীর্ণতা পরিহার

কোন রাজনৈতিক দলের সংকীর্ণ আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতির বশীভূত হওয়া উচিত নহে। সমগ্র দেশের যাহাতে মঙ্গল হয় তাহাই দলের কার্যনীতি হওয়া উচিত। মঙ্গল সাধনের উপায় সম্বন্ধে বিভিন্ন দলের বিভিন্ন মত থাকা স্বাভাবিক।

নেতৃত্বের গুণ

দলের সাফল্যের প্রধান উপায় হইতেছে নেতার ব্যক্তিত্ব। তিনি যদি সুবক্তা, বিবেচক, অমায়িক ও কার্যনিপুণ হন তবে তাঁহার নামে লোকে আকৃষ্ট হয়। সুদক্ষ নেতৃত্বের ফলে দলের কার্যনীতিও চিত্তাকর্ষক হয়। দলের সাধারণ কর্মীদের সহিত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের স্নেহ ও প্রীতির সম্বন্ধ থাকা প্রয়োজন। ঐরূপ সম্বন্ধ থাকিলে কর্মীরা প্রাণপণ করিয়া দলের জন্য কাজ করেন।

৭। **দ্বিদলীয় ব্যবস্থা ঃ** অনেকে মনে করেন যে দুইটি মাত্র দল থাকাই স্বাভাবিক। একদল অতীত ও বর্তমানকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চাহেন, অন্য দল ভবিষ্যতের দিকে উন্মুখ হইয়া থাকেন। তাই সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডে ও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে আমেরিকায় দুইটি মাত্র দলের উদ্ভব হইয়াছিল। সেই সময়ে উভয় রাষ্ট্রেই ভোটারের সংখ্যা ছিল কম। ভোটারগণ নিজেদের অবস্থায় সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহাদের ভিতর মতের পার্থক্য থাকিলেও উহা গুরুতর ছিল না। কিন্তু যে সমাজে ভোটারের সংখ্যা বিপুল এবং অধিকাংশ ভোটার বিত্তহীন, সেখানে দুইটি মাত্র দল সকলের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত করিতে পারে কিনা সন্দেহ।

দেশের মধ্যে দুইটি মাত্র দল থাকিলে সরকার গঠনের খুব সুবিধা হয়। যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় সেই দল মন্ত্রিপরিষদ গঠন করে, অথবা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে। সংখ্যালঘিষ্ঠ দল সরকারী দলের বিরোধিতা করে। তাহার ফলে দেশের লোকে সরকারের দোষত্রুটি সম্বন্ধে সজাগ হয়। বিরোধী দল যদি দেশের লোককে বুঝাইতে পারেন যে, সরকারী দল দেশের অনিষ্ট করিতেছেন, তাহা হইলে পরবর্তী নির্বাচনে তাঁহারা ক্ষমতা লাভ করিতে পারেন।

সরকার গঠনে সুবিধা

দলের ভিতর নিয়মানুবর্তিতা কঠোরভাবে পালন করা হয় বলিয়া এক নির্বাচন হইতে আরম্ভ করিয়া অপর নির্বাচন পর্যন্ত, অর্থাৎ চার-পাঁচ বৎসরকাল মন্ত্রিপরিষদ ক্ষমতার আসনে স্থায়ী থাকিতে পারেন। এরূপ স্থায়িত্ব সুশাসনের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মন্ত্রিসভা স্বল্পকাল স্থায়ী হইলে কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয় না। একটি দল চার পাঁচ বৎসর ধরিয়া একাদিক্রমে সরকারী ক্ষমতা পরিচালনা করিলে দেশের লোকে বুঝিতে পারেন তাঁহাদের যোগ্যতা কিরূপ। দুই এক বছর বা কয়েক মাস মাত্র যে মন্ত্রিসভা স্থায়ী হয় সেখানে লোকে বুঝিয়াই উঠিতে পারে না যে, উহার কর্মকুশলতা আছে কিনা। এত অল্প সময়ের জন্য কাজ করেন বলিয়া তাঁহাদের অভিজ্ঞতাও জন্মে না। দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় মন্ত্রীরা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল ধরিয়া কাজ করেন বলিয়া অভিজ্ঞ হইবার সুযোগ পান।

মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব

দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় ভোটারগণের অভিপ্রায় অনুসারে সরকার গঠিত হয়। নির্বাচনের সময় তাঁহারা যে যে দলের পক্ষে বেশি ভোট দেন, সেই দল ক্ষমতা লাভ করে। কিন্তু যেখানে বহু দল বর্তমান, সেখানে ভোটারদের ইচ্ছা অনুসারে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত নাও হইতে পারে। কোন কেন্দ্রের ভোটাররা একজোট হইয়া 'ক' দলভুক্ত সদস্যকে ভোট দিয়া নির্বাচন করিলেন, কিন্তু সেই দল হয়তো ঐ ভোটারদের অনভিপ্রেত কোন দলের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে পারেন। যেখানে অনেকগুলি দল বর্তমান সেখানে তাহাদের মধ্যে সন্ধি বিগ্রহ লাগিয়াই থাকে। তাই বহু দলের অস্তিত্ব হেতু নির্বাচকগণ ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন না, যে কোন দল তাঁহাদের অভিপ্রায় অনুসারে কাজ করিবে।

দায়িত্ব বোধ

দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় নাগরিকেরা বিশেষ কোন দোষত্রুটির জন্য একটি মাত্র দলকে দায়ী করিতে পারেন, কিন্তু বহু দলের সহযোগিতায় (Coalition) যেখানে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়, সেখানে বিশেষ কোন দলকে দায়ী করা চলে না।

কোয়ালিশনের দুর্বলতা

৮। বহুদলীয় ব্যবস্থার গুণ ও দোষঃ ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি প্রভৃতি পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহে অনেকগুলি রাষ্ট্রীয় দল আছে। মানুষকে মাত্র দুইটি দলে বিভক্ত করা যায় না। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া অন্ততঃ চারিটি দল থাকা প্রয়োজন সে কথা পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। র‍্যামজে মুইর বলেন যে, নাগরিকদিগকে দুই দলে বিভক্ত করা অস্বাভাবিক। এরূপ করিলে তাঁহাদের পছন্দকে সীমাবদ্ধ করা হয়। আইনসভায় বিভিন্ন প্রকার স্বার্থ ও মতবাদ প্রতিফলিত হওয়া দরকার। সেই জন্যও দুই দল অপেক্ষা বেশি দল থাকা উচিত। তাঁহার মতে দুইটি মাত্র দল থাকিলে পার্লামেন্টের প্রভুত্ব নষ্ট হয়; কেন না মন্ত্রিপরিষদের নির্দেশ অনুসারে সরকারী দলের সদস্যদিগকে ভোট দিতে হয়। তা ছাড়া দুই দল নিরন্তর বিবাদ করে। বিরোধী দল সব সময়েই বিরোধিতা করে বলিয়া সরকারী দল তাঁহাদের দোষ-ত্রুটি স্বীকার করেন না, উহা ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। এইরূপে মাত্র দুই দলের অস্তিত্ব থাকায় কৃত্রিম বিরোধ চলে।

দুই দলের দোষ

দুই দলের চেয়ে বহু দলের অপকারিতা বেশি। মন্ত্রিপরিষদের স্থায়িত্ব

না থাকিলে দেশের শাসনকার্য ভালভাবে চলিতে পারে না। অথচ যেখানে বহু দল আছে সেখানে সাধারণতঃ কোন একটি দল একত্রভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে না; কাজেই তাহাকে অন্য কয়েকটি দলের সঙ্গে সাময়িক সহযোগিতা করিয়া Coalition Government গঠন করিতে হয়। উহার ভিতর নীতিগত ও নেতৃত্বগত ঐক্যের অভাব। সুতরাং উহার মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ লাগিয়াই থাকে। কোন একটি দল যদি অসন্তুষ্ট হইয়া সরকারের সহিত সহযোগিতা পরিহার করে তাহা হইলেই মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। অথচ বহু দলকে সন্তুষ্ট রাখা একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার। সেইজন্য বহু দল অপেক্ষা দুই দলই ভাল। কিন্তু গণতন্ত্রে জোর করিয়া সকলকে দুইদলের মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায় না। ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরার দ্বারা নির্ণীত হয় দেশের মধ্যে কয়টি দল থাকিবে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার দ্বিদলীয় প্রথা অন্য কোন দেশে রপ্তানি করা সম্ভব নহে। যে দেশের লোকের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সংহতি অল্প, অর্থচ অর্থনৈতিক বিভেদ প্রচুর সেখানে দুই দল অপেক্ষা বহু দল থাকাই বেশি স্বাভাবিক।

বহুদলের অপকারিতা

৯। **একদলীয় ব্যবস্থা (Single Party System)**ঃ গণতন্ত্রের প্রত্যেক নাগরিক রাজনৈতিক দল সংগঠন করিতে পারে এবং যে কোন দলে যোগ দিতে পারে। সেখানে রাষ্ট্রের আদেশে কোন দল গঠিত হয় না; নাগরিকেরা স্বেচ্ছায়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দল গঠন করে। ভারতবর্ষে কোন নাগরিকের দল-সংগঠনের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই। উত্তর ভারত হইতে দক্ষিণ ভারতকে বিচ্ছিন্ন করিবার মতন অবাস্তব দাবির ভিত্তিতেও দল গঠন করিতে দেওয়া হয়। এখানে দীর্ঘকাল ধরিয়া একটি মাত্র দল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে শাসনক্ষমতা পরিচালনা করিতেছে বটে, কিন্তু কোন দল গঠনে যেমন বাধানিষেধ নাই, তেমনি কোনপ্রকার দলকে দমন করার ব্যবস্থাও নাই। রাশিয়া, ইতালি ও জার্মানির একদলীয় ব্যবস্থা ঠিক ইহার বিপরীত।

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের হানি

ইতালির ফ্যাসিস্ত দল ও জার্মানির নাৎসী দলের সঙ্গে একসঙ্গে রাশিয়ার কম্যুনিস্ট দলের নাম করা একদিক দিয়া হয়তো অসঙ্গত। ফ্যাসিস্ত ও নাৎসী দল ধনতন্ত্রের সমর্থনকল্পে উদ্ভূত হইয়াছিল; উভয় দেশেই

শ্রমিকদিগকে ছলে বলে কৌশলে ধনীশ্রেণীর স্বার্থসংরক্ষণের উদ্দেশ্যে খাটাইয়া লওয়া হইত। আর রাশিয়াতে শ্রমজীবীদের একাধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে উচ্ছেদ করা হইয়াছে। ইতালি ও জার্মানির একদলীয় ব্যবস্থার সঙ্গে রাশিয়ার কম্যুনিস্ট দলের এই মৌলিক পার্থক্য আছে বটে, কিন্তু উহাদের মধ্যে সৌসাদৃশ্যও প্রচুর আছে। ইতালি ও জার্মানির মতন রাশিয়ার সংবিধানে একটি মাত্র দলকে স্বীকার করা হইয়াছে। শুধু স্বীকার করাই নহে, অন্য দলকে মাথা তুলিতে দেওয়া হয় না। যে কেহ অন্য কোন দল গঠন করিতে চেষ্টা করে, তাহাকে বা তাহাদিগকে কঠোর ও নির্মমভাবে দমন করা হয়। গণতন্ত্রে উচ্চতম বিচারালয়কে, পুলিশ ও সৈন্যদলকে ও বেসামরিক স্থায়ী কর্মচারীদিগকে দলের আওতার বাহিরে রাখা হয়। কিন্তু একদলীয় ব্যবস্থায় কি বিচারকগণ কি আমলারা, কি সেনাবাহিনী সকলেই দলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। শিক্ষাব্যবস্থা পর্যন্ত দলের নির্দেশে চলে। যাহারা সরকারী দলের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ করিতে সাহসী হয়, তাহাদের গলা টিপিয়া চুপ করাইয়া দেওয়া হয়। এরূপ রীতিকে আর যাহাই বলা হউক না কেন, গণতান্ত্রিক বলা যায় না।

ফ্যাসিস্ত দলের সহিত কম্যুনিস্ট দলের পার্থক্য

সাদৃশ্য

কিন্তু কম্যুনিস্ট দলের সমর্থনে বলা হয় যে, পশ্চিম ইউরোপে ও উত্তর আমেরিকায় যে গণতন্ত্র প্রচলিত আছে তাহা ভূয়া গণতন্ত্র। প্রত্যেক ব্যক্তির একটি করিয়া ভোট থাকিলেও ধনীরা দলের সাহায্যে এমন কৌশলে কাজ করেন যে তাঁহাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে। যেখানে শ্রেণীগত বৈষম্য প্রবল, সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সার্থকতা আছে। কিন্তু যেখানে শ্রেণীবিভেদ বিলুপ্ত হইয়াছে, সেখানে কৃষক ও শ্রমিকের স্বার্থের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নাই। তাহাদের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে কেহ যদি দাঁড়াইতে চাহে, তাহা হইলে তাহারা সমাজদ্রোহী। সুতরাং এরূপ ব্যক্তিদিগকে দল গঠনের সুযোগ দিলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিপন্ন হইবার আশংকা আছে। তাই তাহাদিগকে দমন করা হয়।

শ্রেণী বৈষম্য না থাকিলে দলপ্রথা থাকার দরকার কি?

এই যুক্তির মধ্যে কিছুটা সত্য আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু গণতন্ত্র বলিতে

অবশ্য সাধারণতঃ যাহা বুঝি তাহা একদলীয় ব্যবস্থায় থাকিতে পারে না.

গণতন্ত্রের মুখ্য নীতি হইতেছে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য, বিশেষ করিয়া মতপ্রকাশের এবং সংঘ বা দল গঠনের স্বাধীনতা। একদলীয় ব্যবস্থায় একদিকে যেমন অন্য কোন দল গঠন করিতে দেওয়া হয় না, অন্যদিকে তেমনি সরকারী দলের কার্যকলাপকে সমালোচনা করিলে সমাজদ্রোহী বলিয়া অভিযুক্ত হইবার প্রবল আশংকা। জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত সরকার গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু মতপ্রকাশের স্বাধীনতা না থাকিলেও জনমত গঠিত হইবে কিরূপে? জনমত প্রতিফলিত হইয়া আইন তৈয়ারিই বা কিরূপে হইবে?

সরকারের সমালোচনায় বিপদ

কম্যুনিস্টরা বলেন যে, রাশিয়াতে দলের অভ্যন্তরে মতপ্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা আছে। কিন্তু সেখানকার বর্তমান শাসকগোষ্ঠী স্বীকার করিতেছেন যে, স্টালিনের সুদীর্ঘকালব্যাপী (১৯২৪-৫৩) আধিপত্যের সময়ে তাঁহার কার্যের ও মতের কোন প্রকার প্রতিবাদ করিতে যাঁহারা সাহসী হইতেন, তাঁহাদিগকে নির্মমভাবে নির্বাসন বা প্রাণদণ্ড দেওয়া হইত। স্টালিনের মৃত্যুর পর ম্যালেনকভ (১৯৫৩-৫৫) ও বুলগানিনের (১৯৫৫-৫৭) উত্থান ও পতন হইতে অনুমিত হয় যে, সেখানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অবাস্তব।

দলের অভ্যন্তরে মত প্রকাশের সুযোগ

একদলীয় ব্যবস্থায় সবচেয়ে বড় দোষ হইতেছে এই যে, ইহাতে বিকল্প সরকার (alternative government) স্থাপনের কোন শান্তিপূর্ণ উপায় নাই। যাঁহারা কর্তৃত্ব করেন তাঁহাদের শাসনে যদি লোকে সন্তুষ্ট না হয়, বা তাঁহারা যদি দোষত্রুটি করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অপসারিত করিতে হইলে ষড়যন্ত্র ও বিপ্লবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। মাথা না ভাঙ্গিয়া, মাথা গণনা করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুসারে কাজ করা যদি গণতন্ত্র হয়, তাহা হইলে একদলীয় ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক বলা যায় না।

বিকল্প সরকারের অভাব

১০। **নির্দলীয় ব্যবস্থা:** মহাত্মা গান্ধীর প্রিয় শিষ্য শ্রীবিনোবা ভাবে ও সর্বোদয় নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ সম্প্রতি দলীয় শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাইতেছেন। বিনোবা ভাবের মতে দলের ভিত্তিতে নির্বাচন চালানো ঘোরতর অনিষ্টকর। ইহাতে সত্য ও বিবেকের চেয়ে

দলের প্রতি আনুগত্য বেশি দেখা যায়। কোন রকমে ক্ষমতা দখল করাই দলের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য দলগুলি জাতি ও ধর্মের দোহাই দেয়। মেষ দলকে তাহাদের রাখাল নির্বাচন করিবার ক্ষমতা দেওয়া যতটা যুক্তিসঙ্গত, অজ্ঞ জনসাধারণকে নেতা নির্বাচন করিতে দেওয়াও ততটা সার্থক। সেইজন্য দলবিহীন গ্রামীন গণতন্ত্রই ভাল। জয়প্রকাশ নারায়ণ বলেন, যে দেশের মধ্যে গ্রামীন, আঞ্চলিক, প্রাদেশিক ও ন্যাশনাল জনসম্প্রদায় থাকিবে এবং ক্ষমতা নিম্নতর সংস্থা হইতে উচ্চতর সংস্থার উপর ন্যস্ত থাকিবে। সুতরাং রাজনৈতিক দলের কোন প্রয়োজনীয়তাই থাকিবে না। সম্প্রতি পুণা ফার্গুসন কলেজের অধ্যক্ষ কোগেকার বলিয়াছেন যে, ভারতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে যখন প্রায় সকলেই একমত, তখন আর দলীয় ব্যবস্থা রাখার প্রয়োজন কি? দলপ্রথা রহিত করিয়া যোগ্যতম ব্যক্তিদিগকে লইয়া মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হওয়া উচিত। সম্প্রতি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে (জুন, ১৯৬২) নেহেরুজী বলিয়াছেন যে, দলপ্রথা বিলুপ্ত হইলে স্বার্থান্ধ চক্রান্তকারীরা ক্ষমতা দখল করিতে চেষ্টা করিবে। এ পর্যন্ত কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্দলীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় নাই। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আদি যুগে Federa-listগণ দলপ্রথার নিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। সুইট্জারল্যাণ্ডে পূর্বে দলপ্রথার প্রভাব অকিঞ্চিৎকর ছিল, কিন্তু এখন উহা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং গণতন্ত্রে নির্দলীয় শাসন-ব্যবস্থার সম্ভাব্যতা অল্প। পাকিস্তানের মতন মৌলিক গণতন্ত্রে (Basic Democracy) নির্দলীয় শাসন চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু সেখানে আসল গণতন্ত্রের একান্ত অভাব।

১১। জনমত (Public Opinion)ঃ জনমতকে গণতন্ত্রের প্রাণবায়ু বলা হয়। জনমতের নির্দেশে সরকার যখন শাসনযন্ত্র পরিচালনা ও আইন প্রণয়ন করেন, তখন উহাকে গণতন্ত্র আখ্যা দেওয়া হয়। আলাপ-আলোচনার সময় আমরা জনমতকে প্রায়ই এক অতি-প্রাকৃত ব্যক্তি বলিয়া ধরি। তাই আমরা বলি 'জনমতকে জাগাইতে হইবে', 'জনমত ইহা দাবি করে', 'জনমত ইহা সহ্য করিবে না' বা 'জনমত ইহার বিচার করিবে'। জনগণের বাণীকে

জনমতের উপর ব্যক্তিত্ব ও দেবত্ব আরোপ

ভগবানের বাণী বলিয়াও মনে করা হয় (Vox Populi Vox Dei)। কিন্তু ভগবানের মতন জনমতও খামখেয়ালি। বেদান্তদর্শনে ভগবানকে অর্ভকবৎ অর্থাৎ শিশুর মতন খেলার ছলে ভাঙ্গেন ও গড়েন বলা হইয়াছে। জনমত সব সময়ে যুক্তিতর্কের ধার ধারে না। ভাবাবেগেও অনেক সময় চালিত হয়। স্যার রবার্ট পীল জনমতকে বোকামী, দুর্বলতা, কুসংস্কার, ভুল বুঝা, ঠিক বুঝা, একগুঁয়েমি ও খবরের কাগজের মতামতের এক বিরাট সংমিশ্রণ বলিয়াছেন ("the great compound of folly, weakness, prejudice, wrong feeling, right feeling, obstinacy and newspaper paragraphs")।

পাবলিক কি, মতই বা কি ?

জনমত বলিতে জনগণ বা পাবলিক ও তাঁহাদের মত (opinion) এই দুইটি জিনিস বুঝায়। কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মতন প্রগতিশীল দেশেও জনগণ বহুল প্রচারিত বিষয় সম্বন্ধে অজ্ঞ ও উদাসীন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ স্থাপনের এক বৎসরের বেশ কিছু পরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীদের মধ্যে একতৃতীয়াংশ ব্যক্তি ঐ সংস্থার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একেবারে কিছুই জানিতেন না। তাঁহারা এমন পর্যন্ত বলিতে পারেন নাই যে, উহার উদ্দেশ্য শান্তিরক্ষা করা বা যুদ্ধ হইতে না দেওয়া। বলা বাহুল্য, সেখানে সকলেই লিখিতে ও পড়িতে জানেন। তথাপি সাধারণের জীবনমরণের সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহাদের এরূপ অজ্ঞতা। কিছু না জানিলে মত দেওয়া যায় কিনা সন্দেহ! কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের মতের পিছনে শক্তি নাই একথা বলা যায় না। টমাস এ, বেইলি নামক লেখক তাঁহার The man in the street শীর্ষক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, জনমত এতই উদাসীন এবং অন্য কাজে ব্যস্ত, এত পরিবর্তনশীল ও ভাবপ্রবণ, এত কম খবর ও ভাল খবর রাখে যে, সমালোচকেরা ইহার ক্ষমতা লইয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে পারেন। তথাপি

জনমতের শক্তি

যে কোন অজ্ঞ ও অস্থিরমতি দৈত্যের মতন ইহার শক্তি প্রচণ্ড এবং সেই শক্তি সে ভয়ংকরভাবে প্রয়োগ করিতে পারে। ("Public opinion is so apathetic and preoccupied, so changeful and implusive, so illinformed and misinformed, that critics are apt to sneer at its power. It is a giant who is fickle

and ignorant, still has a giant's strength, and may use it with frightful effect.")

ব্রাইস্ জনমতের লক্ষণ নিরূপণ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, জনসম্প্রদায়ের (Community) কল্যাণ-সম্পর্কে লোকের মতামতের সমষ্টিকে সাধারণতঃ জনমত বলা হয়। এইভাবে দেখিলে, ইহা বিভিন্ন রকমের অসংবদ্ধ ধারণা, বিশ্বাস, কল্পনা, কুসংস্কার ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বুঝায়। কিন্তু এই বিভিন্নতা ও বিভ্রান্তির মধ্যেও যেমন কোন সমস্যা মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় তেমনি ইহা সংহত ও শ্রেণীবদ্ধ হইবার পদ্ধতির মধ্যে বিশোধিত হইয়া সুস্পষ্ট আকার গ্রহণ করে এবং বহুসংখ্যক নাগরিক ঐ মত পোষণ করে। তখন উহা জনমতের মর্যাদা লাভ করে ও শাসনব্যবস্থাকে পথ প্রদর্শন করে। এই সংজ্ঞা হইতে বুঝা যায় যে, জনমত কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির স্বার্থসংশ্লিষ্ট হইবে না, জনসাধারণের হিতাহিত সম্পর্কিত হওয়া প্রয়োজন। ইহা প্রথমে অস্পষ্ট বা ধোঁয়াটে হইতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও অবিচলিত হওয়া প্রয়োজন। যদি আজ একরকম ধারণা থাকে, কাল একরকম ধারণা হয় তাহা জনমত নামে পরিচিত হইতে পারে না। জনমত দেশের অধিকাংশ লোকের মত হইবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক লোক ও প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উহা ধারণ ও পোষণ করা প্রয়োজন।

জনমতের লক্ষণ ও সংজ্ঞা

জনমত কতখানি তথ্য ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, কতখানিই বা ভাবাবেগ ও গড্ডালিকা বৃত্তির উপর নির্ভরশীল তাহা বিবেচ্য। লোয়েল ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে যখন Public Opinion and Popular Government নামক গ্রন্থ লেখেন তখন তিনি মতের প্রভাব দেখাইতে বলিয়াছিলেন যে, বিশেষ কোন মতকে মত বলিতে হইলে উহা যুক্তির এবং তার চেয়েও বড় কতকগুলি তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। কিন্তু দশ বৎসর পরে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি Public Opinion in War and Peace গ্রন্থ রচনা করেন তখন ঐ মত পরিবর্তন করিয়া বলেন যে, নির্বাচন ও অন্যান্য সামূহিক প্রশ্নে অধিকাংশ লোক সুচিন্তিত মতের অপেক্ষা ধারণার বশে চালিত হয়। মতের চেয়ে ধারণার প্রভাব বেশি।

যুক্তি ও ভাবাবেগ

গণতন্ত্রে জনমত সরকারকে পরিচালিত করে ; আর ব্যক্তি ও দলের একাধিপত্যে সরকার জনমতকে সংগঠন করে। গণতান্ত্রিক শাসনে জনমত অনুসন্ধান করিয়া নির্ণয় করিতে হয়, কিন্তু অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনমত বিশেষভাবে উৎপন্ন (manufacture) করা হয়। অল্প বয়স হইতে শিক্ষার মাধ্যমে কতকগুলি মতবাদ মগজে ঢুকাইয়া দেওয়া, বক্তৃতা, সংবাদপত্র, পুস্তক-পুস্তিকা ও রেডিয়োর সাহায্যে জনসাধারণের নিকট যে কোন সমস্যা সম্বন্ধে কলে তৈয়ারি মতবাদ প্রচার করা উক্ত প্রকার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য।

গণতন্ত্রে ও একনায়কতন্ত্রে জনমত

শাসন সম্পর্কিত তথ্যগুলিকে লুকাইয়া রাখা, স্বাধীন মত প্রকাশের উপর বাধানিষেধ প্রদান করা এবং দেশের প্রকৃত সমস্যা সম্বন্ধে মনোযোগ দিতে না দিয়া অন্য বিষয়ে কৃত্রিম উত্তেজনা সৃষ্টি করা জনমত গঠনের অন্তরায়স্বরূপ। কিন্তু জনমতের সব চেয়ে বড় বাধা হইতেছে দারিদ্র্য। দারিদ্র্যের চাপে লোকে যদি অস্থির হয় তাহা হইলে দেশের সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করিবে কখন ? যে সমাজে ধনবৈষম্য বেশি, সেখানে বড় লোকেরা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সংবাদপত্র প্রভৃতি জনমত গঠনের প্রধান উপকরণগুলি নিজেদের আয়ত্তে আনে।

জনমতের অন্তরায়

জনমতের গতি কোনদিকে তাহা বুঝিবার জন্য একাধিক সংবাদপত্র পাঠ করা দরকার। বিভিন্ন সংবাদপত্র বিভিন্ন দলের ও বিভিন্ন স্বার্থের মুখপত্র। ঐগুলি তুলনা করিয়া পড়িলে বুঝা যায় যে, কোন্ সমস্যা কোন্ শ্রেণীকে কি ভাবে প্রভাবান্বিত করিতেছে। দুই একখানি সংবাদপত্র দল ও বিশেষ কোন শ্রেণীর স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করে। ঐরূপ সংবাদপত্রে চিন্তাশীল লেখকেরা দেশের বিশেষ বিশেষ সমস্যার উপর আলোকপাত করিয়া প্রবন্ধ লেখেন।

সংবাদপত্র

সংবাদপত্র জনমত প্রকাশের অন্যতম উপায় হইলেও একমাত্র উপায় নহে। চিন্তানায়কদের বক্তৃতায় এবং ঘরোয়া আলাপআলোচনার প্রভাবেও জনমত গঠিত হয়। সকলে মত দিবার যোগ্যতা রাখে না। কিন্তু গণতন্ত্রে প্রত্যেক ভোটারই মনে করেন যে, তিনি সবজান্তা। যে কোন বিষয়ে কথা

চিন্তানায়কদের মত কি করিয়া জনমত হয় ?

উঠুক না কেন নাগরিক ভালমন্দ যা হোক একটা মত প্রকাশ করেন। কিন্তু মতটা তাঁহার নিজের নহে; অপরের নিকট হইতে ধার করিয়া পাওয়া। মানুষের সামাজিকতার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনুকরণপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। যিনি যাঁহার প্রতি সশ্রদ্ধ সে তাঁহার মতকে নিজের মত বলিয়া চালাইয়া দেন। কোথাও বা ট্রেড ইউনিয়নের নেতার মত, কোথাও বা কোন শিল্পপতির মত, কোথাও কোন সম্পাদকের মত এইভাবে হাজার হাজার লোকের মুখে মুখে ফেরে। হিমালয় হইতে নিঃসৃত ঝরণাগুলি যেমন একীভূত হইয়া প্রবল স্রোতস্বতীতে পরিণত হয়, তেমনি খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন মতবাদসমূহ অনুকরণশীল জনতার দ্বারা গৃহীত ও প্রতিধ্বনিত হইয়া এমন শক্তিশালী হয় যে, কোন সরকারই উহাকে অবহেলা করিতে পারে না। সুতরাং সাধারণ মানুষ অজ্ঞ বা বিবেচনাহীন বলিয়া তাহারা জনমত গঠনে কোন অংশ গ্রহণ করিতে পারে না এই মত ঠিক নহে।

ভারতীয় জনমতে জাতি ও পরিবারের প্রভাব

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে ভারতবর্ষে লিখিত বাণীর প্রভাব অপেক্ষাকৃত অল্প কেন না অধিকাংশ লোকই (শতকরা ৭৬ জন) লিখিতে পড়িতে জানেন না। কিন্তু আক্ষরিক জ্ঞান না থাকিলেও সাধারণ বুদ্ধিতে তাঁহারা অন্য কোন দেশের লোকের চেয়ে কম নহেন। সবদেশেই সাধারণ লোক পরিবারের প্রভাবে মত গঠন করে। কিন্তু ভারতবর্ষে কামার, কুমোর প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি ও পেশার স্থানীয় নেতৃবর্গের প্রভাব অন্যদেশের চেয়ে বেশি।

নির্বাচনের সময়ে জনমত বেশ কিছুটা নির্ণীত হয়। তবে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে অনেকেই বিশেষ কোন দলের নেতার ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া অথবা বিশেষ কোন হুজুগের বশবর্তী হইয়া ভোট দেন।

নির্বাচন ও আইনসভায় জনমত

নির্বাচিত সদস্যেরা আইনসভায় যখন তর্কবিতর্ক করেন তখন তাঁহাদের আলোচনার প্রভাবেও জনমত দানা বাঁধিয়া উঠে। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা জানেন যে সরকারী দল অথবা বিরোধীদল সবখানি সত্য বলেন না; তাই তাঁহারা নীর ত্যাগ করিয়া ক্ষীর গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের কথাবার্তা হইতে সাধারণ লোকে নিজ নিজ মত স্থির করেন।

জনমতকে শাসনযন্ত্রের নিয়ামক বলিয়া মানিতে হইলে শিক্ষা সংক্রান্ত সংস্থাগুলিকে সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ রাখা প্রয়োজন। ঐ সব প্রতিষ্ঠানে বিশেষ কোন মত শিক্ষা না দিয়া কি করিয়া স্বাধীন চিন্তার দ্বারা সত্য নির্ধারণ করিতে হয় সেই পদ্ধতি শেখানো কর্তব্য। যে সব রাষ্ট্রে রেডিমেড জামার মতন রেডিমেড মতবাদ তৈয়ারি করা হয় এবং ঐ মতবাদ ছেলেমেয়েদের মনে ইন্‌জেকশন করিয়া ঢুকাইয়া দেওয়া হয় সে সব রাষ্ট্রের শিক্ষাপদ্ধতি সরকারের বা সরকারী দলের নির্দেশেই চলে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বাতন্ত্র্য প্রয়োজন

কিন্তু গণতান্ত্রিক সরকার জনমতকে যোগ্য পথে (Proper Channel) চলিতে দেন। উহাকে দাবাইয়া রাখিলে বা বিপথে চালনা করিলে শেষ পর্যন্ত সরকারের ক্ষতি ছাড়া লাভ হয় না। জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ যদি স্বতঃস্ফূর্ত-রূপে প্রকট হয়, তাহা হইলে সরকার সময় মত উহার প্রতিকার করিতে পারেন। নতুবা বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হইয়া সর্বনাশ ঘটাইতে পারে।

জনমত হইতে সরকারের লাভ

অনুশীলন

১। Discuss the nature and importance of Public opinion in popular Government. (1962, 1964)

একাদশ প্রকরণ দেখ।

২। Discuss the functions of Political parties. Are parties indispensable in Democracies ? (1963)

চতুর্থ প্রকরণ দেখ। শেষাংশের উত্তর দশম প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

৩। Discuss the merits and demerits of the two-party and multiple party systems with special reference to Great Britain and France.

সপ্তম ও অষ্টম প্রকরণ দেখ।

৪। Describe the advantages and disadvantages of Party Government.

পঞ্চম প্রকরণ দেখ।

৫। "Party is an organised conspiracy against the nation".

"Party Government is the only alternative to Dictatorship in a modern State". Comment on the above statements.

দল পাকাইয়া জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধে চলা কয়েক দিনের জন্য সম্ভব হইলেও, বেশি দিন ইহা চলিতে পারে না। রাজনৈতিক দলের উদ্ভব যেখানেই নিষেধ করা হইয়াছে সেখানেই একনায়কশাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

আন্তর্জাতিকতা

১। **আন্তর্জাতিক শান্তির আদর্শঃ** প্রাচীন ভারতে যুদ্ধবিগ্রহকে উদ্যমশীল নৃপতির স্বাভাবিক কার্যরূপে গণ্য করা হইত। প্রাচীন গ্রীসেও এক নগর-রাষ্ট্র অন্য নগর-রাষ্ট্রের সহিত বিবাদ-বিসংবাদে রত থাকিত। কিন্তু ইহাতে ক্ষতির পরিমাণ ছিল সীমাবদ্ধ। কেন না কি প্রাচীন ভারতে কি গ্রীসে রাষ্ট্রের আয়তন ছিল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং যুদ্ধের সময়েও অসামরিক শ্রেণীদের বিশেষ কিছু ক্ষতি হইত না। আজকাল রাষ্ট্রগুলি কেবলমাত্র যে আকারেই বাড়ে নাই—যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র এবং রীতিনীতিও বদলাইয়াছে। এ যুগের যুদ্ধ হইতেছে সর্বাত্মক—তাহাতে সামরিক ও বেসামরিক শ্রেণীর ভেদ করা যায় না। এরোপ্লেন, ডুবোজাহাজ, আণবিক বোমা প্রভৃতি ব্যবহারের ফলে মানবসভ্যতা ধ্বংস হইবার আশংকা জন্মিতেছে।

একদিকে যানবাহনের ও সংবাদ আদান-প্রদানের সুবিধা হওয়ায় দেশ ও কালের ব্যবধান প্রায় লোপ পাইবার মত হইয়াছে। কিন্তু অন্যদিকে মানুষের মন এখনও আদিম যুগের বর্বরতার উপরে উঠিতে পারে নাই। মিলিয়া মিশিয়া একত্রে বসবাস করার পরিবর্তে এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রকে খর্ব করিয়া বা ধ্বংস করিয়া বড় হইতে চায়। ইহাই যুদ্ধের মৌলিক কারণ। কিন্তু যুদ্ধের আশংকাকে দূরীভূত না করিতে পারিলে মানুষের সুখ ও শান্তি আলেয়ার মতন অবাস্তব রহিয়া যাইবে।

সেইজন্য অনেক দিন হইতে অনেক মনীষী যুদ্ধ বন্ধ করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ও মহত্তম হইতেছেন প্রিয়দর্শী অশোক। তিনি কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে, আর কখনও যুদ্ধ করিবেন না। শুধু তাহাই নহে; তিনি সেকালের পরিচিত সকল সুসভ্য রাষ্ট্রে ধর্মপ্রচারক পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, এইবার ভেরী-ঘোষের পরিবর্তে ধর্ম-ঘোষ হউক; অর্থাৎ যুদ্ধের দামামা না বাজাইয়া ধর্মের সুশীতল ছায়ায় সকলকে আশ্রয়

গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করা হউক। তাঁহার সুদীর্ঘ রাজ্যকালে কোন অশান্তি দেখা দেয় নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর অল্পদিন পরে বোধ হয় এই শান্তিরক্ষার জন্য অসীম আকুতির ফলেই মৌর্য সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে শান্তির আদর্শ তিরোহিত হইল।

ইউরোপে মধ্যযুগে ক্যাথলিক চার্চ এবং হোলি রোমান্ সাম্রাজ্য খৃষ্টীয় ধর্মাবলম্বী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শান্তিরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু উক্ত উভয় প্রতিষ্ঠানই এত দুর্বল ছিল যে, বিবদমান নৃপতিরা উহাকে অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধে রত হইতেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে ফরাসী পণ্ডিত পিয়েরে দুবোয়া সর্বপ্রথম প্রস্তাব করেন যে সালিসি করিয়া ও আন্তর্জাতিক বিচারালয় স্থাপন করিয়া রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের মধ্যে বিবাদ মিটাইয়া দেওয়া উচিত। ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের চতুর্থ হেন্‌রীর অমাত্য সালী (Sully) পশ্চিম ইউরোপে পনেরটি রাষ্ট্র লইয়া এক পরিষদ গঠন করার প্রস্তাব করেন। যদি কোন সদস্য পরিষদকে অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধ করে, তাহা হইলে অন্য সকলে তাহাকে আক্রমণ করিয়া দাবাইয়া দিয়া শান্তি রক্ষা করিবে। এরূপ প্রস্তাবে সে সময়ে কেহ কর্ণপাত করে নাই। কেন না ১৬১৮ হইতে ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ত্রিশ বর্ষব্যাপী যুদ্ধে প্রোটেস্টাণ্ট ও ক্যাথলিকেরা নৃশংসভাবে পরস্পরকে হত্যা করিতেছিল। ঐ যুদ্ধের সময়ে ডাচ্ আইনবিদ্ হুগো গ্রোটিয়াস্ (Hugo Grotius) যুদ্ধের বর্বরতা কমাইবার জন্য "যুদ্ধ ও শান্তির আইন" নামে আন্তর্জাতিক আইনের সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ সময় হইতে আন্তর্জাতিক আইন সম্বন্ধে বই লেখা আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু উহা মানা বা না মানা রাষ্ট্রের মর্জির উপর নির্ভর করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে (১৭৯৫) জার্মান দার্শনিক ক্যাণ্ট "চিরস্থায়ী শান্তি" নামক গ্রন্থে একটি জাতিসংঘ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করেন। তিনি রাষ্ট্রগুলির নিরস্ত্রীকরণের পক্ষপাতী ছিলেন। সেই সময়ে ইউরোপে ফরাসী বিপ্লবের যুদ্ধ চলিতেছিল। সুতরাং তাঁহার কথায় কোন কাজ হয় নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হইয়াছিল। উহাতে পরাক্রান্ত রাষ্ট্রসমূহ যুদ্ধের নৃশংসতা দূর করিবার জন্য কতকগুলি প্রস্তাব স্বীকার করিয়া লন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাসের চেষ্টায় হল্যাণ্ডের অন্তর্গত হেগ নামক স্থানে ইউরোপের কয়েকজন সুবিখ্যাত

আইনজ্ঞকে লইয়া এক আন্তর্জাতিক বিচারালয় স্থাপিত হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদের মীমাংসা করিয়া দেওয়া ইহার অন্যতম কার্য ছিল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে হেগ নগরীতে আর একটি সম্মেলনের অধিবেশন হয় এবং তথায় সালিসের দ্বারা সমস্ত বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার প্রস্তাব উঠে। কিন্তু এরূপ প্রস্তাবে রাজী হইবার মতন মানসিক উন্নতি কোন রাষ্ট্রেরই হয় নাই। ইহার সাত বছর পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়।

২। **জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা ও উদ্যম (Work of the League of Nations):** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সুবিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন্ যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ স্থাপনের প্রস্তাব করেন। মিত্রশক্তিরা তাঁহার প্রস্তাব মানিয়া লইলেন। কিন্তু আমেরিকার সেনেট উহাতে সম্মত হইলেন না। তাই জাতিসংঘে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কখনই সদস্য হন নাই। পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্র রাশিয়াও ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বে উহার সদস্য পদ পান নাই। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে জাতিসংঘের প্রথম অধিবেশনে ৪২টি রাষ্ট্র যোগ দেয়। পরবর্তী দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে উহার সদস্য সংখ্যা ৫৫ হয়। কিন্তু ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ হইতে জাতিসংঘে ভাঙ্গন ধরিতে আরম্ভ করে। ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে জার্মানি জাতিসংঘের সংস্রব ত্যাগ করে। উহার দুই বৎসর পরে ইতালিও জার্মানির অনুসরণ করে।

জাতিসংঘের একটি সাধারণ সভা (Assembly) ছিল; উহাতে প্রত্যেক রাষ্ট্র তিনজনের অনধিক প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিত কিন্তু একটি রাষ্ট্রের একটির বেশি ভোট থাকিত না। সাধারণ সভা আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারক ও পরিষদের অস্থায়ী সদস্যদিগকে নির্বাচন করিত এবং দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য সম্মত হইলে যে কোন রাষ্ট্রকে সদস্য হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিত। জাতিসংঘের পরিষদে (Council) প্রথমে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালি ও জাপান এই পাঁচটি রাষ্ট্রের এক একজন স্থায়ী সদস্য ও অপ্রধান রাষ্ট্রগুলি হইতে চারজন অস্থায়ী সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যখন উহাতে যোগ দিল না, তখন স্থায়ী সদস্যের সংখ্যা কমাইয়া চার করা হইল। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে অস্থায়ী সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া এগার করা হইয়াছিল।

জাতিসংঘের কার্যবিধির অন্যতম নিয়ম ছিল যে, কোন গুরুতর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে উহার প্রত্যেক সদস্যের সম্মতি দরকার। জাতিসংঘের একটি স্থায়ী দপ্তর, স্থায়ী বিচারালয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা (International Labour Organisation, I. L. O.) ছিল। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রমিকদের অবস্থায় অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতিসংঘ বিশেষ সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই। ছোটখাট রাষ্ট্রদের মধ্যে বিবাদ মিটাইতে কতকটা সফল হইলেও বড় রাষ্ট্রের অন্যায়কে প্রতিরোধ করিবার শক্তি ইহার ছিল না। ইহার কোন সৈন্যবাহিনী ছিল না। কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে জাতিসংঘের সকল সদস্যের সম্মতির প্রয়োজন হইত, অথচ এরূপ সম্মতি পাওয়া একরকম অসম্ভব ছিল। জাতিসংঘ কোন রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে পারিত না।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে জাপান মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিল। জাতিসংঘ একটি তদন্ত কমিশন মাত্র নিযুক্ত করিয়া নিজের কর্তব্য সম্পন্ন করিল। ঐ কমিশন যখন জাপানের কাজকে অন্যায় বলিয়া নিন্দা করিল তখন জেহোল ও মঙ্গোলিয়ার মধ্যভাগ অধিকার করিয়া জাপান তাহার উত্তর দিল। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ইতালি আবেসিনিয়া বা ইথিওপিয়া আক্রমণ করিলে জাতিসংঘ তাহার বিরুদ্ধে আর্থিক বয়কট নীতি গ্রহণ করিল। কিন্তু তাহাতে ইতালি ভয় পাইল না। জাতিসংঘ জার্মানিকে সংযত করিতেও ব্যর্থ হইল। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়া গেল।

৩। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations Organisations বা U. N. O.) ঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব হইতেই ইংলণ্ড, রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি শক্তিশালী রাষ্ট্র চিরতরে যুদ্ধ বন্ধ করিবার উপায় খুঁজিতেছিল। কয়েক বৎসরের চেষ্টার ফলে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়। এবারে প্রথম হইতেই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া সদস্যপদ গ্রহণ করিল। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে, সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠার বৎসরে ইহাতে আমেরিকার ২২টি, ইউরোপের ১৪টি, এশিয়ার ৯টি, আফ্রিকার ৪টি ও ওশেনিয়ার ২টি, একুনে ৫১টি মাত্র রাষ্ট্র যোগ দিয়াছিল।

উহাদের নাম যথাক্রমে :—

আমেরিকার : (১) আর্জেন্টিনা (২) বলিভিয়া (৩) ব্রেজিল (৪) কানাডা (৫) চিলি (৬) কলম্বিয়া (৭) কোস্টারিকা (৮) কিউবা (৯) ডোমিনিকান সাধারণতন্ত্র (১০) ইকুয়েডোর (১১) এল সালভাডোর (১২) গুয়াতেমালা (১৩) হাইতি (পাশ্চাত্যের একমাত্র নিগ্রো সাধারণতন্ত্র) (১৪) হোণ্ডুরাস্ (১৫) মেক্সিকো (১৬) নাইকারগুয়া (১৭) পানামা (১৮) প্যারাগুয়ে (১৯) পেরু (২০) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র (২১) উরুগুয়ে (২২) ভেনিজুয়েলা।

ইউরোপ : (১) বেলজিয়াম (২) বাইলো রাশিয়া (৩) চেকোস্লোভোকিয়া (৪) ডেনমার্ক (৫) ফ্রান্স (৬) গ্রীস্ (৭) লাক্সেমবার্গ (৮) নেদারল্যাণ্ডস্ (৯) নরওয়ে (১০) পোলাণ্ড (১১) ইংলণ্ড (সংযুক্ত রাজ্য) (১২) যুগোস্লাভিয়া (১৩) ইউক্রেন (১৪) রাশিয়া।

এশিয়া : (১) চীন (চিয়াং কাইশেকের ন্যাশনালিস্ট চীন) (২) ভারত (৩) ইরাণ (৪) ইরাক (৫) লেবানন (৬) ফিলিপাইন (৭) তুরস্ক (৮) সাউদি আরেবিয়া (৯) ইয়েমেন (১৯৪৭)।

আফ্রিকা : (১) মিশর (২) ইথোপিয়া (৩) লাইবেরিয়া (৪) দক্ষিণ আফ্রিকা ;

অস্ট্রেলেশিয়া : (১) অস্ট্রেলিয়া (২) নিউজিল্যাণ্ড।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যসংখ্যা ৫১ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১১১ হইয়াছে। শুধু যে সংখ্যাই বাড়িয়াছে তাহা নহে, উহাতে ইউরোপ ও আমেরিকার যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল তাহা লোপ পাইয়াছে। গত ২০ বৎসরে আমেরিকার সদস্য সংখ্যা একেবারেই বাড়ে নাই ; তবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ২টি রাষ্ট্র বাড়িয়াছে। ইউরোপের ১৩টি রাষ্ট্র বাড়িয়াছে। আর এশিয়ার ১৭টি ও আফ্রিকার ৩০টি নূতন রাষ্ট্র উহার সদস্য হইয়াছে। আফ্রিকা-এশিয়ার লোকদের মধ্যে একটা সংহতির ভাব দেখা যাইতেছে বলিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি দাবি করিতেছে যে, রাষ্ট্রের ধনবল, জনবল ও সামরিক গুরুত্ব প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় (Assembly) ওজনকরা ভোটদান পদ্ধতি (Weighted Voting) প্রবর্তন করা হউক। বড় বড় রাষ্ট্রকে অনেকগুলি ভোট দিবার ক্ষমতা দেওয়া হউক। এখন

ছোট বড় প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটি মাত্র ভোট দিবার অধিকার আছে। বড় রাষ্ট্রগুলি বলিতেছে যে, এশিয়া ও আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে এখন শুধু চালাইবার অধিকার পায় নাই, উহাকে বগল-দাবা করিয়া পালাইবার ক্ষমতাও পাইয়াছে ("They have got the power not only of running but also of running away with it".)। ইহার উত্তরে আফ্রিকা ও এশিয়া বলিতেছে বড় বড় রাষ্ট্রের গণতন্ত্রে যখন ছোট বড় প্রত্যেক মানুষের একটির বেশি ভোট নাই, তখন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে বড় রাষ্ট্রদের বেলায় পৃথক ব্যবস্থা কেন হইবে? মনে রাখা প্রয়োজন যে, এশিয়া ও আফ্রিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নূতন রাষ্ট্রগুলি এখন পর্যন্ত ইউরোপের বিভিন্ন ঔপনিবেশিক প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারে নাই। সুতরাং এখন পর্যন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে ওজনকরা ভোটদানের পদ্ধতি প্রবর্তনের দাবি বিশেষ জোরালো করিবার প্রয়োজন হয় নাই। ১৯৬০ ও ১৯৬১ সালের মধ্যে আফ্রিকার অধিকাংশ রাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য হইয়াছে। ১৯৪৬ হইতে ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যে যে নূতন রাষ্ট্র সদস্য হইয়াছে তাহাদের নাম ও তাহাদের পাশে প্রবেশের তারিখ দেওয়া হইল :—

ইউরোপ : (১) আলবেনিয়া ১৯৫৫ (২) অস্ট্রিয়া ১৯৫৫ (৩) আয়ার্ল্যাণ্ড ১৯৫৫ (৪) ইতালি ১৯৫৫ (৫) বুলগারিয়া ১৯৫৫ (৬) সাইপ্রাস ১৯৬০ (৭) ফিনল্যাণ্ড ১৯৫৫ (৮) হাঙ্গেরী ১৯৫৫ (৯) আইস্‌ল্যাণ্ড ১৯৪৬ (১০) পর্তুগাল ১৯৫৫ (১১) স্পেন ১৯৫৫ (১২) রুমানিয়া ১৯৫৫ (১৩) সুইডেন ১৯৪৬।

এশিয়া : (১) আফগানিস্তান ১৯৪৬ (২) জাপান ১৯৫৬ (৩) জর্ডান ১৯৫৫ (৪) লাওস ১৯৫৫ (৫) বর্মা ১৯৪৮ (৬) কাম্বোডিয়া ১৯৫৫ (৭) সিংহল ১৯৫৫ (৮) মালয় যুক্তরাষ্ট্র ১৯৫৭ (৯) ইন্দোনেশিয়া ১৯৫০ (১০) ইস্রায়েল ১৯৪৯ (১১) মঙ্গোলিয়া ১৯৬১ (১২) নেপাল ১৯৫৫ (১৩) ভারত ১৯৪৭ (১৪) পাকিস্তান ১৯৪৭ (১৫) সিরিয়া ১৯৬১ (১৬) থাইল্যাণ্ড ১৯৪৬ (১৭) কুওয়েট (১৮) সংযুক্ত আরব গণতন্ত্র।

আফ্রিকা : (১) আইভরি কোস্ট ১৯৬০ (২) লিবিয়া ১৯৫৫ (৩) মাদাগাস্কার ১৯৬০ (৪) আপার ভোল্টা ১৯৬০ (৫) কামেরুণ ১৯৬০ (৬) মধ্য আফ্রিকা সাধারণতন্ত্র ১৯৬০ (৭) চাদ ১৯৬০ (৮) কাঙ্গো (ব্রাজাভিলি)

১৯৬০ (৯) কঙ্গো (লিওপোল্ডভিলি) ১৯৬০ (১০) দাহোমে ১৯৬০ (১১) গ্যাবন ১৯৬০ (১২) ঘানা ১৯৫৭ (১৩) গিনিয়া ১৯৫৮ (১৪) ম্যালাগ্যাসি সাধারণতন্ত্র ১৯৬০ (১৫) মালি ১৯৬০ (১৬) মাউরিট্রানিয়া ১৯৬১ (১৭) মোরক্কো ১৯৫৬ (১৮) নাইগার ১৯৬০ (১৯) নাইজেরিয়া ১৯৬০ (২০) সাইরোলিওনে ১৯৬১ (২১) সোনিগাল ১৯৬০ (২২) সোমালিয়া ১৯৬০ (২৩) সুদান ১৯৫৬ (২৪) টাংগানায়িকা ১৯৬১ (২৫) টোগো ১৯৬০ (২৬) টিউনিসিয়া ১৯৫৬ (২৭) আলজেরিয়া (২৮) বুরুণ্ডি (২৯) রুআন্দ্রা (৩০) উগান্দ্রা।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পৃথিবীর মধ্যে জনসংখ্যায় সব চেয়ে বড় রাষ্ট্র চীন নামে সদস্য হইলেও, কাজে প্রতিনিধি পাঠাইবার ক্ষমতা পায় নাই। কেন না ঐ ক্ষমতা ফর্মোজা দ্বীপে পলায়িত ন্যাশনালিস্ট দল ভোগ করিতেছে। জার্মানির পূর্ব বা পশ্চিম অঞ্চলের সরকার এখনও সদস্য হয় নাই। সুইট্জারল্যাণ্ড সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য নহে। যদিও জেনিভাতে উহার ইউরোপীয় প্রধান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান কার্যালয় নিউইয়র্কে অবস্থিত। *

* সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যরাষ্ট্রের নাম ইংরাজী [illegible]

(1) Afghanistan (2) Albania (3) Algeria (4) Argentina (5) Australia (6) Austria (7) Belgium (8) Bolivia (9) Brazil (10) Bulgaria (11) Burma (12) Burnudi (13) Byclorussia (14) Cambodia (15) Cameroon (16) Canada (17) Central African Republic (18) Ceylon (19) Chad (20) Chile (21) China (22) Colombia (23) Congo (24) Congolese (25) Costa Rico (26) Cuba (27) Cyprus (28) Czechoslovakia (29) Dahomey (30) Denmark (31) Dominican Republic (32) Ecuador (33) Ethiopia (34) Finland (35) France (36) Gaboon (37) Ghana (38) Greece (39) Gnatemala (40) Guinea (41) Haiti (42) Honduras (43) Hungary (44) Iceland (45) India (46) Indonesia (47) Iraq (48) Republic of Ireland (49) Israil (50) Italy (51) Ivory Coast (52) Jamaica (53) Japan (54) Jordon (55) Kuwait (56) Laos (57) Lebanan (58) Liberia (59) Libya (60) Luxemburg (61) Madagascur (62) Mylasia (63) Mali (64) Manritania (65) Mexico (66) Mongolia (67) Morocco (68) Nepal (69) Netherlands (70) Newzealand (71) Nicargua (72) Niger (73) Nigeria (74) Norway (75) Pakistan (76) Panama (77) Paraguay (78) Persia (79) Peru (80) Philippines (81) Poland (82) Portugal (83) Rumania (84) Ruanda (85) Salvador (86) Saudi Arabia (87) Senegal (88) Sierra Leone (89) Somalia (90) South Africa

৪। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সংগঠন : সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র পাঁচজনের অনধিক প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে ; কিন্তু একটি রাষ্ট্রের একটি মাত্র ভোট আছে। শান্তিরক্ষা, নূতন সদস্যকে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা দান, অছি পরিষদের (Trusteeship Council) কার্য বিবেচনা প্রভৃতি বিষয়ে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা কার্য নির্বাহ করা হয়। সাধারণ সভা শান্তিরক্ষা বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু কাহাকেও উহা মানিতে বাধ্য করিতে পারে না। জাতিসংঘে সাধারণ সভাকে পরিষদ অপেক্ষা বেশি গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল ; কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার সময় পরিষদকেই শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদত্ত হইয়াছিল। পরিষদে বড় রাষ্ট্র পঞ্চকের ভিটো ক্ষমতা আছে বলিয়া কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করাই সম্ভব হইতেছে না। তাই সম্প্রতি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের চার্টার বা সংবিধান না বদলাইয়া সাধারণ সভাকে অনেক প্রয়োজনীয় কার্যভার সমর্পণ করা হইতেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, সাধারণ সভা The Interim Committee, the Collective Measures Committee এবং Peace observation Commission স্থাপন করিয়াছে ও Uniting for Peace প্রস্তাব পাশ করিয়াছে।

সাধারণ সভা

সুরক্ষা পরিষদে এগার জন সদস্য আছেন, তাহার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন স্থায়ী সদস্য আর বাকী ছয়জন প্রতি দুইবৎসর পর পর অস্থায়ী ভাবে নির্বাচিত হন। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রধান দায়িত্ব সুরক্ষা পরিষদের উপর। সাধারণ বিষয়ে (Procedural matters) ১১ জনের মধ্যে যে কোন ৭জনের মত পাইলে সেই অনুসারে কাজ করা হয়, কিন্তু অন্য সব বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে হইলে শুধু ৭ জন সদস্যের মত

সুরক্ষা পরিষদ ও ভেটো ক্ষমতা

(91) Spain (92) Sudan (93) Sweden (94) Syria (95) Tangyayika (96) Thailand (97) Togo (98) Triudiad and Tobago (99) Tunisia (100) Turkey (101) Uganda (102) Ukrainia (103) U. S. S. R. (104) United Arab Republic (105) U. K. (106) U. S. A. (107) Uruguay (108) Venezuela (109) Voltaic Republic (110) Yemen (111) Yugoslavia.

থাকিলে চলিবেনা, পাঁচজন স্থায়ী সদস্যের প্রত্যেকের মত থাকা প্রয়োজন। ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, পাঁচটি বড় রাষ্ট্রের প্রত্যেকের যে কোন প্রস্তাব নাকচ করিয়া দিবার (Veto) ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতার বলে বড় রাষ্ট্রগুলি ছোটদের উপর কিছুটা প্রাধান্য বজায় রাখিতে পারে। রাশিয়া এই ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া অনেক প্রস্তাব নাকচ করিয়া দিয়াছে। ভেটো ক্ষমতা থাকার দরুণ সুরক্ষা পরিষদের পক্ষে কোন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কার্য করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

আগেকার জাতিসংঘের হাতে কোন সামরিক শক্তি ছিল না. সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি সামরিক কমিটি (Military Staff Committee) গঠিত হইয়াছিল। উহাতে স্থায়ী রাষ্ট্রপঞ্চকের প্রধান প্রধান সেনানায়ককে সদস্য করা হইয়াছিল। শান্তির ব্যাঘাত ঘটিতে পারে এমন কোন অবস্থায় ঐ কমিটির অবিলম্বে কার্যক্রম স্থির করিবার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু রাশিয়ার বাধা দেওয়ার ফলে ঐ কমিটি অকেজো হইয়া গিয়াছে।

সামরিক কমিটি

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি বড় দপ্তর আছে। উহার প্রধান সম্পাদক (Secretary General) সুরক্ষা পরিষদের সুপারিশে সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত হন। দপ্তরে বিভিন্ন রাষ্ট্রের লোকে কাজ পাইয়াছেন।

আন্তর্জাতিক বিচারালয় জাতিসংঘের Permanent court of International Justice-এর ভিত্তিতে গঠিত। ইহা শুধু আইনঘটিত প্রশ্নের মীমাংসা করে; রাজনৈতিক সমস্যাগুলি সুরক্ষা পরিষদের আওতায় পড়ে। ইহাতে সুরক্ষা পরিষদ ও সাধারণ সভার দ্বারা নির্বাচিত ১৪ জন বিচারক আছেন। ইহা নেদারল্যাণ্ডস্থিত হেগ নগরীতে অবস্থিত।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার দ্বারা নির্বাচিত ১৮ জন সদস্য লইয়া আর্থিক ও সামাজিক পরিষদ নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা আছে। ইহার সদস্যগণ তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। রুগ্ন, দরিদ্র ও নিরক্ষরদিগকে সাহায্য করিবার জন্য ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মানবীয় অধিকার সংরক্ষণ করা ইহার একটি প্রধান কার্য। আর্থিক ও স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় সমস্যা হইতে যুদ্ধের উদ্ভব ঘটে বলিয়া এই পরিষদ ঐ সব সমস্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া সাধারণ সভার নিকট রিপোর্ট পেশ করেন।

অনুন্নত ও প্রাক্তন সাম্রাজ্যভুক্ত কতকগুলি দেশের শাসনকার্য পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য একটি অছি পরিষদ (Trusteeship Council) আছে। ইহার সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট নাই। যে সব রাষ্ট্র অছির কার্য করে এবং সুরক্ষা পরিষদের যে সব সদস্য অছিগিরি করেনা তাহারা এবং সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত কয়েকজন অতিরিক্ত সদস্য লইয়া ইহা গঠিত।

এই সব সংস্থা ছাড়া International Labour Office (I.L.O.) খাদ্য ও কৃষি প্রতিষ্ঠান (F.A.O.), শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (UNESCO.) পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক (Bank), আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার (Fund), আন্তর্জাতিক Finance Corporation (I.F C.), বিশ্ব স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান (W.H.O.), আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (I A.E.A.) প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ প্রতিষ্ঠান (Specialised Agencies) আছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্যে আন্তর্জাতিক সাহায্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের রাজনৈতিক কার্য নিরস্ত্রীকরণের ন্যায় গুরুতর বিষয়ে বিন্দুমাত্র সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু উহার অ-রাজনৈতিক সংস্থাসমূহ বিশ্বের মানুষকে এক সমাজভুক্ত করিবার কাজে অগ্রণী হইয়াছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উপর যদি ইহার সদস্যদের আস্থা থাকিত এবং তাঁহারা সত্য সত্যই শান্তিকামনা করিতেন, তাহা হইলে আর উহার বাহিরে তাঁহারা নানারূপ সন্ধিমূলক সংগঠনে আবদ্ধ হইতেন না। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, আইসল্যাণ্ড, নরওয়ে, গ্রেটবিটেন, নেদারল্যাণ্ডস, ডেনমার্ক, পশ্চিম জার্মানি, বেলজিয়াম, লাক্সেমবার্গ, ইটালি, পর্তুগাল, ফ্রান্স, গ্রীস ও তুরস্ক North Atlantic Treaty Organization বা NATO সংগঠন করিয়াছেন। সদস্যদের মধ্যে এক জনের উপর আক্রমণ হইলে অন্য সকলে আক্রান্ত হইয়াছেন মনে করিবেন। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, নিউজিল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যাণ্ড, পাকিস্তান ও ফিলিপাইন South Eass Asia Treaty Organisation (SEATO) সংগঠন করিয়াছেন। সদস্যদের কেহ আক্রান্ত হইলে অন্য সকলে অবিলম্বে সকলের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। এইরূপ অনেকগুলি আঞ্চলিক চুক্তি

সম্পন্ন করা হইয়াছে। হিংসা, বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস হইতে বিশ্বমৈত্রী উদ্ভূত হইতে পারে না।

৫। **পঞ্চশীল ঃ** আন্তর্জাতিকতার ভাব উৎপাদন ও সংরক্ষণ করিবার জন্য পঞ্চশীল নীতি সর্বাপেক্ষা মহৎ আদর্শ। ভগবান্ বুদ্ধের বাণীর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া আধুনিক ভারত ইহা ঘোষণা করিয়াছে। ইহার মূল নীতি হইতেছে--(১) পরস্পরের জনপদের অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা (২) আক্রমণ হইতে বিরতি (৩) পরস্পরের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা (৪) সকল রাষ্ট্রকে সমান বলিয়া গণ্য করা এবং পরস্পরের উপকার সাধন করা এবং (৫) শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান। শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি না মানিলে মানব-সমাজ একসঙ্গে ধ্বংস হইবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইহাই চরম সিদ্ধান্ত।

অনুশীলন

১। "The United Nations is neither a world government nor a federation, but an association of sovereign states." Elucidate.

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বিশ্ব-সরকার প্রতিষ্ঠা করে নাই, কেননা ইহার সুরক্ষা পরিষদ এবং সাধারণ সভার হাতে এমন ক্ষমতা নাই যাহার দ্বারা সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত রাখা যায়। সমস্ত রাষ্ট্রের উপরে এক মহান্ বিশ্বরাষ্ট্র গঠন করার চেষ্টা এখন পর্যন্ত করা হয় নাই। ঐরূপ রাষ্ট্র জনসাধারণের পক্ষে হিতকর কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এক যুক্তরাষ্ট্রও গঠন করে নাই। প্রত্যেক রাষ্ট্র তাহার এক্তিয়ারের মধ্যে কিছু কিছু বিষয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হাতে অর্পণ করে নাই। সমস্ত বিষয়ই সদস্য রাষ্ট্রেরা নিজে নিজে পরিচালনা করে। তাই বলা হয় যে সম্মিলিতপুঞ্জ সার্বভৌমিক রাষ্ট্রগুলির একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র। ইহার সার্বভৌম শক্তি নাই। যুক্তি পরামর্শ ও আলোচনার দ্বারা কতকগুলি ব্যাপারে একত্র মিলিত হইয়া কাজ করাই ইহার অভিপ্রায়।

২। Outline the constitution and functions of the United Nations Organisation.

চতুর্থ প্রকরণ দেখ।

৩। In what way is the United Nations superior to the League of Nations ?

দ্বিতীয় প্রকরণ দেখ।

জাতি সংঘে আমেরিকা যোগ দেয় নাই। ইহার নিয়ম ছিল যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সকল সদস্যের সম্মতি আবশ্যক। কিন্তু এরূপ সম্মতি পাওয়া অসম্ভব ছিল। তাই ইহা বিশ্বশান্তি রক্ষা করিতে পারে নাই।

নির্ঘণ্ট

পরিভাষা

Absolute Monarchy—নিরংকুশ

Administrative Law—শাসন-বিভাগীয় আইন

Allegiance—আনুগত্য

Amendment—সংশোধন

Anarchism—নৈরাজ্যবাদ

Analytical concept—বিশ্লেষণাত্মক ধারণা

Analytical jurists—আইনাজ্ঞগণ

Association—সংঘ

Authority—কর্তৃত্ব

Bicameral Legislature—দ্বিসদনীয় আইনসভা

Bureaucracy—দপ্তরশাহী

Cabinet—মন্ত্রিপরিষদ

Capitalism—ধনতন্ত্রবাদ

Citizenship—নাগরিকতা

Civil equality—ব্যক্তিগত সাম্য

Civil Liberty—নাগরিক স্বাধীনতা

Civil rights—সামাজিক অধিকার

Civil Service—রাষ্ট্রীয় কর্মচারিবৃন্দ

Clan—গোষ্ঠী

Collectivism—সমূহতন্ত্রবাদ

Common Law—চিরাচরিত আইন

Communism—সাম্যবাদ

Confederation—রাষ্ট্রসমবায়

Constituency—নির্বাচনক্ষেত্র

Constitution—সংবিধান

Constitutional Law—সংবিধানী কানুন

Constitutional Monarchy—নিয়মতান্ত্রিক রাজ

Contract theory—সামাজিক চুক্তিবাদ

Cumulative vote—স্তূপীকৃত ভোটদান পদ্ধতি

Decentralization—বিকেন্দ্রীকরণ নীতি

De facto—বাস্তব

De jure—আইনানুমোদিত

Deliberative—নীতিনির্ধারণমূলক

Despotism—স্বৈরাচার

Dictatorship—একনায়কতন্ত্র

iplomatic power—কূটনৈতিক ক্ষমতা

Distribution of powers—ক্ষমতাবণ্টন

Divine Origin Theory—দৈবী উৎপত্তিমূলক সিদ্ধান্ত
Divine Right—দৈবী অধিকার
Electorate—নির্বাচকমণ্ডলী
Equity—শাশ্বত নীতি
Executive—শাসনবিভাগ, কার্যাংগ
Fabian Socialism—ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রবাদ
Federal Government—সংঘীয় রাষ্ট্র
Feudal state—সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র
Flexible constitution—নমনীয় বা সুপরিবর্তনীয় সংবিধান
Force theory—বলাত্মক উৎপত্তিবাদ
Functions of state—রাষ্ট্রের কার্যাবলী
Fundamental Rights—মৌলিক অধিকার
General will—সমষ্টিগত ইচ্ছা
Government—সরকার, শাসন-পদ্ধতি
Guild socialism—সংঘ সমাজ-তন্ত্রবাদ
Historical Theory—বিবর্তন মতবাদ
Idealism—আদর্শবাদ
Imperialism—সাম্রাজ্যবাদ
Indirect election—পরোক্ষ নির্বাচন
Individualism—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ
Initiative—গণউদ্যোগ
Judiciary—বিচারবিভাগ
Juristic method—আইনগত ন্যায়াংগ
Juristic theory—কানুনী সিদ্ধান্ত
Law—আইন, বিধান
Law of Nature—প্রাকৃতিক বিধান
Legislature—আইনসভা, আইনাঙ্গ
Liberty—স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা
Majority—সংখ্যাগরিষ্ঠ
Minority—সংখ্যালঘিষ্ঠ
Monism—একত্ববাদ
Morality—নীতি, নৈতিক নিয়ম
Moral Law—নৈতিক বিধান
Municipal Law—রাষ্ট্রীয় বিধান
Nation—নেশন, জাতি
Nationalism—ন্যাশনালিজম, জাতীয়তাবোধ
Natural Law—প্রাকৃতিক বিধান
Naturalisation—অনুমোদনসিদ্ধ
Natural Rights—স্বাভাবিক অধিকার
Oligarchy—কুলীনতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র
Ordinance—শাসনবিভাগীয় আইন
Organic theory—জৈব মতবাদ
Parliamentary Government—সংসদীয় শাসন
Parties—রাজনৈতিক দল
People—জনসমাজ
Plebiscite—গণভোট

Pluralism—বহুত্ববাদ

Plural voting—একাধিক ভোটদান

Population—জনসমষ্টি

Presidential Government—রাষ্ট্রপতির শাসন

Proportional Representation—সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব

Public Opinion—জনমত

Recall পদচ্যুতি

Referendum—গণভোট

Rigid দুষ্পরিবর্তনীয়

Right—অধিকার

Secession—ব্যবচ্ছেদ

Secretariat—দপ্তর

Security Council—নিরাপত্তা পরিষদ্

Self-determination—আত্মনির্ধারণ

Separation of Powers—ক্ষমতা বিভাগ

Society—সমাজ

Sources of Law—বিধানের বা আইনের উৎস

Soveriegnty—সার্বভৌমিকতা

Spheres of state activity—রাষ্ট্রের কার্যক্ষেত্র

Statistical method—পরিসংখ্যান-মূলক পদ্ধতি

Suffrage—ভোটের অধিকার

Syndicalism—রাষ্ট্রহীন সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ

Tyranny—স্বৈরাচারতন্ত্র

Trusteeship council—অছি পরিষদ

United Nations—সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ

Unitary State—এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র

Upper House—উচ্চসদন

Utopian socialism—কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদ

Welfare Theory—জনকল্যাণ নীতি